সুন্নতে নববী
ও
আধুনিক বিজ্ঞান

অনুবাদ সম্পাদনা
খাদিজা আখতার রেজায়ী

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স

সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান

প্রথম ও
দ্বিতীয় খণ্ড

হাকীম মোহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাঈ

অনুবাদ সহযোগী
মাওলানা এ বি এম কামাল উদ্দীন শামীম

অনুবাদ সম্পাদনা
খাদিজা আখতার রেজায়ী

AL QURAN ACADEMY PUBLICATIONS

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান
হাকীম মোহাম্মদ তারেক মাহমুদ চুগতাঈ
প্রকাশক
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
ডাইরেক্টর জেনারেল, আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স
ইউনিট ৩.২১, ৬৫ হোয়াইটচ্যাপল রোড, লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ডি ইউ, ইউ কে
ফোন : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০
বাংলাদেশ সেন্টার
বিক্রয় কেন্দ্র : ❑ ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০০৮৮০-২-৯৩৩৯৬১৫, মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩ ৯৯৭
❑ বাড়ী ১, রোড ১৬, ব্লক জে, বারিধারা, ঢাকা, ফোন : ০০৮৮-০২-৫৮৮১১৩৫৭
❑ ৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা, মোবাইল : ০১৮৫৯ ৫৫৫১৪১
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৬
৫ম সংস্করণ ঃ শাওয়াল ১৪৩৬, আগস্ট ২০১৫, শ্রাবণ ১৪২২
স্বত্বঃ প্রকাশক
বিনিময় : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Sunnat-e- Nabobi O Adhunik Bijyan
Hakim Mohammed Tareque Mahmood Chugtai
Editor for Bengali Translation
Khadija Akhter Rezayee
Published by
Hafiz Munir Uddin Ahmed
Director General
Al Quran Academy Publications
Unit 3.21 (3rd Floor), 65 Whitechapel Road, London, E1 1DU, UK
Phone: 0044 020 7650 8770
Bangladesh Centre
Sales Centre : ❑ 507/1 (362) Wireless Rail Gate, Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 00880-2-9339615, Mobile : 01818 363 997
❑ House 1, Road 16, Block J, Baridhara, Dhaka, Phone : 02-58811 357
❑ 38/3 Computer Market, Shop no 215, Banglabazar, Dhaka
Mobile : 01859 555 141
Ist Edition : April 2006
5th Edition : Shawal 1436, August 2015
Price Tk. 150.00
E-mail: info@alquranacademypublications.com
website: www.alquranacademypublications.cm
ISBN-978-984-90573-7-6

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা কোরআনে কারীমের সূরা আল বাকারার প্রথম আয়াতে বলেছেন, 'এই কেতাব শুধু তাদেরই পথ দেখাবে যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে'। অতপর যারা ভয় করে তাদের যে বিস্তারিত পরিচয় তিনি এখানে তুলে ধরেছেন তার প্রথম কথাই হচ্ছে- 'যারা গায়বের ওপর ঈমান আনে'।

কোরআনে কারীমের এ আয়াত মোতাবেক একজন পরহেযগার মোত্তাকী লোকের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তিনি গায়বের ওপর ঈমান আনবেন। আভিধানিক আরবী ভাষায় 'গায়ব' হচ্ছে ঠিক 'হাযির'-এর প্রতিশব্দ। যা আমার সামনে আছে, যাকে আমি আমার চোখ দিয়ে দেখতে পারি, হাত দিয়ে ধরতে পারি, কান দিয়ে শুনতে পারি তাই 'হাযির'। আবার এর বিপরীত যা আমার সামনে নেই, যা আমি চোখ দিয়ে দেখি না, হাত দিয়ে ধরতে পারি না, কান দিয়ে শুনতে পাই না তাই 'গায়ব'। এই বাহ্যিক আভিধানিক অর্থের পেছনে 'গায়ব' শব্দের ব্যাপক কিছু ব্যবহারিক অর্থও আছে। সে আলোকে 'গায়ব' শুধু তাই নয়- যা দেখা যায় না, ধরা যায় না ও শোনা যায় না। সে অর্থে- পাঁচটি ইন্দ্রীয় শক্তির ধরাছোঁয়ার বাইরের বিষয়ই হচ্ছে গায়ব।

কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি, যেমন মক্কা মদীনা আমি দেখি না বলে তা আমার কাছে 'গায়ব', কিন্তু যারা তা দেখেছেন তাদের কাছে তা 'গায়ব' নয়। কোরআনের বর্ণিত 'গায়ব' হচ্ছে এমন কিছু, যা মানুষ দেখেনি, শুনেনি- যার কল্পনাও সে করতে পারেনি। যেমন জান্নাত জাহান্নাম- এগুলো শুধু যে কেউ দেখেনি তাই নয়- এগুলোর কল্পনা করাও কোনো মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। কোরআনে 'গায়ব' নামে যে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার সত্যিকার ভাবার্থ সম্ভবত তাই। আর এমনি 'গায়বী' বিষয়ের ওপর ঈমান আনাকেই কোরআনে আল্লাহ তায়ালা পরহেযগার ব্যক্তির প্রথম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতের আলোকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও শরা শরীয়তের কোথাও মুসলমানদের 'যুক্তির' পেছনে ধাওয়া করার অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি- যারা জেনে বুঝে বিজ্ঞানের মানদন্ডে চুলচেরা পর্যালোচনা করে ঈমান আনে তারাই পরহেযগার, মোত্তাকী ব্যক্তি। আসলে যত্রতত্র যুক্তি খোঁজার এই মানবীয় চরিত্রের কথা আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত রয়েছেন বলেই তিনি শুরুতেই তার মন থেকে এ বিষয়টি ঝেড়ে মুছে সাফ করে দিতে চান। মানব সন্তানের প্রতি তাই তার স্রষ্টার প্রথম দাবী হচ্ছে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে আগে- না দেখে- হাঁ, গায়বের ওপর একবার বিশ্বাস স্থাপন করার পর তুমি তোমার মানসিক স্বস্তির জন্যে যুক্তির সন্ধান করলে করতে পারো।

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর সমীপে আরয করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, আমি মৃতকে জীবন দান করতে পারি! ইবরাহীম (আ.) বললেন, অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি। তবে দেখতে পেলে আমার মনটা একটু স্বস্তি পেতো। তারপর আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করার প্রক্রিয়াটা তাকে দেখালেন।

কোরআনের পাতায় আল্লাহ তায়ালার শেখানো এই পদ্ধতির পরিবর্তে আজ আমরা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন তরিকায় সত্যের সন্ধান করতে শুরু করেছি। আল্লাহ তায়ালার কোনো আয়াত কিংবা রসূল (স.)-এর কোনো হাদীস আমাদের সামনে এলে আগে আমরা যুক্তি তথা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার আলোকে তা যাচাই বাছাই করতে চাই। আল্লাহর নবী যখন মে'রাজ থেকে এসে সাহাবীদের সামনে তাঁর দীর্ঘ সফরের কাহিনী বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আবু বকর সাথে সাথেই বললেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন- এটাই আমার কাছে বড়ো কথা। এক কাফের নেতা বললো, হে আবু বকর, আসলেই কি তুমি বিশ্বাস করো যে, কোনো রকম বাহ্যিক বাহন ছাড়াই মোহাম্মদ এ স্বল্প সময়ে মহাকাশের বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে পুনরায়

www.nagorikpathagar.org

তুমি বিশ্বাস করো যে, কোনো রকম বাহ্যিক বাহন ছাড়াই মোহাম্মদ এ স্বল্প সময়ে মহাকাশের বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে পুনরায় যমীনে ফিরে এসেছেন। সাথে সাথেই তিনি বললেন, অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি। তিনি আল্লাহর নবী, তাঁর কথা বিশ্বাস করার জন্যে এটুকুই আবু বকরের জন্যে যথেষ্ট ছিলো, এ কারণেই ইতিহাস তাকে নাম দিয়েছে 'সিদ্দীকে আকবর'।

আজ আমরা চৌদ্দশ' বছর পরে এসে তাঁর মে'রাজের এ মহাকাশ পরিভ্রমণকে নানা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়ে পেশ করার কসরত করছি। বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক কোথাও কিছু পাওয়া গেলে সাথে সাথে তার ব্যাপারে আপত্তিকর কিছু মন্তব্য জুড়ে দিতেও আমরা দ্বিধা করি না।

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন তার প্রকাশিত কোরআন, কোরআনের অনুবাদ, কোরআনের তাফসীর, কোরআন ও সীরাতমুখী সাহিত্যের পাতায় এ কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে পেশ করেছে যে, কোরআনের আয়াত ও রসূলের হাদীসকে মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞানের আলোকে যাচাই বাছাই করার আমরা নীতিগতভাবে বিরোধী। আমরা বিশ্বাস করি, স্থায়ী ও অমোঘ একটা সত্যকে অস্থায়ী ও নিত্য পরিবর্তনশীল স্থূল মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করা যায় না। বিজ্ঞানের কিছু সূত্র অনুধাবনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধান নাযিল করেননি। কোরআনের আয়াত ও রসূলের হাদীসকে বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করার এই ফ্যাশন আমাদের ধীরে ধীরে যুক্তিনির্ভর একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করবে। যেখানে মানবীয় মূল্যবোধ, নীতিনৈতিকতা একদিন সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে।

আমরা বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানের অবাধ আলোচনা ও যুক্তির নিষ্টকণ্টক পর্যালোচনা মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষের জন্যে একান্ত জরুরী, তবে তা কোনো অবস্থায়ই আমাদের 'গায়ব'-এর ওপর ঈমান আনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান' বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার আগে আমি এ কয়টি কথা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলা জরুরী মনে করেছি। কোরআন ও বিজ্ঞান, হাদীস ও বিজ্ঞান বিষয়গুলো নিয়ে ইদানীং প্রয়োজনের চাইতে একটু বেশীই আমরা উৎসাহী হয়ে পড়েছি। কোরআন হাদীসের শাশ্বত বিষয়গুলোকে বিজ্ঞানের কতিপয় অস্থায়ী উপকরণের সাথে সামঞ্জস্যশীল বানাতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমরা এমনি তালগোল পাকিয়ে ফেলি যে, মূল সত্যই আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়।

মনে রাখতে হবে, কোরআন হাদীস কোনো বিজ্ঞানের বই নয়। এর কোনো বিষয় যদি বিজ্ঞানের আবিষ্কার উদ্ভাবনীর সাথে মিলে যায় তাহলে সেটা হবে বিজ্ঞানেরই সাফল্য, আর তা একজন মুসলমানের মনে কিছুটা স্বস্তিই যোগাবে মাত্র। তার মৌলিক ঈমান আকীদায় তা কিন্তু কোনো প্রভাব ফেলবে না, কেননা তার ঈমানের মূল ভিত্তি হলো 'গায়ব'- বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত কোনো সূত্র নয়। আবার যদি কোথাও কোরআন ও হাদীসের কোনো চিরন্তন বিধি-বিধানের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত কোনো বিষয়ের গরমিল দেখা যায় তাহলে তাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যর্থতা ও দীনতাই বলতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে সেদিনের- যেদিন বিজ্ঞান তার আবিষ্কার উদ্ভাবনীকে কোরআন হাদীসের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

এই কথাগুলো সামনে রেখে আপনি যদি আমাদের প্রকাশিত 'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান' বইটি পড়তে শুরু করেন তাহলে আপনার মনে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সুন্নতে রসূলের কোনো দ্বন্দ্ব লাগবে না।

'সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান' বিষয় নিয়ে যে দুর্লভ সংগ্রহ বিখ্যাত চিকিৎসক হাকীম তারেক মাহমুদ চুগতাই করেছেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। তিনি তার পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় একথা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর নবীর কোনো কথা ও কাজ বিজ্ঞানের যুক্তির বাইরে ছিলো না।

বর্তমান পুস্তকটির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুন্নতে নববীর আরো কাছাকাছি নিয়ে আসুন, এই কামনা করি।

আহকার
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

❑ প্রথম অধ্যায় ঃ ৭
মেসওয়াক এবং আধুনিক বিজ্ঞান

❑ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ১৫
ওযু

❑ তৃতীয় অধ্যায় ঃ ২৩
নামায

❑ চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৩৪
নামাযের সময় এবং আধুনিক বিজ্ঞান

❑ পঞ্চম অধ্যায় ঃ ৩৭
নামাযের রোকনসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

❑ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ৪১
নামাযের বিশেষ উপকারিতা

❑ সপ্তম অধ্যায় ঃ ৪৪
নামায, মোরাকাবা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

❑ অষ্টম অধ্যায় ঃ ৪৯
রোযা

❑ নবম অধ্যায় ঃ ৬৩
বিশ্রাম, শয়ন এবং ঘুম

❑ দশম অধ্যায় ঃ ৯৬
পোশাক

❑ একাদশ অধ্যায় ঃ ১০৯
ইসলামে খাবার গ্রহণ পদ্ধতি ও আধুনিক বিজ্ঞান

❑ দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ১২১
প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

❑ ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ ১৩৬
দৃষ্টির হেফাযত ও আধুনিক বিজ্ঞান

❑ চতুর্দশ অধ্যায় ঃ ১৩৯
পিতামাতার আনুগত্য ও আধুনিক বিজ্ঞান

❑ পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ ১৪৭
মদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

❑ ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ ১৫৮
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিয়ে এবং আধুনিক বিজ্ঞান

❑ সপ্তদশ অধ্যায় ঃ ১৬২
দাড়ি ও আধুনিক বিজ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

❑ অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ ১৬৩
শরয়ী পর্দা এবং তার নৈতিক প্রভাব
❑ ঊনবিংশ অধ্যায় ঃ ১৬৯
ভালো নাম এবং আধুনিক বিজ্ঞান
❑ বিংশ অধ্যায় ঃ ১৭৩
যেনা ব্যভিচার ও আধুনিক বিজ্ঞান
❑ একবিংশ অধ্যায় ঃ ১৭৭
শিশুদের প্রশিক্ষণ
❑ দ্বাবিংশ অধ্যায় ঃ ১৮৫
বিধবা মহিলাদের জীবন
❑ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ঃ ১৯৩
শিশুদের জন্যে মায়ের দুধ
❑ চতুর্বিংশ অধ্যায় ঃ ১৯৫
পুরুষ বনাম নারী
❑ পঞ্চবিংশ অধ্যায় ঃ ২০০
ইসলামী শরীয়তের বিধান
❑ ষড়বিংশ অধ্যায় ঃ ২০২
পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা
❑ সপ্তবিংশ অধ্যায় ঃ ২০৫
চলচ্চিত্র এবং ইসলামী শিক্ষা
❑ অষ্টাবিংশ অধ্যায় ঃ ২১৩
দোয়া
❑ ঊনত্রিংশ অধ্যায় ঃ ২২৬
বিবিধ

দ্বিতীয় খণ্ড

❑ প্রথম অধ্যায় ঃ ২৪৩
প্রাতভ্রমণ ও ব্যায়াম
❑ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ৩০৪
বৃদ্ধাশ্রমে ইউরোপীয় বৃদ্ধাদের অবস্থা
❑ তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৩৩৫
অশ্লিল সাহিত্য, নগ্নতা ও সিগারেট
❑ চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৩৬৩
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যবসা বাণিজ্য
❑ পঞ্চম অধ্যায় ঃ ৩৬৯
হারাম জিনিসের ব্যবহার
❑ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ৩৮৩
বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়
মেসওয়াক এবং আধুনিক বিজ্ঞান

স্বভাব বা ফেতরাত কখনো মানুষের প্রতিকূলে যায় না। এই স্বভাব বা ফেতরাত পথভ্রষ্ট মানুষকে দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে এক সময় ফিরিয়ে আনে। বিভিন্ন ধরনের ধোঁকা প্রতারণার কারণে এদিক সেদিক গেলেও আবার স্বভাব বা প্রকৃতির কাছেই তারা ফিরে আসে। মেসওয়াকের উদাহরণ ঠিক একই রকমের। কেননা, মেসওয়াক শুরু থেকেই শেষ পর্যন্ত মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্যে সহায়ক হয়ে থাকবে।

এই নেয়ামত যখন থেকে আমরা হাতছাড়া করেছি তখন থেকেই মানুষ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। তবুও তার স্বাস্থ্য প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসছে না। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমরা মেসওয়াক ত্যাগ করেছি সেদিন থেকেই দাঁতের ডাক্তার বা ডেন্টাল সার্জনের উৎপত্তি হয়েছে।

আসুন আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো সুন্নত প্রতিটি মানুষের স্বভাবসম্মত কি না। এ সুন্নত কি আমাদের উন্নতি অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে? এ সুন্নত আমাদের প্রস্তর যুগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না উন্নতি অগ্রগতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিচ্ছে?

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনাদের ওপর ন্যস্ত। আপনারা চিন্তা করুন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

মেসওয়াক

মহানবী (স.) রাতে উঠে মেসওয়াক করতেন। (যাদুল মায়া'দ)

মহানবী (স.)-এর অভ্যাস ছিলো, তিনি রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে মেসওয়াক করতেন। (যাদুল মায়া'দ)

ইঞ্জিনিয়ার নকশবন্দী তাঁর ওয়াযে বলেছেন, 'আমেরিকার ওয়াশিংটনে একজন ডাক্তার আমাকে বলেছেন, রাতে ঘুমাবার সময় মেসওয়াক করে ঘুমাবেন। আমি জানতে চাইলাম, কেন? ডাক্তার বললেন, আধুনিক চিকিৎসায় বলা হয়েছে, মানুষ যা কিছু খায় সেসব মুখের ভেতর প্লাজমা হয়ে থাকে। সেই প্লাজমা শুধু কুলি করলে পরিষ্কার হয় না। সাধারণতঃ রাতে ঘুমের মধ্যেই দাঁত খারাপের যতো অসুখ দেখা দেয়। কারণ মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন মুখ বন্ধ থাকে। মুখের নড়াচড়া বন্ধ থাকে। দিনের বেলায় মানুষ কথা বলে, খাবার খায় পানীয় পান করে কিন্তু রাতে মুখ বন্ধ থাকে। এ কারণে এ সময় প্লাজমা মুখের ভেতর কাজ করার সুযোগ পায়। তাই দাঁতের অসুখ অধিকাংশই রাতে দেখা দেয়। সকালে দাঁত সাফ করতেও পারেন, না-ও করতে পারেন, কিন্তু রাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় অবশ্যই মেসওয়াক করবেন।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তারের কথা শুনে আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহর। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় মেসওয়াক করা আমাদের নবীর সুন্নত। তিনি মেসওয়াক না করে কখনো ওযু করতেন না। মানুষ যে কোনো খাবারই গ্রহণ করুক ওযু করার সময় যেন মেসওয়াক করে। এতে সে দাঁতের সমূহ ক্ষতি থেকে রেহাই পাবে। মহানবী (স.) সব সময়ই খাওয়া দাওয়ার পর কুলি করতেন। অথচ বর্তমানে দেখা যায়, মানুষ খাবার খেয়ে এমনিতেই উঠে যায়। অথচ সে মিষ্টি খাবার খেলে তার কুলি না করার কারণে সে মিষ্টির প্রভাব দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, কিন্তু খাবার খাওয়ার পরপরই কুলি করার অভ্যাস হয়ে গেলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া দিনে পাঁচবার ওযু করার সময় মুখ পরিষ্কার করা হয়। কেননা ওযুর সময়ে হাত মুখ পা ইত্যাদি অংগ প্রত্যংগ পরিষ্কার হয়ে যায়।

নামাযের আগে মেসওয়াক

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার আগে মুখ পরিষ্কার করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা খাদ্য গ্রহণের পর মেসওয়াক না করে ওযু করা হলে কিছু না কিছু খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকাটা স্বাভাবিক। এ কারণে মুখে তখনো খাদ্যের স্বাদ অনুভূত হয়। ফলে অনেক সময় নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়।

নামাযী ব্যক্তির মুখে যদি দুর্গন্ধ থাকে তবে অন্যরা তাকে ঘৃণা করবে। তাছাড়া একজনের মুখের দুর্গন্ধের কারণে অন্য নামাযীদের কষ্ট হবে। কাজেই নামাযীদের উচিত নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করার মাধ্যমে মুখের দুর্গন্ধ দূর করা। তাছাড়া মেসওয়াক করলে মুখে এমন লহরী সৃষ্টি হয় যাতে কোরআন তেলাওয়াত ও তসবীহ পাঠে মজা পাওয়া যায়।

নামাযের সময় একজন বান্দাকে সরাসরি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হয়। আর এ সময় যদি তার মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে তবে তো এটা খুবই লজ্জার কথা।

মেসওয়াক, চিকিৎসক ও সুইজারল্যান্ডের একটি ঘটনা

আমার বন্ধু মনসুর সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, 'একবার সুইজারল্যান্ড সফরের সময় একজন নওমুসলিমের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। তাকে আমি একটি মেসওয়াক দিলাম। সে মেসওয়াকটি তার চোখে ছোঁয়ালো এবং তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তারপর সে পকেট থেকে রুমালে জড়ানো একটি ছোটো মেসওয়াক বের করলো। সাইজে পাঁচ ইঞ্চির চেয়েও ছোটো সেই মেসওয়াক দেখিয়ে সে বললো, 'আমার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা উপহার স্বরূপ আমাকে এ মেসওয়াকটি দিয়েছিলো। আমি যত্ন সহকারে এটি ব্যবহার করি। ক্ষয়ে গিয়ে ছোটো হয়ে গেছে। আপনি এ মেসওয়াক দিয়ে আমার বিশেষ উপকার করেছেন।'

তারপর সেই নওমুসলিম বললো, 'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি দাঁত এবং মাড়ির এতো কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলাম যে, ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে পারছিলেন না। ইসলাম গ্রহণের পর আমি মেসওয়াক ব্যবহার করতে শুরু করলাম। কিছুদিন পর

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার আমার দাঁত এবং দাঁতের মাঢ়ি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। জানতে চাইলেন, আমি কী ওষুধ ব্যবহার করেছি যার ফলে এতো তাড়াতাড়ি আমার দাঁত এবং মাঢ়ির রোগ দূর হয়ে গেছে। আমি বললাম, আপনার দেয়া ওষুধ ব্যবহার করার ফলেই সুস্থ হয়েছি। তিনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন, আমি জানি আমার দেয়া ওষুধে এতো তাড়াতাড়ি আপনার রোগ ভালো হতে পারে না। তারপর আমি তাঁকে মেসওয়াক ব্যবহারের কথা জানালাম এবং মেসওয়াক দেখালাম। ডাক্তার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি তারপর মেসওয়াক নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

মেসওয়াকের প্রতি গুরু নানকের গুরুত্বারোপ

গুরু নানক সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে, তিনি হাতে মেসওয়াক রাখতেন এবং মাঝে মাঝে মেসওয়াক করতেন। তিনি বলতেন, হয়তো এই গাছের ডাল অর্থাৎ মেসওয়াক গ্রহণ করো অথবা রোগ গ্রহণ করো।

কী গভীর তত্ত্বকথা। কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মেসওয়াক যদি না করা হয় তবে অবধারিতভাবে দাঁতের অসুখে কষ্ট পেতে হবে।

মেসওয়াক এবং মুখের দুর্গন্ধ

এক লোক মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্যে উন্নতমানের টুথপেষ্ট ব্যবহার করেছিলেন, অনেক ধরনের এ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধও ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোনো উপকার পাননি। অনেক দিন পর দেখা গেলো, তিনি লোকদের পিলুর মেসওয়াক ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। কারণ তিনি কোনো এক বন্ধুর পরামর্শে এর মেসওয়াক ব্যবহার শুরু করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এতেই তিনি সুস্থ হয়ে যান। তবে তিনি সতর্ক করে দেন, ব্যবহার করা অংশ প্রতিদিন কেটে ফেলে নতুন আঁশ ব্যবহার করতে। কারণ এরকম না করা হলে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া নাও যেতে পারে।

হৃৎপিন্ডে পুঁজ এবং মেসওয়াক

হাকীম এস এম ইকবাল সাপ্তাহিক 'আখবারে জাহান' পত্রিকায় লিখেছেন, আমার কাছে এ রকম একজন রোগী এসেছিলো যার হৃৎপিন্ডের কোষে পুঁজ জমে ছিলো। নানারকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেও তার সেই গুরুতর রোগ ভালো হয়নি। অপারেশন করে পুঁজ বের করে ফেলার পর দেখা গেলো পুনরায় পুঁজ জমে গেছে। আমি নানা কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তার দাঁতের মাঢ়ি খারাপ এবং মাঢ়িতে পুঁজ জমে গেছে। সেই পুঁজের প্রভাব পড়েছে হৃৎপিন্ডে। অন্য চিকিৎসকরাও একথা জানার পর রোগের প্রকৃত উৎস সম্বন্ধে একমত পোষণ করলেন। আমি তাকে দাঁতের মাঢ়িতে ব্যবহার করার জন্যে কিছু ওষুধ দিয়ে পিলুর মেসওয়াক ব্যবহার করার পরামর্শ দিলাম। অল্প কিছুদিন পর জানা গেলো রোগী আরোগ্য লাভ করেছে।

দন্তরোগ ও দশ হাজার দেরহাম

সউদী আরব থেকে একজন রোগী লিখেছেন, দীর্ঘদিন যাবত আমি দাঁতের অসুখে কষ্ট পাচ্ছি। এ যাবত দশ হাজার দেরহাম ব্যয় করেছি, কিন্তু কোনো সুফল পাইনি।

www.nagorikpathagar.org

আমি এ রোগীর চিঠির জবাবে লিখেছি, আপনি পিলুর মেসওয়াক ব্যবহার করুন। দুইমাস যাবত পাঁচওয়াক্ত নামাযের আগে পাঁচবার এবং তাহাজ্জুদ নামাযের আগে একবার এবং অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করবেন না। আল্লাহর রহমতে এ ব্যবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করার ফলে রোগী সুস্থ হয়ে গেছে।

মুখের স্বাদ এবং মেসওয়াক

এক লোক কিছু খেয়ে কোনো স্বাদ পেতো না। তার জিহ্বার স্বাদ অনুভব শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল পায়নি। এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দেয়, জিহ্বায় জোঁক রাখুন, তাহলে স্বাদ ফিরে আসবে। তিনি এ ব্যবস্থাও নিয়েছেন, কিন্তু তবু কিছু হয়নি। আমি তাকে একমাস যাবত পিলুর তাজা মেসওয়াক ব্যবহার করার পরামর্শ দিলাম। একমাস পর তিনি সুস্থ হয়ে আমাকে জানালেন, এতো রকম ওষুধ ব্যবহারেও বিন্দুমাত্র উপকার পাইনি, অথচ এক টাকার পিলুর মেসওয়াকে রোগ মুক্ত হয়েছি। আমার জিহ্বার স্বাদ ফিরে পেয়েছি।

মেসওয়াক ও গলা

টনসিলের রোগীদের নিয়মিত মেসওয়াক ব্যবহার করানো হলে তারা খুব শীঘ্র রোগমুক্ত হয়ে যায়।

গলগন্ড রোগে কষ্ট পাওয়া একজন রোগীকে তুতের শরবত পান করতে এবং পিলুর (এক প্রকার গাছের ডাল) তাজা মেসওয়াক ব্যবহার করতে বলা হলো। মেসওয়াক কেটে টুকরো করে গরম পানিতে সিদ্ধ করে গরগরা করানো হলো। অল্পদিনের মধ্যে গলগন্ড রোগ থেকে রোগী মুক্তি লাভ করলো।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

এক ব্যক্তির ঘাড়ে ও গলায় ব্যথা ছিলো এবং তার কণ্ঠস্বর বসে গিয়েছিলো। ধীরে ধীরে তার স্মৃতিশক্তিরও হ্রাস ঘটছিলো। মাথা ঘুরছিলো। ব্রেইন স্পেশালিস্ট এবং জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দিয়ে চিকিৎসা করানো হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এরপর রোগীকে মেসওয়াক কেটে গরম পানিতে সিদ্ধ করে গরগরা করানো হলো এবং পিলুর মেসওয়াক ব্যবহার করতে দেয়া হলো। গলদেশের নীচে ওষুধের প্রলেপ দেয়া হলো। অল্পদিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করলো।

প্রকৃতপক্ষে এই রোগীর থাইরয়েড গ্লান্ডে ইনফেকশন হয়েছিলো। এতে তার সারাদেহ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমি যে ব্যবস্থা দিয়েছিলাম তাতে রোগী অল্পদিনের মধ্যে সেরে ওঠে।

মেসওয়াক ও মুখের ফোস্কা

গরম এবং ফোস্কার কারণে অনেকের মুখে ফোস্কা পড়ে এবং বিশেষ ধরনের রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। এরকম রোগ দেখা দিলে নিয়মিত মেসওয়াক করতে হবে এবং মেসওয়াকের সময় নিসৃত লালা জিহ্বা দিয়ে ভেতরের ত্বকে ঘষতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

www.nagorikpathagar.org

মেসওয়াক ও দাঁতের হলদে ভাব

অনেকে অভিযোগ করেন, তাদের দাঁত হলুদ হয়ে যায় এবং দাঁতের (হোয়াইটনেস) সাদা ভাব দূর হয়ে যায়। তারা জেনে নিন, মেসওয়াকের নতুন নতুন আঁশ দাঁতের হলদে ভাব দূরীকরণে ফলদায়ক।

মেসওয়াক ও জীবাণু

মেসওয়াক হলো একটি উন্নতমানের এন্টিসেপটিক। মেসওয়াক ব্যবহার করলে মুখের ভেতরের রোগ জীবাণু হত্যা করে। যাতে নামাযী ব্যক্তি অসংখ্য রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। এমনকি কিছু কিছু রোগজীবাণু মেসওয়াক এবং মেসওয়াকের মধ্যে থাকা এন্টিসেপটিক উপাদানের কারণে মরে যায়।

মেসওয়াক ও মস্তিষ্ক

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মেসওয়াক করার ফলে মস্তিষ্ক সজীব সতেজ হয়। প্রকৃতপক্ষে মেসওয়াকের মধ্যে ফসফরাস থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, যে মাটিতে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস বেশী থাকে সেখানে পিলু গাছ বেশী বেশী জন্মে। কবরস্থানে মুর্দাদের হাড় গলে যাওয়ার কারণে সেখানকার মাটিতে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস বেশী থাকে। এ কারণে কবরস্থানে পিলু গাছ বেশী জন্মে। দাঁতের জন্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিশেষ উপকারী। পিলু গাছের শেকড়ের মধ্যে এ উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, পিলুর মেসওয়াক তাজা অবস্থায় চিবানো হলে তার মধ্যে থেকে এক রকমের তিক্ত এবং ভেজাল রস বের হয়। এ উপাদান মেসওয়াকের মাঝে রোগজীবাণুর উৎপাদন বন্ধ করে এবং দাঁতকে রোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। কাজেই পিলুর মেসওয়াকের আঁশ কাটতে থাকবে, তাহলে নতুন আঁশ ব্যবহৃত হবে এবং তেতো উপাদান ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী হবে।

কানির, বাবুল এবং নিম গাছের মেসওয়াক

বাবুল গাছ এবং নিমগাছের উপকারিতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে অবগত নয় এমন কেউ নেই। কিন্তু আমি এখানে কানির গাছের মেসওয়াকের আলোচনা করবো। কানির দু'রকমের হয়ে থাকে। এর একটার ফুল লাল এবং আরেকটার ফুল সাদা। এ গাছ সাধারণত পার্কে এবং বাগবাগিচায় পাওয়া যায়। বাগানের মালী থেকে জেনে নিয়ে এ মেসওয়াক সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এক ভদ্রলোক দাঁতের চিকিৎসায় দশ হাজার দেরহাম ব্যয় করেছেন। ইনি আরব দেশে থাকেন। অবশেষে তাঁকে কানির এবং পিলু গাছের মেসওয়াক ব্যবহার করানো হলে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যান। সম্মানিত চিকিৎসকগণ এবং এ অধম পাইওনিয়ার রোগীদের দীর্ঘকাল থেকে কানির গাছের মেসওয়াক ব্যবহার করাচ্ছি। এতে দুরারোগ্য রোগী সুস্থ হয়ে গেছে।

মেসওয়াক প্রথমে গ্লাসের পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন। এরপর চিবিয়ে আঁশ বের করবেন এবং দাঁতের ওপর থেকে নীচে এবং নীচে থেকে ওপরে মেসওয়াক করবেন। কানির গাছের মেসওয়াক যদিও খুবই তেতো হয়, কিন্তু তা দাঁতের রোগের জন্যে খুবই

www.nagorikpathagar.org

উপকারী। এতে এমন সব উপাদান রয়েছে যা দাঁতকে সুদৃঢ়, চমকদার করে এবং এসব উপাদান পাইওরিয়ার-এর মত ধ্বংসকর রোগ প্রতিরোধে মহৌষধ।

দাঁত এবং মস্তিষ্ক

অপরিচ্ছন্ন, ময়লা এবং পুঁজযুক্ত দাঁত মস্তিষ্ক রোগের কারণ হয়। মানসিক রোগসমূহ যেমন উন্মাদনা, মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং অন্যান্য ধ্বংসকর রোগসমূহ এসবের শামিল। এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর মস্তিষ্কের সমস্যা ছিলো। জটিল পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায়, তার মস্তিষ্কের পর্দার ওপর পুঁজ জমে গেছে এবং রোগিনী দীর্ঘদিন থেকে পাইওরিয়া রোগে ভুগছিলো। আর পাইওরিয়াজনিত পুঁজই তার মস্তিষ্ক রোগের কারণ হয়েছে। অনুরূপ পুঁজের প্রতিক্রিয়া অস্থিমজ্জা অথবা পিটুইরি গ্ল্যান্ডের জন্যে ধ্বংসকর হয়।

দাঁত এবং কান

যাদের কান ফোলা, কানে পুঁজ, খৈল এবং ব্যথা রয়েছে, এমন রোগীদের সম্পর্কে চিকিৎসকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, অনেক চিকিৎসার পরও কিন্তু তা মোটেও ভালো হয়নি। গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা গেছে, রোগীর মাঢ়িতে পুঁজ জমেছে। মাঢ়ির চিকিৎসা করা হলে রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়।

দাঁত এবং দৃষ্টিশক্তি

দৃষ্টিশক্তি এবং চোখের রোগের সাথে দাঁতের রোগের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দাঁতে পুঁজ হলে অথবা দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা আটকে গিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত হলে চোখ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তখন দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্ধত্ব সৃষ্টি হয়। আজকাল দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার যেখানে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, দাঁতের প্রতি উদাসীনতা অমনোযোগীতা। দাঁত যদি পরিষ্কারও করা হয় তবে তা করা হয় ব্রাশ দিয়ে। ব্রাশ দাঁতের জন্যে উপকারী না ক্ষতিকর, সামনে সে সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করা হবে।

দাঁত ও পাকস্থলী

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সব অভিজ্ঞতা এবং গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, শতকরা আশিভাগ রোগ পাকস্থলী এবং দাঁতের রোগের কারণে হয়ে থাকে। পাকস্থলীর রোগ বর্তমানে বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। দাঁতের মাঢ়িতে জমে থাকা পুঁজ খাদ্যদ্রব্যের সাথে বা মুখের লালার সাথে যখন পাকস্থলীতে পৌছে, তখন এ পুঁজই রোগ সৃষ্টি হয়। ভালো খাবারের ক্রিয়াও নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পাকস্থলীর চিকিৎসার আগে দাঁতের সুস্থতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। তাহলে পাকস্থলীর রোগের দ্রুত এবং স্বতন্ত্র চিকিৎসা সম্ভব।

দাঁত ও সমাজ

মানুষ যখন কোনো সামাজিক মজলিসে কথা বলে বা কোনো যানবাহনের যাত্রী হয়, তখন তার মুখে যদি দুর্গন্ধ থাকে তাহলে তা অন্যদের জন্যে বেশ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত জাহাজে আরোহী হলে তার শ্বাস প্রশ্বাস থেকে দুর্গন্ধ অনুভূত

www.nagorikpathagar.org

হয়। এরকম সহযাত্রীর যদি হাঁচি শুরু হয়ে যায়, তাহলে তো পুরো পরিবেশই দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। সর্বাগ্রে দাঁতের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ দাঁতই অধিকাংশ দুর্গন্ধের কারণ হয়ে থাকে। নয় তো পাকস্থলীর চিকিৎসা করাতে হবে।

মোট কথা, দেহের সুস্থতার প্রয়োজনে দাঁতের সুস্থতা অত্যাবশ্যক। কেননা ভালো দাঁত ও সুস্থ দাঁত সবল জীবন নিশ্চিত করতে পারে। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে যারা উদাসীন তারা সফল জীবন যাপন করতে পারে না।

ব্রাশ ও মেসওয়াকের মধ্যে পার্থক্য

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়, দাঁতের পরিচ্ছন্নতা এবং সংরক্ষণের জন্যে ব্রাশ ব্যবহার আবশ্যক নাকি মেসওয়াকই ব্যবহার করতে হবে? প্রথমে আমি ব্রাশের কল্যাণকারিতা অথবা ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ব্রাশ

জীবাণু বিশেষজ্ঞদের বছরের পর বছরের গবেষণায় একথা পূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্রাশ একবার ব্যবহার করা হয়, পুনরায় তা ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কেননা, একবার ব্যবহারের পরই তা রোগ-জীবাণুর স্তর জমে যায়। তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেললেও ক্রিয়াশীল থাকে। তাছাড়া ব্রাশ ব্যবহার করা হলে দাঁতের ওপরের চমকদার সাদা স্তর নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দাঁতের মাঝে ফাঁক তৈরী হয় এবং ধীরে ধীরে দাঁত মাড়ি থেকে আলাদা হয়ে যায়। দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা আটকে গিয়ে মাড়ি এবং দাঁতের ক্ষতির কারণ হয়।

মেসওয়াক

এমন প্রত্যেক গাছের মেসওয়াক দাঁতের জন্যে উপযোগী, যে গাছের আঁশ নরম। দাঁতের মাঝের ফাঁক বাড়ায় না এবং মাড়ি জখম করে না। তবে এর মধ্যে পিলু, নিম অথবা বাবুল গাছ এবং কানির গাছের মেসওয়াক দাঁতের জন্যে খুবই উপকারী।

পিলুর মেসওয়াক

মেসওয়াক মহানবী (স.)-এর সুন্নত। প্রত্যেক নামাযের আগে ওযুর সময় মেসওয়াক ব্যবহার করা দ্বীন ইসলামে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অত্যাবশ্যক সুন্নত। পিলুর মেসওয়াকের উপকারিতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তা নরম আঁশযুক্ত তাতে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস থাকে। পাঞ্জাবের লবণাক্ত বিরানভূমিতে পিলুর গাছ পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিকদর নবতর গবেষণায় প্রমাণিত হয়, মেসওয়াকের ফসফরাস এবং ক্যালসিয়াম লালার মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছে যায়। ফলে মস্তিষ্ক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

স্থায়ী সর্দি ও মেসওয়াক

যেসব রোগীর সর্দি লেগেই থাকে, মেসওয়াক ব্যবহার করলে তাদের সর্দি বেরিয়ে যায় এবং মগয হালকা হয়।

একজন প্যাথলজিস্ট বলেছেন, আমার অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, স্থায়ী সর্দির রোগীর জন্যে মেসওয়াক বিশেষ ফলপ্রদ। মেসওয়াক ব্যবহার করা হলে এ রকম রোগীদের নাক এবং গলার অপারেশনের প্রয়োজন কমে যায়।

www.nagorikpathagar.org

জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস

হাসি মানুষের মনের প্রফুল্লতা এবং আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু এ হাসিও মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে। সুন্দর চেহারার, উত্তম চরিত্রের একজন মানুষের হাসিও দাঁতের কারণে অসুন্দর এবং নোংরা হতে পারে। অপরিষ্কার দাঁত যখন দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রকাশ পায় তখন লজ্জার শেষ থাকে না।

স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্যে মানুষ জীবনের শুরু থেকেই চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং স্পর্শকাতর অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির দাঁতও যদি অপরিষ্কার থাকে তবে অস্বস্তির শেষ থাকে না। অপরিষ্কার দাঁত বহু রোগের বিস্তার ঘটায়, একথা অভিজ্ঞতায় এবং গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

দাঁতের জন্যে তৈরী করা মাজনে যদি কোনো ক্যামিক্যাল জাতীয় পাওয়ারফুল ওষুধের সংমিশ্রণ না করা হয় তাহলে সেই মাজন ব্যবহারেও উপকার পাওয়া যায়। তবে পিলু, নিম এবং কানির বৃক্ষের শাখা ও শিকড় দিয়ে তৈরী মেসওয়াকে যে উপকার রয়েছে, অন্য কোনো কিছুর মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
ওযু

আযানের মাধ্যমে মূলত আদেশ দেয়া হয় যে, তুমি সেসব কাজ থেকে বেরিয়ে এসো যেসব কাজ তোমার ভেতর বাইর ক্লেদাক্ত করেছে। আযান আদেশ দেয়, ওইসব কাজ থেকে বিরত হও যেসব কাজ তোমাকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে রোগীতে পরিণত করেছে। এবার মসজিদে আসো, আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হও। তোমার ভেতরের বাইরের পরিচ্ছন্নতা এখন একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছে। বাইরের দিকটা তুমি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করো, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ভেতরের দিক পরিষ্কার করে দেবেন।

ওযু ইসলামের এমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বিধান যা অন্য কোনো জীবনব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। ওযুর মাধ্যমে দেহের সে সকল অংশ পরিষ্কার করা হয় যেসব অংশ দিয়ে দেহে রোগ প্রবেশ করে। এ অংগ-প্রত্যংগের মাধমে রোগ দেহে প্রবেশের পর আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করে। কাজেই রোগ দেহে প্রবেশ এবং রোগের বিস্তার ঘটার পথ বন্ধ করে দিয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা অধিক প্রয়োজন। আর স্বাস্থ্যের জন্যে শত্রু যেসব রোগ রয়েছে সেসব রোগ থেকে ওযু মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা করে।

ইসলাম উন্নতির নাম নাকি অবনতির নাম? ইসলামী বিধান পালন করলে মানুষের জীবন আলোকিত হয়, নাকি অন্ধকারাচ্ছন্ন? ইসলামের বিধান কি সুস্থতা দেয়, নাকি রোগ সৃষ্টি করে? যদি বুঝতে পারেন তবে বুঝে নিন, যদি বুঝতে না পারেন বিবেকের মুখোমুখি হয়ে এ বইয়ের লেখা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। বুঝতে পারবেন ইসলাম কী বলে, বিজ্ঞান কী চায় আর ফ্যাশন মানুষকে কী দেয়।

হাত ধোয়া

ওযু করার সময় প্রথমে হাত ধুতে হয়। কারণ হাত ধোয়ার পর কুলি করতে হবে। যদি হাতই অপরিষ্কার থাকে তবে হাতের মাধ্যমে রোগজীবাণু মুখে প্রবেশ করবে। ফলে নানারকম রোগ দেখা দেবে।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নেই। মানুষ নানারকম কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কখনো কখনো কাজ করার সময় হাতে বিভিন্ন ধরনের ক্যামিকেল লেগে যায়। এ ক্যামিকেল দীর্ঘ সময় হাতে লেগে থাকলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা নানা জিনিসে হাত লাগায়। যদি সেসব জিনিসের সাথে আসা জীবাণু হাতে লেগেই থাকে তবে খুব শীঘ্রই তারা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

ওযুর মাধ্যমে যদি নিয়মিত হাত না ধোয়া হয় তবে যেসব রোগের আশংকা থাকে সেসব রোগ হচ্ছে, স্কিন ডিজিজ, একজিমা, প্রিকলি হিট, স্কীন ইনফেকশন, ফাংগাশ ইত্যাদি।

যখন আমরা ওযু করার উদ্দেশে হাত ধুই তখন আমাদের আংগুলের গোড়া থেকে বের হওয়া রশ্মি একপ্রকার বৃত্ত সৃষ্টি করে। এর ফলে আমাদের মধ্যে সুপ্ত থাকা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা তীব্র হয়। এ বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে হাতের সৌন্দর্য বেড়ে যায়, আংগুলের মধ্যে কমনীয়তা সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা বেড়ে যায়।

কুলি করা

কুলি করার আগে মেসওয়াক করতে হয়। মেসওয়াক সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কুলির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, আমরা যে পানি ব্যবহার করছি সে পানির স্বাদ, রং এবং গন্ধ কেমন।

আমরা খাবার খেলে কিছু না কিছু খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে। তারপর সেই খাদ্যকণা পচে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মুখের লালার সাথে মিশে সেই পচা খাদ্যকণা পাকস্থলীতে পৌছে যায়। কুলি এবং মেসওয়াক করা হলে বিষাক্ত খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকতে পারে না। ফলে রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বাতাসে থাকা বহু রোগজীবাণু আমরা চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু বাতাসের মাধ্যমে অনেক রোগজীবাণু আমাদের মুখের ভেতর প্রবেশ করে এবং লালার মাধ্যমে পেটে চলে যায়। যদি কুলি না করা হয় তবে সেসব জীবাণু যেসব রোগ সৃষ্টি করতে পারে যা নিম্নরূপ।

মুখের অসুখ

এইডস-এর প্রাথমিক লক্ষণ মুখেও প্রকাশ পায়। মুখের কিনারা ফেটে যায়, মুখে ফুসকুড়ি দেখা দেয়। মোটকথা, কুলি এমন একটি আমল যার মাধ্যমে মানুষ এমন অনেক রোগ থেকে রক্ষা পায়, যে রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের দ্বীন দুনিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কুলির সময়ে গরগরা করা হলে গলায় টনসিল এবং অন্যান্য রোগ হয় না। গলার ভেতরে বার বার পানি পৌছানো হলে গলার ক্যান্সার থেকে মানুষ রক্ষা পায়।

নাকে পানি দেয়া

নাক হচ্ছে নিশ্বাস নেয়ার একমাত্র পথ। যে বাতাস থেকে আমরা নিশ্বাস নিই সে বাতাসে অসংখ্য রোগজীবাণু ভেসে বেড়ায় এবং রোগ মনব দেহে খুব সহজে প্রবেশ করে। কারণ বাতাসবাহিত জীবাণু সব সময় আমাদের নিশ্বাসের সাথে দেহের ভেতর প্রবেশের সুযোগ পায়। ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মারাত্মক রোগ সংক্রমণের আশংকা থাকে। এমনকি স্থায়ী সর্দিতে নাকের জখম দেখা দেয়। এ রকম রোগীদের জন্যে ওযুর সময়ে নাকে পানি দেয়া বিশেষ উপকারী। ওযুর কারণে প্রতিদিন আমরা পাঁচবার নাকে পানি দিয়ে থাকি। কাজেই নাকের ভেতর কোনো প্রকার রোগজীবাণু আস্তানা গাড়তে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

নাক মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। নাকের মাধ্যমে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করা যায়। নাকের ছিদ্রে আংগুল ঢুকিয়ে কথা বললেই এর নানারকম শব্দ তৈরী হয়। নাক পরিষ্কার করা হলে এর প্রভাব ফুসফুসের ওপর পড়ে। প্রত্যেক মানুষের দেহের ভেতর নাসিকা ছিদ্র দিয়ে প্রতিদিন প্রায় পাঁচশ ঘনফুট বাতাস প্রবেশ করে।

বরফাবৃত দিনে বা শুকনো দিনে বরফঢাকা মাঠে স্ক্যাটিং শুরু করুন। দেখবেন আপনার ফুসফুস শুষ্ক বাতাস গ্রহণ করছে না; বরং সিক্ত বা ভেজা ভেজা বাতাস গ্রহণের জন্যে ফুসফুস উন্মুখ হয়ে আছে। ফুসফুস যে বাতাস গ্রহণ করে তার মধ্যে শতকরা আশি ভাগ সিক্ততা এবং শতকরা নব্বই ভাগ উষ্ণতা থাকা আবশ্যক।

ফুসফুস চায় জীবাণু, ধোঁয়া, ধুলোবালি থেকে মুক্ত বাতাস। এরকম বাতাস সরবরাহকারী সাধারণ একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এয়ার কন্ডিশনার, যা একটি ছোটো ট্রাংকের সমান হয়ে থাকে, কিন্তু নাকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সেই এয়ার কন্ডিশনার ফিট করে দিয়েছেন। অথচ নাকের উচ্চতা মাত্র কয়েক ইঞ্চি।

বাতাসকে সিক্ত করে গ্রহণ করার জন্যে নাক প্রতিদিন এক গ্যালনের এক চতুর্থাংশ সিক্ততা তৈরী করে। পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেয় নাকের ভেতরের পর্দা। নাকের ভেতর সেই যন্ত্রের মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছানো বাতাসকে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

নামাযী মানুষ ওযুর সময় যখন নাকে পানি দেয় তখন এক প্রকার বিদ্যুৎ প্রবাহ নাকের ভেতরের পর্দাকে শক্তিশালী করে। এর ফলে নাক যাবতীয় জটিল রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।

মুখ মন্ডল ধোয়া

আমার একজন রোগী ছিলো, যার চেহারা সব সময় গরম থাকতো। ঠান্ডা ওষুধ এবং এন্টি এলার্জি ওষুধ ব্যবহার করেও কোনো উপকার পায়নি। আমি তাকে নিয়মিত নামায আদায় করার পরামর্শ দিলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে নতুন ওযু করতে বললাম। ওযু করার পর দরুদ শরীফ পাঠ করে দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে চেহারায় মালিশ করতে বললাম। অল্প কয়েকদিন এ আমল করার ফলে রোগী সুস্থ হয়ে গেলো।

মুখমন্ডল ধোয়ার ফলে বহু রকম রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ

ক্যামিক্যালস থেকে সাবধানতা

বর্তমান আণবিক যুগে চারদিকে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা পরিবেশ সুস্থ ও নির্মল রাখার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। হাত মুখ বার বার ধোয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন যেন ক্যামিক্যালস, ধুলোবালি মুখে হাতে জমে থাকতে না পারে। এসব সমস্যা থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওযু। ধোঁয়ার মধ্যে নানা রকমের বিপজ্জনক ক্যামিকেলস বিদ্যমান থাকে, যেমন সীসা, লেদ ইত্যাদি। বাতাসবাহিত এসব কেমিক্যালসের জীবাণু বেশী সময় ত্বকে জমে থাকলে এলার্জি এবং অন্যান্য রোগ দেখা দেয়।

www.nagorikpathagar.org

মুখের ব্রণ

মুখমন্ডল নিয়মিত ধোয়া হলে মুখে ব্রণ উঠতে পারে না, অথবা ওঠার সম্ভাবনা কমে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যতো রকমের ক্রিম, লোশন বাজারে পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহার করা হলে চেহারায় দাগ পড়ে। চেহারার সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্যে বার বার মুখমন্ডল ধোয়া আবশ্যক।

আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটির পরিচালক লেডী বিচার একটি বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের কোনো প্রকার রাসায়নিক লোশন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। ইসলামী মতে ওযু করার মাধ্যমে মুখমন্ডল ধোয়া হলে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

চেহারার এলার্জি

চেহারার এলার্জির রোগীরা যদি নিয়মিত ওযু করে তাহলে এলার্জি হওয়ার আশংকা কমে যায়।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এলার্জি থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর নিয়ম হচ্ছে নিয়মিত মুখ ধোয়া। ওযুর মাধ্যমেই এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

চেহারার ম্যাসেজ

ওযুর সময় তিন বার মুখমন্ডল ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। মুখমন্ডল ধোয়ার সময় তিন বার হাত দিয়ে মুখ ম্যাসেজও করা হয়। এ সময় মুখে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় এবং মুখের ধুলো ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

চেহারা তিন বার ধোয়ার যৌক্তিকতা হচ্ছে, প্রথমবার মুখে পানি দিয়ে ময়লা নরম করা হয়। দ্বিতীয় বার পানি দিলে ময়লা দূর হয়ে যায়। তৃতীয় বার পানি দেয়ায় ময়লা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

ভ্রুতে পানির প্রভাব

ওযুর মাধ্যমে ভ্রুতে পানি লেগে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, ভ্রু ভেজা থাকলে চোখের এমন মারাত্মক রোগ থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যেসব রোগে চোখের দৃষ্টিশক্তি পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

একবার আমার কাছে একজন অন্ধ রোগী এসে জানালো, কয়েক মাস থেকে আমার চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে। চিকিৎসকরা বলেছেন, চোখের রস এবং সিক্ততা কমে যাওয়ার কারণেই এ রকম অবস্থা হয়েছে।

চক্ষুরোগ থেকে বাঁচুন

আপনাদের ঘরে কারো চোখে ব্যথা হলে আপনারা চোখে পানির ছিটা দেয়ার পরামর্শ দেন। এটা একটা ভালো ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে চোখের অসুখ কমে যায়। চোখে পানি দেয়া হলে ধোঁয়া, ধুলোবালি ধুয়ে যায়। ধুলোবালি, ধোঁয়া নাক চোখকে প্রভাবিত করে। পানি দিয়ে ধোয়া হলে চোখ নানা রকম অসুখ থেকে রক্ষা পায়।

চোখ, পানি ও স্বাস্থ্য

ইউরোপের একজন ডাক্তার চোখ, পানি এবং স্বাস্থ্য নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি প্রতিদিন কয়েকবার পানি দিয়ে চোখ ধোয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। তিনি লিখেছেন, তোমরা প্রতিদিন একাধিকবার মুখ ধোও, তা না হলে তোমরা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবে।

ওযুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

ইঞ্জিনিয়ার নকশেবন্দী তার রচিত মাওয়ায়েযে লিখেছেন, মহানবী (স.) প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওযু করতেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বলা হয়েছে, ঘুমোবার পর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে চোখে পিচুটি জমে। এতে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে ঘুম থেকে উঠেই চোখে পানির ছিটা দিতে হবে। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্যে উঠবে এবং ওযু করবে, তারপর ফজরের জন্যে উঠবে এবং ওযু করবে, এভাবে একাধিকবার ওযু করা হলে চোখের রোগ ভালো হয়ে যায়। তা ছাড়া মুখমন্ডল ধোয়া হলে দেহের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের উপকার হয়।

দাড়ি খেলাল করা

দাড়ি যেহেতু খুব ঘন হয়ে থাকে, এ কারণে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, দাড়ি খেলাল করে তার ভেতরে পানি পৌছাতে হবে। দাড়ির ভেতরে পানি পৌছানো হলে দাড়ির গোড়া মযবুত হয়ে যায়। সাধারণ যেসব জীবাণু সংক্রমণের আশংকা থাকে সেসব সংক্রমণ হয় না। সেসব জীবাণু পানির সাথে ধুয়ে যায়। দাড়ি খেলাল করা না হলে তাতে উকুন হওয়ার আশংকা থাকে। এছাড়া দাড়িতে পানি ব্যবহার করার ফলে ঘাড়ের মাসল, থাইরয়েড গ্লান্ডে এবং গলায় রোগ সংক্রমণের কোনো প্রকার সম্ভাবনা থাকে না। (ডক্টর প্রফেসর জর্জ এল বাই- সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড)

কনুই পর্যন্ত ধোয়া

দেহের এ অংশ সব সময় অনাবৃত থাকে। তাই এ অংশে যদি পানির স্পর্শ না লাগে তবে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অংগ প্রত্যংগের অসুখ দেখা দেয়। কনুইতে তিনটি বড়ো শিরা রয়েছে। সেই শিরার সম্পর্ক মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিন্ডের সাথে। কনুই ধোয়া হলে উল্লিখিত তিনটি অংগই শক্তি লাভ করে এবং রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।

এছাড়া কনুই ধোয়ার ফলে হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত আলোর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আলোর সেই বিচ্ছুরণের কারণে হাতের পেশী ও শিরা শক্তিশালী হয়।

মাসেহ করা এবং ফ্রান্সের একটি ঘটনা

ইঞ্জিনিয়ার নকশেবন্দী তার রচিত মাওয়ায়েযে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের এক বন্ধু ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে বলেন, 'সেখানে একদিন আমি ওযু করছিলাম। একজন লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাকে লক্ষ্য করলেও ওযু করতে থাকলাম। ওযু শেষ করার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? আমি বললাম, আমি একজন মুসলমান। জানতে চাইলেন, আমি কোত্থেকে এসেছি? আমি জানালাম, পাকিস্তান থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পাকিস্তানে কয়টি পাগলা গারদ রয়েছে। বিস্ময়কর প্রশ্ন। আমি বললাম, দুই চারটি থাকতে পারে, আমি ঠিক জানি না। তিনি বললেন, এ মাত্র আপনি কী করেছেন? আমি

www.nagorikpathagar.org

বললাম কেন, ওযু করেছি। বললেন, এভাবে কি প্রতিদিন করেন? আমি বললাম প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ বার করি। তিনি বললেন, তিনি ওখানকার একটি মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসক। তারপর তিনি বলেন, আমি চিন্তা গবেষণা করি, কেন মানুষ পাগল হয়। আমার গবেষণা হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সিগনাল সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে আমাদের দেহের অংগ প্রত্যংগ কাজ করে। আমাদের মস্তিষ্ক সব সময় ফ্লুইডের ভেতর ফ্লোয়াট করে। এ কারণে আমরা কর্মব্যস্ত সময় কাটাই, ছুটোছুটি করি। মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হয় না। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে কতিপয় শিরা উপশিরা বাহক হয়ে আমাদের সারা দেহে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমি গবেষণা করে দেখেছি, চুল লম্বা করে রেখে ঘাড়ের অংশ শুকনো রাখলে শিরাসমূহে শুষ্কতা দেখা দেয়। কয়েকবার এরকমও হয়ে থাকে যে, মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করা ছেড়ে দেয়। এ কারণে আমি চিন্তা করলাম, ঘাড় মাসেহ করার জায়গা দিনে কয়েকবার ভেজা রাখা দরকার। আপনাকে ওযু করতে এবং মাসেহ করতে দেখেছি। আমি মনে করলাম, আপনারা কিভাবে পাগল হতে পারেন? ঘাড় মাসেহ করা হলে সানস্ট্রোক এবং ঘাড়ের জ্বর ভালো হয়ে যায়।

চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, একজন চিকিৎসক সারাজীবন একটি মোস্তাহাব আমল নিয়ে গবেষণা করে কাটিয়ে দিলেন। সুতরাং সুন্নত ওয়াজেব ফরয নিয়ে গবেষণার ফল কেমন হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

হাবলুল অরিদের রহস্য

রূহানিয়াত বিশেষজ্ঞরা মানব দেহকে ছয় ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। একটি অংশ হচ্ছে হাবলুল অরিদ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি তোমাদের শাহরগের চেয়েও সন্নিকটে অবস্থান করছি। এ শাহরগ মাথা ও ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। ঘাড় মসেহ করা হলে মানব দেহে একপ্রকার সতেজতা সজীবতা অনুভব করা যায়। দেহের প্রতিটি জোড়ার সাথে এ শাহরগের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। নামাযী ব্যক্তি অযুর যখন ঘাড় মাসেহ করে তখন হাতের স্পর্শে বিদ্যুৎ প্রবাহ শিরায় গিয়ে জমা হয় এবং দেহের অংগ প্রত্যংগে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সারাদেহে সজীবতা অনুভূত হয়।

পা ধোয়া

একজন ডাক্তার ডায়াবেটিসের রোগীদের বলেছেন, আপনারা যেভাবে নিজেদের চেহারার হেফাযত করেন একইভাবে পায়ের হেফাযত করুন। কারণ ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ে ইনফেকশন বেশী হয়। অধিকাংশ সময় পা থাকে জুতোর ভেতর, শুধু সকাল সন্ধ্যায় জুতো খোলা হয়। ইউরোপের প্রগতিশীল লোকেরা কয়েকদিন পর্যন্ত জুতো পায়ে রাখে। এমনকি রাতে জুতো পায়ে রেখেই ঘুমায়। এ রকম অভ্যাসের ফলে তারা খুব সহজেই পায়ের অসুখে আক্রান্ত হয়।

আমাদের পায়ে ধুলোবালি ময়লা সবচেয়ে বেশী লাগে। ফলে রোগ জীবাণু তৈরী হয়। ইনফেকশন হয়। ইসলাম দিনে পাঁচ বার পা ধোয়ার এবং খেলাল করার ব্যবস্থা করেছে। এতে পায়ে কোনো প্রকার জীবাণু জড়িয়ে থাকার সুযোগ পায় না।

www.nagorikpathagar.org

পা ধোয়ার কারণে মানুষ অনেক রকমের রোগ থেকে মুক্ত থাকে। যেমন ডিপ্রেশন, অস্থিরতা, মস্তিষ্কের শুষ্কতা, অনিদ্রা ইত্যাদি।

ওযু ও উচ্চ রক্তচাপ

শরীয়তের আদেশ রয়েছে, তোমরা ক্রোধান্বিত হলে ওযু করবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে যখন রক্তচাপ বেড়ে যাবে তখন ওযু করবে। এ উভয় বিধান লক্ষ্য করলে গবেষণার নতুন পথ খুলে যায়। ক্রোধের সময় রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদরোগ যখন উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয় তখন ওযু করা হলে রক্তচাপ কমে যায়।

একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের অভিমত

একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীকে ওযু করাতে হবে। ওযু করানোর পর রক্তচাপ পরিমাপ করা হলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে, রক্তচাপ কমে গেছে।

এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন মনস্তত্ত্ববিদ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সালামত আযিয। তিনি বলেন, ওযু হৃদরোগ আরোগ্য হওয়ার একটি উত্তম উপায়। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদরা প্রতিদিন ওযুর মতো করে কয়েকবার দেহে পানি লাগানোর পরামর্শ দেন, কিন্তু এসব জ্ঞান গবেষণার কয়েকশ' বছর আগেই ইসলাম ওযুর বিধান প্রবর্তন করেছে।

ওযু করার সময়ে প্রথমে হাত ধোয়া, এরপর কুলি করা, তারপর নাকে পানি দেয়া, তারপর মুখ ধোয়া, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ ধোয়ার বিধান রয়েছে। পর্যায়ক্রমিক এ রকম ধৌতকরণের মধ্যেও বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিকতা রয়েছে।

ওযু করার পর অবশিষ্ট পানি

হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে, ওযু করার পর অবশিষ্ট পানি পান করা হলে সুস্থ থাকা যায়। এ বিষয়ে ডাক্তার ফারুক আহমদ গবেষণা করে বলেছেন, ওযু করার পর অবশিষ্ট পানি পান করার সুফল প্রথমে কিডনি লাভ করে। এ পানি পান করার ফলে প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এছাড়া ওযুর অবশিষ্ট পানি পান করা হলে অবৈধ যৌন সংসর্গের ইচ্ছা মনে জাগে না। যেসব রোগীর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় তাদের এ সমস্যা দূর হয়ে যায়।

এছাড়া ওযুর পর অবশিষ্ট পানি পান হৃৎপিন্ড, কিডনি, পাকস্থলীর শুষ্কতা দূর করে দেয়।

পশ্চিম জার্মানীতে একটি সেমিনার এবং ওযু

মুলতানের নিশতার মেডিকেল কলেজের ডাক্তার নূর আহমদ বলেছেন, পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ডিপ্রেশন বা অবসাদ রোগ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এ কারণে প্রতিটি মহল্লায় পাগল চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে মানসিক রোগের চিকিৎসকরা সবচেয়ে বেশী ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে এ রোগ খুব কম লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত যেসব মুসলমান ধর্মীয় বিধি বিধান পালন করেন তাদের মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে খুব একটা দেখা যায় না। পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরা এর কারণ জানার চেষ্টা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

কয়েক বছর আগে আমি ফয়সালাবাদ গিয়েছিলাম। সেখানে পাঞ্জাব মেডিকেল কলেজের সামনে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট দোকান খুলেছেন। আমি তার সাথে দেখা করলাম। পশ্চিম জার্মানী থেকে তিনি ডিপ্লোমা করেছেন। তিনি বলেন, জার্মানীর ডাক্তাররা তাকে জানিয়েছেন, অবসাদের চিকিৎসা তারা গতানুগতিক ওষুধের মাধ্যমে নয়; বরং অন্য ব্যবস্থায় পেয়েছেন।

পশ্চিম জার্মানীতে এ বিষয়ে একবার একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিলো। আলোচ্যসূচী ছিলো অবসাদের চিকিৎসা ওষুধ ব্যতীত অন্য কী উপায়ে করা যায়? একজন ডাক্তার জানালেন, তিনি অবসাদের রোগীদের কয়েকজনের ওপর পরীক্ষা করেছেন। তাদের প্রতিদিন পাঁচ বার মুখ ধুতে বলেছেন। কয়েক মাস পর দেখা গেলো তারা সুস্থ হয়ে গেছে।

সেই ডাক্তার পরে মানসিক রোগীদের আলাদা একটি দল গঠন করেছেন। তাদের হাত পা মুখ দৈনিক পাঁচ বার ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে তাদের মানসিক রোগ দূর হয়ে গিয়েছিলো। আলোচনার শেষ দিকে তিনি এ সিদ্ধান্তে আসেন, হতাশা রোগ মুসলমানদের কম হয়। কারণ তারা প্রতিদিন পাঁচ বার হাত মুখ ধোয়, অর্থাৎ ওযু করে।

তৃতীয় অধ্যায়

নামায

নামায ও বিপদ মুক্তি

নামায প্রকৃতপক্ষে এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষকে তার রূহের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। মানুষ যখন নিজের রূহ সম্পর্কে জানতে পারে তখন সে বুঝতে পারে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে পথনির্দেশ করছেন। এ বোধ জাগ্রত হলে মানুষ বুঝতে পারে, সে আল্লাহর কতোটা কাছাকাছি পৌঁছেছে, মানুষের নিজের মর্যাদা কতো মহান। এরপর মানুষের প্রতিটি তৎপরতা আল্লাহর বিধি বিধানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

এ বিষয়টির মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, মানুষ যখন শুধু আল্লাহর জন্যে কোনো কাজ করে তখন সে কতোটা আনন্দিত হয়। এ আনন্দ তার ভেতরে প্রবেশ করে তার রূহকে আলোকিত করে। এ আনন্দের ফলে তার রূহ এতোটা সজীব হয়ে যায় যে, সে তার দেহের কথা ভুলে যায়। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনকথার প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেছে ঠিকই, কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের সাথে তাদের অনেক পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে, তারা জীবন যাপনের স্বাদ জানতেন। অথচ আমরা সেটা জানি না, বুঝি না।

আমাদের বুযর্গদের জন্যে যা সম্ভব ছিলো রসূল (স.)-এর সকল উম্মতের জন্যে কি সেটা সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু আমরা গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছি।

আমাদের বুযর্গরা সেই স্বাদ সম্পর্কে অবগত হয়ে নামায আদায় করতেন। তাদের সে নামাযই ছিলো প্রকৃত নামায। সে নামাযের বরকতে তারা এমন একটি বিপ্লবী দলে পরিণত হয়েছিলেন, যাদের প্রচেষ্টায় দুনিয়ার চেহারা পাল্টে গিয়েছিলো, কিন্তু পরবর্তীকালে নোংরা বস্তুবাদী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা এবাদাতকে একটি রসম রেওয়াজে পরিণত করেছি। ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছেন। চিন্তা, চেতনা, মননশীলতায় এসেছে দৈন্য, জ্ঞান প্রজ্ঞা রূহানিয়াত দূরে চলে গেছে। নামাযের মধ্যে বিনয় নম্রতা, আল্লাহভীতি, নিজেকে ভুলে যাওয়ার আত্মদর্শন আমরা ভুলে গেছি। নামাযে যদি খুশুখুজু তথা বিনয় নম্রতা না থাকে, তবে সে নামায হয় আত্মাবিহীন দেহের মতো। যদি আমরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর প্রদর্শিত নিয়মে নামায আদায় করি তবে আমাদের নামায হবে না কেন?

www.nagorikpathagar.org

আমরা কেন সে সকল পুরস্কার এবং বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি যেসব পুরস্কার এবং বরকত আমাদের পূর্বপুরুষরা লাভ করেছিলেন? আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী নামায আমাদের সকল দুঃখ কষ্ট মুছে দেয়, নামায সকল রোগের প্রতিষেধক, কিন্তু আমরা নিজেদের উদাসীনতার কারণে এ নামাযকে নিষ্প্রাণ করে ফেলেছি।

নামাযকে যে সকল দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির উপায় বলা হয়েছে সে দুঃখ কষ্ট কি শুধু আখেরাতের, নাকি দুনিয়ারও? প্রকৃতপক্ষে নামায দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল দুঃখ কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়, কিন্তু সেটা কখন? মুসলমানের কালেমা যখন সঠিক হবে, আমল যখন সঠিক মাপকাঠি অনুযায়ী হবে, তখন মুসলমানরা বিজয়ী হবে, কাফেররা পরাজিত হবে। যখন থেকে আমরা কালেমা এবং নামাযের জন্যে পরিশ্রম ত্যাগ করেছি, তখন থেকে নামাযের বিশেষত্ব আমাদের মন থেকে মুছে গেছে। আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক, যে জিনিসের বিশেষত্ব থাকে না সে জিনিসের প্রভাবও বিদ্যমান থাকে না।

বর্তমানে আমাদের নামায কেন সজীব এবং প্রাণবন্ত হচ্ছে না? এখনকার মতো চারটি সাজদার দুই রাকাত নামাযের মাধ্যমেই তো সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, আওলিয়ায়ে কেরাম গোটা বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এর কারণ হলো, তাদের নামায ছিলো বিশেষত্বপূর্ণ আর আমাদের নামায হচ্ছে বিশেষত্বহীন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ বাঘ হত্যার উদ্দেশে গুলী করছে, কারণ সে শুনেছে রাইফেলের গুলীতে বাঘ মারা যায়, কিন্তু দেখা গেলো, বাঘ হত্যা করা দূরে থাক সে বহুকষ্টে নিজের জীবন রক্ষা করেছে। তখন সে ভাবতে বসে গেলো, সত্যিই কী রাইফেলের গুলীতে বাঘ মারা যায়? একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে বোঝালো, রাইফেলের এই গুলী যখন রাইফেলের ভেতর ঢোকানো হয় তখনই এর কার্যকর শক্তি তৈরী হয়। রাইফেলের ভেতর না ঢোকালে রাইফেলের গুলীর কার্যকারিতা প্রমাণ করা যায় না। ঠিক একইভাবে আমাদের নামায অর্থাৎ রাইফেলের গুলী রয়েছে, কিন্তু ঈমান, তাকওয়া বিনয় ও নম্রতার রাইফেল না থাকায় গুলী কোনো কাজে আসছে না।

নামায কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে না। এরকম প্রভাববিহীন নামায দিয়ে দুনিয়ার উপকারই হচ্ছে না, তা হলে আখেরাতের উপকার আর কী হবে? চিন্তার কথা হচ্ছে, সে নামায দ্বারা কিভাবে জান্নাত পাওয়া যাবে? জান্নাতের দৈর্ঘ এ বিশ্বজগতের দৈর্ঘের চেয়েও অধিক।

মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হচ্ছে নামায। মুসলমান নামায আদায়ের মাধ্যমে পরকালে যেমন কল্যাণ লাভ করে তেমনি দুনিয়ায়ও কল্যাণ লাভ করে। আসুন, পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখা যাক, নামায দ্বারা দুনিয়ার কতো সব নেয়ামত ও পুরস্কার পাওয়া যায়।

নামায এবং শারীরিক সুস্থতা

নামায হচ্ছে একটি উত্তম ব্যায়াম। দুর্বলতা অলসতা এবং বেআমলের এ যুগে নামাযই এমন ব্যায়াম এবং এমন ক্রীড়াশৈলী, যার মাধ্যমে দুনিয়ার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হতে পারে। তবে সেই নামায সঠিকভাবে আদায় করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

নামাযের ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহের বাহ্যিক অংগ প্রত্যংগের সৌন্দর্য যেমন বজায় থাকে তেমনি হৃৎপিন্ড, লিভার, কিডনি, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, অন্ত্র, মেরুদন্ড, ঘাড়, বুক এবং সকল প্রকার গ্লান্ড পুষ্টি ও সুস্থতা লাভ করে। নামায দেহকে সুডৌল এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করে।

নামায এমন একটি ব্যায়াম যার মাধ্যমে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে উঠে। নামাযের মাধ্যমে চেহারার সৌন্দযর্ও বৃদ্ধি পায়।

খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের নানা রকম পদ্ধতি রয়েছে। বড়োদের জন্যে এক রকম, ছোটোদের জন্যে অন্যরকম, মহিলাদের জন্যে আবার আরেক রকম। কিন্তু নামায এমন একটি ব্যায়াম যা সকলের জন্যে এক সমান। যে কোনো বয়সের মানুষ– নারী পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলের জন্যে নামায একই নিয়মে আদায় করতে হয়।

নামায ও ব্যায়ামের চার্ট

মানুষ রাতভর ঘুমিয়ে থাকে, ফলে অংগ প্রত্যংগ স্থবির হয়ে রক্ত জমে যায়। এমতাবস্থায় রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে ব্যায়ামের প্রয়োজন। এ কারণে তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাযের বিধান দেয়া হয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে এশরাক, তারপর চাশত নামাযের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর কর্মব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে যোহরের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যোহরের নামাযের পর আছর, তারপর মাগরেব, তারপর এশার নামায আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এশার নামাযে বেশী রাকাত রাখা হয়েছে, কারণ রাতে মানুষ বেশী পানাহার করে, বেশী রাকাত নামায আদায়ের মাধ্যমে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর যে খাবার হজম হয় না তা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

একজন অমুসলিম বিশেষজ্ঞের বিস্ময়

এ, আর, কমর নামে একজন বিশেষজ্ঞ তার ইউরোপের ডায়রিতে লিখেছেন, 'আমি নামায আদায় করছিলাম। একজন ইংরেজ গভীর মনযোগ দিয়ে আমার নামায আদায় প্রত্যক্ষ করছিলেন। নামায শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, আপনি ব্যায়ামের এ পদ্ধতি আমার লেখা বই থেকে শিখেছেন? কারণ আমিও ব্যায়ামের এ রকম পদ্ধতিই আমার বইতে উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি এ রকম পদ্ধতিতে ব্যায়াম করবে সে কখনো জটিল কোনো রোগে আক্রান্ত হবে না।'

সেই ইংরেজ তারপর ব্যাখ্যা করে বললেন, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সরাসরি সাজদার ব্যায়ামে চলে গেলে হৃৎপিন্ডের ওপর চাপ পড়ে। এ কারণেই আমি আমার বইতে এ রকম ব্যায়াম করতে নিষেধ করেছি। আমি লিখেছি, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতে হবে এবং হাত বাঁধতে হবে। এরপর খানিকটা ঝুঁকে হাত এবং কোমরের ব্যায়াম অর্থাৎ রুকু করতে হবে। তারপর মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে ব্যায়াম অর্থাৎ সাজদা করতে হবে। শুধু বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই এরকম ব্যায়াম করানো সম্ভব।

ইংরেজ লোকটির কথা শেষ হওয়ার পর আমি তাকে জানালাম, আমি একজন মুসলমান। ইসলাম এভাবেই নামায আদায় করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে। আপনার

www.nagorikpathagar.org

লেখা বই আমি কখনো দেখিওনি, পাঠও করিনি। দিনে পাঁচ বার আমরা এ নিয়মে নামায আদায় করে থাকি।

আমার কথা শুনে তার বিস্ময়ের অবধি রইলো না। তিনি ইসলাম সম্পর্কে আমার কাছে আরো নানা তথ্য জানতে চাইলেন।

একজন চিকিৎসকের প্রতিক্রিয়া

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক তার দেহের অংগ প্রত্যংগের ব্যথা এবং দুর্বলতার চিকিৎসা নামাযের মাধ্যমে করেছেন। নিয়মিত নামাযের পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন। অন্য সকল ওষুধ ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে তিনি তার প্রত্যেক রোগীকে নিয়মিত নামায আদায়ের জন্যে তাকিদ দিতেন। দেখা গেলো, এতে তার কাছে আসা রোগীরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

পাকিস্তানের একজন হৃদরোগী তার হৃদরোগের নানা রকম চিকিৎসা নিতে নিতে একপর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ায় যান। সেখানে হার্ট স্পেশালিস্ট তাকে পরীক্ষা করার পর কিছু ওষুধ দেন এবং ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন। ব্যায়ামের ব্যাপারে ডাক্তার বলেন, আপনাকে আমার ফিজিও ওয়ার্ডে আমার তত্ত্বাবধানে আট দিন ব্যায়াম করতে হবে। রোগী ব্যায়াম অনুশীলন করে দেখলেন, সে ব্যায়াম হচ্ছে সম্পূর্ণ নামাযের মতো। রোগী সঠিক নিয়মেই ব্যায়াম অনুশীল করছিলেন। ডাক্তার এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বললেন, আপনি কিভাবে এতো কঠিন ব্যায়াম এতো তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করলেন? আমার অন্য রোগীদের তো এ ব্যায়াম অনুশীলনে কমপক্ষে আট দিন সময় লেগে যায়। রোগী জানালেন, আমি একজন মুসলমান। আপনার শেখানো ব্যায়াম তো সম্পূর্ণই নামাযের মতো। এ কারণেই এ ব্যায়াম অনুশীলনে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। ডাক্তার পরদিনই রোগীকে কিছু ওষুধ এবং কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

ফিজিওথেরাপিস্টের শিক্ষা ও নামায

পাকিস্তানী ডাক্তার মাজেদ যামান ওসমানী ইউরোপে ফিজিওথেরাপিতে উচ্চ ডিগ্রীর জন্যে গেলেন। সেখানে তাকে ব্যায়াম সম্পর্কে যা কিছু শেখানো হলো সেই পাঠ ছিলো পুরোপুরি নামাযের মতো। তিনি অবাক হয়ে বললেন, এ যাবত শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে আমি নামায আদায় করেছি, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি বিস্ময়কর ব্যাপার। নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে বড়ো বড়ো রোগ ভালো হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেব লেখে দিলেন, এ ব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে যেসব রোগ আরোগ্য হতে পারে তা হলো–

১. মস্তিষ্কের রোগ বা মেন্টাল ডিজিজ। ২. স্নায়বিক রোগ ৩. মানসিক রোগ ৪. অস্থিরতা ও অবসাদজনিত রোগ ৫. হৃদরোগ ৬. আর্থারাইটিস ৭. ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ ৮. পাকস্থলীর ক্যান্সার ৯. ডায়াবেটিস এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট অন্যান্য রোগ, ১০ চোখ এবং গলার রোগ।

www.nagorikpathagar.org

একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা

আমার অভ্যাস হলো, আমি যে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে গবেষণা করি। আমি আমার অভিজ্ঞতায় প্রমাণ পেয়েছি, সারাদিন কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকার পর মসজিদে গিয়ে যোহরের সুন্নত এবং ফরয নামায আদায়ের পর দেহ মনে নতুন শক্তি এবং সজীবতা তৈরী হয়। এ নামায আদায়ের পর দেহের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং দেহ পুনরায় চাংগা হয়ে ওঠে।

একবার কোনো কাজে আমি করাচী গিয়েছিলাম। মার্কেটে বিশেষ কাজে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বন্ধু বললেন, কাছেই মসজিদ রয়েছে, চলো নামায আদায় করে আসি। তাই করলাম। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, নামায আদায় করার পর সম্পূর্ণ সজীবতা অনুভব করছি। দীর্ঘ দিন পর এখনো আমি নামায আদায় করে সে রকম সজীবতা অনুভব করি।

ডাঃ বার্থাম জোশেফের অভিজ্ঞতা

বিখ্যাত একজন আমেরিকান ডাক্তার তার এক সাক্ষাৎকারে নামায এবং ইসলাম সম্পর্কে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, নামায হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যায়াম। এতে শারীরিক ও পাশবিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয় না। যিনি নামাযের এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন তিনি সম্ভবত আধুনিক যুগের যান্ত্রিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনা করেই এ পদ্ধতির বিন্যাস ঘটিয়েছেন।

নামাযে হাত তোলা, হাত বাঁধা, নীচের দিকে চোখ রাখা, আবার হাত ছেড়ে দেয়া, নত হওয়া বা ঝুঁকে যাওয়া, মন মস্তিষ্ককে কেন্দ্রীভূত রাখা, অধিক রক্ত সঞ্চালনের সুযোগ দেয়া, কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়ে হাঁটু ভেংগে বসা, এসব কিছুই হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ব্যায়ামের পদ্ধতি।

নামায ও যোগব্যায়াম

যোগব্যায়ামের বিশেষজ্ঞরা নামাযকে নিশ্বাস প্রশিক্ষণের একটি সহজ পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে কেয়াম বা দাঁড়ানো, সাজদার জায়গায় দৃষ্টি দেয়া এবং দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখা। দ্বিতীয় হচ্ছে রুকু, এ রুকুতে পায়ের জায়গায় দৃষ্টি রাখা। তৃতীয়ত সাজদা এবং সাজদায় নিশ্বাস প্রশ্বাসের উঠানামা।

ইটালীর বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে নামায

ইটালীর একজন নও-মুসলিম জামাল আবদুর রহমান বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ। তিনি নামাযের ব্যায়াম কৌশল বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, আপনি ঘাড় বা দেহের অন্য কোনো অংগ প্রত্যংগের ব্যথা বেদনা দূর করতে চান তবে প্রথমে শরীরের গ্রন্থিগুলো ঢিলে করে দিন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ান। বিভিন্ন রোগের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বৈঠক বা আসন রয়েছে। যেমন মেরুদন্ডের ব্যথা দূর করার জন্যে আলাদা উপায়ে বসতে হবে, হৃদরোগ দূর করার জন্যে আলাদা পদ্ধতি রয়েছে, কিডনির সমস্যা দূর করার জন্যে আলাদা উপায় রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

নামাযের শর্তাবলী ও আধুনিক বিজ্ঞান

নামায একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতির অংশ, একটি পূর্ণাংগ এবাদাত এবং দুনিয়া আখেরাতের আলোকবর্তিকা। নামায শুরুর প্রাক্কালে ইসলাম কিছু শর্তাবলী দিয়েছে এবং নামাযেরও বিভিন্ন রকমফের রয়েছে। যেমন ফরয নামায, সুন্নত নামায, ওয়াজেব নামায, মোস্তাহাব নামায ইত্যাদি।

যে কোনো প্রকারের ব্যায়াম শুরুর আগে কিছু প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। কেননা ব্যায়ামের পদ্ধতি সম্পর্কে জানলেই তো তা বাস্তবায়ন করা হয়। নামায যেহেতু একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যায়াম, কাজেই নামায শুরুর আগে নামায সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

দুঃখী মানুষের জন্যে নামায হচ্ছে চিকিৎসা। এ কারণে চিকিৎসামূলক কাজ শুরুর আগে যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক সেসব হচ্ছে নামাযের শর্ত।

রোগ নিরাময়ের ওষুধ তৈরীর জন্যে যেমন লতাপাতা বা কেমিকেল দরকার, ঠিক তেমনি নামাযের আমল শুরুর আগেও প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক।

ফরয নামায এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা

এখানে ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব নামায সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। ইসলাম স্বভাবসম্মত ধর্ম বা ফেতরাতের ধর্ম। কাজেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের প্রতিটি বিধান কল্যাণকর। স্থান কাল পাত্র পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ অপরিবর্তনীয়, এর কোনো পরিবর্তন নেই।

জায়গা পবিত্র হওয়া

নামায যেহেতু একটি পরিপূর্ণ আমল, এ কারণে নামায আদায়ের জন্যে এ রকম জায়গা দরকার যেখানে কোনো রোগজীবাণু থাকবে না। আমরা অনেক সময় যেসব জায়গাকে নাপাক মনে করি সেখানে ছোঁয়াচে রোগের জীবাণু থাকে। যেমন বলা যায় গোবরে টিটেনাসের জীবাণু বিদ্যমান থাকে। এছাড়া কলেরা, টাইফয়েডের জীবাণুও বিভিন্ন নাপাক জিনিসে লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম শত শত বছর আগেই এ সম্পর্কে আমাদের অবগত করেছে।

জায়গা পাক পবিত্র হওয়ার পর দৈহিক পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ নামাযী যখন নামাযের জন্যে মসজিদে যাবে তখন তার দেহ যদি পরিচ্ছন্ন না থাকে তবে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। দেহ পাক পবিত্র না হলে দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে এবং অন্য নামাযীদের দেহে সে জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। তাছাড়া অন্য নামাযীরা এ নামাযীকে ঘৃণা করবে। মানুষ তার কাছে আসতে চাইবে না। নামাযীর জামা কাপড়, পোশাক পরিচ্ছদ যদি অপরিচ্ছন্ন থাকে তবে তার মাধ্যমে নানারকম রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

সার্জারীর বিশিষ্ট সার্জন রবার্ট স্মীথ বলেছেন, আমরা পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা ইসলাম থেকে লাভ করেছি।

সামাজিক প্রভাব

একটি সুস্থ সুন্দর সমাজের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য বিদ্যমান থাকবে। অভিজ্ঞতায়

www.nagorikpathagar.org

দেখা গেছে, যাদের পোশাক পরিচ্ছদ অপরিষ্কার থাকে, সব মানুষ তাদের অপছন্দ করে। নামাযের মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে সমাজে বসবাস করার এবং সম্মানজনক জীবন যাপনের নিয়ম শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার ওপর এ কারণেই গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষকে সবাই ভালোবাসে।

মানুষ সম্পর্কে কথা বলার সময়ে সাধারণত আমরা বলে থাকি, মানুষ সামাজিক জীব। অর্থাৎ মানুষ অন্য মানুষের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে বাধ্য। ইসলামও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। হাদীসে বলা হয়েছে, ইসলামে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসব্রত নেই। সমাজবিহীন বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন ইসলাম অনুমোদন করে না। সমাজে অবস্থান করেও আলাদা জীবন যাপন করা যায় না। হাদীসে আরো বলা হয়েছে, গোটা মুসলিম জাতি হচ্ছে একটি দেহের মতো। দেহের এক অংশে ব্যথা হলে সারা দেহে (যেমন) সে ব্যথা অনুভূত হয়, (তেমনি) একজন মুসলমানের কোনো কষ্ট হলে সে কষ্টও সকল মুসলমান অনুভব করে।

এই দৃষ্টিভংগির কারণে জামায়াতে নামায আদায়ের জন্যে তাকিদ দেয়া হয়েছে। শুধু তাকিদই নয়; বরং জামায়াতে নামায আদায়ের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচ বার মানুষ যখন একত্রিত হবে তখন অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় হবে। একে অন্যের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। একজন অন্য জনের সমস্যা জেনে সেই সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারবে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

মানুষ সম্মান ও মর্যাদার সাথে সমাজে বসবাস করবে, এটাই হচ্ছে তা স্বভাব ধর্ম। এ মানুষই যদি ইসলামের পবিত্রতার শিক্ষা উপেক্ষা করে, তবে তারা নানা রকমের মানসিক রোগে আক্রান্ত হবে। এসব রোগের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো রোগ হচ্ছে, তারা হীনমন্যতার শিকার হবে। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরই তারা নানা রকম মানসিক রোগের সম্মুখীন হবে।

তারতীব অনুযায়ী নামায আদায়

নামায আদায়ে তারতীব বা পর্যায়ক্রম রক্ষা করা ওয়াজিব। যদি নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তারতীব লংঘন করা হয় তবে শারীরিক এবং মানসিক উপকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নামাযের ক্ষেত্রে ব্যায়ামের পদ্ধতি বিদ্যমান। এর মধ্যে একটা পর্যায়ক্রমিকতা রয়েছে। এ পর্যায়ক্রম রক্ষা করা আবশ্যক। প্রথমে কেয়াম না করে কেউ যদি সাজদা করে তবে স্বাস্থ্যের জন্যে যা প্রয়োজন তা পূরণ হবে না; বরং এরকম করা হলে রোগ দেখা দেবে।

কান বা কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলা

কান বা কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলা নামাযের সুন্নত। কান পর্যন্ত হাত তোলা হলে বাহু, ঘাড়, কাঁধের ব্যায়াম সম্পন্ন হয়। হৃদরোগীদের জন্যে এ ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারী। নামায আদায়ের মধ্যে এ ব্যায়াম সম্পন্ন হয়ে যায়। এ ব্যায়াম পক্ষাঘাত রোগ থেকেও মানুষকে নিরাপদ রাখে।

www.nagorikpathagar.org

তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথানত না করা

তাকবীরে তাহরিমার সময় যদি মাথা নীচু করা হয় অথবা ডানে বামে ঝুঁকানো হয় তবে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠানোর যে উপকারিতা রয়েছে তা পাওয়া যাবে না। নামায দুনিয়া ও আখেরাতের যে কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয় তা কেবল তখনই পাওয়া যাবে, যখন নামায পরিপূর্ণভাবে সুন্নত অনুযায়ী আদায় করা হবে, অন্যথায় সে কল্যাণপ্রাপ্তি সুদূরপরাহত হয়ে যাবে।

বাম হাত ডান হাতের ওপর রাখা

প্রত্যেক ভালো কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইসলাম ডান হাত ব্যবহার করার তাকিদ দিয়েছে। ডান হাতের মধ্যে বরকত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ডান দিকের অংগ এবং বাম দিকের অংগের প্রকৃতি আলাদা। ডান দিকের অংগ প্রত্যংগ থেকে বের হওয়া রশ্মি পজেটিভ আর বাম দিকের অংগ প্রত্যংগ থেকে বের হওয়া রশ্মি নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

নামাযের মধ্যে সাজদা করার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা জরুরী। বাম হাতের ওপর ডান হাত বাঁধার বিধান দেয়া হয়েছে। ডান হাত অবশ হয়ে যাওয়া লোকদের সচল বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখতে বলা হয়। এতে করে বাম হাতের বিদ্যুৎ প্রবাহ ডান হাতে সঞ্চালিত হয়ে ডান হাতে সচলতা ফিরে আসতে পারে।

নামায ও সাংবাদিক দেওয়ান সিং মাফতুন

দেওয়ান সিং মাফতুন ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি 'রিয়াসাত' নামে একটি সাময়িকী বের করতেন। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সময় উক্ত সাময়িকী ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

এ সাময়িকীর একটি সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, নামায মানুষকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। কেউ যদি ডিসিপ্লিন শিখতে চায় সে যেন নামায সম্পর্কে চিন্তা করে। নামাযের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের পার্থক্য থাকে না। বাদশাহ সুলতান মাহমুদ এবং ভৃত্য আয়াজ একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে। সকল মুসলমান সঠিকভাবে যদি নামায আদায় করতে শুরু করে তবে কোরআনের ঘোষণাই বাস্তবায়িত হবে, মুসলমানরাই বিজয়ী হবে। দেহ, সমাজ সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হচ্ছে নামায। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন আল্লাহর সৃষ্টিও সন্তুষ্ট হয়। (রিয়াসাত সাময়িকীর সৌজন্যে)

তাহাজ্জুদ এবং শেষ রাতে জাগ্রত থাকা
অবসাদগ্রস্ততার চিকিৎসা

অভিজ্ঞতা এবং গবেষণায় একথা দিবালোকের মতো সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, রুগ্ন, অসুস্থ, অর্ধমৃত এবং অনিদ্রার রোগীদের নানা রকমের চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কল্যাণকর একটি চিকিৎসাও রয়েছে। এ চিকিৎসা হচ্ছে নামায। যাদের দেহের ভেতর নানাবিধ আভ্যন্তরীণ রোগ রয়েছে তারা যদি

www.nagorikpathagar.org

রাতের শেষদিকে জেগে কাটায়, তবে তাদের দেহ অবশ্যই এর সুফল লাভ করে। মনস্তত্ত্বের চিকিৎসক এবং মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে প্রমাণিত কিছু গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, রমযানে মুসলমানদের মধ্যে ডিপ্রেশন বা অবসাদ রোগ কম দেখা যায়। রমযান মাসে চিকিৎসকদের কাছে অবসাদের রোগী খুব কম আসে। এর কারণস্বরূপ তারা উল্লেখ করেন, রমযান মাসে মুসলমানরা রাত্রি শেষে সেহরী খায়, তাহাজ্জুদ আদায় করে, ফলে তাদের মধ্যে ক্লান্তি এবং অবসাদ দেখা দেয় না। এ কারণেই চিকিৎসকরা এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শেষ রাতে জেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত উপকারী।

আল্লামা ইকবাল মেডিকেল কলেজের মেথড অব ট্রিটমেন্ট

১৯৮৫ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাহোরের আল্লামা ইকবাল মেডিকেল কলেজের মনস্তত্ত্ব ও মস্তিষ্ক বিজ্ঞান বিভাগ অবসাদ সংক্রান্ত এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীতে অবসাদ বা ডিপ্রেশনের রোগীদের একত্রে রাখা হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ৬৪ জন রোগী মনোনীত করা হয়। এদেরকে ৩২ জন করে দুই ভাগে ভাগ করে প্রথম দলের ৩২ জনের জন্যে তাহাজ্জুদ নামায বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় দলের ৩২ জনকে শেষ রাতে কিছু সময় জেগে থেকে যারা তাহাজ্জুদ আদায় করবে তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়। এ সকল রোগী দীর্ঘদিন যাবত অবসাদে ভুগছিলেন এবং নানা রকমের চিকিৎসাও তারা গ্রহণ করেছেন। উল্লিখিত চিকিৎসার সময়ে অন্য সকল প্রকার ওষুধ তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়।

উভয় দলের জন্যে রাত ২টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত জেগে থাকা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। প্রথম দলকে বলা হয়, তারা আল্লাহর যেকের, কোরআন তেলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবে। এ সময়ে কোরআনের এ দু'টি আয়াত কয়েকশ বার পাঠ করতে বলা হয়।

১. আলা বেযিকরিল্লাহে তাৎমাইননুল কুলুব

২. ওয়া ইযা মারিদতু ফাহুয়া ইয়াশফিন

রোগীদের বলা হয়, তারা যেন যেকেরের সময়ে মন নরম রাখে এবং নিজেদের মহান আল্লাহর নিকটবর্তী মনে করে। এ দলের নামকরণ করা হয় রিসার্চ গ্রুপ।

দ্বিতীয় দলকে নাম দেয়া হয়েছিলো কন্ট্রোল গ্রুপ। তাদের বলা হয়, তারা যে দুই ঘন্টা জেগে থাকবে সে দুই ঘন্টা তারা ছোটোখাটো কাজ কর্ম করবে অথবা বই পড়বে।

সপ্তাহে দুবার এ রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হতো। চার সপ্তাহ পর রোগীদের হেমিলটন ডিপ্রেশন স্কেল দিয়ে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, যারা ছোটোখাটো কর্ম করেছে এবং বই পড়েছে, অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপ– তাদের তুলনায় যারা নামায, কোরআন তেলাওয়াত এবং যেকের করেছে তাদের রোগ অনেক কমে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

ফলাফল ঃ

চার সপ্তাহ চিকিৎসার পর	সুস্থ	কোনো প্রকার প্রভাব পড়েনি	মোট
১. রিসার্চ গ্রুপ	২৫ জন	৭ জন	৩২ জন
২. কন্ট্রোল গ্রুপ	৫ জন	২৭ জন	৩২ জন
৩. মোট	৩০ জন	৩৪ জন	৬৪ জন

রিসার্চ গ্রুপের ৬২ জন রোগীর মধ্যে ২৫ জন আরোগ্য লাভ করেছে। এদের মধ্যে ১৫ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা। অর্থাৎ ৭৮ ভাগ সুস্থ হয়েছে। ৭ জন রোগী অর্থাৎ শতকরা ২১ দশমিক ৯ ভাগ (৫ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা) কোনো ফল পায়নি।

অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ৩২ জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। অর্থাৎ শতকরা ৮৩ দশমিক ২৭ ভাগ রোগী (১৬ জন পুরুষ, ১১ জন মহিলা) কোনো উপকার পায়নি।

তাহাজ্জুদ নামায একজন মুসলমানের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ আদায় করো। এটা তোমার জন্যে অতিরিক্ত। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭৯)

তাহাজ্জুদ নামায রোগীদের সরল সঠিক পথ নির্দেশ করে। এ নামায যদি গভীর মনোযোগের সাথে আদায় করা যায়, এ নামাযে যদি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো যায় তবে সুফল অবধারিত। এর ফলে রোগের প্রকোপ কমে যাবে এবং জীবন সুন্দর সুখময় হয়ে ওঠবে। কারণ যারা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে তারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আরেক আয়াতে বলেন, আর আমি কোরআনে এমন জিনিস অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্যে আরোগ্য এবং রহমত স্বরূপ। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮২)

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যায়, মুসলমানরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, সকল বিপদ আপদ, সুখ শান্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যদি আমরা খাঁটি মনে আল্লাহর কাছে দোষত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তবে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন। তিনি নিজের দয়া ও রহমত দ্বারা আমাদের বিপদ-মসিবত দূর করে দেবেন।

তাহাজ্জুদ নামায হচ্ছে একটি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। এ নামায আদায়ের শিক্ষা কোরআন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সফলতার দিক থেকে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা এ চিকিৎসার ধারেকাছেও আসতে পারে না। একজন মুসলমান মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করে, সে আল্লাহ তায়ালার একজন ক্ষুদ্র দাস। একথাও বিশ্বাস করে যে, তার জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে রয়েছে। জীবনের নানারকমের সমস্যা ও জটিলতায় আল্লাহ তায়ালাই মুক্তি দিয়ে থাকেন– একথাও একজন মুসলমান পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে।

www.nagorikpathagar.org

কোরআন হাদীস থেকে সংগৃহীত এ চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক এবং অমনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা পদ্ধতির মোক্ষম জবাব। প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগই এমন নেই যে রোগের চিকিৎসা নেই। রসূল (স.) বলেছেন, সকল রোগেরই ওষুধ রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা রোগীদের রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তবে এমন রোগও রয়েছে যে রোগের চিকিৎসা বা প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন ক্যান্সার এবং এইডস। তবে উপরোক্ত হাদীসের আলোকে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, এ সকল রোগেরও চিকিৎসা অবশ্যই রয়েছে। মানসিক রোগসমূহের চিকিৎসা হচ্ছে মানসিক শান্তি। এ মানসিক শান্তি একমাত্র নামাযের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। নামাযের মাধ্যমে রূহানী এবং মনস্তাত্ত্বিক পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা লাভ করা যায়। মোট কথা, আমরা যে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্যেই সেরাতুল মোস্তাকিমের আশ্রয় নিতে পারি। কোরআনের আয়াত এবং হাদীস থেকেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। (মাসিক আশরাফ, ডক্টর শরীফ চৌধুরী)

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

নামাযের সময় এবং আধুনিক বিজ্ঞান

মানবদেহ একটি জড় পদার্থের মতো। তাই সুস্থতার জন্যে প্রত্যেকরই নড়াচড়া, হাঁটাচলা ও ওঠাবসা করা দরকার। নামাযে বার বার ওঠাবসার ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবনের পূর্বাপর সকল সমস্যা সম্পর্কেই অবগত রয়েছেন, এ কারণে তিনি মানুষের জন্যে নামাযের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ফজরের নামায

ফজরের নামাযের সময় শুরু হয় রাত শেষ হওয়ার পর থেকে, মানুষ যখন রাতের আরাম, বিশ্রাম থেকে জেগে ওঠে। স্বাস্থ্য রক্ষার বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম হচ্ছে, কোনো প্রকার ক্রীড়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ধীর গতি, পরে জোরদার গতি সঞ্চার করতে হবে। দৌড় প্রতিযোগিতায় দেখা যায়, প্রথমে ধীরে এবং পরে জোরে দৌড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরই যদি সতের রাকাত নামায আদায় করতে হতো তবে সেই নামায হতো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। খুব শীঘ্র মানুষ অংগ প্রত্যংগের ব্যথার রোগী হয়ে যেতো এবং শক্তিহীনতার সম্মুখীন হতো।

সারারাত ঘুমিয়ে ওঠার পর সকালে মানুষের পেট থাকে খালি। অংগ প্রত্যংগ রাতভর বিশ্রাম পায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরই যদি খালি পেটে অনেকবার ওঠাবসা করতে হয় তবে তা নিশ্চয়ই হবে অত্যন্ত পরিশ্রমের এবং ক্ষতিকর। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফজরের নামায খুব সংক্ষিপ্ত করেছেন।

ফজরের নামাযের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার প্রতি আকৃষ্ট করা। যদি কেউ নামাযের জন্যে ওযু না করে এবং মেসওয়াক না করেই নাশতা করে, তবে রাতভর মুখে জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া নাশতার সাথে পেটে চলে যায়। ফলে অন্ত্ররোগ এবং আলসার হওয়ার আশংকা থাকে।

যোহরের নামায

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মানুষ জীবিকা উপার্জনের জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। এ সময়ে মানবদেহে ধুলো, মাটি লেগে যায়। অনেক সময় বিষাক্ত কেমিক্যাল বাতাসে উড়ে এসে দেহের অনাবৃত অংগ প্রত্যংগে লাগে। সেসব যদি বেশী সময় দেহে লেগে থাকে তবে দেহের ক্ষতি করে। এমতাবস্থায় যোহরের সময়ে নামাযের জন্যে মানুষ যখন ওযু করে তখন তার দেহের ধুলোবালি পরিষ্কার হয়ে যায় এবং দেহের সকল ক্লান্তি দূর হয়, মনে প্রফুল্ল ভাব তৈরী হয়, চিন্তা চেতনা আলোকিত হয়।

উত্তাপ কমে গিয়ে সূর্য যখন অস্তগামী হয় তখন মাটির ভেতর থেকে এক রকমের গ্যাস বের হতে থাকে। সেই গ্যাস এতোটা বিষাক্ত যে, যদি তা মানুষের ওপর প্রভাব

www.nagorikpathagar.org

বিস্তার করে তবে মানুষ নানা রকমের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক ব্যবস্থা এমন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে মানুষ পাগল হয়ে যায়। নামাযের নূরানী আলোকধারা মানুষকে সেই গ্যাস থেকে রক্ষা করে নিরাপদ রাখে। নূরানী আলোকধারার কারণে সেই গ্যাস নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

আসরের নামায

পৃথিবীর আবর্তন মানুষের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। দিনে দিনে এ আবর্তন কমে যায়। আসর সময়ে এ আবর্তন মানুষের অনুভূতিতে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে। মানুষ, পশু পাখী, জীবজন্তু প্রভৃতির ওপর রাতের অনুভূতি কার্যকর হতে শুরু করে। আসরের সময়ে প্রত্যেক অনুভূতিশীল মানুষ ক্লান্তি এবং অস্থিরতা অনুভব করে। ওযু এবং আসরের নামায আদায়ের ফলে মানুষের অনুভূতিশক্তি সজীবতা লাভ করে এবং তা মানুষের অবচেতন মনে তা কার্যকর হয়। মানুষকে তার রূহের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়, তাকে রূহ বা আত্মার স্পন্দন গ্রহণ করার জন্যে তৈরী করে।

একজন রোগীর অস্থিরতা

একবার আমার ক্লিনিকে একজন রোগী চিকিৎসার জন্যে উপস্থিত হলো। তার সমস্যা ছিলো, সে আসরের সময় থেকে মানসিক চাপ, অস্থিরতা অনুভব করতো। পর্যায়ক্রমে সে চাপ বেড়ে যেতো। মাগরেবের পর সে চাপ কমতে শুরু করতো। আমি তাকে কিছু ওষুধ এবং বেশী করে দরুদ শরীফ পাঠ করতে পরামর্শ দিলাম। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, রোগী কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলো।

আসরের নামাযের পর যেকের তাসবীহ ও দোয়া

আসরের নামাযের পর কিছুক্ষণ আল্লাহর যেকের, তাসবীহ পাঠ করার পর দোয়া করা হয়। এটা শরীয়তের বিধান। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপজ্জনক প্রভাব উল্লিখিত যেকের, তাসবীহ এবং দোয়ার মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।

আওলিয়ায়ে কেরামের রীতি

আল্লাহর ওলীরা আসর থেকে মাগরেব পর্যন্ত একাধারে যেকের, তাসবীহ ও ওযিফা পাঠে নিয়োজিত থাকেন। ফলে তারা পৃথিবীর আবর্তনে সৃষ্ট নানারকমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকেন।

মাগরেবের নামায এবং রূহানী ধারা

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে রেযেক দেন তা দিয়েই মানুষ নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণ করে। কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সে উজ্জীবিত হয় এবং আনন্দ অনুভব করে। আল্লাহ তায়ালা যে গুণ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার ভেতরে আল্লাহর সৃষ্টিশীল গুণ অনুভব করে। মানুষ যখন নিজের পরিবারের লোকদের সাথে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কথা বলে তখন তার ভেতরের আলোর ধারা শিশু মনে সংক্রমিত হয়। ফলে শিশু মনে পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা এবং মর্যাদা তৈরী হয়। শিশুরা পিতামাতার অভ্যাসসমূহ নিজেদের অজান্তে আত্মস্থ করে নেয়। পিতামাতার প্রতি শিশু মনে ভালোবাসার প্রেরণা তৈরী হয়। মোট কথা, মাগরেবের

www.nagorikpathagar.org

নামায যারা নিয়মিতভাবে আদায় করে তাদের সন্তানরা পুণ্যশীল হয়ে গড়ে ওঠে এবং পিতামাতার খেদমত করে। (নামায, খাজা শামসুদ্দিন আজিমী)

এশার নামায

স্বভাবের দিক থেকে মানুষ লোভী। দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে মানুষ রাতের খাবার খায়। লোভ এবং স্বাদের কারণে খাবার বেশী খেয়ে ফেলে। রাতের খাবার খাওয়ার পর পরই যদি মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে তবে ক্ষতিকর রোগের শিকার হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ তায়ালা এক্ষেত্রে মানুষের একটি উপকারের ব্যবস্থা করেছেন। সারা দিনের কর্মক্লান্তি শেষে মানুষ যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করবে। নামাযের মাধ্যমেই মানুষের পক্ষে শান্তি পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

পানাহার, বিশ্রাম এবং শান্তির ব্যবস্থা এভাবে নামাযের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। সামনে ঘুম থেকে ওঠে ফজরের নামায আদায়ের চিন্তা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে এশার নামায আদায়ের দীর্ঘ ব্যায়ামের পূর্ণতা লাভ হয়। মানুষ শান্তি এবং আরামের সাথে ঘুমাতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা ঘুমানোর আগে হালকা ব্যায়াম করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। গবেষকদের মতে, ঘুমানোর আগে নামাযের চেয়ে উত্তম অন্য কোনো ব্যায়াম হতেই পারে না।

তাহাজ্জুদ নামায

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে মানুষ বিশেষভাবে যেসব উপকার পায় সেসব উপকার নিম্নরূপ–

১. অস্থিরতা এবং অনিদ্রা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ২. হৃদরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ৩. অংগ প্রত্যংগের অসুখ থেকে নিরাময় পাওয়া যায়। ৪. মস্তিষ্কের রোগ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ রোগের প্রতিকারের জন্যে নামায হচ্ছে শেষ চিকিৎসা। ৫. তাহাজ্জুদ নামায চোখের দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে। যারা দূরের জিনিস দেখতে পায় না এ নামায তাদের জন্যে বিশেষ উপকারী। ৬. তাহাজ্জুদ নামায মানবদেহে স্থিতি, প্রশান্তি এবং অস্বাভাবিক শক্তি তৈরী করে। ফলে মানুষ সারাদিন প্রফুল্ল থাকে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

নামাযের রোকনসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

নিয়ত বাঁধা

মানব মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিদ্যুৎ তরংগ প্রবাহিত হয়। এ বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে চিন্তা চেতনার ছবি তৈরী হয় এবং সেই ছবি বিতরণ করা হয়। ছবি প্রথমে থাকে হয়তো অস্পষ্ট অন্ধকার অথবা আলো ঝলমলে। মস্তিষ্কের অন্য একটি কোষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত থাকে, সে বিষয়কে আমরা রূহানী যোগ্যতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। নামাযী যখন হাত উঠিয়ে মাথার দুই পাশে কানের কাছে নিয়ে যায়, তখন এক প্রকার বিদ্যুৎপ্রবাহ মস্তিষ্কের ভেতর চলে যায় এবং মস্তিষ্ক কোষকে বিদ্যুতায়িত করে। এ মস্তিষ্ক কোষ বিদ্যুতায়িত হলে মস্তিষ্কের ভেতর আলোর চমক দেখা দেয়। কানের কাছ থেকে হাত যখন নাভির পাশে নেয়া হয় তখন হাতের কন্ডেনসার থেকে নাভিতে বিদ্যুৎ জমা হয়। নিয়ত বাঁধার পর যখন সোবহানাকা আল্লাহুম্মা পাঠ করা হয় তখন রূহ তার পূর্ণ যোগ্যতার সাথে আল্লাহর গুণাবলীতে অভিষিক্ত হয়ে সমগ্র দেহে আল্লাহর গুণাবলী আলো হয়ে বিরাজ করে। দেহের প্রতিটি কোষ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে।

কেয়াম

কেয়াম হচ্ছে নামাযের প্রথম অবস্থা এবং নামাযের শুরু। নিয়ত করার পর দেহ পুরোপুরি শান্ত এবং স্থির হয়ে যায়। দেহে সেসময় নিম্নোক্ত রকমের প্রভাব পড়ে।

১. হাদীসে রয়েছে, নামাযী এমনভাবে কেরাত পাঠ করবে যাতে সেই কেরাত নিজের কানে শুনতে পায়। এতে কোরআনের শব্দ প্রবাহের নূর সারাদেহে প্রবাহিত হয়। এসব শব্দ রোগ প্রতিরোধে প্রতিষেধকের ভূমিকা রাখে। ২. কেয়ামের মাধ্যমে দেহে শান্ত অনুভূতি বিরাজ করে। ৩. যেহেতু কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে এ কারণে সারা দেহ এক অপার্থিব নূর বা আলোয় জড়িয়ে যেতে থাকে। যখন মানুষ এরকম অবস্থায় থাকে তখন এক অদৃশ্য নূর তাকে ঘিরে রাখে। ৪. কেয়ামের সময়ে মানুষ যে অবস্থায় থাকে, যদি প্রতিদিন ৪৫ মিনিট এরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তবে মস্তিষ্কে এবং অংগ প্রত্যংগে প্রবল শক্তি তৈরী হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেহে অনেক বেড়ে যায়।

সাজদা দেয়ার ফলে যোগব্যায়াম, টেলিপ্যাথি এবং হাইজিন এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়। কেয়ামের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষ শক্তিশালী হয় এবং এমন

www.nagorikpathagar.org

একটি গুরুতর রোগ থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যে রোগের ফলে সে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। (ফিজিওলজি রিসার্চ)

নামাযে মহিলাদের হাত বাঁধা

মহিলারা নামাযের নিয়ত করে যখন বুকের উপর হাত বাঁধেন তখন তাদের অন্তরের ভেতর এক রকমের উত্তাপ তৈরী হয়। এতে মহিলাদের স্তন পুষ্টি লাভ করে, সেই স্তনের ওপর শিশুদের খাদ্য নির্ভর করে। যেসব মা নামায আদায় করে তাদের দুধে বিশেষ প্রভাব থাকে। নামাযী মায়ের দুধ পান করানো হলে শিশুদের মধ্যে আলোর বিকিরণ হয়। শিশু মনে এবং শিশুর অনুভূতিতে আলোর প্রকাশ ঘটে।

আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, মহিলারা বুকের ওপর হাত বেঁধে যখন বিশেষ ধরনের মোরাকাবা করে তখন তারা পার্থিব চিন্তার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়। তখন তাদের মনে বিশেষ রকমের রশ্মি তৈরী হয়। ডাক্তার ব্রাউনের মতে, সেই রশ্মি হালকা নীল অথবা সাদা হয়ে থাকে। সেই রশ্মি নামাযী মহিলার দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে বের হয়। এতে মহিলার দেহে প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পায়, তার ত্বকে কখনো ক্যান্সার হতে দেখা যায় না।

নামাযে ভালোভাবে রুকু করা

রাওয়ালপিন্ডি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার মোহাম্মদ নওয়াজ বলেছেন, আমার কাছে এক চিকিৎসক দম্পতি এসেছিলেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ডাক্তার। স্বামী বললেন, আমার কোমরে এবং দেহের অন্যান্য অংগে দারুণ ব্যথা। অনেক ওষুধ খেয়েছি কিন্তু কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। ডাক্তার নওয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নামায আদায় করেন? ডাক্তার বললেন, হাঁ। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। ডাক্তার নওয়াজ বললেন, আপনি নিশ্চয়ই রুকু সাজদা ভালোভাবে আদায় করেন না। রুকু সাজদা ভালোভাবে সুন্নতী তরিকায় আদায় করুন। কিছুদিন পর সেই ডাক্তার কোমর ও গাঁটের ব্যথা থেকে নিরাময় হন।

রুকুর মাধ্যমে স্পাইনাল কডের কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। যেসব রোগীর অংগ প্রত্যংগ অবশ হয়ে যায় তারা রুকুর মাধ্যমে এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে। রুকুর মাধ্যমে কোমর ব্যথার রোগী শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। রুকুর মাধ্যমে পিত্ত পাথরি রোগ আরোগ্য হয়। অংগ প্রত্যংগ প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া রোগীরা রুকুর মাধ্যমে হাঁটাচলার শক্তি ফিরে পায়। রুকুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে এবং চোখে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। ফলে দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নামাযে ভালোভাবে সাজদা করা

নামাযী যখন সাজদা করে তখন তার মস্তিষ্কের কোষে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। অন্য কোনো অবস্থাতেই মস্তিষ্কের দিকে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে না। একমাত্র সাজদার মাধ্যমেই মস্তিষ্ক, চোখ এবং মাথার অন্যান্য অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়। ফলে মস্তিষ্ক সতেজ এবং দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয়।

www.nagorikpathagar.org

স্থায়ী সৌন্দর্যের রহস্য

ইঞ্জিনিয়ার জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী বলেন, নামাযী মানুষের চেহারায় সবসময় এক ধরনের সজীবতা বিরাজ করে। কারণ নামায আদায় করার কারণে দেহের বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগে রক্ত চলাচল করে। যারা নামায আদায় করে না তাদের দেহে এক রকমের ফ্যাকাসে ভাব লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নামায আদায় করবে তার চেহারায় পুণ্যশীলতার নূর চমকাবে।

মহিলাদের সাজদা সম্পর্কে ওয়াশিংটনের ডাক্তার

শেখ ইঞ্জিনিয়ার নকশবন্দী বলেছেন, আমেরিকার একজন ডাক্তারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বলেছেন, নামাযে দীর্ঘ সাজদার মাধ্যমে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। একথা যদি মহিলারা জানতো তবে তারা সাজদা থেকে মাথা তুলতেই চাইতো না।

সাজদা এবং টেলিপ্যাথি

আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার ২৮২ মাইল। এ আলো পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে আট বার আবর্তিত হয়। মানুষ যখন সাজদার জন্যে যমীনে মাথা রাখে তখন ব্রেইনের আলোক রশ্মি মাটিতে মিশে যায়। ফলে ব্রেইনের গতি আলোর গতির মতো হয়ে যায়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, মস্তিষ্কে অধিকতর চিন্তা উদ্রেককারী বিদ্যুৎ সরাসরি মাটিতে মিশে যায় এবং বান্দা নিজের অবচেতনে ফোর্স অব গ্রাভিটি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তার রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়, চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গিয়ে তার সামনে অদৃশ্য জগত ভেসে ওঠে।

নামাযী যখন মুক্ত পরিবেশ থেকে তাজা আলো বাতাস গ্রহণ করে, মাথা, নাক, হাত পায়ের আংগুল কেবলামুখী রেখে যমীনের সাথে মিলিয়ে সাজদা দেয় তখন দেহের উর্ধ্বাংশের রক্ত মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়। ফলে মস্তিষ্কে এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে টেলিপ্যাথির যোগ্যতা অর্জিত হয়।

নামায শেষে সালাম ফেরানো

নামায শেষে নামাযীকে সালাম ফেরানোর জন্যে মাথা ডানে বামে নিতে হয়। একই নামাযে একাধিকবার এ রকম করতে হয়। এর ফলে নামাযী হৃদরোগ এবং আভ্যন্তরীণ জটিলতা থেকে মুক্তি লাভ করে। এসব রোগে সে কমই আক্রান্ত হয়।

(ডাক্তার কাজী আবদুল ওয়াহেদ, মুলতান নিশতার মেডিকেল কলেজের গবেষণা)

তাহাজ্জুদ নামাযের উপকারিতা

মুলতানের নিশতার মেডিকল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাক্তার নূর আহমদ নূর তাহাজ্জুদ নামাযের উপকারিতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, হতাশা এবং অবসাদ বিষয়ে পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিশারদ ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খাইবার মেডিকেল কলেজের মনস্তত্ত্ববিদরা আমাকে জানিয়েছেন। তাদের মতে, যেসব মুসলমান তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ে জাগ্রত হন তারা কখনো হতাশা এবং অবসাদে আক্রান্ত হন না। তাদের মতে হতাশা এবং অবসাদের চিকিৎসাই হচ্ছে তাহাজ্জুদের সময়ে জাগ্রত হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

মনস্তত্ত্ববিদরা হতাশার রোগীদের নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। গবেষণার পর তারা হতাশা এবং অবসাদের রোগীদের তাহাজ্জুদের সময়ে জাগতে শুরু করেন। এসব রোগী ঘুম থেকে জেগে কিছু পাঠ করতেন তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। কয়েক মাস এ নিয়ম পালন করার ফলে তারা অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওষুধ ছাড়াই তাদের রোগ ভালো হয়ে যায়। ফলে পশ্চিমা ডাক্তাররা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অর্ধেক রাতের পরে জাগ্রত হওয়াই হচ্ছে হতাশা এবং অবসাদগ্রস্ত রোগীদের একমাত্র প্রতিষেধক।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কারণ

প্রায় প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাস করে, মানুষ হচ্ছে দেহ ও আত্মার সমষ্টি। দেহের খাদ্য হচ্ছে মাটি থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, আর আত্মার খাদ্য হচ্ছে নামায। ইসলামে পাশাপাশি দেহ ও আত্মার খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকালে নাশতা খাওয়ার মাধ্যমে দেহকে খাদ্য দেয়া হয়। ফজরের নামায আদায় করে রূহকে শক্তি দেয়া হয়। দুপুরের খাবার খেয়ে দেহকে শক্তি যোগানো হয়, জোহরের নামায আদায়ের মাধ্যমে আত্মাকে শক্তি দেয়া হয়। আসর এবং মাগরেবের নামাযের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাত্রিকালে অধিক খাদ্য দেহের জন্যে যেহেতু গ্রহণ করা হয়, এ কারণে এশার নামাযের রাকাতের সংখ্যাও বেশী রাখা হয়েছে।

হৃদরোগ থেকে আত্মরক্ষা

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা কয়েক বছরের পরিশ্রমের ফলে একটি ব্যায়াম আবিষ্কার করেছেন, এ ব্যায়ামের মাধ্যমে হৃদরোগ কমে যায়। এ ব্যায়াম হচ্ছে নামায। যখন আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াই তখন দেহের নীচের অংশে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়। যখন আমরা রুকু করি তখন দেহের মাঝখানের অংশ উপকৃত হয়। যখন আমরা সাজদা করি তখন দেহের উপরের অংশে বেশী পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়। কাজেই নামাযের মাধ্যমে সারাদেহে পরিমাণমতো রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। এর ফলে কয়েকটি রোগ বিশেষত হৃদরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দেখা যায়, এ কারণে কোনো এবাদাতকারী ব্যক্তি শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হলেও তার অন্তর থাকে শক্তিশালী। যারা এবাদাত করে তারা হৃদরোগে কমই আক্রান্ত হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

নামাযের বিশেষ উপকারিতা

নামায এবং উচ্চ রক্তচাপ

ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আজমী বলেছেন, নামায আদায় করার জন্যে প্রথমে আমাদের ওযু করতে হয়। ওযুর সময় যখন আমরা চেহারা এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধুই, পা ধুই, মাথা মাসেহ করি, তখন আমাদের দেহের রক্ত এক নবজীবন লাভ করে। এর ফলে আমরা অনেক প্রশান্তি লাভ করি। এ প্রশান্তির ফলে আমাদের দেহের সকল অংগ প্রত্যংগ প্রভাবিত হয়। শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালিত হওয়ার কারণে মস্তিষ্ক আরাম বোধ করে। ফুসফুস, মস্তিষ্কসহ বিভিন্ন অংগ প্রশান্তি অনুভব করে। কিডনি এবং লিভার নিজ নিজ তৎপরতা স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ কমে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়। চেহারার সৌন্দর্য বেড়ে যায়, সতেজতা লাভ করে। ওযু করার মাধ্যমে অংগ প্রত্যংগের শিথিলতা দূর হয়। চোখ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অলসতা দূর হয়ে যায়। আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ওযু করানো হলে রক্তচাপ সাথে সাথে কমে যায়।

নামাযে কেয়ামের মাধ্যমে গেঁটে রোগের প্রতিকার

নামাযের মাধ্যমে গাঁট বা জোড়ার ব্যথা আরোগ্য লাভ করে। ওযু করার পর যখন আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াই তখন দেহ ঢিলেঢালা থাকে, কিন্তু যখনই নিয়ত করার জন্যে দু'হাত ওপরে তুলি তখনই কুদরতীভাবে দেহ স্থির হয়ে যায়। সকল বৈষয়িক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মস্তিষ্ক থেকে একটি আলো এসে মেরুদন্ডের হাড় আলোকিত হয় এবং সেই আলো দেহের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগে পৌঁছে যায়। একথা সবাই জানে, শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যে মেরুদন্ডের একটি বিশেষ শক্তি রয়েছে। মেরুদন্ডের সুস্থতা ও শক্তির ওপর ভালো স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

নামাযে কেয়াম করার মাধ্যমে হাত পায়ের জোড়া ও কোমর শক্তিশালী হয় এবং গেঁটে বাত দূর হয়। তবে শর্ত হচ্ছে, নামাযের সময়ে কেয়াম হতে হবে অত্যন্ত স্থির ও সঠিকভাবে।

রুকুর মাধ্যমে কিডনি রোগের প্রতিকার

ঝুঁকে রুকু করার সময়ে হাঁটুর ওপর দুই হাত রাখার ফলে পিঠ সোজা হয়ে থাকে। এতে পাকস্থলী শক্তিশালী হয়। ডাইজেস্ট বা হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্ত্র রোগ, পেটে ভাঁজ পড়া, পেটে ব্যথা ইত্যাদি রোগ আরোগ্য হয়। রুকুর মাধ্যমে কিডনি এবং হৃৎপিন্ড শক্তিশালী হয়, কোমরে এবং পেটে চর্বি জমতে পারে না। দেহে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। মাথা এবং হৃৎপিন্ডের সাথে যেহেতু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, এ কারণে

www.nagorikpathagar.org

হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত মাথায় সঞ্চারিত হয়, মাথা ঠান্ডা থাকে। হৃৎপিণ্ডও শান্ত সুস্থ থাকে। হৃদযন্ত্র কার্যকর ও শক্তিশালী হয়। মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায়। রুকু করার সময়ে যেহেতু হাত নীচের দিকে যায়, এ কারণে কাঁধ থেকে শুরু করে হাতের আংগুল পর্যন্ত পুরো অংশের ব্যায়াম হয়ে যায়। ফলে বাহুমূল শক্তিশালী হয়। বার্ধক্যের কারণে দেহে যেসব বাড়তি উপাদান জমা হয়, সেসব উপাদান আপনা থেকেই বেরিয়ে যায়।

সাজদা পেটের চর্বি কমানোর ব্যবস্থা

রুকু করার পর নামাযী সোজা দাঁড়িয়ে তারপর আবার সাজদা করে। সাজদায় যাওয়ার আগে হাত যমীনে রাখা হয়। এটা আভ্যন্তরীণ অংগ প্রত্যংগ শক্তিশালী করে। রুকুর পরে যদি সাজদায় যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো না করে বরং ধীরে সুস্থে যায় তবে এ আমল দেহের অংগ প্রত্যংগের সুস্থতায় বিশেষ উপকার সাধন করে। সাজদার মাধ্যমে উরুর বাড়তি চর্বি কমে যায়, পেট হয় সুন্দর।

আমার এক বন্ধুর বিস্ময়কর ঘটনা

আমার এক বন্ধু ভুঁড়ি কমানোর উদ্দেশে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বললেন, তুমি একজন মুসলমান, তোমার চিকিৎসা হচ্ছে নামায। নিয়মিত নামায আদায় করো, এতে তোমার দেহ স্মার্ট হয়ে যাবে। এরপরও যদি কোনো ক্রটি থাকে তবে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করো।

সাজদার মাধ্যমে আলসারের চিকিৎসা

যেসব লোকের পাকস্থলীতে যন্ত্রণা এবং ক্ষত দেখা দেয়, তাদের আলসার হয়েছে বুঝতে হবে। ভালোভাবে সাজদা করা হলে এ রোগ ভালো হয়ে যায়। সাজদার সময়ে কপাল মাটিতে রাখা হয়, এ আমলের মাধ্যমে মস্তিষ্কের রশ্মি মাটিতে থাকা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে নিজে শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে মস্তিষ্কের শান্তি এবং নিশ্চিন্ততার পরিবেশ তৈরী হয়। শান্তিপূর্ণ মস্তিষ্ক পাকস্থলীর সতেজ গ্লান্ডকে আরো সতেজ করে।

মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ

খুশুখুযু অর্থাৎ বিনয় নম্রতার সাথে দীর্ঘ সময় সাজদা করার কারণেও মস্তিষ্কের রোগ নিরাময় হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত সঞ্চারিত হওয়ায় অপ্রয়োজনীয় উপাদান কিডনির মাধ্যমে পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায়। সাজদা থেকে ওঠার সময়ে একথা মনে রাখতে হবে, মাথা নীচু করে রাখতে হবে, বাহু সোজা রাখতে হবে। সাজদা থেকে ওঠার সময়ে উরুর ওপর হাতের তালু স্থাপন করতে হবে। চেষ্টা করে কোমর ওপরে ওঠাতে হবে এবং ধীরে ধীরে ওপরে উঠিয়ে পরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

চেহারার মেদ কমে যাওয়া

সাজদায় মাথা নীচু হওয়ার কারণে রক্তের প্রবাহ দেহের উপরিভাগে সঞ্চালিত হয়। এতে দাঁত, চোখ ও পুরো চেহারা প্লাবিত হয় এবং চেহারার মেদ ঝরে যায়। সহজে বার্ধক্য আসে না। একশ বছর বয়স হলেও মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে। সাজদা মানুষের মধ্যে এক রকমের বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরী হয়ে দেহের অংগ প্রত্যংগকে শক্তিমান করে। সঠিক নিয়মে সাজদা করা হলে সর্দি কাশি, কানের সমস্যা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

যৌন রোগের প্রতিকার

নামাযে উভয় সাজদার মাঝখানে বসার মাধ্যমে হাঁটু, কোমর মযবুত হয়। দুই উরুর সন্ধিস্থলে মানব বংশ বিস্তারের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে অংগ দিয়েছেন সেই অংগ শক্তিশালী হয়। পুরুষোচিত শক্তি বৃদ্ধি পায়, যৌন দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। ফলে মানুষের বংশ বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক দিক থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে।

বুকের ব্যথার নিরাময়

নামায শেষ হওয়ার পর আমরা দুই দিকে সালাম ফেরাই। দুইদিকে ঘাড় ফেরানোর ফলে ঘাড়ের ত্বক শক্তিশালী হয়, ত্বকের সাথে যেসব রোগের সম্পর্ক রয়েছে তা ভালো হয়ে যায়। মানুষ হাসিখুশী থাকে। বুকের ঢিলেপনা দূর হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে, এ সকল উপকার তখনই পাওয়া যাবে যখন নামাযী ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ আন্তরিকতার সাথে এবং কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে নামায আদায় করবে।

নামায সম্পর্কে ওয়াশিংটনের একজন ডাক্তার

হাফেজ ইঞ্জিনিয়ার জুলফিকার আহমদ বলেন, একবার ওয়াশিংটনে একজন ডাক্তারের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা হয় সারাদেশের মানুষদের নামাযী বানিয়ে দিই। আমি জানতে চাইলাম, আপনার এরকম ইচ্ছা হওয়ার কারণ কি? তিনি ছিলেন ত্বক বিশেষজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন, আপনি তো একজন ইঞ্জিনিয়ার, আপনি বুঝতে পারবেন, মানব দেহের ফিজিওলজি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মানুষের হৃৎপিন্ড রক্ত প্রবেশ করায় আবার বেরও করে দেয়। হৃৎপিন্ডে তাজা রক্ত প্রবেশ করে। যখন মানুষ বসে বা দাঁড়ায় তখন দেহের নীচের অংশে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, এ সময় নীচের অংশে প্রেসার বা চাপও বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, তিন তলা ভবনের পুরোটায় যদি পাইপ লাগানো থাকে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় পানি মজুদ থাকে, তবে পাইপ থাকা সত্ত্বেও মেশিন চালু না করা হলে তিন তলায় পানি ওঠবে না। মেশিন চালু করা হলেই কেবল তিন তলায় পানি ওঠবে।

এ উদাহরণ সামনে রেখে বলা যায়, মানুষের অংগ প্রত্যংগের নীচের অংশে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে, কিন্তু ওপরের অংশে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রক্ত চলাচল করতে পারে না। যখন নামাযের সাজদা দেয়া হয় তখনই কেবল মস্তিষ্কে এবং দেহের উর্ধ্বাংশে রক্ত চলাচল করে। সাজদায় যাওয়ার পর মানুষ অনুভব করে, সমগ্র চেহারা যেন রক্তের প্লাবনে ভেসে গেছে। সাজদায় কিছুটা দেরী করা হলে অনুভূত হয় যেন মাথার সকল সূক্ষ্ম শিরা উপশিরায় রক্ত পৌঁছে গেছে।

ডাক্তার বললেন, সাধারণ মানুষ বসে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে বা শুয়ে থাকে। বসে থাকার বা দাঁড়িয়ে থাকার সময় মানুষের মাথা থাকে ওপরের দিকে, শুয়ে থাকার সময় হৃৎপিন্ড থাকে নীচের দিকে মাথা থাকে ওপরের দিকে। সাজদা দেয়ার সময়ই কেবল হৃৎপিন্ড বা ফুসফুস ওপরের দিকে থাকে, মাথা চলে যায় নীচের দিকে। মাথার দিকে রক্তপ্রবাহের আরেকটি উপায় হচ্ছে, মানুষ পা ওপরের দিকে তুলে মাথা নীচের দিকে রেখে ব্যায়ামের ভংগি করবে। এর ফলে রক্ত ফুসফুসে থেকে যাবে, কিন্তু এটা করা খুব মুশকিল।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

নামায, মোরাকাবা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

মোরাকাবাকে বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতে মেডিটেশন নাম দেয়া হয়েছে। বহু জায়গায় মেডিটেশন ক্লাব তৈরী করা হয়েছে। আমি একবার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। শ্রোতারা আমার কাছে জানতে চাইলেন মেডিটেশন কী? আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, মেডিটেশন সম্পর্কে আপনারা কী জানেন? তারা বললেন, নানা জায়গায় দেখতে পাচ্ছি মেডিটেশন ক্লাব গড়ে ওঠেছে। নারী পুরুষরা সেখানে যায়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেসব লোকদের কখনো বলে, নাক বরাবর দৃষ্টি দিন, কখনো বলে, নাভির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। সবকিছু ভুলে গিয়ে রিল্যাক্স মুডে বসুন ইত্যাদি।

মেডিটেশন ক্লাবে অংশগ্রহণকারীরা এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা বসে থাকে। টাকা দেয় সময় দেয়। তারপর ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তারা আমাদের রিল্যাক্স মুডের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চিন্তা করে দেখুন, তারা অনেক ঘুরে ফিরে ইসলামের পথেই আসছে। এতে সন্দেহ নেই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের স্মরণে যে শান্তি রেখেছেন সে শান্তি অন্য কোনো জিনিসে নেই।

নামায এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা

ইউরোপে এমন অনেক ক্লাব বিদ্যমান রয়েছে যেখানে মানুষ টাকা দিয়ে এমন মজলিসে অংশ গ্রহণ করে, যেখানে তাদের হাসানো হয়। সেখানে হেসে হেসে তারা জীবনের দুঃখকষ্ট সাময়িকভাবে ভুলে যায়। তারপর আবার জীবন যাপন, আবার অশান্তি। ইউরোপে এ রকম কেন্দ্রও রয়েছে যেখানে লোকদের কাঁদানো হয়। লোকেরা কেঁদে কেঁদে জীবনের দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়, কিন্তু জীবনের দুঃখ কষ্ট তাদের সংগ ত্যাগ করে না।

গভীরভাবে চিন্তা করুন, বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখুন, নামাযের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে শান্তি রেখেছেন এবং আল্লাহর জন্যে কেঁদে যে শান্তি পাওয়া যায়, অন্য কোনো উপায়ে কেঁদে কি সেটা সম্ভব? নামাযের মাধ্যমে যে তৃপ্তি যে আনন্দ পাওয়া যায়, অন্য কোনো উপায়ে কি সে তৃপ্তি সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব? না কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্য কোনো উপায়েই সে তৃপ্তি সেই আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। (উইকলি সান-এর সৌজন্যে)

www.nagorikpathagar.org

নামাযের সময়ে সাজদায় গিয়ে হাত সোজা রাখা

সাজদায় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সারাদিনে আমরা দুই হাত সোজা করে রাখতে পারি না। হাত ভাঁজ করে বাঁকা রাখতে হয়। ঢিলেঢালাভাবে রাখতে হয়। ফলে হাতের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ও শক্তি কমে যায়।

সাজদায় যখন আমরা হাত সোজা রাখি। এটা হাতের আংগুল এবং গিরার বিশেষ ব্যায়াম নিশ্চিত করে। হাত নানারকম রোগ থেকে মুক্তি পায়, স্বাভাবিক শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে।

খুশুখুযুর মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক রোগের চিকিৎসা

মানুষ দুনিয়ার নানারকমের সমস্যায় জড়িয়ে যায়। যতোই সমস্যায় জড়ায় ততোই শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। তারপর শান্তির সন্ধানে বের হয় এবং অধিকতর শান্তি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। মাছি মধুর ওপর বসে, মধু পান করে, কিন্তু মধু খেয়ে আটকা পড়ে যায়। তারপর বের হওয়ার জন্যে চেষ্টা করে, কিন্তু বের হতে পারে না। তারপর এক সময় ছটফট করে রেশম কীটের মতো মৃত্যুবরণ করে। মানুষের অবস্থাও একই রকম। তবে তাদের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে নামায। কি রকমের নামায? আমার আপনার নামায নয়; বরং এমন নামায যে নামাযে খুশুখুযু, বিনয় নম্রতা রয়েছে।

খুশুর মধ্যে রয়েছে মানসিক শান্তি, ধ্যান এবং মনোযোগ। খুযু হচ্ছে নামাযের রোকনগুলোর ধারাবাহিকতা এবং মনোযোগ। টেলিপ্যাথিতে এ দু'টি জিনিসই একান্ত প্রয়োজন। এ দু'টি জিনিসই প্রয়োজন হিপসোটিজমে। এ দু'টি জিনিসই প্রয়োজন যোগ সাধনায়। এসব কিছু একত্রিত হয়েই মানুষের চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরী হয়ে থাকে।

মনস্তত্ত্ববিশারদরা এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নামায হচ্ছে পরিপূর্ণ প্রশান্তি। বর্তমানে মানসিক রোগীদের মনোযোগ দিয়ে নামায আদায় করার কথা বলা হয়ে থাকে। একজন মনস্তত্ত্ববিশারদ বলেছেন, মানুষ যদি খুশুখুযু সহকারে নামাযের উপকারিতা বুঝতে পারতো, তবে দুনিয়ার সকল কাজকর্ম ত্যাগ করে শুধু নামাযই আদায় করতো।

আমার পরিচিত একজন ডাক্তার একদিন আমাকে বললেন, তার কাছে একজন রোগী এসেছে। তিনি সব রকমের চিকিৎসা করেই ব্যর্থ হয়েছেন। আমি একথা শোনার পর তাকে পরামর্শ দিলাম, আপনি তাকে পরামর্শ দিন, সে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, তাহাজ্জুদ, আওয়াবিন, চাশত, এশরাক নফল নিয়মিত আদায় করুক। এসব নামায এমনভাবে আদায় করবে যেভাবে এসব নামায আদায়ের জন্যে দ্বীন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। কিছুদিন পর ওই রোগী ডাক্তারকে জানালো, আমার এক তৃতীয়াংশ রোগ এ অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্য হয়ে গেছে।

নামায ও আত্মহত্যার প্রবণতা কমে যাওয়া

ফ্রান্সের কমফোর্ট সেন্টারের রোগীদের গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যাপ্রবণ রোগীদের নামাযের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যায়াম করানো হয়েছে। তাদের নামাযের

www.nagorikpathagar.org

মতোই খুশুখুযুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে রোগীরা আত্মহত্যাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ডাক্তার আলেকজান্ডার বলেছেন, ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক কম লক্ষ্য করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, ওযু, নামায, বিশেষত খুশুখুযুসম্পন্ন নামাযের মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক কমে যায় এবং এক সময় এ প্রবণতা আর মোটেই অবশিষ্ট থাকে না।

স্যার উইলিয়াম কারকিস-এর গবেষণা

ইউরোপের এক আধ্যাত্মিকতাবিশারদ তার রচিত গ্রন্থ 'রিসার্চ ইন দি ফেনোমেনন অব স্পিরিচুয়্যালিজম'-এ লিখেছেন, লোভ, লালসা, কৃপণতা, হিংসা, ঘৃণা প্রতিশোধ গ্রহণ এ রকম ঘৃণ্য যেসব রোগের কারণে মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়, তা থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষ এ সকল রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু এসব রোগে আক্রান্ত মানুষই যদি খুশুখুযুর সাথে নামায আদায় করতে শুরু করে তবে খুব শীঘ্রই এ সকল রোগ থেকে মুক্তিলাভে সক্ষম হয়।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ভাইস এডমিরাল তার রচিত 'আসবর্ন মূর দি ভয়েস' গ্রন্থে লিখেছেন, নামাযে বিনয় ও নম্রতা নামাযের অংশ নয়; বরং এসব হচ্ছে শান্তির অংশ। তিনি আরো লিখেছেন, কেউ যদি আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে উন্নীত হতে চায় তবে তার প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে নামায পড়ো, নামায পড়ো, নামায পড়ো।

ইমামের তেলাওয়াত এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ইমাম যখন কোরআন তেলাওয়াত করে তখন মোকতাদীরা গভীর মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করে। এ তেলাওয়াত এবং শ্রবণের মাঝখানে একটি বিশেষ রকমের রশ্মি তৈরী হয়। এ রশ্মি ইমাম এবং মোকতাদীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। যদি ইমামের পটেনশিয়াল পাওয়ার অধিক এবং তীব্র হয়, তবে সে রশ্মি মোকতাদীদের মধ্যে বেশী পরিমাণে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। যদি সেই বিদ্যুৎরশ্মি মোকতাদীদের মধ্যে বেশী হয় তবে তা ইমামের দিকেও স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

প্রখ্যাত আধ্যাত্মবিশারদ লিড বিটার লিখেছেন, প্রতিটি শব্দ হচ্ছে একটি ইউনিট। এ ইউনিট থেকে একটি তীব্র আলো বের হয়। সেই আলো পজেটিভ এবং নেগেটিভ হয়ে থাকে। কোরআনের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই পজেটিভ। মোকতাদীদের ওপর যখন সেই শব্দের প্রভাব পড়ে তখন তাদের বহু রোগ শেষ হয়ে যায়। (তান কি দুনিয়া, ডাক্তার গোলাম জিলানী বার্ক)

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রক্তের লোহিত কণিকা এক অদৃশ্য প্রভাবে ভাংতে থাকে। এ ভাংগন বৃদ্ধি পেলে ব্লাড ক্যান্সারের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। নামাযে কোরআন তেলাওয়াতের ফলে বের হওয়া রশ্মি সেই রোগ থেকে নিরাপদ রাখে।

সাইকোলোজিক্যাল ডিজিজ বা মানসিক রোগ সকল যুগেই মানুষের জন্যে প্রাণঘাতী রূপ ধারণ করে আসছে। এ রোগ থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া রশ্মি নিজের ভেতর স্থানান্তর করা।

www.nagorikpathagar.org

ডিপ্রেশন, এ্যাংজাইটি তথা অবসাদ এবং অস্থিরতার মতো রোগ থেকে মানুষকে একমাত্র নামাযই মুক্তি দিতে পারে। যদি খুশুখুযু বা বিনয় নম্রতা বেশী হয় তবে এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়। অন্যথা সাধারণ নামাযীদের ক্ষেত্রে অন্তত এ রোগ কমে যায়, তবে পুরোপুরি শেষ হয় না। নামায আদায়ের মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রবণতা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়।

নামাযে পা প্রসারিত করা

যদি নামাযী নামাযের মধ্যে পরিমিত পরিমাণ অর্থাৎ শরীয়ত নির্দেশিত উপায়ে পা প্রসারিত করে তবে এর উপকার রয়েছে। যদি পা শরীয়ত নির্দেশিত পরিমাণের চেয়ে কম প্রসারিত করে, তবে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

পা যদি সংকীর্ণ করে গুটিয়ে রাখা হয় তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব অংগ প্রত্যংগের ওপর পড়তে পারে। এতে দেহের নীচের অংশ দুর্বল হয়ে যাবে। পা কম প্রসারিত করার প্রভাব তীব্রভাবে পড়ে অন্ডকোষের ওপর। এর ফলে বংশ বিস্তারের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে পা যদি নির্দেশিত পরিমাণের চেয়ে বেশী প্রসারিত করা হয় তবে অন্ডকোষের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে দেহের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরকম মানুষ পরিণতিতে মস্তিষ্কের দুর্বলতার সম্মুখীন হয়। এদের চাল চলনে শিথিলতা দেখা দেয়। তাছাড়া পা বেশী প্রসারিত করার ফলে পায়ের জোড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পায়ের গোড়ালি এবং বাইরের অংশে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। পায়ের জয়েন্ট বা জোড়া প্রভাবিত হলে পায়ের আকৃতি পরিবর্তনের ঝুঁকি তৈরী হয়।

নারীদের নামায ও আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য

নারীদের নামায পুরুষদের নামায থেকে একটু আলাদাভাবে ইসলামী শরীয়তে বিধান রয়েছে। তা হলো– সাজদা করার সময় নারীরা যেন তাদের দুই হাতের কনুই প্রসারিত করে না রাখে এবং দুই কনুই থাকবে শরীরের সঙ্গে লাগানো। এতে তাদের বুক, স্তন থাকবে নিরাপদ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। ঐ পদ্ধতিতে দুই রানকে মিলিয়ে রাখতে হবে।

শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক সাজদা করলে মেয়েলী রোগ বা স্ত্রী-রোগ থেকে রক্ষা পাবে। আর শরীয়তসম্মত উপায়ে নামায না পড়লে এমন কঠিন স্ত্রী-রোগ হতে পারে যা জীবনেও সারবে না।

বিজ্ঞানের আলোকে তারাবীহ নামাযের যৌক্তিকতা

রমযান মাসের রোযার কথা চিন্তা করলে বোঝা যায়, রমযানের রাতে তারাবীহ নামাযের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইফতারের সময় নানারকমের খাবার সামনে থাকে। পেটে থাকে ক্ষুধা। সে সময়ে খেতে বসে মানুষ একথা চিন্তা করে না যে সারাদিন পাকস্থলী খালি ছিলো। এমতাবস্থায় যদি একত্রে বেশী পরিমাণ খাবার পেটে প্রবেশ করানো হয় তবে কি পরিণতি দেখা দেবে। ফলে বেখবর মানুষ নিজের ওপর অবিচার করে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের বন্ধু এবং মানুষের সকল রোগের সর্বোত্তম চিকিৎসক। তিনি প্রতিটি মানুষের জন্যে আলাদা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্যই মানবীয় চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ভরা পেট মানুষের জন্যে তারাবীহ্ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিয়মিত দীর্ঘ সময় ওঠাবসা করা হলে অধিক খাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রোযাদার নিরাপদ থাকবে। তারাবীহ্ নামায শেষ করে রোযাদার খুশী মনে হালকা দেহে ঘরে ফিরে আসে।

তারাবীহ্ নামায আদায় না করতে পারলে সেহরী না খাওয়াই উচিত। যদি কেউ তারাবীহ্ আদায় না করেই সেহরী খায় তবে সে নানারকমের রোগের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারাবীহ্র ব্যবস্থা না থাকলে খাওয়ার পর রোযাদার ঘুমিয়ে পড়তো। এর ফলে তাকে যেসব রোগের সম্মুখীন হতে হতো সেসব রোগ নিম্নরূপ–

১. হৃদস্পন্দন এবং হৃদরোগ ২. রক্তচাপ ৩. পাকস্থলীর উত্তপ্ত হওয়া ৪. মাথা ঘোরানো এবং অন্যরকম অবস্থা ৫. দাঁতের মাঢ়ির অসুখ, বিশেষত পাইওয়োরিয়া, ৬. কফ, কাশি এবং লাগাতার সর্দি ৭. দেহের অবসাদ এবং শুষ্কতা ৮. উদরাময় এবং আমাশয়।

উল্লিখিত বিপজ্জনক রোগসমূহ সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা হলে বুঝতে পারা যাবে, একটি সুন্নতের ওপর আমল করে আমরা অনেকগুলো ক্ষতিকর রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। তারাবীহ্ একটি হালকা ব্যায়ামের মতো। এ নামায আদায়ের পর আমরা আরামের ঘুম ঘুমাতে পারি। যেসব মানুষ অনিদ্রায় ভোগে তাদের জন্যে তারাবীহ্ বিশেষ উপকারী ও প্রতিষেধক। একজন ফার্মাসিষ্ট বলেছেন, তারাবীহ্ নামায আদায়ের মাধ্যমে যৌন রোগ আরোগ্য হয়ে যায় এবং শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়। উরু এবং পায়ের মাস্যল মযবুত হয়। পাকস্থলীর রোগ এবং হৃদরোগ আরোগ্য হয়। রমযান মাসে বিকেলের পর থেকে দেহ ক্লান্তি এবং অবসাদে ভরে যায়। এ ক্লান্তি এবং অবসাদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হচ্ছে তারাবীহ্ নামায।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

রোযা

ইসলাম হচ্ছে নীতি-নৈতিকতা, শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্যে যেসব হুকুম আহকাম দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। যেমন ইসলাম নামাযের আদেশ দিয়েছে। নামায আদায়ের ফলে আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যবস্থা হয় এবং এতে সুস্থতা সজীবতা পাওয়া যায়।

রোযা পালনও আল্লাহর আদেশ। এ রোযা পালনে দুনিয়ার জীবনেও অনেক কল্যাণ রয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, রোযা রাখো, তোমরা সুস্থ থাকবে। (তাবারানী)

একাধিক হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে, তোমরা রোযা রাখো, এতে তোমরা সুস্থ থাকবে।

রোযা ও আধুনিক বিজ্ঞান

ইসলাম রোযাকে মোমেনের জন্যে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম হওয়ার সাথে সাথে শেফা বা আরোগ্যের ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের অভিমত কী? সে বিষয়ে এখানে কিছু আলোকপাত করা যাচ্ছে।

আমার এক বন্ধু বলেছেন, আমি ফ্রান্স গিয়েছিলাম। তখন ছিলো রমযান মাস। আমাকে রোযা রাখতে হবে, তারাবীহ আদায় করতে হবে। আমার প্রফেসরকে আমি বললাম, আমাকে এক মাসের ছুটি দিন। তিনি বললেন কেন ছুটি নেবে? আমি বললাম, আমাকে রোযা রাখতে হবে, তারাবীহ আদায় করতে হবে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, কিন্তু এজন্যে ছুটি নিতে হবে কেন? আমি বললাম, আমাকে প্রতিদিন অমুক জায়গায় অনেক দূরে যেতে হবে, সেখান থেকে প্রতিদিন আসা যাওয়া করা সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, এখানে কাছাকাছি একটা জায়গার কথা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। তারপর তিনি আমাকে একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম যাদের কাছে আমাকে নেয়া হয়েছে তাদের প্রায় সকলেরই মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, পরিধানে জোব্বা। কেউ মেসওয়াক করছে, কেউ ওযু করছে, কেউ আযান দিচ্ছে, কেউ নামায আদায় করছে।

একজন কোরআন পাঠ করছে অন্য কয়েকজন মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তারা সবাই রমযান মাসে রোযাও পালন করছে। রমযানের শেষ দিকে এতেকাফ করেছে। তারা শেষরাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মমতো সেহরী ইফতার করে। আমি তাদের সাথে সেখানে রমযানের সকল এবাদত বন্দেগী পালন করলাম। আমি আমার প্রফেসরকে

www.nagorikpathagar.org

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে নিয়ে গেছেন যাদের সংস্পর্শে থেকে আমার রমযান মাস ভালোই কেটেছে। প্রফেসর আমার কথা শুনে হাসলেন। আমি তার হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, তুমি কি জানো ওরা সবাই ইহুদী? আমি বললাম সেটা কি করে জানবো? প্রফেসর বললেন, তারা একটি প্রকল্পের অধীনে কাজ করছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুসলমানরা একমাস রোযা পালন করে। আমরাও একমাস পালন করে দেখি ইসলামের বিধান অনুসরণে কী কী উপকারিতা রয়েছে? যদি কল্যাণকর কিছু পাওয়া যায় আমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবো। (ওলামায়ে কেরাম এবং তাদের দায়িত্ব)

আমেরিকান এক অমুসলিমের ঘটনা

আমেরিকান এক ব্যক্তি আমাকে একদিন জানালেন তিনি রোযা পালন করছেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মুসলমান নন, আপনি কেন রোযা রাখছেন? তিনি বললেন, বছরে কিছু সময় মানুষের এরকম অতিবাহিত করা উচিত যে সময়ে তারা ডায়েট কন্ট্রোল করে নিজেদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে কিছুটা বিরতি দেবে। এর ফলে মানব দেহে তৈরী হওয়া বিষ নি:শেষ হয়ে যাবে। লালার মতো সে বিষ নি:শেষ হলে অনেক মারাত্মক রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। হজম শক্তি বা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আগের চেয়ে শক্তিশালী এবং মযবুত হয়ে উঠে। এ কারণে আমি এবং আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা প্রতি মাসে অন্তত কয়েকদিন রোযা রেখে ডায়েটিং করবো। একথা শুনে আমি তাকে বললাম, আপনি এটা করছেন ডায়েট কন্ট্রোলের জন্যে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা আমাদের অনেক আগেই এ শিক্ষা দিয়েছে। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রতি চান্দ্রমাসের মাঝামাঝি সময়ে এ রোযা পালন করা হলে অবিবাহিত লোকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তারা ধৈর্যশীল এবং আত্মসংযমী হয়ে ওঠতে পারে।

আলেকজান্ডার গ্রেট এবং এরিস্টটল

উল্লিখিত দু'জনই ছিলেন গ্রীসের অধিবাসী, নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা বিশ্ববিখ্যাত। তারা মাঝে মধ্যে ক্ষুধার্ত বা উপবাস থাকাকে দেহের সুস্থতা সবলতার জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন।

আলেকজান্ডার গ্রেট বলেন, আমার জীবন অনেক ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় দু'বেলা আহার করে সে রোগমুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারে। আমি ভারতে এরকম প্রচন্ড উষ্ণ এলাকা দেখেছি, যেখানে সবুজ গাছপালা খরতাপে পুড়ে গেছে, কিন্তু সেই তীব্র গরমের মধ্যেও আমি সকালে এবং বিকেলে দু'বেলা খেয়েছি। সারাদিন কোনো প্রকার পানাহার করিনি। এর ফলে আমি নিজের ভেতর অনুভব করেছি একধরনের নতুন সজীবতা এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

(আলেকজান্ডার গ্রেট– মাহফুজুর রহমান আখতারী, দিল্লী)

www.nagorikpathagar.org

চন্দ্রগুপ্তের উজির চানক্যের বক্তব্য

রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উজির চাণক্য অর্থশাস্ত্র নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, আমি উপোস থেকে বাঁচতে শিখেছি এবং উপোস থেকে উড়তে শিখেছি। আমি ক্ষুধার্ত পেটে শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছি। (আলেকজান্ডার গ্রেট)

মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা

মহাত্মা গান্ধীর উপোস থাকার ঘটনা সর্বজনবিদিত। ফিরোজ রাজ লিখিত গান্ধী জীবনে একথা লেখা রয়েছে যে, তিনি রোযা রাখা পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, মানুষ খাবার খেয়ে নিজের দেহ ভারি করে ফেলে। এরকম ভারি অলস দেহ দুনিয়ার কোনো কাজে লাগে না। যদি তোমরা তোমাদের দেহ সবল এবং কর্মক্ষম রাখতে চাও তবে দেহকে কম খাবার দাও। তোমরা উপোস থাকো। সারাদিন জপতপ করো আর সন্ধ্যায় বকরির দুধ দিয়ে উপবাস ভঙ্গ কর। (দাস্তানে গান্ধী)

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র প্রফেসর মোরপান্ড বলেছেন, আমি ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি লেখাপড়া করার চেষ্টা করেছি। রোযা অধ্যায়ে লেখাপড়া করার সময়ে আমি খুবই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। চিন্তা করেছি, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্যে এক মহান ফর্মূলা দিয়েছে। ইসলাম যদি তার অনুসারীদের অন্য কোনো বিধান না দিয়ে শুধু এ রোযাই দিতো, তবু এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কিছু হতে পারতো না।

বিষয়টি নিয়ে আমি একটু গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার চিন্তা করলাম। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্যে আমি মুসলমানদের নিয়মে রোযা পালন করতে শুরু করি। দীর্ঘদিন যাবত আমি পাকস্থলীর গোলমালে ভুগছিলাম। রোযা রাখার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বেশ সুস্থবোধ করতে শুরু করলাম। দেখলাম, রোগ অনেকটাই কমে গেছে। আমি রোযা চালিয়ে যেতে লাগলাম। এতে দেহে আরো কিছু পরিবর্তন অনুভব করলাম। কিছুদিন পর লক্ষ্য করলাম আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি।

একমাস পরে নিজের মধ্যে আমি এক আমূল পরিবর্তন অনুভব করলাম। (রেসালা নঈ দুনিয়া)

পোপ ঈলপ গল এর অভিজ্ঞতা

পোপ ঈলপ গল ছিলেন পোল্যান্ডের বিশিষ্ট পাদ্রী। রোযা সম্পর্কে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলেন, যারা আমার আধ্যাত্মিক অনুসারী তাদের আমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার আদেশ দিচ্ছি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে আমি যে শারীরিক সুস্থতা অনুভব করেছি তা ভাষায় অবর্ণনীয়। আমার দেহ অভাবনীয়ভাবে সতেজ হয়ে ওঠেছে। আমার অনুসারীরা আরো কিছু দিকনির্দেশনার জন্যে আমায় পীড়াপীড়ি করে। যেসব রোগের কোনো ওষুধ নেই সেসব থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে আমি তাদের তিন দিন নয়; বরং একমাস রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছি।

যেসব রোগীর ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং পাকস্থলীর অসুখ রয়েছে, তাদের জন্যে আমি একমাস রোযা পালনের ব্যবস্থা দিয়েছি। একমাস রোযা রাখার ফলে অনেকের

www.nagorikpathagar.org

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ নিরাময় হয়েছে, হৃদ রোগীদের অস্থিরতা এবং নিশ্বাস ফুলে যাওয়া কমে গেছে; পাকস্থলীর রোগীদের উপকার হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

ক্যাম্ব্রিজের ডাক্তার লোথার জিম-এর মন্তব্য

এ ডাক্তার ছিলেন ফার্মাকোলজি বিশেষজ্ঞ। সবকিছু গভীরভাবে দেখা এবং পর্যালোচনা করা ছিলো তার স্বভাব। তিনি রোযাদার ব্যক্তির খালি পেটের খাদ্যনালীর লালা (স্টোমাক সিক্রেশন) সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেন। এতে তিনি বুঝতে পারেন, রোযার মাধ্যমে ফুড পার্টিকেলস সেপটিক সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যায়। পরীক্ষার পর ডাক্তার লোথার মন্তব্য করেছেন, রোযা হচ্ছে দেহের অসুস্থতায় বিশেষত পাকস্থলীর রোগে স্বাস্থ্যের গ্যারান্টি।

সিগমন্ড নারায়েড

সিগমন্ড নারায়েড ছিলেন বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিশারদ। তাঁর আবিষ্কৃত থিওরী মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। তিনিও রোযা এবং উপবাসের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেন, রোযার মাধ্যমে মস্তিষ্কের এবং মনের যাবতীয় রোগ ভালো হয়ে যায়। মানুষ শারীরিকভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, কিন্তু রোযাদার ব্যক্তির দেহ ক্রমাগত বাইরের চাপ সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করে। সে খিঁচুনি রোগ এবং মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি লাভ করে। এমনকি সে এ দুটি রোগের সম্মুখীন আর কখনো হয় নি।

প্যারা সাইকোলজি গবেষণা

বস্তুবাদী জীবন এবং বস্তুবাদী সম্পর্কের কারণে মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে বর্তমান যুগের মানুষ শান্তির সন্ধানে ছুটছে আর ছুটছে। এ শান্তি অন্বেষার অন্য নাম হচ্ছে প্যারা সাইকোলজি।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদরা ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। কারণ পাশ্চাত্যের মানুষেরা বর্তমানে বস্তুবাদী জীবন যাপনে ত্যক্ত বিরক্ত। এ বস্তুবাদী সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে আত্মহত্যা, হত্যা প্রচেষ্টা, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, সতীত্বহরণ, সমকামিতা, অপহরণ, হত্যা, প্রতিশোধপরায়ণতা, বোমা সন্ত্রাস, সম্মিলিত হত্যাকাণ্ড, জারজ সন্তান, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি। এ রকমের ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলী গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের অতলে তলিয়ে দিচ্ছে। গোটা ইউরোপ এবং পাশ্চাত্য সমাজ এ সকল ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় নিয়োজিত।

ইউরোপের একজন নওমুসলিম মহিলা পাকিস্তানের কয়েকটি শহরের জীবনযাত্রা দেখে দুঃখ করে বলেন, আফসোস, যে সমাজকে আমি থুথু দিয়ে ফিরে এসেছি, সে নোংরা সমাজকে এদেশের মানুষ চেটে চেটে খাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের গবেষকরা বর্তমানে প্রাচ্যের ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে গবেষণা করছেন এবং নিজেদের জীবনযাত্রার সংস্কার উন্নতির উপায় অনুসন্ধান করছেন। রোযা সম্পর্কে ইউরোপীয় গবেষকরা নিয়মিত গবেষণা করেছেন। তারা স্বীকার করেছেন,

www.nagorikpathagar.org

রোযা একদিকে শারীরিক জীবনকে যেমন নতুন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করে, তেমনি এর মাধ্যমে নানারকম অর্থনৈতিক সমস্যাও দূর হয়। কারণ যখন রোগ কম হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালে রোগীদের সংখ্যাও কমে যাবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে ইউরোপের লোকেরা আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে ফিরে আসছে আর আমরা ইউরোপীয়দের আচার-আচরণ অনুকরণ করে চলেছি।

বিখ্যাত একজন ক্রিকেটার বলেছেন, বর্তমান যুব সমাজ ইউরোপকে তাদের আদর্শ মনে করছে, অথচ আমি সেই ইউরোপকে একেবারে কাছ থেকে দেখেছি। যদি শান্তি পেতে চাও তবে ইসলামের দিকে ফিরে আসো।

চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা আবেদ চাট-এর মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি ইসলামী জীবনে ফিরে আসার পর দাড়ি রেখেছেন। সুন্নতী পোশাক পরিধান করছেন, মাথায় কালো পাগড়ি ব্যবহার করছেন। তাকে দেখে মনে হয় প্রাচীনকালের কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি। অথচ পরিবর্তনের আগে তিনি ছিলেন চলচ্চিত্রের একজন নায়ক।

রসূল (স.)-এর সুন্নতের দিকে ফিরে আসার সময় ও সুযোগ এখনো আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হতে হবে রসূল (স.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা। যদি আমরা বিজ্ঞান মানার নামে সুন্নতে নববীর ওপর আমল না করি তবে এটা যেমন মূর্খতা হিসেবে বিবেচিত হবে, তেমনি এ প্রশ্নও থেকে যাবে, রসূল (স.)-কে মুখ দেখাবো কী করে? সাথে সাথে রসূল (স.) প্রদর্শিত পথের অনুসারী হলে দুনিয়ার জীবনেও যেমন উপকার পাওয়া যাবে তেমনি পরকালীন জীবনে নবীর সুন্নতের অনুসারী হিসেবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

এরকম দিন আসবে যখন সব মানুষই রোযা পালন করবে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা (এর মাধ্যমে আল্লাহকে) ভয় করতে পারো; (রোযা ফরয করা হয়েছে) কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্যে; (তারপরও) কেউ যদি সে (দিনগুলোতে) অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা কেউ যদি (তখন) সফরে থাকে, সে ব্যক্তি সমপরিমাণ দিনের রোযা (সুস্থ হয়ে অথবা সফর থেকে ফিরে এসে) আদায় করে নেবে; (এরপরও) যাদের ওপর (রোযা) একান্ত কষ্টকর হবে, তাদের জন্যে এর বিনিময়ে ফেদিয়া থাকবে (এবং তা) হচ্ছে একজন গরীব ব্যক্তিকে (তৃপ্তিভরে) খাবার দেয়া; অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি (এর চাইতে বেশী দিয়ে) ভালো কাজ করতে চায়, তাহলে এ (অতিরিক্ত) কাজ তার জন্যে হবে একান্ত কল্যাণকর; তবে (এ সময়) তোমরা যদি রোযা রাখতে পারো তাই তোমাদের জন্যে ভালো; তোমরা যদি রোযার উপকারিতা সম্পর্কে জানতে (যে, এতেই কল্যাণ রয়েছে)! (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৩-১৮৪)

www.nagorikpathagar.org

আমরা সবাই জানি, সূরা বাকারার ১৮৩ থেকে ১৮৭ নং আয়াত পর্যন্ত দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান রোযার আলোচনা রয়েছে। এ কয়টি আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। ১৮৪ নং আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত বক্তব্য আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করলে দেখতে পাই, এখানে বলা হয়েছে, রোযা পালন করা তোমাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণপ্রসদ। এতে অনেক রকমের উপকার রয়েছে। এখানে বুঝানো হয়েছে, কেউ যদি স্বতস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে সে কাজ তার জন্যে অধিক কল্যাণকর।

কিছুদিন আগেও মনে করা হতো, রোযার একমাত্র উপকারিতা হচ্ছে হজম শক্তিতে আরাম পাওয়া। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা ক্রমে আরো জানতে পেরেছি, রোযা আসলে একটি তিব্বি মোজেযা, অর্থাৎ চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক বিস্ময়। এ কারণেই আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, যদি তোমরা বুঝতে পারো।

আসুন দেখা যাক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

ক. হজম শক্তির উপর রোযার প্রভাব

আমরা জানি, হজম ব্যবস্থা দেহের অনেক অংগ প্রত্যংগের সংগে সংশ্লিষ্ট। এর প্রতিটি অংগ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মুখ, জিহ্বা, মাঢ়ি, মুখের লালা, গলা, এলিমেন্টারি ক্যানেল (গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত খাদ্যবাহী নালী ইত্যাদি)। এছাড়া রয়েছে খাদ্য গ্রহণকারী অন্ত্র, লিভার, অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। এ অংগ প্রত্যংগগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এর একটি অন্যটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটি চালু হলে অন্যগুলো আপনা আপনি কম্পিউটারী ব্যবস্থার মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। যখন আমরা খেতে শুরু করি বা খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি, তখনই এ সকল অংগ প্রত্যংগ সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিটি অংগ তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে থাকে। সমগ্র ব্যবস্থা চব্বিশ ঘন্টা কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালন করে।

রোযা এক মাসের জন্যে হজম প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত অংগ্যপ্রত্যংগসমূহের আরামের ব্যবস্থা করে। তবে হজমের ক্ষেত্রে লিভারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রোযায় লিভারের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়ে। কারণ লিভার খাদ্য হজম করা ছাড়াও আরো পনেরটি অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করে। ফলে লিভার ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। রোযার মাধ্যমে এ হজম ব্যবস্থা চার থেকে ছয় ঘন্টা বিশ্রাম লাভ করে। এ বিশ্রাম রোযা ব্যতীত সম্পূর্ণ অসম্ভব। খুব সামান্য পরিমাণ খাদ্য এমনকি এক গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাদ্যও যদি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, এতেই সমগ্র হজম ব্যবস্থা নিজের কাজ শুরু করে দেয়। লিভার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাবী করা যায়, এ বিরতির মেয়াদ বছরে এক মাস হওয়া আবশ্যক।

বর্তমান যুগের মানুষ জীবনের অসাধারণ মূল্য নির্ধারণ করেছে। তারা চিকিৎসার নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে শুরু করে, কিন্তু লিভার যদি

www.nagorikpathagar.org

কথা বলতে সক্ষম হতো তবে সে মানুষকে বলতো, তোমরা একমাত্র রোযা রাখার মাধ্যমে আমার ওপর বড়ো রকমের দয়া করতে পারো।

লিভারের ওপর রোযার বরকতসমূহের মধ্যে একটি রক্তের রাসায়নিক কার্যক্রমের প্রভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। লিভারের জটিল ও কঠিন কাজসমূহের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে হজম করা এবং হজম না হওয়া খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। লিভারকে হয়তো প্রতিটি লোকমা পাকস্থলীর স্টোরে পৌছে দিতে হয় অথবা খাদ্য হজম হয়ে রক্তের সাথে মিশে যাওয়ার কার্যক্রম তদারক করতে হয়। রোযা রাখার সময়ে লিভার শক্তি সঞ্চারক খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌছে দেয়ার কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। এ সময়ে লিভার রক্তে গ্লোবুলিন সৃষ্টির কাজে মনোযোগী হতে পারে। রোযার মাধ্যমে গলা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর খাদ্যনালী বিশ্রাম পায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া এ তোহফার কোনো মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

রোযার মাধ্যমে মানুষের পাকস্থলী অত্যন্ত কল্যাণকর প্রভাব অর্জন করে। এ সময়ে পাকস্থলী থেকে বের হওয়া লালা চমৎকারভাবে ভারসাম্য খুঁজে পায়। এ কারণে রোযার সময়ে এসিডিটি সঞ্চিত হয় না। অথচ রোযার সময় ব্যতীত অন্য সময়ের ক্ষুধায় এসিডিটি বেড়ে যায়, কিন্তু রোযার নিয়ত করার পর এসিডিটি তৈরী হওয়া বন্ধ থাকে। এ নিয়মে খাদ্যনালীতে লালা সৃষ্টিকারী কোষ রমযান মাসে বিশ্রামে চলে যায়। যারা সারাজীবনে কখনো রোযা রাখে না তাদের দাবীর বিপরীতে এটা প্রমাণিত হয়েছে, একটি স্বাস্থ্যবান পাকস্থলী সন্ধ্যায় ইফতার করার পর সফলতার সাথে হজমের কাজ সম্পন্ন করে।

রোযা পাকস্থলীর অন্ত্রসমূহকেও বিশ্রাম দেয় এবং এতে সেগুলো সজীবতা লাভ করে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর লালা এবং পাকস্থলীর কার্যক্রম জোরদার হয়। রোযার মাধ্যমে অন্ত্রের জাল যেমন নতুন সজীবতা লাভ করে, ঠিক তেমনি হজম নালীর ওপর হওয়া সকল রোগের আক্রমণ থেকেও নিরাপদ থাকে।

খ. রোযার মাধ্যমে রক্তের ওপর কল্যাণকর প্রভাব

দিনের বেলায় রোযা রাখার কারণে রক্তের পরিমাণ কমে যায়। এ রক্তস্বল্পতা হৃৎপিন্ডকে খুবই কল্যাণকর বিশ্রাম দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ইন্টারসেলুলার বা কোষের আন্তঃসংযোগ কমে যাওয়ার কারণে টিস্যুর ওপর চাপ কমে যায়। টিস্যুর ওপর চাপ অথবা ডায়াসটোলিকের চাপ হৃৎপিন্ডের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোযার মাধ্যমে ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার সব সময়েই কম থাকে। সে সময় হৃৎপিন্ড থাকে বিশ্রামে। বর্তমানে বস্তুবাদী আদর্শে জীবন যাপনের কারণে মানুষ হাইপার টেনশনে ভুগতে থাকে। রমযানের এক মাসের রোযা ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার কমিয়ে দেয়ার কারণে মানুষ অবর্ণনীয় উপকারলাভে সক্ষম হয়। রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে রক্ত চলাচল ব্যবস্থার ওপর। রক্ত চলাচল কোষের দুর্বলতার কারণে রক্তের মধ্যে অবশিষ্ট রেমন্যান্টিস মিশ্রিত হতে পারে না। অথচ

www.nagorikpathagar.org

ইফতারের সময় এ রক্ত চলাচল স্বাভাবিকতা অর্জন করে। ফলে রক্ত চলাচলকারী কোষের দেয়ালের মধ্যে চর্বিসহ অন্য উপাদান সঞ্চিত হতে পারে। এ কারণে বর্তমান যুগের অনেক ধরনের বিপজ্জনক রোগ হওয়ার আশংকা দূর হয়ে যায়। রোযার সময়ে কিডনিও বিশ্রাম লাভ করে। মোটকথা, মানব দেহের অংগ প্রত্যংগসমূহ রোযার বরকতের কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।

গ. সেল বা কোষের ওপর রোযার প্রভাব

রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে সেলসমূহের ভারসাম্য সৃষ্টির উপর। রোযার মাধ্যমে দেহের সেল বা কোষ বিশ্রাম লাভ করে। লালাযুক্ত ঝিল্লিকে বলা হয় ইপিথেলিয়াল সেল। এ সেল বা কোষ দেহের বর্জ নিষ্কাশনের দায়িত্ব পালন করে। রোযার মাধ্যমে এসব কোষ বিশ্রাম পাওয়ার কারণে তাদের পুষ্টি নিশ্চিত হয়। দেহের এসব অংগ প্রত্যংগ সারা বছর রমযান মাসের প্রতীক্ষায় থাকে। কারণ রোযার মাধ্যমে তাদের বিশ্রামের সুযোগ ঘটে। অধিকতর সক্রিয় হওয়ার জন্যে নিজের মধ্যে তারা সজীবতালাভে সক্ষম হয়।

ঘ. নার্ভ সিস্টেমের ওপর রোযার প্রভাব

একটা কথা মনে রাখতে হবে, রোযা রাখার সময় কিছু লোকের মধ্যে যে রুক্ষতা উগ্রতা লক্ষ্য করা যায়, এর সাথে নার্ভ সিস্টেমের কোনো সম্পর্ক নেই। এ রকম অবস্থার জন্যে মানুষের ব্যক্তিগত রুক্ষ স্বভাব এবং উগ্র মেজাজ দায়ী। রোযা রাখার সময়ে নার্ভ সিস্টেম সম্পূর্ণ শান্ত থাকে। এবাদাতের মাধ্যমে অর্জিত প্রশান্তি আমাদের মনের সকল কলুষ কালিমা, ক্রোধ দূর করে দেয়। অধিকতর খুশুখুযু বা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের কারণে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় সকল প্রকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের ওপর যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তা প্রায় সম্পূর্ণই লোপ পেয়ে যায় রোযার কারণে। রোযা রাখার ফলে আমাদের যৌন আকাংখা সুপ্ত থাকে তাই আমাদের মনস্তত্ত্বের ওপর বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

রোযা এবং ওযুর সম্মিলিত প্রভাবে যে রকম দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্ম নেয়, এর ফলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর নার্ভ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এক অপার্থিব প্রশান্তিতে মন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মানুষের জন্যে রোযা যে আল্লাহর অনুগ্রহ, এটা বোঝার আরেকটি উপায় হলো, রোযার সময় সকল প্রকার উদ্বেগ থেকে মুক্ত পরিচ্ছন্ন থাকা যায়।

ঙ. রক্ত উৎপাদন এবং রোযার বৈশিষ্ট্য

হাড়ের টিস্যুর মধ্যে রক্ত তৈরী হয়। দেহের যখন রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হাড়ের টিস্যুকে স্টিমুলেট করে, দুর্বল লোকদের মধ্যেও এ ব্যবস্থার কোনো ব্যত্যয় দেখা যায় না।

রোযার সময়ে রক্তে খাদ্যের উপাদান কম থাকে। টিস্যুর সক্রিয়তার কারণে দুর্বল লোকও রোযা রেখে নিজের ভেতর অধিক রক্ত তৈরী করতে পারে। তবে যে ব্যক্তি রক্তজনিত জটিল রোগে আক্রান্ত হয় তাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে এবং

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তারের মতামত নিতে হবে। রোযার মাধ্যমে যেহেতু লিভার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম লাভ করে, তাই এ সময়ে হাড়ের টিস্যু প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ পায়। এর ফলে খুব সহজেই অধিক পরিমাণ রক্ত তৈরী হতে পারে।

রোযার বরকতের কারণে একজন দুর্বল লোকের ওজন বেড়ে যেতে এবং মোটা লোকের ওজন কমে যেতে পারে।

আসুন, কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতের শেষাংশ আবার পাঠ করি এবং রোযার বরকত ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করি। আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন, যদি তোমরা বুঝতে পারো যে রোযা রাখা তোমাদের জন্যে উত্তম, তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

রোযার সামাজিক প্রভাব

ইসলাম ন্যায়নীতি, সুবিচার এবং গরীবের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। পেট যখন ভরা থাকে তখন অন্যের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করা যায় না। জিহ্বা যখন পানিতে ভেজা থাকে তখন অন্যের পিপাসার কষ্ট অনুভব হয় না। রোযা মুসলানদের সহমর্মিতা, করুণা এবং গরীবের প্রতি সমবেদনা শিক্ষা দেয়। আর এর প্রত্যেকটি হচ্ছে ইসলামী সমাজের অংশ।

গরীবদের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্যে ইউরোপে অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু ধনী গরীবের ব্যবধান সম্ভবত ইউরোপেই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়।

মাও সেতুং ছিলেন চীনের মহান নেতা। ধনী গরীব সমস্যার সমাধানের জন্যে তিনি তার ভাষণে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, নিজে যখন খাবে তখন যারা দেখবে তাদের এবং পাড়া প্রতিবেশীদেরও সে খাবারে শামিল করবে। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে ক্ষুধার্তদের কষ্ট অনুভব করবে। উল্লিখিত শিক্ষা মাও সেতুং-এর নয়; বরং এ শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের।

ইসলাম হচ্ছে গরীব দুঃখীদের প্রতি সর্বোচ্চ সহমর্মিতা প্রকাশের ধর্ম। ইসলাম ধনীদের অর্থসম্পদের নিরাপত্তা দেয়। ইসলাম অর্থ সম্পদ উপার্জনের বিরোধী নয়, ইসলাম যা বলতে চায় তা হলো, অর্থ সম্পদ উপার্জন এবং ব্যয় করার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্ধারিত ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

পাকিস্তানে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সার্ভে রিপোর্ট

রমযান মাসে নাক, কান এবং গলার অসুখ কম হয়। জার্মানী, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি টীম এ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে এক রমযান মাসে পাকিস্তানে আসে। গবেষণা কর্মের জন্যে তারা পাকিস্তানের করাচী, লাহোর এবং ফয়সালাবাদ শহরকে মনোনীত করে। সার্ভে করার পর তারা যে রিপোর্ট প্রণয়ন করে তার মূলকথা ছিলো নিম্নরূপ।

'মুসলমানরা যেহেতু নামায আদায় করে, বিশেষত রমযান মাসে অধিক পাবন্দীর সাথে নামায আদায় করে থাকে, এ কারণে ওযু করে। এ ওযু করার কারণে তাদের

www.nagorikpathagar.org

নাক, কান গলার অসুখ কম হয়। খাদ্য কম খাওয়ার কারণে পাকস্থলী এবং লিভারের অসুখ কম হয়। রোযার মাধ্যমে এ ডায়েটিং করার কারণে তারা মস্তিষ্ক এবং হৃদরোগে কম আক্রান্ত হয়। (দৈনিক জং, ১৯৮৮)

অভিজ্ঞতার আলোকে মানব দেহের ওপর রোযার প্রভাব

মৌসুম এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে রোযার মেয়াদ ১২ থেকে ১৯ ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। রাত বড়ো হলে সাধারণত ইফতারের পর সাহরীর আগে দু'একবার খাবার খেতে হয়। শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একথা পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না যে, রোযার দ্বারা দেহের ওপর কেমন প্রভাব পড়ে। কেউ কেউ বলেন, রোযার কারণে দৈহিক দুর্বলতা দেখা দেয়। আবার কেউ বলেন, রোযা রাখার ফলে দেহে কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। রোযা রাখার ফলে দুই ওয়াক্তের আহারের ব্যবধান কিছু বেশী হয়। ২৪ ঘন্টায় যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় এতে যতোটুকু পুষ্টি অর্জন করে তা দেহের জন্যে যথেষ্ট। রোযায় দেহের পুষ্টি অন্য সময়ের চেয়ে মোটেই কম হয় না। তবে এটা একটা বাস্তব সত্য যে, রমযান মাসে মানুষ প্রোটিন এবং কার্বো হাইড্রেটযুক্ত জিনিস অধিক ব্যবহার করে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, রমযান মাসে দেহ সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশী খাদ্যপ্রাণ লাভ করে।

সামগ্রিকভাবে রোযাদারের দেহের অবস্থা রমযানে কেমন থাকে তা পর্যবেক্ষণের জন্যে একবার এক উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো। এ উদ্দেশে ১৩ জন রোযাদারের একটি গ্রুপ মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে ছয় মাসের একজন গর্ভবতী মহিলাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উল্লিখিত ১৩ জনের সংগে ২৭ বছর বয়স্ক এমন একজনকে মনোনীত করা হয় যে রোযা রাখেনি। এভাবে ১৪ জনকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় নিম্নোক্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করা হয়েছে।

১. ওজন, ২. শারীরিক উত্তাপ, ৩. নাড়ি, ৪. রক্ত চলাচল, ৫. দৈহিক সুস্থতা অসুস্থতা, ৬. সামগ্রিক দৈহিক অবস্থা, ৭. রক্ত ও পেশাবের রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ।

উল্লিখিত গ্রুপে গর্ভবতী মহিলা বাদে অন্য তিন জন মহিলার বয়স ছিলো যথাক্রমে ১৭, ২৭ এবং ৪০ বছর। অবশিষ্ট পুরুষদের বয়স ছিলো ২২ থেকে ৬৯ বছর। সব নারী পুরুষ ছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এদের গ্রহণ করা খাদ্যের মধ্যে প্রতিদিন তিন হাজার কেলোরি রেকর্ড করা হয়েছে। রমযান শুরুর এক সপ্তাহ আগে তাদের বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে যেন পরবর্তী সময়ের অবস্থার সাথে তাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যায়। সে সময় নাশতা খাওয়ার আগে পরীক্ষার জন্যে তাদের প্রস্রাব ও রক্ত সংগ্রহ করা হয়। তারপর ইফতার করার পর পরই আবার প্রস্রাব এবং রক্ত সংগ্রহ করা হয়। অথচ রোযাদাররা এক চুম্বক পানি দ্বারা ইফতার সম্পন্ন করেছিলেন।

তাদের উপর পরিচালিত এ জরিপের সময় ছিলো পহেলা রমযান, ১০ই রমযান, শেষ রমযানের দিন এবং রোযার চার সপ্তাহ পর। প্রসংগত উল্লেখ্য, উক্ত গ্রুপে রোযা

www.nagorikpathagar.org

না রাখা ব্যক্তির দেহে ওজনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। কারণ রমযান ছাড়া সাধারণ সময়েও ওজনে কমবেশী হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণের ফলে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ-

পাউন্ডের হিসেবে ওজন

	রমযানের আগে	পহেলা রমযান	দশম রমযান	শেষ রোযার দিন	চার সপ্তাহ পর
রোযা না রাখা ব্যক্তি	১৪২	১৪০	১৪২	১৪০	১৪২
যারা রোযা রেখেছেন	১২২	১২২	১১৯	১২১	১২১
গর্ভবতী মহিলা	১০৬	১০৬	১১০	১০৮	১১৭

উল্লেখ্য, গর্ভধারণের সময়ে ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ওপরে যে তথ্য চিত্র দেয়া হয়েছে এর মধ্যে দুই জনের ওজন ৭ পাউন্ড কমে গেছে। একজনের ওজনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। গর্ভবতী মহিলার ওজন রমযানে চার পাউন্ড বেড়ে গেছে। সাত ব্যক্তির ওজন চার সপ্তাহ পর সেটাই হয়েছে যে ওজন রমযানের আগে ছিলো।

নার্ভ এবং দৈহিক উত্তাপের ওপর রোযার কোনো প্রভাব পড়েনি। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ রমযানের আগের মতোই অক্ষুণ্ন ছিলো। মোট কথা, সামগ্রিকভাবে রক্ত চলাচলে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি।

খাদ্যে শর্করার পরিমাণ কারো ক্ষেত্রেই শতকরা ৭ মিলিগ্রামের নীচে ছিলো না। রমযানে শর্করার পরিমাণ ছিলো কম। এছাড়া রক্তে রাসায়নিক উপাদান রমযানে স্বাভাবিক পরিমাণে বজায় ছিলো। এতে কোনোপ্রকার পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়নি।

সাধারণভাবে গ্রুপের লোকেরা রমযানে ২৪ ঘন্টায় সে পরিমাণ পানিই ব্যবহার করেছে যে পরিমাণ অন্য সময়ে ব্যবহার করতো। প্রস্রাবের পরিমাণেও তেমন একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়নি। এটা ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবের কারণে হয়েছিলো। প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রাভিটিতেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এসব পর্যালোচনায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, রমযানে যদিও দেহের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। রক্তে শর্করার পরিমাণের ক্ষেত্রেও কোনো তারতম্য হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, পরীক্ষায় যাদের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক প্রমাণিত হয় তাদের উপরই পরীক্ষা চালানো হয়। কাজেই গুরুতর রোগীদের ক্ষেত্রেও যে একই রকম ফলাফল পাওয়া যাবে একথা বলা যায় না। কিডনির রোগী বা ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিন্নরকম ফলাফল পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (হামদর্দ ছেহেত)

রোযা স্বাস্থ্য রক্ষার একটি অতুলনীয় পদ্ধতি

আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর দেহকাঠামো এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, যতোক্ষণ তারা খাদ্যপানীয় নিয়মিত এবং সময়মতো না পায়, ততোক্ষণ তাদের পক্ষে জীবন ধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। খাদ্য পানীয় কম বেশী হওয়ার সাথে সাথে তাদের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হবে। পশুকুল তাদের বিবেচনা অনুযায়ী খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও সীমালংঘন করে। এর ফলে তাদের

www.nagorikpathagar.org

দেহকাঠামো বিগড়ে যায় এবং তাদের নানারকম ক্ষতিকর রোগের সম্মুখীন হতে হয়। এ কারণেই অন্যান্য পশু এবং মানুষের রোগের ধরনের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দেহ রোগমুক্ত রাখার জন্যে এ যাবত যতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে কিছুদিনের জন্যে পানাহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাকস্থলী খালি রাখা। এর ফলে সারাদেহ সুস্থ থাকে। ক্ষুধার কারণে পাকস্থলীর অপ্রয়োজনীয় উপাদান জ্বলেপুড়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর পাকস্থলী স্বাভাবিকভাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

বিশ্বের প্রায় সকল ধর্ম এবং শরীয়তই তাদের অনুসারীদের জন্যে উপবাস থাকার ব্যবস্থা করেছে। ইসলামী পরিভাষায় এ উপবাস থাকাকে সিয়াম বলা হয়ে থাকে। হিন্দুরা ২৪ ঘন্টা ব্রত বা উপবাস পালন করে। এ ব্রত পালনকালীন সময়ে তারা আগুনে রান্না করা কোনো খাবার খায় না। কিন্তু কাঁচা দুধ, পানি ইত্যাদি পান করা দোষণীয় মনে করে না। আধুনিককালের ইহুদীরা মাছ গোশত ইত্যাদি ত্যাগ করে অন্যান্য জিনিস খেয়ে সেটাকেই রোযা নামে অভিহিত করে। ইহুদীদের রোযার বিধানেও কিছু কিছু জিনিস পানাহার নিষিদ্ধ নয়।

ইসলামে চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী একমাস রোযা পালন করা হয়। সৌরবর্ষের হিসাব অনুযায়ী ১০ দিন পার্থক্য থাকে। ফলে ৩৬ বছরে রমযান শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পড়ে। এতে করে প্রায় ৫০ বছর বা এর অধিককাল একজন মুসলমান শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে রোযা পালনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

রমযান মাসের রোযা পালন প্রত্যেক সুস্থ, সক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী পুরুষের ওপর ফরয। এই রোযা ছাড়া অন্য রোযাও রাখার বিধান রয়েছে। সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা পালন করতে হয়। উল্লিখিত সময়ে পানাহার এবং যৌন মিলন থেকে বিরত থাকতে হবে। এ সময়ে পান, বিড়ি, সিগারেট, হুঁকো পান থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক। এ রকম কোনো কিছু যদি কেউ ব্যবহার করে তবে তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে।

এভাবে রোযা পালন আত্মনিয়ন্ত্রণ আত্মসংযমের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিশোর নবীন যুবকরা যখন গরমের মৌসুমে প্রথম রোযা রাখে এবং পিপাসার কষ্ট সহ্য করে, সেটা বড়ো রকমের সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। রোযাদার ব্যক্তি সতর্কতার সাথে ওযু করে। সামান্য একটু পানিও গলার ভেতর প্রবেশ করতে দেয় না। গোসলখানায় কেউ দেখে না, কিন্তু সেখানেও সংযমের পরিচয় দেয়। আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক এবং স্বাস্থ্যগত উপকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা খুবই কল্যাণকর একটি নিয়ম। ক্ষুধা পিপাসা এবং আত্মসংযমের তীব্রতায় রোযা দেহে শক্তি সঞ্চয় করে। ইফতারের সময় একজন রোযাদার যে রকম আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

চিকিৎসকরা স্বীকার করেছেন, রোযা পালন করা স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই উপকারী। অনেক রোগের চিকিৎসায় ডাক্তাররা রোগীদের রোযা পালন করার পরামর্শ দেন।

www.nagorikpathagar.org

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইসলাম কোনো মানুষের ওপর তার শক্তির অতিরিক্ত বোঝা চাপায় না। সুস্থ অবস্থায় রোযা পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর ফরয, কিন্তু অসুস্থতার সময়ে, সফরের সময়ে, বার্ধক্যের সময়ে, গর্ভবতী মহিলাদের জন্যে শিশুকে দুধ পান করানো মায়েদের ক্ষেত্রে রোযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যেসব রোগের প্রতিকারের জন্যে ডাক্তার রোযা রাখার বিধান দেন তাদের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রমযান মাসে প্রতিদিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। কারণ এভাবে রোযা রাখা হলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অধিকাংশ শিক্ষিত লোক একটি প্রশ্ন করেন। উত্তর মেরুতে এবং দক্ষিণ মেরুতে বছরে ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত থাকে। সেখানে একদিন আমাদের এক বছরের সমান, সুতরাং তারা কিভাবে রোযা রাখবে? সে ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপায় না। তাই উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর অধিবাসীরা যেভাবে নিজেদের কাজকর্ম, পানাহার এবং নামায আদায় করে থাকেন সেভাবেই রোযাও পালন করবেন। রসূল (স.) একবার বলেছিলেন, ইয়াজুজ মাজুজের সময়ে একদিন হবে এক বছরের সমান। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, তবে সেই এক বছরের দিন কি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ই যথেষ্ট হবে? রসূল (স.) বললেন, না হবে না, নামাযের জন্যে তোমরা সময় নির্ধারণ করে নেবে।

রুশ শরীর বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ভি এন নিকটন দীর্ঘায়ু লাভের উপায় সম্পর্কে লন্ডনে ১৯৬০ সালের ২২ মার্চ একটি বক্তৃতা দেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি কাজ করা হলে দেহের বিষাক্ত উপাদান ঝরে যাবে এবং বার্ধক্য রোধ করা যাবে। সে তিনটি কাজ হলো–

১. যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। এমন পেশা নির্বাচন করতে হবে যে পেশায় দেহের শিরা উপশিরায় সজীবতা সৃষ্টি হয়। তবে সে পেশার প্রতি মনের আগ্রহও থাকতে হবে। যদি সে পেশা পছন্দ না হয় তবে সাথে সাথে ছেড়ে দেবে। ২. পরিমিত ব্যায়াম করতে হবে। ৩. যে খাদ্য পছন্দ করবে তা-ই খাবে। তবে প্রতি মাসে কমপক্ষে একদিন অবশ্যই উপবাস থাকবে।

রসূল (স.) রমযানের রোযা ছাড়াও প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালন করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা রোযা রাখো, তাহলে সুস্থ থাকবে।

রসূল (স.) মৃত্যুশয্যায় হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-কে তিনটি অসিয়ত করেছিলেন। সে তিনটির মধ্যে একটি ছিলো, প্রতি মাসে তিনটি রোযা পালন করবে।

খেজুর দ্বারা ইফতার এবং আধুনিক বিজ্ঞান

যে ব্যক্তি খেজুর পাবে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যে ব্যক্তি খেজুর পাবে না সে পানি দ্বারা ইফতার করলেই চলবে। কারণ পানিও পবিত্র। (নাসাঈ)

রোযা রাখার পর স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। এ কারণে এমন জিনিস দ্বারা ইফতার করতে হবে যা সহজে হজম হবে এবং দেহে শক্তি যোগাবে।

www.nagorikpathagar.org

খেজুরের রাসায়নিক পর্যালোচনা

প্রোটিন	২.০
ফ্যাট	২.০
কার্বো হাইড্রেটস	২৪.০
ক্যালোরি	২.০
সোডিয়াম	৪.৭
পটাশিয়াম	৭৫৪.০
ক্যালশিয়াম	৬৭ .৯
ম্যাগনেশিয়াম	৫৮.৯
কপার	০.২১
আয়রন	১.৬১
ফসফরাস	৬৩৮.০
সালফার	৫১.৬
ক্লোরাইন	২৯০.০

এছাড়া খেজুরের মধ্যে প্যারোক্সাইডেসও পাওয়া যায়। রোযার সময়ে ভোর রাতে সেহরী খাওয়ার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু পানাহার করা যায় না। এ কারণে দেহে ক্যালোরি এবং উত্তাপ ক্রমাগত কমতে থাকে। তাই খেজুর দিয়ে ইফতার করলে দেহের ক্যালোরি এবং উত্তাপে ভারসাম্য ফিরে আসে। দেহ নানাপ্রকার রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। দেহের উত্তাপ যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তবে নিম্নোক্ত রোগের আশংকা থেকে যায়।

যাদের দেহে লো ব্লাড প্রেসার, প্যারালাইসিস, ফ্যাসিয়াল প্যারালাইসিস এবং মাথা ঘোরানোর ব্যাধি রয়েছে, খেজুর দ্বারা ইফতারের ফলে তারা উপকার লাভ করে।

খাদ্যে প্রোটিন কমে যাওয়ার কারণে দেহে আয়রনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। খেজুর এ আয়রন শূন্যতা পূরণ করে।

যাদের মাথায় খুশকি আছে রোযা রাখলে তাদের খুশকি আরো বেড়ে যায়। খেজুর এক্ষেত্রেও উপকারী। কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, রোযাদারের জন্যে খেজুর অত্যন্ত উপকারী।

গ্রীষ্মকালের রোযাদার পিপাসায় একটু বেশী কাতর হয়ে পড়ে। এ কারণে ইফতারের প্রথমেই ঠান্ডা পানি পান করলে পাকস্থলীতে গ্যাস এবং লিভার ইনফ্ল্যামেশন হওয়ার আশংকা থাকে। কাজেই খেজুর খাওয়ার পর পানি পান করলে নানারকম রোগের আশংকা থেকে তারা মুক্ত থাকে।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়

ইসলামে খাবার গ্রহণ পদ্ধতি ও আধুনিক বিজ্ঞান

খাদ্য দেহের প্রয়োজন পূরণ করে। বেঁচে থাকার জন্যে সবাই খাবার গ্রহণ করে, কিন্তু এ খাদ্য যদি স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে হয়ে থাকে তবে মানুষ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সুস্থতা অর্জনে সক্ষম হতে পারে। আরো ভালো কথা হচ্ছে, যদি আল্লাহর আদেশ এবং রসূল (স.)-এর তরিকা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা হয় তবে সে খাদ্য গ্রহণ সুন্নতী তরিকা অনুযায়ী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক হতে পারে।

খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, শতকরা আশি ভাগ রোগ শুধু নিয়ম কানুনহীন খাদ্য গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। বর্তমানে সকল ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে গবেষণা করছেন যে, কী কী খাদ্য মানুষের জন্যে প্রয়োজন এবং কখন কী কী খাদ্য মানুষের পরিহার করা আবশ্যক। খাদ্য গবেষণা বিষয়ে বর্তমানে পিএইচডি ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে। একজন বিশেষজ্ঞ যব সম্পর্কে গবেষণা করে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁর গবেষণায় এও ছিলো, রসূল (স.) যবের রুটি খেতেন, এ রুটি স্বাস্থ্যের জন্যে কতোটুকু উপকারী ছিলো।

উল্লিখিত খাদ্য সম্পর্কিত তথ্য ও উপাদান যেসব গ্রন্থের সাহায্যে সাজানো হয়েছে সেসব গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. উসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (স)
ডাক্তার মোঃ আবদুল হাই

২. যাদুল মায়া'দ
হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ

৩. মাযাকুল আরেফীন
ইমাম গাযযালী

৪. রাহবারে জিন্দেগী
সাইয়েদ মোহাম্মদ সাঈদুল হাসান শাহ

৫. মামূলাতে নববী (স.)
ইসলামী কুতুবখানা

৬. মাওয়ায়েজে নকশবন্দী
হাফেজ জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

www.nagorikpathagar.org

৭. ইসতেফাদা
ডাক্তার নূর আহমদ, নিশতার মেডিকেল কলেজ

৮. ফাযায়েলে সাদাকাত
কুতুবখানায়ে ফয়জী, লাহোর

৯. ছেহেত ওয়া যিন্দেগী
খোশতার গ্রাসী, দিল্লী, রাবেয়া বুক ডিপো লাহোর

১০. মেডিকেল এন্ড হাইজিন
ডাক্তার জর্জ এল ডব্লিউ

১১. মাদারেজুন নবুওত
শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী

১২. ইসতেফাদা
ডাঃ কাজী আবদুল ওয়াহেদ, নিশতার মেডিকেল কলেজ

ওয়াশিংটনের এক কোম্পানী ডাইরেক্টর এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

ইঞ্জিনিয়ার নকশবন্দী বলেন, ওয়াশিংটনে একবার একটি সভা চলছিলো। সেখানে আমেরিকার তিনটি বড় বড় কোম্পানীর ডাইরেক্টর এবং জেনারেল ম্যানেজাররা উপস্থিত ছিলেন। একই টেবিলে আমরা খাবার খেলাম। আমরা মুসলমানরা খাবার হাত দিয়ে খেতে শুরু করলাম। আমাদের অবস্থা দেখে ইংরেজরা ছুরি কাঁটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। আমরা এ দৃশ্য দেখে অবাক হলাম। শ্বেতাংগদের এই প্রথম দেখলাম এভাবে খাবার খাচ্ছে। খাবার শেষে তাদের প্রতি হাত মোছার পেপার এগিয়ে দিলাম, কিন্তু তারা তাতে হাত না মুছে আংগুল চুষে খেতে লাগলেন। আমি বললাম, হয়্যার ইউ লার্ন ইট? আপনারা এটা শিখলেন কোথায়? তারা বললেন, আমেরিকার সাম্প্রতিক কালের এক গবেষণায় জানা গেছে, হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা হলে আংগুল থেকে প্লাজমা বের হয়। সে প্লাজমা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যায়। বর্তমানে আমরা ছুরি কাঁটার পরিবর্তে আংগুল দিয়ে খাওয়া পছন্দ করি।

খাওয়ার আগে হাত ধোয়া

মানুষ নানা কাজে নানা জায়গায় হাত লাগায়। এতে অনেক সময় হাতে রোগজীবাণু লেগে যায়। এ কারণে ইসলামী শরীয়তে খাবার আগে হাত ধোয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। আরেকটি আদেশ হচ্ছে, হাত কাপড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে না। কারণ কাপড়েও রোগজীবাণু লেগে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। একজন ট্রাক ড্রাইভার খাওয়ার জন্যে একটি হোটেলের কাছে গাড়ী থামালো। নীচে নেমে সে প্রথমে টায়ার চেক করলো তারপর খাবার খেলো। সে খাদ্য গ্রহণের পর পরই মৃত্যুবরণ করলো। অথচ সেই হোটেলে অসংখ্য লোক খাবার খেয়েছে, কিন্তু অন্য কারো ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেলো, সে ট্রাকের টায়ারে একটি সাপ জড়িয়ে ছিলো। সেই সাপের দেহনিঃসৃত তাজা বিষ টায়ারে লেগেছিলো। ড্রাইভার

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু হাত দিয়ে টায়ার পরীক্ষা করেছিলো, তারপর হাত না ধুয়েই খাবার খেয়েছে, এ কারণে খাদ্য গ্রহণের পর পরই তার মৃত্যু হয়েছে।

খাওয়ার আগে এবং পরে লবণ খাওয়া

খাওয়া শুরু করার আগে কিছু পরিমাণ লবণ মুখে দিতে হবে। কারণ লবণের মধ্যে খাদ্যস্পৃহা বৃদ্ধি করার উপাদান রয়েছে। কিছু পরিমাণ লবণ মুখে দেয়ার পর খাদ্য গ্রহণ করা হলে খাদ্য সুস্বাদু মনে হয়। ক্ষুধা জেগে ওঠে এবং আল্লাহর নেয়ামতের যথাযথ স্বাদ আস্বাদন করা যায়। একইভাবে খাদ্য গ্রহণের পর সামান্য কিছু লবণ মুখে দেয়াও স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী।

খাওয়ার আগে কুলি করা

খাওয়ার আগে কুলি করতে বলা হয়েছে। সারাদিন বাতাসে ধূলোবালি নাকে মুখে চোখে প্রবেশ করে। এসব ধুলোবালির সাথে থাকে নানারকমের রোগ-জীবাণু। এমতাবস্থায় কুলি না করে খাবার খাওয়া হলে খাদ্যের সাথে জীবাণুও পেটে প্রবেশ করতে পারে। এ কারণে মুখ পরিষ্কার করার জন্যে কুলি করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শরীয়তে এরকম বিধানই রয়েছে।

খাদ্য গ্রহণের সময় ডান হাত ব্যবহার করা

নামাযের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, ডান হাত ও বাম হাত থেকে ইনভিজিবল রে বা অদৃশ্যমান রশ্মি বের হয়। ডান হাতের রশ্মি হচ্ছে পজেটিভ আর বাম হাতের রশ্মি হচ্ছে নেগেটিভ। পজেটিভের মধ্যে আরোগ্য আর নেগেটিভের মধ্যে রোগ রয়েছে। কাজেই ডান হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। যেহেতু প্রস্রাব করার সময় বাম হাত ব্যবহার করা হয় এ কারণে বাম হাতে রোগজীবাণু লেগে থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

খাদ্যের উপর ফুঁ না দেয়া

মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনডাইঅক্সাইড বের করে দেয়। কার্বনডাইঅক্সাইডের মধ্যে অসংখ্য জীবাণু থাকে। যখন মানুষ ফুঁ দেয় তখন অসংখ্য জীবাণু খাদ্যের সংগে মিশে যায়। অনেক লোকের জন্যে তৈরী করা খাদ্যের মধ্যে কেউ যদি ফুঁ দেয় এবং সেই ফুঁয়ে রোগজীবাণু থাকে, তবে সেই জীবাণু খাদ্যের সংগে মিশে যাবে। ফলে যতো মানুষ সেই খাদ্য গ্রহণ করবে সকলেরই ক্ষতি হবে। এ কারণে খাদ্যের মধ্যে ফুঁ দেয়া নিষেধ।

একত্রে খাদ্য গ্রহণ করা এবং উচ্ছিষ্ট খাওয়া

আমার পরিচিত প্যাথলজির একজন প্রফেসর বলেন, একত্রে অনেকে খেতে বসলে সবার জীবাণু খাদ্যের সংগে মিশে যায়। এ জীবাণু অন্যান্য রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়। এ প্রতিষেধক পাকস্থলীর রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত উপকারী।

উন্নত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং চমৎকার করে কথা বলেন এ রকম এক ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। তিনি জানালেন, এক সময় আমি পাগল ছিলাম। দীর্ঘদিন মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকি। মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ফরমও দেখালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সুস্থ হয়েছেন কিভাবে? তিনি বললেন, আমার

www.nagorikpathagar.org

পরিবারের লোকেরা আমার চিকিৎসা করতে করতে বিরক্ত হয়ে গিয়ে একপর্যায়ে আমাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। সেখানে আমি একদিন একেবারেই সুস্থ, সচেতন অবস্থায় বসেছিলাম। একজন লোক তখন আমাকে বললেন, মুসলমানের উচ্ছিষ্টের মধ্যেও সুস্থতা রয়েছে। সেদিন থেকে আমি অন্য মানুষের উচ্ছিষ্ট সুন্নত ভেবে খেতে শুরু করলাম। এতে মাত্র সাত মাসে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম।

গুজরানওয়ালার অন্য একজন লোকের সাথে আমার দেখা হলো। তিনি ছিলেন হৃদরোগের পুরাতন রোগী। তিনি জানালেন, যখন থেকে আমি সুন্নত মনে করে উচ্ছিষ্ট খেতে শুরু করেছি তখন থেকে এ পর্যন্ত আমার কখনো হৃদরোগ হয়নি।

অন্য একজন বললেন, আমার একজন বন্ধু ছিলেন। ১৯৭০ সালে তার টিবি রোগ হয়েছিলো। তিনি ওষুধ খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও কোনো লাভ হয়নি। অবশেষে একজনের কাছে শুনে মুসলমানের উচ্ছিষ্ট খেতে শুরু করেন। ফলে মাত্র চার মাসে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। ১৯৯৬ সালে তার সাথে শাদাদপুরে আমার দেখা হয় তখনো তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ।

কিভাবে খাবার খেতে হবে

হাদীসে খাবার খাওয়ার তিন প্রকার নিয়মের কথা বলা হয়েছে ঃ

১. দুই পা তুলে বসা

এ নিয়মে খাবার গ্রহণ করা হলে খাবার পাকস্থলীতে পৌঁছে যায় এবং অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছুতে পারে না। পাকস্থলীতে যতো কম খাদ্য পৌঁছে অসুখ বিসুখ ততোই কম হয়।

২. এক পা তুলে বসা

এ নিয়মে বসলে কিছু অতিরিক্ত খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছে। তবে এ নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করা হলে তিল্লির রোগ (Spleen) থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এ রকম ব্যক্তির উরু মযবুত থাকে।

৩. জোড়া আসনে বসা

দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে জোড়া আসনে বসে খাবার খাওয়া। এ নিয়মে খাদ্য গ্রহণ সে সব লোকের জন্যে উপকারী, যারা কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। যারা চেয়ারে বসে কাজ করে, যারা গাড়ী চালায় তারা যদি জোড়া আসনে বসে এ নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করে তবে খুব কম সময়ের মধ্যে রোগে আক্রান্ত হবে। যদি প্রথম নিয়মে অর্থাৎ এক পা তুলে বসে তবে ইনশাআল্লাহ কখনো রোগে আক্রান্ত হবে না।

কোরিয়ায় সফরকালীন অভিজ্ঞতা

কোরিয়া সফরের সময়ে আমি সেখানের লোকদের এক পা তুলে এবং দুই পা তুলে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখেছি। চেয়ারে বসে খাদ্য গ্রহণ করার সময়েও তারা এক পা তুলে এবং দুই পা তুলে খাদ্য গ্রহণ করতো। তাদের এই দৃশ্য আমাকে সত্যিই অবাক করলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এ নিয়ম কোথায় এবং কিভাবে শিখেছেন? তারা বললেন, বর্তমানে মুটিয়ে যাওয়া একটি রোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মুটিয়ে যাওয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে এক পা বা দুই পা তুলে খাদ্য গ্রহণ করা। কারণ বর্তমানে সকল প্রকার ওষুধের ব্যর্থতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকি অতিরিক্ত ওষুধ সেবন করা হলে রোগ বেড়ে যায়- এ রকমও দেখা গেছে। আধুনিক গবেষণায় আমরা প্রমাণ পেয়েছি, এক পা বা দুই পা তুলে খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত উপকারী। এ পদ্ধতির কথা গ্রন্থাকারে লিখে আমরা সমগ্র দুনিয়ার মানুষদের জানাতে চাই।

আমি তাদের কথা শোনার পর বললাম, এ নিয়ম তো ইসলাম আমাদের চৌদ্দশ বছর আগেই শিক্ষা দিয়েছে।

আমার কথা শুনে তারা অবাক হয়ে গেলেন। তারা বললেন, যদি তাই হয়ে থাকে তবে আপনারা আমাদের এতোদিন জানালেন না কেন? (দেশ কাহিনীঃ রঈস সরদার আহমদ)

একজন ইংরেজকে আমি এক পা তুলে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখে এভাবে বসার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি নিজের পেটের প্রতি ইংগিত করে বললেন, এর কারণে। (চশমে দীদ, পৃষ্ঠা ১০৬)

ভালোভাবে চিবিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা

প্রিয় নবীর সুন্নতে খাদ্য ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক দন্ত চিকিৎসকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য কম চিবিয়ে খায় তার দাঁত খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। যদি একদিকের দাঁতে চিবিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে তবে অন্যদিকের মাঢ়ির দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই উভয় পাশের দাঁত দিয়েই খাদ্য চিবাতে হবে এবং ভালোভাবে চিবাতে হবে। খাদ্য কম চিবিয়ে খেলে পাকস্থলীতে এসিড তৈরী হতে পারে। মোটকথা, যদি আমরা হজমীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাই তবে খাদ্য ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। এতে আমরা নিজেরা যেমন উপকৃত হবো তেমনি একটি সুন্নত জীবিত করার নেকীও পাবো ইনশাআল্লাহ।

প্লেট পরিষ্কার করে খাওয়া

যে বরতনে খাবার খাওয়া হয় সে বরতন ভালোভাবে চেটে খেতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, রসূল (স.) যে প্লেটে খাবার খেতেন তা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতো যে, সে প্লেট খুব সহজেই চেনা যেতো। আংগুলে চেটে প্লেট পরিষ্কার করে খেতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, খাদ্য খাওয়ার শেষ পর্যায়ে বরতনে ভিটামিন বিশেষত ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স বিদ্যমান থাকে। অবশিষ্ট খাদ্যকণায় যে ভিটামিন থাকে তা হচ্ছে মিনারেল সল্ট। এ ভিটামিন স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই উপকারী।

হেলান দিয়ে বসে খাদ্য গ্রহণ উচিত নয়

হেলান দিয়ে বসে খাদ্য গ্রহণ করা হলে এতে তিনটি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

১. খাদ্য ভালোভাবে চিবানো যায় না। এভাবে খেলে খাদ্যে পরিমিত পরিমাণ লালা সংযোজিত হতে পারে না। খাদ্য হজম করার জন্যে যে পরিমাণ কার্বো হাইড্রেটস বিদ্যমান থাকার কথা সে পরিমাণ পাওয়া যায় না। এর ফলে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. হেলান দিয়ে বসার ফলে পাকস্থলী প্রসারিত হয়ে যায়। এতে করে অপ্রয়োজনীয় খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। ফলে হজম ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

৩. গবেষণায় দেখা গেছে, হেলান দিয়ে বসে খাদ্য গ্রহণ করার ফলে অন্ত্র এবং লিভার ব্যবস্থার ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

খাদ্য গ্রহণে আংগুলের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা

খাদ্য গ্রহণে আংগুলের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্যে আংগুলের গোড়াসহ প্রবেশ করানো ঠিক নয়। (উসওয়ায়ে রসূলে আকরাম স.)

খাবার খাওয়ার পর আংগুল চেটে খাওয়া জরুরী। যদি আংগুল চেটে না খাওয়া হয় তবে প্রত্যাশিত উপকার পাওয়া যাবে না। এটা স্পষ্ট, আংগুলের গোড়া পর্যন্ত চেটে খাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না।

অনেক সময় দুই আংগুলের সন্ধিস্থলে জীবাণু লেগে থাকে। যদি পুরো আংগুল খাদ্যের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া হয় তবে খাদ্যদ্রব্যে জীবাণু লেগে যেতে পারে। যদি আংগুলের সেই সন্ধিস্থল চেটে খাওয়া হয় তবে জীবাণু পেটের ভেতরও প্রবেশ করবে।

খলীফা হারুনুর রশীদের একটি ঘটনা

খলীফা হারুনুর রশীদ একবার তাঁর দরবারে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের একত্রিত করেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারতীয়, একজন রোমের ইংরেজ, একজন ইরাকী, অন্যজন সাওয়াদ নামক এলাকার অধিবাসী। তারপর তিনি চিকিৎসকদের কাছে জানতে চাইলেন, এমন একটি ওষুধের নাম বলুন যে ওষুধ কোনো জিনিসের ক্ষতি করবে না।

ভারতীয় ডাক্তার বললেন, এরকম জিনিস হচ্ছে 'কালি হিটার'।

ইরাকী ডাক্তার বললেন, এরকম জিনিস হচ্ছে 'হোব্বুর রাশাদ' অর্থাৎ 'হালিয়া' বা 'হালুন'।

রোমের ডাক্তার বললেন, এ রকম জিনিস হচ্ছে গরম পানি।

সাওয়াদের ডাক্তার অন্য তিন জনের মতের বিরোধিতা করে বললেন, কালি হিটার পাকস্থলীকে চাপ সৃষ্টি করে, হালুন পাকস্থলীতে সেঁতসেঁতে ভাব সৃষ্টি করে আর গরম পানি পাকস্থলী শিথিল করে দেয়। আমি মনে করি খাদ্য এমন সময়ে গ্রহণ করা উচিত যখন ক্ষুধা তীব্র হবে এবং চাহিদা থাকতেই খাদ্য গ্রহণ শেষ করা উচিত।

অবশেষে অন্য তিন জন চিকিৎসক চতুর্থ জনের এ কথার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

বর্তমানকালে আধুনিক বিজ্ঞান অধিক আয়ুপ্রাপ্তি ও সুস্থ থাকার জন্যে কম খাওয়ার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানুষকে একথা বার বার বুঝাতে হবে। অধিক খাদ্য গ্রহণের ফলে যেসব রোগ হতে পারে, ইংল্যান্ডের ডিউজবেরির অধ্যাপক রিচার্ড তার একটি তালিকা তৈরী করেছেন। এ তালিকা নিম্নরূপ–

www.nagorikpathagar.org

১. মস্তিষ্কের রোগ ২. চোখের অসুখ ৩. জিহ্বা ও গলার অসুখ ৪. কলিজা এবং ফুসফুসের অসুখ ৫. হার্ট এবং ভালবের অসুখ ৬. লিভার এবং গলব্লাডার-এর অসুখ ৭. ডায়াবেটিস ৮. উচ্চ রক্তচাপ ৯. ব্রেইন ডিসট্রাকশন ১০. মনস্তাত্ত্বিক অসুখ ১১. অবসাদ ও হতাশা (ডিপ্রেশন) ১২. দেহের নিম্নাংগ অবশ হয়ে যাওয়া। (উইকলি সান, সুইডেন)

আমি মনে করি, এ তালিকা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলে বুঝা যাবে, এ তালিকা হচ্ছে মৃত্যুর তালিকা। অধ্যাপক রিচার্ড অনেক গবেষণা করে এ তালিকা তৈরী করেছেন। অন্যদিকে রসূল (স.)-এর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য।

পেটের তিন অংশ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূলে আকরাম (স.) বলেছেন, পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য গ্রহণের জন্যে, এক তৃতীয়াংশ পানি পানের জন্যে আর এক তৃতীয়াংশ নিশ্বাস গ্রহণের জন্যে। (মাযাকুল আরেফিন)

একজন দার্শনিকের সামনে এ হাদীস শোনানোর পর তিনি মন্তব্য করলেন যে, এর চেয়ে চমৎকার এবং শক্তিশালী কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি।

রসূল (স.)-এর বক্তব্য সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান যতোই গবেষণা করছে ততোই বিস্মিত হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে ইটালীর একজন ডাক্তার

ইটালীর খাদ্য বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার বলেছেন, দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ করো না। এতে হৃদরোগ এবং তিল্লির রোগে আক্রান্ত হবে। তিনি বলেন, বসে খাও এবং কম খাও। কারণ দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরী করে। এছাড়া এমন একটি রোগ তৈরী করে যে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ নিজেকে চিনতে পারে না।

ইসলাম তার অনুসারীদের চৌদ্দশ বছর আগেই দাঁড়িয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে আর বিজ্ঞান এখন নিষেধ করছে।

ইমাম গাযালীর বক্তব্য এবং স্লিমিং সেন্টার

ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন, কম খাওয়ার অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে। কেউ যদি বেশী খেতে অভ্যস্ত থাকে সে হঠাৎ করে কম খেয়ে থাকতে পারবে না। ফলে তার দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং কষ্টের মধ্যে পড়বে। (এহইয়াউল উলুম)

এখন থেকে দশ বছর আগে ইউরোপে মুটিয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে ক্যামিকেল প্রয়োগ করে চিকিৎসা শুরু করা হয়। পরে দেখা যায়, এ ক্যামিকেল ব্যবহার করা হলে কিডনির খুব ক্ষতি হয়। নিরন্তর গবেষণার পর বিশেষজ্ঞরা খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে চিকিৎসা দিয়েছেন। এতে রোগীদের কিছু ওষুধ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ব্যায়ামের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, যতোদিন পর্যন্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করা হবে ততোদিন পর্যন্ত মোটা হওয়া কমানোর অন্য কোনো ব্যবস্থাই কার্যকর হবে না। ময়দা, ঘি এবং মিষ্টি– এ তিনটি জিনিস পরিহার করতে হবে এবং

www.nagorikpathagar.org

খাবার কম খেতে হবে। তবে খাদ্য গ্রহণ ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। যদি হঠাৎ করে খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়া হয় তবে এতে অনেক ক্ষতি হবে। দেহ দুর্বল হয়ে যাবে। দুর্বল দেহ নতুন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দেবে।

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত শিডিউল মেনে চলা হলে প্রতি সপ্তাহেই এর সুফল লক্ষ্য করা যাবে। (স্বাস্থ্য ও জীবন-এর সৌজন্যে)

হযরত হাসান বসরীর বক্তব্য এবং আধুনিক মনস্তত্ত্ববিশারদরা

হাসান বসরী বলেছেন, একজন মুসলমানের উদাহরণ হচ্ছে বকরি শাবকের মতো। এদের একমুঠো পুরাতন খেজুর, একমুঠো ছাতু এবং এক চুমুক পানিই যথেষ্ট। (ফাযায়েলে সাদাকাত)

এটাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার নমুনা। আর এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেই মুসলমানরা সফলতা অর্জন করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ববিদরা এ নিয়ম অনুশীলনের জন্যে প্রচারণার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

খৃস্টান মিশনারী ও সতর্কতার সঙ্গে খাদ্য অভিযান

খৃস্টান মিশনারীর ডাক্তাররা বিশ্বজুড়ে আজকাল একথা প্রচার করছেন, কম খাও, নিজে খাও এবং অন্যদের খেতে দাও। সতর্কতার সাথে খাও, বাঁচার জন্যে খাও। সমাজের সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখো। নিজে খাও, অন্যদের খেতে দাও। সামাজিক জীবন যাপন করো। নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখো, অন্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখো। (স্বাস্থ্য ও জীবন-এর সৌজন্যে)

বর্তমানে চিকিৎসকরা এসব কথা বলছেন। এসব কথার মধ্যে কি ইসলামী শিক্ষার বাস্তবমুখিতা ও সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না?

ক্ষুধার্ত থাকা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ক্ষুধার্ত থাকা হচ্ছে চিকিৎসা। 'তোমরা তোমাদের রোগীদের ক্ষুধার মাধ্যমে চিকিৎসা করো'- হাদীস বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের অনেক কথা বর্ণনা করেছেন। সাহাবারা ক্ষুধার্ত থাকতেন। রসূল (স.) নিজেও ক্ষুধার্ত থাকতেন। ফলে সাহাবারা এবং স্বয়ং রসূল (স.) বড়ো রকমের কোনো রোগে আক্রান্ত হতেন না। বর্তমানে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করাই রোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। জেরুজালেমের বিখ্যাত ইহুদী ডাক্তার ও মোবাল্লেগ ইউফগুন ক্ষুধার্ত রেখে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, পাকস্থলীর রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, মানসিক রোগ এসব রোগের চিকিৎসা হচ্ছে খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা। আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমানে ক্ষুধার্ত থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে। রসূল (স.), সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, আওলিয়ায়ে কেরামের জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায় তারা অধিকাংশ সময়েই না খেয়ে থাকতেন। অথচ তাঁদের জেহাদ, জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, দ্বীনের তাবলীগের জন্যে প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয়। বর্তমানে আমরা যে বিষয়টিকে লজ্জাজনক মনে করি, আমাদের পূর্বপুরুষরা সেটা আত্মস্থ করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদা অর্জন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে ইসলামের শিক্ষা অমুসলিমরা গ্রহণ করে উপকার পাচ্ছে, কিন্তু মুসলমানরা সেসব শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। ইসলাম এবং কোরআন অস্বীকার করেও ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে কাফের অমুসলিমরা নিজেদের জীবন সার্থক করছে।

না খেয়ে থাকার বিস্ময়কর উপকারিতা

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ কসম করে বলেছেন, ক্ষুধার্ত ব্যতীত কোনো লোককে আল্লাহ তায়ালা পাপ থেকে পবিত্র করেন না। এ কারণেই দেখা যায়, বুযুর্গানে দ্বীন শুধু পানি পান করেই অনেক সময় জীবন ধারণ করতেন। (এহইয়াউল উলুম-ইমাম গাযালী)

আওলিয়ায়ে কেরাম ক্ষুধার্ত থেকে উন্নত মর্যাদালাভে সক্ষম হয়েছেন। কারণ তারা রেযেক ছেড়ে রাযযাক-এর সন্ধানে থাকতেন। ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে তারা উন্নত মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। আজকের দুনিয়ার মানুষ সে মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে।

মোজাহাদা এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা উন্নত মর্যাদায় পৌছার একমাত্র সিঁড়ি। মোজাহাদার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে ভোগবিলাসের পেছনে না দৌড়ানো। এ কারণেই দেখা যায়, আওলিয়ায়ে কেরাম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার্ত থাকার জীবন গ্রহণ করেছেন। এটা রসূল (স.)-এর সুন্নত। চিত্রের বিপরীত অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। গান্ধী ক্ষুধার্ত থাকলে হিন্দুরা তাকে পূজা করতে শুরু করে। রসূল (স.) ক্ষুধার্ত থেকে আল্লাহর সাহায্যে খন্দক, বদরে পৌছে যান। সাহাবারা ক্ষুধার্ত থেকে সমগ্র বিশ্ব জয় করেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, যমীনের দূরত্ব অল্প সময়ে অতিক্রম করা কি জায়েয? ক্ষুধার্ত থাকা এবং মোজাহাদার মাধ্যমে কাফেররা কী অর্জন করেছে? এ প্রসংগে এমন কিছু ঘটনা আমি এখানে লিখছি, যেসব ঘটনা ইংরেজ খৃস্টানরা লিখেছেন। এতে বুঝা যায়, ক্ষুধার্ত থাকা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দেয়। রসূল (স.)-এর সুন্নত যারা পালন করবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে, কিন্তু এ ক্ষুধার্ত থাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এ বিষয়ে যেসব ঘটনা লেখা হচ্ছে তার সম্পর্ক নির্ভেজাল রূহানিয়াতের সাথে। ১৯৫৭ সালে ইংল্যান্ডের 'ইনভিজিবল হেলপারস' নামক গ্রন্থে লিড বিটার এ সম্পর্কিত বেশ কিছু ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকায় ১৯৫৭ সালেই এ প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এমন কোনো মানুষ কি রয়েছেন যিনি সশরীরে অলৌকিক সফর করেছেন? অথবা উড়ে গেছেন? দু'জন মহিলা দাবী করেছেন, তাদের এ রকম শক্তি রয়েছে। তাদের একজনের নাম মিসেস বিই বিকম, অন্যজনের নাম মিসেস এ ও সাম।

এ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর ১৯৫৭ সালের ১৩ই অক্টোবর পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর ক্যারিংটন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি প্রজেকশন অব দি আসটাল বডিজ' গ্রন্থে এরকম বেশ কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন যারা অলৌকিক সফর করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর আলেকজান্ডার কানন-এর অভিজ্ঞতা

ডক্টর কানন পিএইচডি লন্ডনের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ। তিনি আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ পোষণ করেন। এর রহস্য উদঘাটনের জন্যে তিনি ভারত এবং তিব্বত সফর করেন। তার সফরের অভিজ্ঞতা তিনি 'ইনভিজিবল ইনফ্লুয়েন্স' নামের একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

একবার একজন কর্নেল আমার সংগে দেখা করতে এলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে আমার কথা হচ্ছিলো। একপর্যায়ে তাকে আমি তার মস্তিষ্ক প্রবাহ সম্পর্কে অমনোযোগী করে দিলাম এবং তার হাতে কাগজ কলম দিলাম। তাকে বললাম, অমুক রাজনীতিকের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করুন। তিনি তিন ঘন্টা পর্যন্ত লেখলেন। পরে তার লেখা আমি সংশ্লিষ্ট রাজনীতিককে দেখালাম। তিনি সব কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। (পৃষ্ঠা ৩৬)

তিব্বতে যাওয়ার সময়ে তিব্বত থেকে একশ মাইল দূরে থাকা অবস্থায় একজন অপরিচিত লোকের সাথে আমার দেখা হলো। লোকটি ছিলো গেরুয়া রং-এর পোশাক পরিহিত। লোকটি বললো, আপনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে দালাইলামা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি এবং আমার সফরসংগীরা অবাক হলাম। চিন্তা করলাম, লোকটি আমাদের খবর কিভাবে জানলেন এবং এতোদূরে কিভাবে এসে পৌছুলেন।

দালাইলামা বললেন, মানুষ যদি আল্লাহর ইচ্ছার কাঠামোতে নিজেকে গড়ে তোলে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে তার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিশে যায়।

উদাহরণ হিসেবে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো

এরকম বহু ঘটনা দালাইলামার বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে মানুষ শান্তির সন্ধানে ঘুরছে। এ শান্তি বাইরে কোথাও নেই; বরং এ শান্তি রয়েছে মানুষের ঈমানের শক্তি এবং আমলের শক্তির মধ্যে। পাঠক আমার কথাকে হয়তো অতিরঞ্জিত মনে করতে পারেন। আসলে তা নয়। মানুষ কখনো নেতা হয়, কখনো অন্যের নেতৃত্বে জীবন কাটায়। এ সম্পর্কে জানার জন্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

১. আস্ট্রাল প্লেন- লীড বিটার ২. ম্যান এন্ড হিজ বডি- এ্যানি বেসান্ত ৩. লিটল জার্নিস ইন টু দি ইনভিজিবল- গিফোর্ড শিন।

ইসলামের শিক্ষা ও সমাজতন্ত্র

হযরত সালমান ফারেসীকে এক ব্যক্তি বলেছিলো, যমীনের ধনভান্ডার আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তবুও আপনি কেন ক্ষুধার্ত থাকেন? তিনি বলেন, আমি আশংকা করছি যে, পেট ভরে খেয়ে ক্ষুধার্তদের ভুলে না যাই। তাছাড়া ক্ষুধার্ত এবং পিপাসিত থাকলে কেয়ামতের দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে থাকে। মহান আল্লাহর আযাবের শান্তির কথাও মনে জাগে।

ইসলাম হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শান্তির জীবনব্যবস্থা। গরীব দুঃখীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং বেওয়ারিসদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হচ্ছে ইসলামের আদর্শ।

www.nagorikpathagar.org

স্ট্যালিনের আদর্শকে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম বলা হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এ আদর্শেরই শ্লোগান। ইসলামের আদর্শ হচ্ছে কাউকে কষ্ট না দেয়া, এমনকি তোমার ঘরের ধোঁয়া দিয়েও তুমি তোমার প্রতিবেশীদের কষ্ট দিতে পারবে না।

অধিক খাদ্য গ্রহণ করা ইসলামে প্রথম বেদয়াত

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর ওফাতের পর ইসলামে সর্বপ্রথম যে বেদয়াত সৃষ্টি হয়েছে সেই বেদয়াত হচ্ছে পেট পুরে আহার করার বেদয়াত। (ফাযায়েলে সাদাকাত)

রসূল (স.) কখনো পেট ভরে খাওয়ার মতো খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে পারতেন না। সাহাবায়ে কেরাম এবং আওলিয়ায়ে কেরামও পেট ভরে খাওয়ার মতো খাদ্যসামগ্রী কমই খেতেন। যতো বেশী পেট ভরে খাবে ততো বেশী রোগ ব্যাধি তৈরী হবে।

প্রফেসর ব্রাউন এবং ইসলামী বিশ্ব

প্রফেসর ব্রাউন তার রচিত গ্রন্থ 'লেকচারস অব প্রফেসর ব্রাউন'-এ লিখেছেন, রসূল (স.)-এর যমানায় হারেম ইবনে কালদা ছাকাফী নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু তার কাছে কোনো রোগী আসতো না। হারেম রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে এ বিষয়টি তাকে জানালেন। তিনি বললেন, ওরা খাদ্য তখনই গ্রহণ করে যখন ক্ষুধা তীব্র হয়, আবার ক্ষুধা থাকতে থাকতেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

অধিক খাদ্য গ্রহণ করাকে আমরা বেদয়াত বলেছি। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রতিটি মানুষের জন্যে একটি মেন্যু তৈরী করার পক্ষপাতী। এমনকি মেন্যু তৈরীর জন্যে এটাও জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি চেয়ারে বসে থাকবেন নাকি কারখানায় দাঁড়িয়ে কাজ করবেন। যারা চেয়ারে বসে সময় কাটায় তাদের খাবার এক রকম, আবার যারা দাঁড়িয়ে কাজ করবে তাদের খাবার হবে আরেক রকম। অধিক খাদ্য গ্রহণ করা বেদয়াত। এ বেদয়াত থেকে আরো অনেক রকমের বেদয়াত তৈরী হয়ে থাকে।

যব এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.)-এর যুগে সাধারণত যবের রুটি খাওয়া হতো। এ রুটির শক্তিতে শক্তিমান হয়েই সাহাবারা সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ডংকা বাজান। কবি আল্লামা ইকবাল যব সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন–

জাহাঁ মেঁ নানে সাঈর হায় / মোদারে কুয়েতে হায়দারী
অর্থাৎ যবের রুটি বিশ্বজুড়ে হায়দরী শক্তির সৃষ্টি করে।

যবের মধ্যে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান

১. আলট্রামিনোইডস	১১ দশমিক ৫
২. স্ট্রার্চ	৭০
৩. ফ্যাট	১ দশমিক ৩
৪. ফাইবার	২ দশমিক ৬
৫. এ্যাশ	২ দশমিক ১
৬. ওয়াটার	১২ দশমিক ৫

এছাড়া যবের মধ্যে চিকনাই তেলের সংমিশ্রণে গ্লুটেন আকৃতিতে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক গবেষণা

আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী যব হচ্ছে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী খাদ্য। যদি এর সাথে জ্বাল দেয়া দুধ দেয়া হয় তবে আরো উৎকৃষ্ট খাদ্য তৈরী হয়। আমেরিকায় হৃদরোগের রোগীদের শুধুমাত্র যবের তৈরী খাদ্য খেতে দেয়া হয়। সেখানে 'বিয়ার বার্লি' নামে ছিপি আটা কৌটায় এ খাদ্য পাওয়া যায়।

যেসব শিশুর লিভারের রোগ রয়েছে তাদের চিকিৎসায় যবের তৈরী খাদ্য বিশেষ উপকারী। গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসব শুরু হওয়ার সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে উদ্দীপনা ও শক্তি সৃষ্টির জন্যে যেসব খাদ্য নির্বাচন করা হয় তার মধ্যে যবের রুটি অন্যতম।

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রসূল (স.) যে বলেছেন, যব গুঁড়ো করে দুধ দিয়ে রান্না করার পর মধু মিলিয়ে খাও। এ নিয়মে যবের মিশ্রণ খাওয়ানো হলে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের রোগী দুই থেকে তিন মাসে সুস্থ হয়ে যায়। এক মহিলার আলসার হয়েছিলো, সে উক্ত নিয়মে সে যবের রুটি ও দুধ খাওয়ার পরও বিশ্বাস করেনি, তার রোগ ভালো হয়েছে। অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে সে আমেরিকায় গিয়েছিলো। সেখানে তাকে পরীক্ষা করে জানানো হয়, আপনার রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। অথচ ডাক্তারী চিকিৎসায় এই রোগ দুই বছরের কম সময়ে আরোগ্য হয় না।

যেসব রোগীর পেশাবে রক্ত এবং পুঁজ দেখা দেয় তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পাশাপাশি যদি যবের পানি মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়, তবে এ রোগ পনের দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়ে যায়। পিত্ত পাথর বের করার জন্যেও এ ব্যবস্থা উপকারী।

পুরাতন আমাশয় ও উদরাময় ভালো করার জন্যে যবের তৈরী হালুয়ার চেয়ে উত্তম কোনো ওষুধ নেই। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর কাছে কেউ যদি ক্ষুধামন্দার অভিযোগ করতো, তিনি তাকে যবের তৈরী 'তালবিনা' খাওয়ার আদেশ দিতেন। তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যবের তালবিনা তোমাদের পেটের ময়লা ঠিক সেভাবে দূর করে যেমন নাকি পানি তোমাদের চেহারার ময়লা দূর করে দেয়। (তিব্বে নববী আওর জাদিদ সায়েন্স, প্রথম খন্ড)

খাওয়ার সময় ভালো ভালো কথা বলা

ইসলামের বিধানমতে খাওয়ার সময় মন খারাপ হওয়ার মতো কথা বলা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য শুনুন।

ইউরোপের এক্সরে বিশেষজ্ঞ ও প্রখ্যাত ডাক্তার কাইফেন বলেছেন, এক্সরের মাধ্যমে আমি পাকস্থলী, লিভার ও অন্ত্রের বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার পরামর্শ হচ্ছে, দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তার সময়ে হজম সম্পর্কিত যাবতীয় অংগ প্রতংগের ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, সেসব অংগ প্রত্যংগ অনুভূতিহীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আনন্দ এবং খুশীর কথা বলা হলে পাকস্থলী ও অন্ত্র শক্তিশালী হয়।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী যারা খাদ্য গ্রহণের সময়ে বিমর্ষ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, ক্রুদ্ধ থাকে, তারা অল্পদিনের মধ্যেই পাকস্থলীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। খাওয়ার সময় শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই দেহ মন শান্ত ও প্রসন্ন থাকতে হবে। হাকিম জালিনুস বলেছেন, প্রসন্নতা ও খুশী খুশী ভাব খাদ্য হজম এবং খাদ্য দেহের অংশে পরিণত হওয়ায় সাহায্য করে। অথচ দুঃখ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং বিমর্ষ অবস্থায় গ্রহণ করা খাদ্য দেহের অংশে পরিণত হয় না।

খাওয়ার পর হাত দিয়ে মুখ মালিশ করা

খাওয়ার পর হাতে চিকনাই লেগে থাকলে সে চিকনাই বাহু এবং পায়ে মুছে পরিষ্কার করবে। (ইবনে মাজা, যাদুল মায়াদ, উসওয়ায়ে রসূলে আকরাম স.)

খাদ্য গ্রহণের পর চিকনাই বাহুতে চেহারায় মুছে পরিষ্কার করার কথা হাদীসের কেতাবে বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

খাওয়ার সময় হাত থেকে বের হওয়া ঘাম শরীরের জন্যে উপকারী। এ কারণে দেহের একাংশে সেই হাত মালিশ করা নানা রোগের প্রতিকারে উপকারী।

ত্বকের ভেতর থেকে সিবিকিউরাস গ্লান্ড থাকে, সেই গ্লান্ড থেকে এক রকমের ঘাম বের হয়, এর নাম হচ্ছে সিবাম। ওযু করার মাধ্যমে, বেশী পানি লাগার মাধ্যমে এবং শুকনো আবহাওয়ায় এ সিবাম কমে যায়। খাওয়ার পর হাতে যে চিকনাই লেগে থাকে তা যদি বাহুতে এবং মুখে মালিশ করা হয় তবে সে অপূর্ণতা দূর হয়ে যায়। ত্বক ফেটে যাওয়া, খসখসে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দূর করে। এছাড়া সিবিকিউয়াস থেকে বের হওয়া ঘাম নার্ভ, মাসল, ত্বক ইত্যাদির জন্যে খুবই উপকারী। অংগ প্রত্যংগের ব্যথা বেদনা উপশমেও এ ঘাম বেশ উপকারী। এছাড়া আংগুলের সংযোগস্থল থেকেও এক প্রকার জীবাণুনাশক ঘাম বের হয়, সে ঘাম খাদ্যের সাথে পাকস্থলীতে যায়। এটাও স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত উপকারী।

হাত দিয়ে খাওয়া এবং আংগুল চেটে খাওয়া

আমার পরিচিত এক লোক একবার এক সফর থেকে ফিরে এসে আমাকে বললেন, আপনার জন্যে দারুণ একটা খবর আছে। আমি জানতে চাইলাম সেটা কী? তিনি বললেন, সুন্নতে নববী এবং আধুনিক বিজ্ঞান। আমি তার কথা বুঝতে পেরে বললাম, বলুন। তিনি বললেন, কানাডার টরেন্টোতে একজন পাদ্রী আমাকে খাবার দাওয়াত দিলেন। আমি খেতে বসলাম এবং হাত দিয়ে খাওয়া শেষ করলাম। খাওয়া শেষ হওয়ার পর পাদ্রী আমাকে বললেন, আমি কি আপনার আংগুল চেটে খাবো?

আমি অবাক হয়ে বললাম, এটা কী বলেন? তিনি বললেন, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ যখন খাওয়ার ইচ্ছা করে তখনই তার পিটুইটারি গ্লান্ডস থেকে হজম করার শক্তিসম্পন্ন এক প্রকার উপাদান বের হয়। সেই উপাদান খাদ্যের সাথে মিশে যায় এবং হজমে সাহায্য করে। এ ডাইজেস্টিভ সিক্রেশনের প্রভাব পড়ে কার্বোহাইড্রেটস-এর ওপর। এর ফলে যেসব লোকের ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে তারা উপকৃত হয় এবং তাদের দেহে ইনস্যুলিনের ঘাটতি হতে দেয় না। আংগুল চেটে

www.nagorikpathagar.org

খাওয়ার ফলে ডাইজেস্টিভ সিক্রেশনের যে উপাদান আংগুলে লেগে থাকে সেটা খাদ্যের সাথে মিশে যায় এবং অন্যান্য সকল আংগুলে লেগে যায়। আংগুল চেটে খাওয়ার ফলে এ উপাদান মুখের ভেতর দিয়ে পেটে প্রবেশ করে। খাদ্য যতো সুস্বাদু হয়, ক্ষুধা যতো তীব্র হয়, সেই অনুপাতে হজমশক্তিসম্পন্ন উপাদান বের হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে যায়। আংগুল চেটে খাওয়ার প্রভাব চোখ, পাকস্থলী, মস্তিষ্কের ওপরও পড়ে। একজন ফিজিশিয়ান আমাকে বলেছেন, আমি গবেষণা করে দেখেছি, খাদ্য গ্রহণের পর আংগুল চেটে চুষে খাওয়ার ফলে হৃদরোগ, কিডনির রোগ এবং মস্তিষ্কের রোগ আরোগ্য হয়।

ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা

ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা আমেরিকানদের খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি শিখিয়েছেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, তাদের বর্ণিত নিয়মনীতি প্রকৃতপক্ষে রসূল (স.)-এর আদেশ নিষেধের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে। এখানে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার কিছু কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

খাদ্য গ্রহণের ভুল নিয়ম ও সঠিক নিয়ম

খাদ্য হচ্ছে দেহের একটি জরুরী প্রয়োজন। খাদ্য ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, কিন্তু এ খাদ্য পানীয় আপনা আপনি হজম হয় না; বরং খাদ্য হজমের ব্যাপারে দেহের শক্তিরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করা হয় অথবা খাদ্য নির্বাচনে দেহের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা মনে না রাখা হয়, তবে সে খাদ্য দেহের জন্যে ক্ষতিকরও হয়ে যেতে পারে। মানুষ যেসব রোগের সম্মুখীন হয় এসব রোগের অধিকাংশই ভুল খাদ্য গ্রহণ, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের কারণেই হয়ে থাকে। একবারে গ্রহণ করা খাদ্য হজম হওয়ার আগে পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করা হলেও রোগ দেখা দেয়।

কখন খাবার খাওয়া উচিত

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে খাদ্য গ্রহণের সময় মেনে চলা আবশ্যিক প্রয়োজন। খাদ্য গ্রহণের জন্যে রুটিন মেনে চলা আবশ্যক। সময় হওয়ার এবং ক্ষুধা পাওয়ার আগে দুনিয়ার বড়ো বড়ো নেয়ামত পেলেও খাওয়া উচিত নয়। এমন হাজারো লোক রয়েছে যারা খাওয়ার কোনো নিয়ম মেনে চলে না। যদি নিয়ম মেনে না চলা হয় তবে যতো উপাদেয় খাদ্যই হোক না কেন, তা গ্রহণের ফলে উল্টো ক্ষতিই হয়। হজমের গোলমাল হয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে, নানারকম রোগ দেহে বাসা বেঁধে দেহকে খোকলা করে দেয়। ফলে খাদ্য দেহের জন্যে স্বাস্থ্যকর না হয়ে বিষ হিসেবে প্রমাণিত হয়। কাজেই স্বাস্থ্যের জন্যে খাদ্যের পরিমাণ এবং সময় মেনে চলা অপরিহার্য।

আরবের একজন হাকিম বলেছেন, ক্ষুধা পেলেই খাবার খাও। সক্রেটিস বলেছেন, অসময়ে খাদ্য গ্রহণ অনেক সময় বিষের মতো ক্ষতি করে। ভালোভাবে ক্ষুধা না পেলে খাবার খাবে না, কিছু ক্ষুধা থাকতেই খাওয়া শেষ করবে।

যখন তখন আজেবাজে জিনিস খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এভাবে যা তা খেলে খাদ্য ভালোভাবে হজম হয় না এবং সে খাদ্য দেহের অংশে পরিণত হয় না।

www.nagorikpathagar.org

সত্যিকার ক্ষুধার সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা হলেই তা যথাযথভাবে হজম হয় এবং দেহের অংশে পরিণত হয়। আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। কাজেই খাদ্য গ্রহণের সময় নির্ধারণ করে নিয়ে অসময়ে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস পরিহার করতে হবে।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে পানাহার করা

ঘুমোতে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে খাদ্য গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাতের খাবার দেরী করে খেলে অথবা খাওয়ার পর পরই ঘুমিয়ে পড়লে পাকস্থলী ক্রমাগতভাবে নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘুমানোর সময় খাওয়া খাদ্য ভালোভাবে হজম হয় না। আরামের ঘুম আসে না। ঘুম এলেও নানারকমের দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে। সকালে ঘুম ভাংগলেও দেহে অলসতা ঘিরে থাকে, দেহ সজীব সতেজ মনে হয় না। ঘুমোবার ঠিক আগে দুধ পান করা হলেও একই রকমের অবস্থা দেখা দেয়।

সঠিক নিয়ম হচ্ছে, ঘুমাতে যাওয়ার আগেই যেন পাকস্থলীর কাজ শেষ হয়ে যায়, অন্ততঃ এতোটুকু সময় নিয়ে খেতে হবে। যখন আমরা বিশ্রাম করি সে সময় আমাদের পাকস্থলীরও বিশ্রাম আবশ্যক। অন্যথা পাকস্থলীর ব্যস্ততা এবং কর্মতৎপরতায় সকল অংগ প্রত্যংগের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে। ঘুমের স্বাভাবিক যে উদ্দেশ্য তা পূরণ হয় না। আরামপ্রিয় যেসব লোক বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে না, এ রকম লোকের রাতের খাবার দেরীতে খাওয়ার অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। পাকস্থলীর ক্ষতির কারণে এ রকমের লোক নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে এদের স্বাস্থ্য ঠিক করা কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

রাতে সারাদেহের পাশাপাশি পাকস্থলীকেও বিশ্রাম দেয়া আবশ্যক। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যদি রাতে পাঁচ ছয় ঘন্টা দেহের অংগ প্রত্যংগকে বিশ্রাম না দেয়া হয় তবে পাকস্থলীর জন্যে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। এ কারণে প্রাচীনকালের চিকিৎসকরা রাতের খাবার দেরীতে খেতে নিষেধ করেছেন। বর্তমান যুগে প্রতি তিন ঘণ্টা পর খাদ্য গ্রহণ বা নাশতা করার কথা বলা হয়ে থাকে। এ রকম ব্যবস্থার সময়েও অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলেছেন, রাতের খাবার দেরী করে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে বিষতুল্য। এ অভ্যাস পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য এবং জীবন ধ্বংস করে দেয়।

খাদ্য গ্রহণের মূলনীতি

স্বভাবের দিক থেকে যেসব মানুষ শান্তিপ্রিয় এবং নির্বিরোধ, অধিক খাদ্য গ্রহণ করা তাদের জন্যে ক্ষতিকর। ক্ষুধার সময়ে এ শ্রেণীর লোকের উচিত কম খাওয়া এবং কিছু ব্যায়াম করা। অনেক লোক জন্মগতভাবেই অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে তাকে, কিন্তু জীবনে তারা যা যা করতে চায় তার অর্ধেক কাজও করতে পারে না। নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে এরকম লোক বুঝতে পারবে, নিজের ক্ষুধার ওপর এদের নিয়ন্ত্রণ নেই। পেট ভারী হওয়ার কারণে এরা ঈপ্সিত কাজকর্ম করতে পারে না। এটা বাস্তব সত্য, ভারী পেটের কোনো মানুষ আল্লাহর দেয়া যোগ্যতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না।

www.nagorikpathagar.org

দিনে তিন বারের বেশী আহার করবেন না এবং সাদাসিধে জিনিস আহার করুন। নানারকম জিনিস খাবেন না। ক্ষুধায় পরিমিত আহার করুন। প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়াম করুন। এতে দৈহিক দুর্বলতা, অলসতা, হজমের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনার যোগ্যতার প্রমাণ প্রকাশ পেতে শুরু করবে।

পাকস্থলীর দুর্বলতা এবং অসুস্থতা থেকে আত্মরক্ষার উপায়

কঠোর পরিশ্রম বা ব্যায়ামের পর পর খাদ্য গ্রহণ করাও স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। কারণ কঠোর পরিশ্রম ও ব্যায়ামের পর দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক থাকে এবং ক্লান্তির সময়ে গ্রহণ করা খাদ্যের চাপ পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের ওপর পড়ে। অস্থিরতার সময়ে, তাড়াহুড়োর সময়ে খাদ্য গ্রহণ করাও অনুচিত। কারণ এ সময়ে মনোযোগ অন্যদিকে নিবদ্ধ থাকে। খাওয়ার পর পরই ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করাও ক্ষতিকর। কারণ এ সময়ে স্বভাবের আকর্ষণ এবং দৈহিক শক্তি দুই দিকে বিভক্ত হয়ে যায়। খাদ্য হজম হওয়ার কাজ পুরোপুরি হয় না। এমন সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত যখন দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে শান্তভাব বিরাজ করে। অর্থাৎ দেহ মন শান্ত থাকে। জালিনুস বলেছেন, শান্ত ও প্রসন্নভাব খাদ্য হজম হওয়ার এবং তা দেহের অংশ হওয়ার কাজে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে দুঃখ কষ্ট, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ অস্থিরতার মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করা হলে সে খাবার দেহের অংশে পরিণত হতে পারে না।

ডাক্তার কিনান ইউরোপের এক্সরে বিশেষজ্ঞ। তিনি এক্সরের মাধ্যমে পাকস্থলীর লিভার এবং অন্ত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেন, ক্রোধ এবং বিষণ্ণতার সময়ে হজম শক্তির ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, তা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, দুঃখ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার সময়ে গ্রহণ করা খাদ্য বিষতুল্য হয়ে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে খাবার খাওয়ার সময়ে হাসিখুশী থাকা আবশ্যক।

পরোটার চেয়ে রুটি তাড়াতাড়ি হজম হয়। সাদামাটাভাবে ঘি দিয়ে রান্না করা সবজি, মসলা দিয়ে রান্না করা গোশতের চেয়ে তাড়াতাড়ি হজম হয়। পাক ভারত উপমহাদেশে মসলাদার গুরুপাক খাদ্য অধিক পরিমাণে তৈরী করা হয়। ময়দার তৈরী খাদ্যদ্রব্য, মিঠাই মন্ডা, ঘিয়ে ভাজা পরোটা, জর্দা, পোলাও, রওগন জোশ ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য হজমে বিলম্ব ঘটে। কেক, পেস্ট্রি, চকলেট ইত্যাদিও ক্ষতিকর।

খাদ্য গ্রহণ করার পর কমপক্ষে আধাঘন্টা মানসিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করা উচিত নয়। কেউ কেউ খাওয়ার সময়ে এবং কেউ কেউ খাওয়ার পর পরই অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। এতে করে মস্তিষ্ক এবং হজম শক্তির ওপর মন্দ প্রভাব পড়ে।

খাদ্য গ্রহণ করার সময়ে অতিরিক্ত পানি বা অন্য তরল জিনিস খাওয়া হলে হজমের ক্ষতি হয়। পাকস্থলীতে অধিক তরলতাহেতু খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে হজম হতে পারে না। খাদ্য গ্রহণের সময়ে পিপাসা পাওয়ার মতো খাদ্য পরিহার করা কর্তব্য। খাদ্যের মধ্যে অতিরিক্ত লবণ, মসলা, আচার, চাটনি, মোরব্বা ইত্যাদির পরিবর্তে হজমে সহায়ক এবং পিপাসা উদ্রেককারী খাদ্য গ্রহণে মনোযোগী হওয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসার নীতি হচ্ছে, যে জিনিসই আমরা খাবো তার তাপমাত্রা যেন আমাদের দেহের তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বেশী গরম জিনিসও খাওয়া যাবে না, বেশী ঠান্ডা জিনিসও খাওয়া যাবে না। বরফ, আইসক্রিম, কুলফি, বরফে রাখা ফল, বরফগলা পানি পান করা হলে দাঁতের ক্ষতি হয়, দাঁতের মাঢ়িরও ক্ষতি হয়। বরফ মেশানো পানি, বেশী ঠান্ডা জিনিস পানাহার করা হলে পাকস্থলীর দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

পাকস্থলীর ক্ষতির মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

পাকস্থলীর ক্ষতি কথাটি একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অনিয়মিত আহার, অতিরিক্ত আহার ও গুরুপাক আহার ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট রোগে পাকস্থলীর ক্ষতি হয়ে থাকে। তবে পাকস্থলীর ক্ষতির জন্যে এ সকল বাহ্যিক কারণই যে যথেষ্ট তা কিন্তু নয়। অনেক সময় খাদ্য গ্রহণে অনিয়ম বা ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ ছাড়াও পাকস্থলীর ক্ষতি হতে পারে। এ শ্রেণীর রোগীর সংখ্যা কম হলেও একেবারে যে নেই তা কিন্তু নয়। এ রকম ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের উচিত মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করা। স্বাভাবিক ওষুধের চিকিৎসায় কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। নীচে সংক্ষেপে পাকস্থলীর জন্যে ক্ষতিকর মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

রবার্ট একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ। তার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। অফিস থেকে সে বাসায় ফিরেছে। উত্তম খাদ্য রান্না করা হয়েছিলো। দু'জন নিকটাত্মীয় মেহমানও এসেছিলো। তাদের সাথে বসে সে বেশ আনন্দের সাথে খাবার গ্রহণ করলো। ভালো স্বাস্থ্য, তীব্র ক্ষুধা, উত্তম খাদ্য, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এসব কিছুর সংস্পর্শে খাওয়া খাদ্য রবার্টের হজম শক্তির ওপর ভালো প্রভাব বিস্তার করবে, এটাই ছিলো স্বাভাবিক, কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করার পর পরই সে একটা টেলিগ্রাম পেলো। টেলিগ্রামের খবর পাঠ করে তার সব আনন্দ মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেলো। তার হাঁটাচলার শক্তিও যেন লোপ পেলো। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো। রাতের খাবারে আর কোনো আগ্রহবোধ করলো না। তার মনে হচ্ছিলো, পাকস্থলী যেন অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় নিদারুণ কষ্টে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সকালে স্বাভাবিকভাবে তার পায়খানা হলো না। দুপুরে কিছু পায়খানা হলো, তাও বেশ কষ্টকর মনে হলো। তৃতীয় দিন তার উদরাময় দেখা দিলো।

উল্লিখিত উদাহরণের কথা বাদ দিলেও পৃথিবীতে দুই রকমের মানুষ পাওয়া যায়। একশ্রেণীর মানুষ যথেষ্ট শক্ত মনের অধিকারী। ছোটোখাটো ভুলত্রুটি দুর্ঘটনা তাদের বিচলিত করে না। তারা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় জীবন যাপন করেন। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন যারা ছোটোখাটো বিষয়েও বেশ ভেংগে পড়েন, বিচলিত হন। মনে করুন, এরকম লোক ঘরে বসে বই পড়ছেন। এমন সময় কেউ এসে পাশে বসলো, অথবা আলোর পাশে কয়েকটি পতংগ করে ওড়াওড়ি করছিলো, অথবা ঘরের বাইরে একদল ছেলে হৈ চৈ করে খেলাধুলা করছিলো, এর যে কোনো কারণেই এ লোকটির মনযোগ বিক্ষিপ্ত হতে পারে, তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

স্পর্শকাতর মেজাজের এ শ্রেণীর মানুষ ক্রমাগত এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তারা মনোকষ্টে ভুগতে পারেন, এমনকি অসুস্থও হয়ে পড়তে পারেন। এদের এ মনোকষ্ট

www.nagorikpathagar.org

এবং অসুস্থতার প্রভাব প্রথমে পড়বে তাদের পাকস্থলীর ওপর। পাকস্থলী অসুস্থ হলে সারা দেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিউইয়র্কের ডাক্তার জেবি রাইস তার একটি প্রবন্ধে এমন একজন রোগিণীর কথা উল্লেখ করেছেন, যে রোগিণী সব সময়েই পাকস্থলীর কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগতো। একপর্যায়ে সে মহিলা দিনে এক বেলা খাওয়া কমিয়ে দিলো, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হলো না, প্রায়ই সে বমি করতো। ধীরে ধীরে সে মহিলা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লো।

ডাক্তার তাকে এক্সরেসহ এবং আরো নানা উপায়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাকস্থলীতে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলো না। ডাক্তার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি মহিলার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। কয়েক মিনিটের আলাপে তিনি মহিলার রোগের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে ফেললেন।

এ মহিলার স্বামী ছিলো একজন পেশাদার জল্লাদ। সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকদের শাস্তি কার্যকর করতো। লোকটির স্ত্রী ছিলো তার অনুগত, আদর্শ গৃহবধূ, কিন্তু স্বামীর পেশা তার পছন্দনীয় ছিলো না। একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার খবর পাওয়ার পর মহিলা মনে মনে ভাবতো, তার স্বামী যে লোকটির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে সে লোক নির্দোষ নয় তো? এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে মহিলার মনে হতে লাগলো, তার স্বামী যেসব লোকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করছে তারা আসলেই নিরপরাধ, নির্দোষ। স্বামীকে সেই মহিলা হত্যাকারী মনে করতে শুরু করলো। মানসিক এ ধারণা পর্যায়ক্রমে মহিলার পাকস্থলীর অসুখে পরিণত হলো।

ডাক্তার রাইস লিখেছেন, পৃথিবীর কোনো ওষুধই এ মহিলাকে সুস্থ করতে সক্ষম হতো না। কারণ সে ছিলো মানসিক রোগী এবং সেই রোগ তার স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছিলো। তারপর ডাক্তারের সুপারিশ অনুযায়ী কারা কর্তৃপক্ষ মহিলার স্বামীকে জল্লাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য দায়িত্বে নিয়োগ করলো। এর ফলে মহিলার পাকস্থলীর সমস্যা দূর হয়ে গেলো এবং সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

প্রশ্ন হচ্ছে, পাকস্থলী কেন মানুষের মানসিক অবস্থা প্রভাবিত করে? বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য যখন পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন হজমের কাজে সাহায্যের জন্যে পরিমিত পরিমাণ রক্ত পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। সে রক্তের কারণেই পাকস্থলীতে এমন তারল্য সৃষ্টি হয় যাকে হজম বলা হয়। অর্থাৎ গৃহীত খাদ্যদ্রব্য রক্তে পরিণত হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করে, অপ্রয়োজনীয় জিনিস অন্ত্রের দিকে ঠেলে দেয়।

খাদ্যদ্রব্য হজমের জন্যে যে সময়ে পরিমিত রক্তের প্রয়োজন সে সময় কেউ যদি বিষণ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শোকাতুর থাকে তবে পাকস্থলীতে পরিমিত রক্ত সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। এ সময় রক্ত পাকস্থলীতে না গিয়ে মস্তিষ্কের দিকে চলে যায়। কারণ দুঃখ দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় যে মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হয় তার জন্যে রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে পাকস্থলী তার কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না। পাকস্থলীতে তরলতা সৃষ্টি হয় না, হলেও হয় খুব সামান্য। ফলে খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে হজম হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

একথা সবাই জানে, খাদ্য গ্রহণের পর পর কোনো ডাক্তার গোসল করার জন্যে কাউকে অনুমতি দেয় না। এর কারণ হচ্ছে, গোসলের সময় রক্ত পাকস্থলীতে পৌঁছে না। খাদ্য গ্রহণের পর পর লেখাপড়া বা মস্তিষ্কের পরিশ্রমের কোনো কাজ করতে, খেলাধুলা বা ব্যায়াম করতেও ডাক্তাররা নিষেধ করেন। উল্লেখিত কারণে দেহের রক্ত পরিমিত পরিমাণে পাকস্থলীতে পৌঁছুতেও বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ কারণে খাদ্য গ্রহণের সময়ে এবং খাদ্য গ্রহণের পর পর দেহ মন প্রশান্ত থাকলে পাকস্থলী সুষ্ঠুভাবে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

শারীরিক কারণের মতোই মানসিক কারণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের জীবনে সমস্যা, ব্যস্ততা থাকবেই- এসব জীবনের অংশ। কখনো ব্যবসায়ে ক্ষতির আশংকা, কখনো স্ত্রী বা সন্তানদের অসুস্থতা, কখনো অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কখনো দাম্পত্য জীবনে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। মোটকথা, কোনো না কোনো সমস্যার কারণে হতাশা, অস্থিরতা লেগেই থাকে। এসব কারণে আমাদের পাকস্থলী প্রভাবিত হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। তবে এরকম পরিস্থিতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে একেবারেই পারবো না এরকম মনে করা ঠিক নয়। মনস্তাত্ত্বিকরা এমন কিছু ব্যবস্থা প্রদান করেছেন যা অনুসরণের মাধ্যমে আমরা পাকস্থলীর ক্ষতি রোধ করতে পারি। প্রথমত অনাগত সমস্যা নিয়ে মন খারাপ করার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত দুঃখকষ্ট, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ভুলে থাকার জন্যে ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে, বন্ধুবান্ধবের সাথে মেলামেশা করে আনন্দময় সময় কাটাতে উদ্যোগী হতে হবে। একাকিত্ব, নিসংগতা পরিহার করতে হবে। যতোটা সম্ভব হাসিখুশী জীবন যাপনের চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানসিক রোগের চিকিৎসা মানসিকভাবেই করা হয়। মানসিক রোগের চিকিৎসা কেউ যদি ওষুধ সেবনের মাধ্যমে করতে চায় এতে তারা কখনোই সফল হবে না; বরং রোগ আরো জটিল হয়ে পড়বে।

খাবার কিভাবে খেতে হবে

খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না; বরং ধীরে ধীরে খেতে হবে। এতে খাদ্য হজমে সহায়তা পাওয়া যাবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, ড্রিংক ইউর মিলস এন্ড ইট ইউর ওয়াটার। শক্ত খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে তরল করে খেতে হবে, তরল জিনিস ধীরে সুস্থে চিবিয়ে খাওয়ার মতো খেতে হবে। এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে, কোনো শক্ত খাবার গলাধকরণ করার সময়ে শক্ত রাখা চলবে না, পানীয় দ্রব্যও অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে গলাধকরণ করতে হবে। একজন ইউরোপীয় ডাক্তার বলেছেন, কেউ যদি আমাকে হজম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে আমি তাকে বলবো, খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে চিবিয়ে আস্তে ধীরে খাও।

খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে চিবিয়ে খেলে হজমের কোনো সমস্যা সাধারণত দেখা দেবে না। এ খাদ্যদ্রব্য দেহের পুষ্টির অংশে পরিণত হয়। তাছাড়া ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কম খাদ্য হলেই চলে। আমাদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছে যারা প্রচুর খাদ্য তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে। তারা বুঝতে পারে না,

www.nagorikpathagar.org

অধিক পরিমাণ খাদ্য ক্ষতির কারণ হয়। দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্যে কম খাওয়া আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্য যেন বেশী গরম আবার বেশী ঠান্ডাও যেন না হয়। বেশী গরম খাদ্য পাকস্থলীকে শিথিল করে এবং পাকস্থলীর শক্তি কমিয়ে দেয়। খাদ্য ঠান্ডা হলে তা গরম করে হজম করতে পাকস্থলীর অনেক শক্তি ক্ষয় হয়। খাদ্য খাওয়ার সময় অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি পান করাও পাকস্থলীল জন্যে ক্ষতিকর।

খেলাল

যে শলা বা চিকন কোনো কাঠি দিয়ে খাওয়ার পর দাঁতের ফাঁক থেকে ময়লা (দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকার খাবার) বের করা হয় তাই খেলাল।

খাওয়ার পর খেলাল করার জন্যে হাদীসে তাকিদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে হোটেলে বা ঘরে খাদ্য গ্রহণের পর খুব সহজেই খিলাল করার জন্যে উপাদান পাওয়া যায়। খেলাল করা রসূল (স.)-এর সুন্নত।

খাওয়ার সময় খাদ্যকণা দাঁতে এবং মাঢ়ির কোণে লেগে থাকে। যদি খিলাল করে সেসব বের না করা হয় তবে সেগুলো সেপটিকে পরিণত হয় এবং দাঁত ও মাঢ়ির ক্ষতি করে। পাইওরিয়া হওয়ার প্রবল আশংকা থেকে যায়। অনেক সময় খাদ্যকণা ক্রমাগত জমে গিয়ে মাঢ়িতে পুঁজ তৈরী হয়। মুখের লালার সাথে সেই পুঁজ পাকস্থলীতে পৌঁছে যায় এবং পাকস্থলীর গুরুতর রোগ দেখা দেয়। বিশেষত আলসার এবং স্টমাকে এসিডিটি দেখা দেয়।

হাদীস এবং ফেকাহর আলেমরা বলেছেন, খাওয়ার পর খেলাল ব্যতীত যেসব খাদ্যকণা বের হয় তা ফেলে দিতে হবে। তেমনি যেসব খাদ্যকণা খিলালের মাধ্যমে বের হয় তা ফেলে দিতে হবে। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন চায় মানুষের সুস্থ জীবন, জীবনের নিরাপত্তা। বর্তমানে অনেক জ্ঞান আমাদের কাছে রয়েছে, কিন্তু দ্বীনী জ্ঞান থেকে আমরা দূরে সরে পড়েছি। অথচ দ্বীনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে না জানা লোকদের কাছে দ্বীন সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হলে তারা অবাক হয়ে বলে, দ্বীন এতো ব্যাপক? দ্বীন এটাও আমাদের শিক্ষা দিয়েছে?

খাওয়ার পর দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যকণা যেহেতু খাদ্যের অংশ, এ কারণে তা খাওয়া ক্ষতিকর নয়। পক্ষান্তরে খেলাল করে বের করা খাদ্যকণা যেহেতু দাঁতের ফাঁকে এবং মাঢ়ির কোণে লেগে থাকার কারণে বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে, তাই এ খাদ্যকণা খেলে উপকারের চেয়ে বরং ক্ষতিই বেশী হবে।

খাওয়ার পরে হাত পরিষ্কার করা

খাওয়ার পরে হাত ধুয়ে কোনো কাপড়ে মুছে ফেলতে হবে। খাওয়ার পর যেহেতু খাদ্যের অংশ হাতে লেগে থাকে, এ কারণে হাত না ধোয়া হলে সেই হাত যেখানে লাগবে সেখানে সেপটিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অসংখ্য জীবাণু তৈরী হবে। কাপড় দিয়ে মুছে ফেলার কথা এ কারণে বলা হয়েছে, যেহেতু কাপড় দিয়ে মোছা হলে হাতে লেগে থাকা তৈলাক্ততা কাপড়ে লেগে পরিষ্কার হয়। মোটকথা, দ্বীন হচ্ছে সর্বাঙ্গীন সুন্দর জীবনব্যবস্থার নাম। দ্বীনের প্রতিটি বিধানেই মানুষের জন্যে অশেষ কল্যাণ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার কর্নেল চোপরা এবং ইসলামী শিক্ষা

ডাক্তার কর্নেল চোপরা প্রখ্যাত হিন্দু বৈজ্ঞানিক। তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এক ঘটনায় তিনি লিখেছেন, 'আমি অনেক গবেষণা করে দেখেছি, খাওয়ার সাথে সাথে পানি পান করা হলে পাকস্থলীকে শিথিল করে দেয়। পাকস্থলীর আভ্যন্তরীণ ঝিল্লি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় এ পানি পাকস্থলীর অসুখ তৈরী করে। আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর একজন মুসলমান অধ্যাপক আমাকে বললেন, আপনার গবেষণা প্রশংসনীয়, তবে এটা নতুন কোনো কথা নয়। শত শত বছর আগে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) একথাই বলে গেছেন। অধ্যাপকের কথা শুনে আমি প্রমাণ দেখতে চাইলাম। তিনি হাদীস গ্রন্থ খুলে আমাকে প্রমাণ দেখালেন।'

খাবার শেষে শুয়ে পড়া ও বিজ্ঞান

খাবার শেষ করেই শুয়ে পড়া মানে রোগ-বালাইকে ডেকে আনা। আমাদের প্রিয় নবী (স.) খাবার খেয়ে সাথে সাথেই শুয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মায়াদ)

খাবার শেষে পাকস্থলীতে খাদ্য হজমের কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যখন মানুষ শুয়ে পড়ে তখন পাকস্থলীও শুয়ে পড়ে। অর্থাৎ তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে। যা শরীরের জন্যে খুবই কক্ষতিকর। ফিজিওলজি ও প্যাথলজি বিশেষজ্ঞগণ তাদের গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো- খাবার পর শরীরের নড়াচড়া করা খুবই জরুরী। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে পাকস্থলীতে খাদ্য জমা হয়ে পঁচন ধরে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই চেপে বসে। তন্মধ্যে খাবার সাথে সাথে শুয়ে যাওয়ার ফলে পেটে গ্যাস ও এসিড জমতে থাকে। মানুষ কাজকর্ম শেষে ঘরে ফিরে। যেহেতু শরীর ক্লান্ত শ্রান্ত এজন্যে খাবার সাথে সাথে শুয়ে পড়ে। আর এদিকে খাবার যে পরিমাণ হজম হবার সে পরিমাণ হজম হতে পারেনি। ফলে সুগার, হার্টডিজিজ, বদহজম, প্যারালাইসিস ইত্যাদি রোগ শরীরে জন্ম নেয়।

কাইলুলা (দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম) সুন্নত

অনেকগুলো গ্রন্থ রচয়িতা এবং মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জিয়ালক আস্টিন লিখেছেন, যদি আমার পক্ষে সম্ভব হতো তবে সকল মিল কারখানা, অফিস আদালত বন্ধ করে দিয়ে লোকদের খাওয়ার পর কাইলুলা করার ব্যবস্থা করতাম। কারণ এটা করা হলে অসুখ বিসুখ কমে যায় এবং আমাদের রোগীদের সংখ্যাও কমে। মানুষ অনিদ্রাজনিত রোগ এবং মানসিক রোগ থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পায়।

আধুনিক বিজ্ঞান বহু রকমের রোগের প্রকোপ লক্ষ্য করে জীবন যাপন পদ্ধতি সংশোধনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে।

ফিজিওলজি বিশেষজ্ঞদের মতে, সারাদিনের ক্লান্ত শ্রান্ত লোকেরা মানসিক চাপ অনুভব করে। রাতে অনিদ্রায় ভোগে। অথচ তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি কিছুটা সংশোধন করা হলে তারা এসব সমস্যার সম্মুখীন হবে না। তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে না। জীবন যাপন পদ্ধতি সংশোধনের অংশ হিসেবে বিজ্ঞানীরা কাইলুলা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কাইলুলা করার ফলে মানুষ দিনের অবশিষ্ট অংশ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারে এবং অনেক রকমের মানসিক মস্তিষ্ক রোগ থেকে নিরাপদ থাকে।

www.nagorikpathagar.org

মনে রাখতে হবে, কাইলুলা শুধু দুপুরের খাওয়ার পরই আবশ্যক। বড় জোর একঘন্টা কাইলুলা করা যেতে পারে। এরচেয়ে বেশী সময় কাইলুলা করা হলে আবার রোগের ঝুঁকি তৈরী হয়। কাইলুলার সবচেয়ে বড়ো উপকারিতা হচ্ছে, এর মাধ্যমে অনিদ্রা দূর হয়ে যায়।

রসূল (স.)-এর সতর্কতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হাদীস গ্রন্থসমূহে রসূল (স.)-এর কাছ থেকে এমন সব বিষয়ে সতর্কতার বিবরণ উল্লেখ রয়েছে, যেসব সতর্কতার বাস্তবমুখিতার ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান আজ সর্বতোভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। রসূল (স.)-এর অনেক আমল বা কাজ সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। অথচ সেসব আমল বা কাজ রসূল (স.) শত শত বছর আগে করেছেন। তাঁর বাণী সম্পর্কেও গবেষণা হচ্ছে, অথচ সেসব বাণী শত শত বছর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ডক্টর কোস্টোর স্বীকারোক্তি

ডক্টর কোস্টো এমন এক ব্যক্তি, যিনি সমুদ্রের পানি সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা করেছেন। দুই সমুদ্রের পানি পরস্পর কেন মিশে যায় না এটা একটা আলাদা ঘটনা। তিনি লিখেছেন, ইসলাম সম্পর্কে পড়ালেখা করলে বুঝা যায়, ইসলাম তার অনুসারীদের পদে পদে সতর্কতামূলক উপদেশ দিয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছে। যারা ইসলামের বিধান মেনে চলে তারা কখনো অস্থিরতার সম্মুখীন হবে না, ব্যর্থ হবে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামের বিধান সফল বিধান। রসূল (স.) খাদ্য, পোশাক, সামাজিকতা, অর্থনীতি, মোটকথা, মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে, সকল ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এর ফলে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই জটিলতা বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

রসূল (স.)-এর পানপাত্র বা পেয়ালা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.)-এর একাধিক পানপাত্র বা পেয়ালা ছিলো। হযরত আনাস (রা.) (একটি পেয়ালার প্রতি সকল ব্যাপারে ইংগিত করে) বলেন, আমি আমার এ পেয়ালায় করে রসূল (স.)-কে মধু, পানি এবং দুধ পান করিয়েছি। কোনো কোনো কেতাবে রয়েছে, সেই পাত্র ছিলো ঝাউ গাছের কাঠের তৈরী, কিছুটা হলুদ রংয়ের। পাত্রটি চওড়া এবং ভালো কাঠের তৈরী এবং তার ওপর লোহার আবরণী ছিলো। (রাহবারে জিন্দেগী, ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম স.)

রসূল (স.) খোলা বরতনে পানি পান করতেন। এ ধরনের পাত্রে পানি পান করা বেশী তৃপ্তিকরও বটে। তাঁর ব্যবহার করা পাত্র ছিলো ঝাউ গাছের তৈরী। ঝাউ গাছকে আরবীতে তারখা, ফার্সীতে গজ, পাঞ্জাবীতে লাই মাহরা, ইংরেজীতে টামারিস্ক ট্রি বলা হয়।

ডাক্তার কর্নেল চোপরা টামারিস্ক ট্রির পাত্রের নিম্নোক্ত উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ গাছের পাত্রে পানি পান করা হলে লিভার ডিজিজ, লিভার ইনফ্লামেশন,

www.nagorikpathagar.org

ওডেমা নির্মূল হয়। এর মাধ্যমে কিডনির সমস্যা। কিডনির ইনফেকশন দূর হয়। প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। রক্তকণিকায় কোলেস্টরেলের পরিমাণ কমে যায়। গল ব্লাডারে পাথর তৈরী হলে তা প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

খাদ্যে সতর্কতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.) খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরনের সতর্কতার কথা উল্লেখ করেছেন নীচে তা উল্লেখ করা যাচ্ছে–।

আল্লামা ইবনে কাইয়েম যাদুল মায়াদ গ্রন্থে লিখেছেন, রসূল (স.) দুধ এবং মাছ একই সময়ে খেতেন না। দুধের সাথে অন্য কোনো ঠান্ডা জিনিস খেতেন না। দুটি গরম জিনিস একত্রে খেতেন না। কম সময়ে হজম হওয়া খাদ্য এবং বেশী সময়ে হজম হওয়া খাদ্য একত্রে খেতেন না। ভুনা করা এবং রান্না করা জিনিস একই সময়ে খেতেন না। তাজা এবং বাসী জিনিস একই সময়ে খেতেন না। রসূল (স.) বেশী গরম খাবার খেতেন না আবার রাতে রান্না করা খাবার বাসী হলে সকালে খেতেন না। গন্ধ হয়ে যাওয়া খাবারও তিনি খেতেন না। তিনি চাটনিও খেতেন না। (যাদুল মায়াদ, রাহবারে জিন্দেগী) এ বিষয়ে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা যাচ্ছে–

বেশী গরম খাবার গ্রহণ করতে নিষেধ

রসূল (স.) বেশী গরম খাবার গ্রহণ নিষেধ করেছেন। কেননা এরকম খাবার গ্রহণে বরকত পাওয়া যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। বেশী গরম খাবার খাওয়া হলে মুখের ভেতর চামড়া ওঠে যায়, পাকস্থলীতে জ্বালা যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, গলা বা খাদ্যনালীর ক্ষতি হয়। বেশী গরম খাবার খাওয়ার পর সাথে সাথে পানি পান করলে দাঁত এবং পাকস্থলীর ক্ষতি হয়, কিন্তু খাবার ঠান্ডা করে খেলে মানুষ উল্লিখিত সমস্যা এবং রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

বেশী গরম গরম খাবারে বরকতহীনতার একটি প্রমাণ হচ্ছে, চুলা থেকে নামানো গরম গরম রুটি বেশী খাওয়া যায়, কিন্তু ঠান্ডা হলে এতো বেশী খাওয়া যায় না। অথচ রসূল (স.)-এর কথা অনুযায়ী বরকত পেতে হলে কম খেতে হবে। এখানে কেউ যেন মনে না করেন, ঠান্ডায় জমে যাওয়া খাবার খেতে বলা হয়েছে; বরং এখানে গরম খাবার কিছুটা ঠান্ডা করে খেতে বলা হয়েছে।

ডাক্তার আলবার্ট 'ফীড এন্ড কেয়ার' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে নানারকম খাবার খাওয়ার নিয়ম এবং উপকারিতা বর্ণনার পাশাপাশি খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়েও বেশ আলোকপাত করা হয়েছে। কাজেই সকল প্রকার খাবার গ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের জন্যে অত্যাবশ্যক। মহানবী (স.) অনেক আগেই আমাদের এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

দুধ এবং মাছ একত্রে আহার করা যাবে না

একবার বেশ কয়েকজন কুষ্ঠরোগীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাদের কিভাবে এ রোগ হয়েছে, তারা বললো, আমরা মৎস্যজীবী, মাছ খেয়ে বকরীর দুধ পান করেছি, ফলে চামড়ায় ধবল কুষ্ঠ দেখা দিয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মাছ খেয়ে যে কোন

www.nagorikpathagar.org

দুধ পান করলেই কুষ্ঠ রোগ হয় না; বরং মাছ খেয়ে ছাগলের দুধ পান করলেই কুষ্ঠ রোগ দেখা দিতে পারে।

হাকীম এস এম ইকবাল– আখবারে জাহান

রসূল (স.) দুধ এবং মাছ একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা দুধ এবং মাছ একত্রে আহার করা হলে ক্ষতির আশংকা থাকে। (যাদুল মায়াদ)

রসূল (স.) ছিলেন একজন মহামানব। তাঁর সত্যবাদিতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, দুধ যদি বকরীর হয় তবে এতে দেহের ত্বকের রং পরিবর্তনের আশংকা বিদ্যমান থাকে।

দুই রকমের গরম খাবার একত্রিত না করা

একপ্রকার গরম খাদ্যের সাথে অন্য আরেকটি খাদ্য মিলে গরম বৃদ্ধি পায়। উভয় প্রকার খাদ্য যদি বেশী ক্যালোরিযুক্ত হয়, এতে রক্ত ও চর্বি বেড়ে যায় এবং অনেক সময় উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এ কারণে উচ্চ প্রোটিনসম্পন্ন একাধিক গরম খাবার একত্রে খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

দুই প্রকার ঠান্ডা খাবার একত্রিত না করা

যে খাদ্যে উষ্ণতা এবং ক্যালোরি কম থাকবে, সে খাদ্য নিয়মিত গ্রহণ করা হলে দেহের ক্ষতি হওয়ার বেশী সম্ভাবনা থাকে। দুই রকমের ঠান্ডা খাদ্য একত্রে গ্রহণ করা হলে এতে লো ব্লাড প্রেসার, হেমিপ্লেগিয়া, হাত পা অচল হওয়া, হাত পা কামড়ানো ইত্যাদি রোগ হওয়ার শংকা রয়েছে।

লালাযুক্ত দুই রকমের খাদ্য একত্রে না খাওয়া

লালাযুক্ত দুই ধরনের খাদ্য একত্রে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এরকম খাদ্য পাকস্থলীর দেয়ালে ও ঝিল্লিতে লেগে যায় এবং পাকস্থলী থেকে বের হওয়া হজম শক্তির লালা খাদ্যের লালার সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। লালাযুক্ত খাদ্যের মধ্যে ভেন্ডি উল্লেখযোগ্য।

জোলাব হওয়ার মতো দুই প্রকারের খাদ্য একত্রিত না করা

অন্ত্রের তৎপরতা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্ত্রে জখম, আলসার এবং জ্বালাযন্ত্রণা দেখা দেয়। জোলাবযুক্ত খাদ্য অন্ত্রের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ফলে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, জ্বালা যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। যেমন করলা।

গুরুপাক দুই প্রকার খাদ্য একত্রিত না করা

পাকস্থলীর দুর্বলতা খাবার হজমে প্রভাব সৃষ্টি করে। এ দুর্বলতার কারণে মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। পাকস্থলীর দুর্বলতা সৃষ্টিকারী খাদ্যের মধ্যে রয়েছে পালেক, আরভি, ভেন্ডি, মাষকলাই, চানার ডাল।

যেসব খাদ্য গ্রহণের কারণে পাকস্থলীতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় সেসব খাদ্য পরিহার করাই উত্তম।

তাড়াতাড়ি হজম হওয়া এবং দেরীতে হজম হওয়া খাদ্য একত্রিত না করা

উল্লিখিত দুই ধরনের খাবার একত্রে গ্রহণ করা হলে তা পাকস্থলীর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেমন বকরীর গোশত এবং উটের গোশত যদি একত্রে রান্না করতে

www.nagorikpathagar.org

দেয়া হয় তবে একত্রে সিদ্ধ হবে না। ঠিক একইভাবে এ দুই প্রকার খাদ্য একত্র করা যাবে না।

ভুনা করা এবং রান্না করা খাদ্য একত্রে না খাওয়া

যদি ভুনা করা গোশত আহার করার পাশাপাশি ঝোলযুক্ত খাদ্য আহার করা হয় তবে পাকস্থলীতে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

তাজা এবং বাসী খাদ্য একত্রিত না করা

কানাডার বিখ্যাত খাদ্য বিশেষজ্ঞ রাজেস্ট বর্ন বলেছেন, বিলের তাজা ঘাসও রান্না করা বাসী গোশতের চেয়ে উত্তম। আমি বাসী খাদ্য খেয়ে অনেককে মরতে দেখেছি। আমার জীবনে বহু ঘটনা দুর্ঘটনা রয়েছে, বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। অনেক কিছু করেই আমি বিজ্ঞানী হয়েছি। আপনারা খাবার মুখে তোলার সময় লক্ষ্য করবেন, সে খাবার তাজা নাকি সুস্বাদু। আসল স্বাদ হচ্ছে তাজা হওয়ার মধ্যে। রান্নার সময় অনেক মসলা দিয়ে খাবার সুস্বাদু করা হলেই তা উত্তম খাবার হয়ে যায় না।

রাসূল (স.) তাজা খাবার পছন্দ করতেন। তিনি তাজা খাবার গ্রহণের ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেসব খাদ্য থেকে দুর্গন্ধ বের হয় তা খেতে নিষেধ করেছেন।

চটপটি খাবেন না

রাজেস্ট বর্ন বলেছেন, সাদাসিধে তাজা খাবারই সুস্থতা নিশ্চিত করে। যেসব খাদ্যে মরিচ মসলার কারণে কৃত্রিম স্বাদ তৈরী হয় তা স্বাস্থ্যের জন্যে মোটেই উপকারী নয়।

রোস্ট, ব্রোস্ট, চিকেন ইত্যাদি পরিভাষা ইউরোপীয়রা আমাদের শিখিয়েছে। এসব খাদ্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে মোটেই সহায়ক নয়। এগুলো গ্রহণের ফলে আলসার, পাকস্থলীর এসিড, বদহজম, পাইলস ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হয়। ইসলাম সাদামাটা খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়েছে। এসব খাদ্য একদিকে যেমন সুস্বাদু অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্যকর।

মাটি খাওয়া যাবে না

হযরত আবু হোরায়য়া (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মাটি খায় সে যেন আত্মহত্যা করে। (তাবারানী, তিব্বে নববী, রাহবারে জিন্দেগী)

হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা মাটি খাবে না। কারণ এতে তিন প্রকারের ক্ষতি রয়েছে। প্রথমত স্থায়ী অসুস্থতা, দ্বিতীয়ত পেটের পীড়া, তৃতীয়ত গায়ের রং হলুদ হয়ে যাওয়া। (জামে কবির, রাহবারে জিন্দেগী)

ডাক্তার কিউর-এর অভিজ্ঞতা

ফিজিওলজিস্ট ডাক্তার কিউর বলেছেন, আমি এমন কিছু রোগী দেখেছি যারা ক্রমাগত মাটি খেয়েছিলো। এসকল রোগীর মধ্যে ছিলো শিশু, নারী এবং কিছুসংখ্যক পুরুষ। ডাক্তার কিউর-এর গবেষণামূলক রিপোর্ট অনুযায়ী রোগীদের অবস্থা ছিলো নিম্নরূপ–

www.nagorikpathagar.org

মাটি খাওয়ার ক্ষতি

মহিলা ঃ

✳ গর্ভবতী মহিলাদের সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয়।

✳ কিডনি বেড়ে যায়।

✳ জরায়ুতে ক্যান্সার হয়।

✳ হজম শক্তি কমে যায়।

✳ গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

✳ দুধ শুকিয়ে যায়, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

✳ অনেক মহিলার পান্ডুরোগ হতে দেখা গেছে।

শিশু ঃ

✳ পেট বড় হয়।

✳ পেটের পীড়া হয়।

✳ মস্তিষ্কের দুর্বলতা দেখা দেয়।

✳ থাইরয়েড গ্লান্ডে দুর্বলতা দেখা দেয়।

✳ মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে।

✳ পাকস্থলীতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়।

✳ কিডনি বড় হয়ে যায়।

✳ পান্ডুরোগ হয়।

✳ মায়ের দুধের প্রতি ঘৃণা দেখা দেয়।

✳ শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

পুরুষঃ

✳ পুরুষদের পাকস্থলী ও কিডনির ক্ষতি হয় এবং মস্তিষ্ক কোষে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এরকম অনেক রোগী দেখা গেছে যারা কিডনি এবং পিত্ত পাথরী রোগে ভোগে। একবার পাথর বের করার পর আবারও পাথর তৈরী হয়। এসব রোগীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তাদের শতকরা ৩০ জন মাটি খায়। এদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। মাটি খেলে কিডনির গুরুতর ক্ষতি হয়। কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর প্রতিক্রিয়ায় নানা রকমের যৌন রোগ দেখা দেয়।

চারটি উপকারিতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, চারটি জিনিসকে চারটি কারণে মন্দ জানবে না।

১. চোখের পানিকে মন্দ জানবে না, কারণ এর ফলে দৃষ্টিহীনতা লোপ পায়। ২. হাঁচিকে মন্দ জানবে না, কারণ হাঁচি, কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত রোগের মূলোৎপাটন করে। ৩. সর্দিকে মন্দ জানবে না, কারণ সর্দি রোগের প্রতিকার করে। ৪. ফোঁড়াকে মন্দ জানবে না, কারণ ফোঁড়া শ্বেত কুষ্ঠের শিকড় কর্তন করে। (নুজহাতুল মাজালেছ)

www.nagorikpathagar.org

বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসামূলক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

চোখ ওঠা চোখের মারাত্মক অসুখ। এ অসুখে চোখ লাল হয়ে যায় এবং মারাত্মক যন্ত্রণা হয়। চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে। তবে এ রোগ হলে চোখ অন্যান্য গুরুতর অসুখ থেকে রক্ষা পায়। রসূল (স.) এ অসুখে সুরমা ব্যবহারের কথা বলেছেন। চোখ ওঠা রোগের কারণে অন্যান্য বড় রোগ বিশেষত অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মানুষের চোখে এবং নাকে কুষ্ঠ রোগ হয়ে থাকে। ডাক্তার কিউর-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী শ্বেতী বা কুষ্ঠ রোগের মারাত্মক জীবাণু নাকের ছিদ্রপথে দেহে প্রবেশ করে। নাক হচ্ছে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থান। সর্দি হলে নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হয়। এতে করে নাকের ভেতর জমে থাকা সকল জীবাণু নাক দিয়ে সর্দির সাথে বের হয়ে যায়। সর্দি হলে ঘন ঘন হাঁচি আসে। হাঁচির মাধ্যমেও নাকের ভেতর থাকা জীবাণু বেরিয়ে আসে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক প্রকার কুষ্ঠ রোগকে বালগামি বলা হয়েছে। বালগাম বা শ্লেষ্মা কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। কাজেই বলা যায়, সর্দি কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধে উপকারী।

হাঁচিকে মন্দ জানবে না, কারণ হাঁচি কুষ্ঠ রোগের মূলোৎপাটন করে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ পক্ষাঘাত হৃদরোগের কারণে হয়ে থাকে। উচ্চ রক্তচাপ অতপর তার বৃদ্ধি পক্ষাঘাত রোগের কারণ হয়।

হাঁচি হলে ফুসফুসে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন প্রবেশ করে। এ কারণে পালমোনারি ভেইনের মাধ্যমে ফুসফুসে আসা রক্ত অধিক পরিস্কার হয়। ফলে অন্য কোন রোগ হতে পারে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুষ্ঠ পক্ষাঘাত নানারকমের হয়ে থাকে এবং এর কারণও অনেক। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে শ্লেষ্মা। হাঁচির মাধ্যমে শ্লেষ্মা বের হয়ে যায়, ফলে শ্লেষ্মাজনিত ঠান্ডার আধিক্য কমে যায়।

পানি পান করার নিয়ম

রসূল (স.) বলেছেন, পানি চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে পান করো। ঢক ঢক করে পান করো না। (উসওয়ায়ে রসূল (স.); মাদারেজুন নবুওয়াত)।

মরুভূমির একটি ঘটনা

আমার পরিচিত একজন লোক বলেন, মরুভূমিতে এক সফরের সময় আমরা কয়েকজন আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। প্রচণ্ড গরমে আমাদের প্রাণ ছিলো ওষ্ঠাগত। পিপাসায় ছটফট করছিলাম। কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিলো না। বহুকষ্টে এক জায়গায় কিছু লোক দেখে সেখানে গিয়ে কিছু পানি চাইলাম। একজন বয়স্ক ব্যক্তি একটি মাটির পাত্রে পানি দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ পানিতে কিছু ভূষি মিশিয়ে দিলেন। আমরা অবাক হলাম। ভূষির কারণে স্বাভাবিকভাবে পানি পান করা সম্ভব হচ্ছিলো না। আমরা ছোটো ছোটো চুমুকে পানি পান করছিলাম। কিছু পানি পান করার পর দেহমনে শান্তি অনুভব করলাম। তারপর বৃদ্ধকে পানিতে ভূষি

www.nagorikpathagar.org

মেশানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধ বললেন, আপনারা যেরকম প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর ছিলেন, আপনাদের যদি শুধু পানি দিতাম তাহলে এক চুমুকেই পানি পান করতেন। এতে আপনাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হতো, এমনকি মৃত্যুমুখেও পতিত হতে পারতেন। এভাবে পানি পান করে একাধিক ব্যক্তিকে মৃত্যু বরণ করতে আমি দেখেছি। (ইংল্যান্ডে এক বছর- মোহাম্মদ আখতার খান)

বড়ো বড়ো চুমুকে পানি পান করলে পানির কিছু অংশ শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে পারে। এতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

পানি দেখে পান করা

রসূল (স.)-এর অভ্যাস ছিলো, তিনি সব সময় পানি দেখে তারপর পান করতেন।

সেনাবাহিনীর এক অডিট ইন্সপেক্টরের সাথে আমি এক সফরে গিয়েছিলাম। তিনি সাদা কটনের সূক্ষ্ম পোশাক পরিধান করেছিলেন। রাতে পিপাসিত হয়ে পানি পান করার সময়ে গ্লাসের ওপর কাপড় রেখে তারপর পানি পান করলেন। তিনি এভাবে পানি পান করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বললেন, যদি পানিতে কোনো পোকা বা কীট থাকে তবে আটকে যাবে, মুখের ভেতর প্রবেশ করতে পারবে না।

পানিতে এ রকম কীট থাকে যা পেটের ভেতর গিয়ে কিডনি এবং হৃৎপিন্ডের ক্ষতি করে। পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এমন কিছু কীট থাকে, যদি পানি দেখে পান না করা হয় তবে সেগুলো পানির সাথে পেটের ভেতর চলে যায়। মুলতানের নিশতার হাসপাতালে এক যুবকের অপারেশন হলে তার পাকস্থলীতে কেঁচোর মতো একটি জিনিস পাওয়া গেলো। এটি পানির সাথে তার পেটে প্রবেশ করে। ফলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো।

রসূল (স.) দেখে পানি পান করতেন, এ সুন্নত যে কতো প্রয়োজনীয়, উপরোক্ত ঘটনাই তার প্রমাণ।

বসে পানি পান করা

যদি বসে পানি পান করা হয় তবে দেহের যে অংগের যতোটুকু প্রয়োজন সে অংগে ততোটুকু পানি প্রবেশ করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি প্রবেশ করলে বিপজ্জনক একটি রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এ রোগকে বলা হয় ওকেমা। এ রোগে আক্রান্ত রোগীর দেহ ফুলে যায়।

দাঁড়িয়ে পানি পান করা

রসূল (স.) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পাকস্থলী এবং লিভারে এমন এক রোগ ছড়িয়ে পড়ে, যার চিকিৎসা করতে চিকিৎসকরা আজও অক্ষম।

দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পা ফুলে যাওয়ার আশংকা থাকে। পা ফুলে গেলে সারাদেহ ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এ প্রসংগে বেশ কিছু হাদীসও রয়েছে। তার একটি হাদীসের মূলকথা হচ্ছে, দাঁড়িয়ে পানি পান করার ক্ষতি সম্পর্কে যদি

www.nagorikpathagar.org

তোমরা জানতে তবে পান করা পানি গলায় আংগুল ঢুকিয়ে বমি করে বের করে ফেলতে।

তিন শ্বাসে পানি পান করা

হাদীসে তিন শ্বাসে অথবা দুই শ্বাসে পানি পান করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (মামুলাতে নববী)

তিন শ্বাসে বা দুই শ্বাসে যদি পান না করা হয় তবে যেসব ক্ষতির আশংকা রয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. পানি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। এতে অনেক সময় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যায়। ২. মস্তিষ্কের পর্দার ওপর চাপ পড়ে। কেননা মস্তিষ্কের ফ্লুয়েডের সাথে পানির সম্পর্ক রয়েছে। ধীরে ধীরে পানি পান করা হলে মস্তিষ্কের ওপর পানি পানের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

পাকস্থলীতে যদি একত্রে অধিক পানি পৌছে যায় তবে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দেয়। এমনকি হার্ট এবং লান্সেরও ক্ষতির আশংকা থাকে। লিভারেরও ক্ষতি হতে পারে, পাকস্থলীর অন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে।

খোলা বরতনে পানি পান করা

রসূল (স.) সব সময় পেয়ালায় পানি পান করতেন। (মামুলাতে নববী)

যদি সংকীর্ণ পাত্রে পানি পান করা হয় তবে মনে স্বস্তি পাওয়া যায় না।

পিথাগোরাসের বক্তব্য

প্রখ্যাত গবেষক পিথাগোরাস বলেছেন, খোলা বরতনে পানি পান করা, চামড়ার জুতো পরিধান করা আর যবের আটা, এ তিনটি জিনিস যদি আমি পেয়ে যাই তবে আকাশের হিসাব নিতে পারবো। (যবান মেরি আওর বাত উনকি)

পানির পেয়ালায় নিশ্বাস না নেয়া

রসূল (স.) পানির পেয়ালায় নিশ্বাস ফেলতে এবং গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মামুলাতে নববী)

পানির পেয়ালায় নিশ্বাস নেয়া হলে বা ফেলা হলে, অর্থাৎ পানি পান করার সময়ে নিশ্বাস নেয়া হলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার এবং পানিতে জীবাণু সংক্রমিত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকে। পানি পান করার সময় নিশ্বাস গ্রহণ করা হলে নাকের ছিদ্রের ভেতর পানি প্রবেশ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এতে নাকের ছিদ্র ফুলে যেতে পারে।

মিঠা পানি পান করা

রসূল (স.) সব সময় মিঠা পানি পান করতেন। (মাদারেজুন নবুওত)

বর্তমান বিশ্বে পানির সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। বহু দেশে পান করার মতো পানির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশে এমন অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে মিঠা পানি পেতে অনেক কষ্ট হয়। রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় মক্কায়ও মিঠা পানির সমস্যা ছিলো প্রকট।

রসূল (স.) মিঠা পানি পান করতেন। কারণ যে পানির মধ্যে সালফার এবং আয়োডিন রয়েছে সে পানি পানে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যে পানিতে অধিক লবণাক্ততা

www.nagorikpathagar.org

থাকে সে পানি স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। এ কারণেই রসূল (স.) সব সময় মিঠা পানি পান করতেন। বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদদের মতে, যেখানে খেজুর গাছের সংখ্যা বেশী থাকে সেখানকার পানি মিঠা হয়।

রোগীকে বেশী খেতে পীড়াপীড়ি না করা

রোগীকে বেশী খেতে পীড়াপীড়ি না করার পরামর্শ হাদীসে একাধিক জায়গায় দেয়া হয়েছে। (যাদুল মায়াদ)

কেননা রোগীর সকল অংগ প্রত্যংগ থাকে দুর্বল। দুর্বল অংগ বেশী শক্তির কাজ করতে পারে না। বেশী পুষ্টিকর খাবার হজম করতে পারে না। যেহেতু রোগীর পাকস্থলী দুর্বল থাকে, এ কারণে নানারকম খাদ্য হজম করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কাজেই রোগীকে হালকা মানের খাবার দিতে হবে।

রোগীকে যদি বেশী খাদ্য দেয়া হয় বা বেশী খাদ্য খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করা হয়, তবে তার রোগ আরো বৃদ্ধি পাবে। এমনকি রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। এরকম একাধিক ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

একজন লোক কিছুকাল অসুস্থ থেকে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরে মাছ রান্না করা হচ্ছিলো। রান্নার ঘ্রাণ তার নাকে যাওয়ায় তিনি মাছ খাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তারপর প্রচুর পরিমাণে মাছ এবং রুটি আহার করলেন, কিন্তু বিকেলে বমি করতে করতে আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। রোগ বেড়ে গেলো। একদিন পর মৃত্যুবরণ করলেন।

বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিদ্যার নীতি হচ্ছে, রোগীর ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। তাকে কোনো জিনিস খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি বা পীড়াপীড়ি করা যাবে না; বরং তার পাকস্থলীকে এতোটা শক্তিশালী হতে দিতে হবে যেন সে নিজেই খাদ্য গ্রহণে স্বাভাবিকভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটাই হচ্ছে রোগীর আসল চিকিৎসা।

গোশত দাঁতে কাটা

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর কাছে একবার কোথাও থেকে কিছু গোশত হাদিয়াস্বরূপ এলো। বকরীর সামনের অংশ তাঁর সামনে নেয়া হলো। তিনি বকরীর গোশতের সামনের অংশ পছন্দ করতেন। তিনি সে গোশত দাঁতে কেটে আহার করেন, ছুরি বা চাকু দিয়ে কাটেননি।

রসূল (স.) দাঁতে কেটে খাওয়ার কথা বলেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে, গোশত দাঁতে কেটে খাও। এতে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়। দেহ দ্রুত পুষ্টি লাভ করে।

দাঁতে কেটে চিবানোর যুক্তি হচ্ছে, যতো বেশী চিবানো হবে ততো গোশতের সংগে লালা মিশ্রিত হবে। ফলে পাকস্থলীতে যাওয়ার পর হজমে কোনো সমস্যা হবে না। এতে পাকস্থলীকে বেশী কষ্টও করতে হবে না। যদি গোশত ভালোভাবে চিবানো না হয় তবে কম লালা লাগার কারণে পাকস্থলীর হজম কাজে সমস্যা হবে।

গোশত দাঁতে কাটার কারণে সিলভারি গ্লান্ডের লালা অধিক নিঃসরিত হয়ে তা পাকস্থলীর হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। এতে মানুষ অসংখ্য রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তরকারি হিসেবে খেজুর

রসূল (স.) একটি রুটির টুকরো নিয়ে তার ওপর খেজুর রাখলেন তারপর বললেন, এ খেজুর হচ্ছে এ রুটির তরকারি। এ কথা বলে তিনি আহার করলেন। (তিরমিযী)

পর্যটক ক্রিস্টোর নিজের কথা

ক্রিস্টো ছিলেন বিশ্বের বিখ্যাত পর্যটকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বিশ্বের বহু দেশ সফর করেছেন। এসব সফরে নানা কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, আফ্রিকা সফরের সময়ে আমি তিন মাস যাবত তরকারি হিসেবে খেজুরকে ব্যবহার করেছি। এটা ছিলো আমার জীবনের নতুন ও প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার সফর ছিলো অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু তবু আমি কোনো প্রকার ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করিনি। (মোশাহাদাত ওয়া ওয়াকেয়াত)

বরকতে নববীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

হযরত আবু ওবায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন রসূল (স.)-এর জন্যে গোশত রান্না করলাম। তিনি বকরীর সামনের পায়ের গোশত পছন্দ করতেন। প্রথমে একখানি পায়ের গোশত দেয়ার পর তিনি আরেকটি চাইলেন। দ্বিতীয় পায়ের সামনের অংশের গোশত তাঁকে দিলাম। তিনি আবার চাইলেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, একটি বকরীর সামনের পা তো দু'টিই থাকে। রসূল (স.) বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তুমি চুপচাপ থাকতে তবে যতোক্ষণ চাইতে ততোক্ষণ হাঁড়ি থেকে বকরীর পা বের করা সম্ভব হতো।

এটা ছিলো রসূল (স.)-এর মোজেযা। মোসনাদে আহমদে আবু রাফে থেকে একই রকমের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রসূল (স.)-এর জীবনে এ রকমের বহু ঘটনার উদাহরণ পাওয়া যায়। কাজী ইয়ায শেফা গ্রন্থে এরকম কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

হযরত আবু আইয়ুব (রা.) একবার রসূল (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে দাওয়াত দেন। তিনি দুই জনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাবার রান্না করান। রসূল (স.) তার ঘরে আসার পর ত্রিশ জন আনসারকে ডেকে আনতে বলেন। তারা এসে খেয়ে যাওয়ার পর আরো ষাট জনকে ডেকে আনতে বলেন। তারাও এসে খেয়ে যান। তারপর অন্য বেশ কয়েকজন সাহাবীকে ডেকে আনা হয়। মোট ১৮০ জন সেদিন দুই জনের জন্যে রান্না করা খাবার খেয়েছিলেন।

হযরত সামুরা (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর কাছে কোথাও থেকে এক পেয়ালা গোশত এসেছিলো, সেই গোশত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আগন্তুকরা খেয়েছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, আমার কাছে একটি থলের ভেতর দশ এগারোটি খেজুর ছিলো। রসূল (স.) জানতে চাইলেন কোনো খাবার আছে কিনা। আমি বললাম, এ থলের ভেতর কয়েকটি খেজুর রয়েছে। রসূল (স.) থলের মুখ ফাঁক করে দোয়া পড়লেন তারপর বললেন, সাহাবী দশ জন করে ডাকো এবং তাদের খেতে

www.nagorikpathagar.org

দাও। পুরো সেনাদলের জন্যে সেই খেজুর যথেষ্ট হওয়ার পরেও বেশ কিছু অবশিষ্ট থাকলো। রসূল (স.) বললেন, এ থলে থেকে বের করে খেতে থাকো, তবে থলে উপুড় করবে না।

তারপর আমি দীর্ঘদিন যাবত সেই থলে থেকে বের করে খেজুর খেয়েছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকাল, হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকাল এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত সেই থলে থেকে খেজুর বের করে খেয়েছি। অনেক সময় সেই থলে থেকে খেজুর বের করে অন্যদের দাওয়াতও করেছি। আমার বের করা খেজুরের পরিমাণ ছিলো কয়েক মণ। হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার সময় এক ব্যক্তি আমার কাছ থেকে থলেটি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর এক বিয়ের অনুষ্ঠানে আমার মা মালিদা তৈরী করেছিলেন। সেই মালিদার এক পাত্র রসূল (স.)-এর জন্যে প্রেরণ করেন। রসূল (স.) সেই পাত্র রেখে আমাকে বললেন, অমুক অমুককে ডেকে আনো। আর যার সংগে দেখা হবে তাকেই পাঠিয়ে দেবে। আমি তাই করলাম। আহলে সুফফা সবাইকে খবর দিলাম। রসূল (স.) বললেন, দশ জন করে বসে খেতে থাকো। সকল আগত লোকের তৃপ্তির পর রসূল (স.) বললেন, হে আনাস, এ পাত্র নিয়ে যাও। আনাস বলেন, আমি বুঝতে পারলাম না যখন আনা হয়েছিলো তখন এ পাত্র বেশী পরিপূর্ণ ছিলো নাকি এখন বেশী পরিপূর্ণ রয়েছে।

মেহমানকে খেতে জোর করা

দস্তরখানে যখন কোনো মেহমান থাকতো রসূল (স.) তখন তাকে বারবার বলতেন খান খান, আরো খান। মেহমান যখন পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে যেতো এবং খেতে অস্বীকার করতো তখন আর তিনি সাধাসাধি করতেন না। (মেশকাত, যাদুল মায়াদ, আদাবে জিন্দেগী)

ইসলামে মেহমানদারীর নীতিমালাও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্য লক্ষ্য করুন।

ফ্রয়েডের নীতি

মেহমান সব সময়ে আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার কারণে আসে। যদি আগন্তুকের প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার প্রকাশ না ঘটে তবে তাকে মেহমান বলা যাবে না। আমি মনে করি চেহারায় হাসি ফুটিয়ে তুলুন, খুশী হোন, নিজে বসে থেকে মেহমানকে খাবার খাওয়ান। এতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। মেহমানের পছন্দের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, কিছুসংখ্যক মেহমানকে বার বার অনুরোধ করার কারণে তারা আসলেই পেট ভরে খেয়েছেন। (ফ্রয়েড স্টোরী)

নাপাক অবস্থায় খাবার খাওয়া

নাপাক অবস্থায় খাবার খেতে চাইলে প্রথমে ওযু করে নিতে হবে। (মোসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

স্বামী স্ত্রীর যৌন মিলনের পর দেহের অংগ প্রত্যংগ বিশেষ একটি কাজের প্রতি মনেযোগী থাকার কারণে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। আধুনিক বিজ্ঞান একথা প্রমাণ করেছে, ওযু করার পর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসে। কাজেই দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার আগে যদি খাবার গ্রহণ করা হয় তবে পাকস্থলীর উত্তাপ সৃষ্টি এবং হৃদরোগ দেখা দেয়ার গুরুতর আশংকা থাকে। (রিসার্চ রিপোর্ট)

বাজার থেকে ক্রয় করা নাশতা

মায়ের তৈরী করা নাশতা

পারিবারিক পরিবেশে শিশু যখন মায়ের স্নেহ ছায়ায় থাকে তখন মায়ের স্নেহ ভালোবাসা সব সময় শিশুকে ঘিরে থাকে। সন্তান প্রসব করার পর একজন মা তার সন্তানের সব রকমের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করার দায়িত্ব নেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে খানাপিনা মায়ের হাত থেকে বেরিয়ে মেশিন এবং অন্যান্য খেদমতগারদের হাতে চলে গেছে।

এখন কোথায় সেই ভালোবাসা যে ভালোবাসা মাকে জান্নাত মনে করবে। সেই ভালোবাসা কোথায় যা মায়ের মমতার আওয়াযের সাথে সাথে সাড়া দেবে। সেই সৌহার্দ কোথায় যা তার পায়ের নীচে জান্নাত মনে করবে। সেই ধ্যান ধারণা কোথায় যা মায়ের চেহারা দেখা সওয়াবের কাজ মনে করবে। সেই বিবেক কোথায় যা মা এবং স্ত্রীর মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে।

বর্তমানে সমাজের অবস্থা হচ্ছে, শিশু সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় টাকা, ডলার বা পাউন্ড নিয়ে যায়। পথে বিস্কুট বা বার্গার কিনে ছুটে যেতে যেতে খেতে থাকে। অথচ এতে মা এবং শিশুর মধ্যেকার সম্পর্কের যে মাধুর্য যে সৌহার্দ সেটা কিভাবে গড়ে ওঠতে পারে?

এস্ট্রোলজিস্ট ডাক্তার ইথারের মন্তব্য

নাশতা তৈরীর সময় তার মধ্যে মায়ের ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটে। যে মা বাজারে তৈরী করা নাশতা খাইয়ে শিশু পালন করে, অথবা যে সন্তান সকালে উঠে নাশতা খাওয়ার জন্যে দোকানে চলে যায়, তার মনে মাতাপিতার প্রতি ভালোবাসা, আদর সোহাগ গড়ে ওঠবে কি করে?

www.nagorikpathagar.org

দশম অধ্যায়

বিশ্রাম, শয়ন এবং ঘুম

সাহাবায়ে কেরামের কেউ কখনো অনিদ্রার রোগে আক্রান্ত হননি। কারণ তারা রসূল (স.)-এর সুন্নত মেনে চলতেন। রসূল (স.)-এর এ সুন্নত চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। বর্তমান কালের মানুষের অনিদ্রা দূর করার জন্যেও এ সুন্নত নিসন্দেহে উপকারী বিবেচিত হবে?

ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন

রসূল (স.) ডান দিকে কাত হয়ে কেবলামুখী শয়ন করতেন। (উসওয়ায়ে রসূল স.)

বাম দিকে হৃৎপিন্ড থাকে, কাজেই বাম দিকে কাত হয়ে শুলে পাকস্থলী এবং হৃৎপিন্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে রক্ত চলাচল এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘুম সম্পর্কে বোম্বে হাসপাতালের (বোম্বাই অডিটরিয়াম) ডাক্তার কৃষ্ণ লাল মার্মা গবেষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, যেসব রোগীকে ডান দিকে কাত করে শয়ন করানো হয়েছে তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যেসব রোগীকে বাম কাতে শয়ন করানো হয়েছে তারা অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে।

আধুনিক গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে, ডান দিকে ফিরে শয়ন করা হলে হৃদরোগ এবং পাকস্থলীর রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া বেহুশ বা সংজ্ঞাহীন হওয়ার আশংকা থেকেও নিরাপদ থাকা যায়।

মাদারেজুন নবুওত গ্রন্থের লেখক ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমানোর উপকারিতা প্রসংগে লিখেছেন, বাম দিকে যেহেতু হৃৎপিন্ড থাকে, এ কারণে বাম দিকে কাত হয়ে ঘুমালে ঘুম অত্যন্ত গভীর হয়। মানুষ সহজে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে পারে না। পক্ষান্তরে ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমালে ঘুম অতোটা গভীর হয় না। খুব সহজে মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হতে পারে। ফজরের নামাযের সময়ে ঘুম ভেংগে যায়। রসূল (স.) সফরকালীন সময়ে ডান দিকে কাত হয়ে ডান হাত খাড়া করে বাহুর ওপর মাথা রেখে ঘুমাতেন। এতে ঘুম গভীর হতো না, ফজরের নামায কাযা হতো না। এভাবেই রসূল (স.) জীবন যাপন করেছেন।

রেলিংবিহীন ছাদে ঘুমানোর নিষেধাজ্ঞা

রাতে ঘুমের ঘোরে মানুষ প্রস্রাব করার জন্যে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেও চোখে ঘুমের ঘোর থেকে যায়। এ কারণে রসূল (স.) রেলিংবিহীন ছাদে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। কারণ ঘুম ঘুম চোখে বাইরে যাওয়ার সময় ছাদ থেকে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশংকা থাকে। বর্তমান যুগে ছাদে রেলিং লাগানোর

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, অথচ রসূল (স.) বহু আগেই এ রকম রেলিং-এর ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

উপুড় হয়ে না ঘুমানোর পরামর্শ

উল্টোমুখে উপুড় হয়ে শয়ন করলে দেহের সকল অংগপ্রত্যংগ বিশেষত পাকস্থলী অবিন্যস্ত হয়ে যায়। উপুড় হয়ে শয়ন করা হলে সবচেয়ে ক্ষতি হয় মস্তিষ্কের। নার্ভ ইমপালসেস নিজের বিন্যাস থেকে সরে গিয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে উপুড় হয়ে যারা শয়ন করে তারা স্বাভাবিক জীবনধারা থেকেও বিচ্যুত হয়ে যায়। এভাবে শয়ন করার ফলে মানুষ ভীতিকর স্বপ্ন দেখে। রসূল (স.) বলেছেন, উপুড় হয়ে শয়ন করা উন্মাদনার লক্ষণ। ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন, উপুড় হয়ে শয়ন করা নির্বোধ লোকদের কাজ। হাদীসে রয়েছে, শয়তান উপুড় হয়ে শয়ন করে। যেসব মানুষ উপুড় হয়ে শয়ন করে শয়তান তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়।

বেশী ঘুমানো নিষেধ

রসূল (স.) বেশী ঘুমাতে মানুষকে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মায়াদ)

অধিক ঘুমানোর ফলে দেহে অলসতা সৃষ্টি হয়। এতে দৈনন্দিন কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটে এবং দ্বীনী আমলের ক্ষেত্রেও অলসতা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বেশী ঘুমানোর ফলে মৃগী রোগ, হিস্ট্রিরিয়া এবং একপর্যায়ে অনিদ্রা রোগ দেখা দেয়। বেশী ঘুমানোর ফলে চোখ ফুলে যায়, দুঃস্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জাপানের লোকেরা খুব কম ঘুমায়। ফলে তারা বিশ্বের উন্নত জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে।

চামড়া এবং খেজুর গাছের আঁশের বিছানা

রসূল (স.) শোয়ার জন্যে চামড়ার বিছানার ব্যবস্থা করতেন। সে বিছানায় খেজুর গাছের ভেতরের আঁশ ব্যবহার করা হতো। (মাদারেজুন নবুওত)

বিজ্ঞান পর্যায়ক্রমে ফিতরাত বা স্বভাবধর্মের দিকেই ফিরে আসছে। আধুনিক কালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, চামড়া দিয়ে তৈরী জিনিস ব্যবহার মানব দেহের চাহিদার সংগে সংগতিপূর্ণ। এতে দেহের কোনো ক্ষতি হয় না।

আমেরিকান স্বাস্থ্য কাউন্সিল

আমেরিকান কাউন্সিল ফর হেলথ সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে চামড়ার বিছানার কথা উল্লেখ করেছে। তাদের মতে চামড়ার বিছানা ব্যবহার করলে পাইলস, কোমর ব্যথা, নার্ভ ডিপ্রেশন এবং মাসল-এর দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। (ছেহেত আওর জিন্দেগী)

বিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে গবেষণা করে দেখতে চায়, কিসে মানুষের কল্যাণ এবং সুস্থতা রয়েছে, কিন্তু কল্যাণ এবং সুস্থতা একমাত্র সুন্নাহর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে। খেজুর গাছের আঁশ নরম হওয়ার কারণে ফোমের মতো আরাম পাওয়া যায়। তবে এ আঁশের তৈরী বিছানা ফোমের মতো ক্ষতিকর নয়।

আছরের নামাযের পরে ও এশার নামাযের আগে শয়ন করা নিষেধ

রসূল (স.) এশার নামাযের আগে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মায়াদ, উসওয়ায়ে রসূল স.)

www.nagorikpathagar.org

আছরের নামাযের পর থেকে মাটির উষ্ণ বাষ্প উঠতে থাকে। এছাড়া মাটি থেকে বিশেষ রকমের গ্যাসও বের হয়। ফলে মানুষের মনে মগযে এক প্রকার ওজন এবং চাপ সৃষ্টি হয়। মানুষ যদি আছরের পরে বা এশার আগে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে উল্লিখিত গ্যাসের মোকাবিলা করতে পারে না। এতে তারা নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়।

ওযু করে ঘুমানো

রসূল (স.) ঘুমুতে যাওয়ার আগে ওযু করতেন। (মামুলাতে নববী)

এশার নামাযের পর দৈনন্দিন জীবনের কিছু কাজ করতে হয়। এরপর বিশ্রামের সময় এলে সে সময় ওযু করা দরকার। ওযুর মাধ্যমে অংগ-প্রত্যংগের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকে। ওযুর ফলে অনিদ্রা এবং মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওযুর মাধ্যমে ডিপ্রেশান বা অবসাদের অবসান ঘটে। তাই মানসিক শান্তি এবং শারীরিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ওযু করে ঘুমানো আবশ্যক।

ঘুমানোর আগে পোশাক পরিবর্তন

রসূল (স.) ঘুমানোর আগে তহবন্দ পরিধান করতেন এবং গায়ের জামা খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন। (মামুলাতে নববী)

স্বাস্থ্য রক্ষা অর্থাৎ হাইজিনের নিয়ম হচ্ছে, যে পোশাক পরিধান করে সারাদিন অতিবাহিত করা হয় সে পোশাক পরিধান করে ঘুমাতে না যাওয়া। রাতের পোশাক হতে হবে হালকা এবং ঢিলেঢালা। কারণ আঁটসাঁট পোশাক পরলে ঘুম আসতে চায় না। ইউরোপের লোকেরা স্লিপিং ড্রেস বা ঘুমানোর পোশাকের কথা প্রায়ই বলে থাকে। তারা এ পোশাক বেশ গর্বের সাথে পরিধান করে। অথচ ইসলাম চৌদ্দশ বছর আগেই রাতের পোশাক হিসেবে তহবন্দের প্রচলন করেছে। কারণ তহবন্দ হচ্ছে একমাত্র পোশাক যা হালকা এবং ঢিলেঢালা।

বিছানা পরিষ্কার করে শোয়া

রসূল (স.) ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে শোয়ার আদেশ দিয়েছেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

অন্য কোনো ধর্মে এ রকম চমৎকার ব্যবস্থা পাওয়া যাবে না। একজন লোকের বিছানায় শীতের দিনে সাপ ঢুকেছিলো। রাতে বিছানা পরিষ্কার না করে ঘুমাতে যাওয়ার পর সাপ তাকে দংশন করে এবং তার মৃত্যু হয়। এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে, যেসব ঘটনা সুন্নত না মানারই কুফল।

রসূল (স.) সকল প্রকার নিরাপত্তার জন্যে বিছানা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে শোয়ার আদেশ দিয়েছেন। ফলে যে কোনো প্রকার কীট, পোকামাকড়, সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এটাচড বাথ

রসূল (স.) রাতে ঘুমানোর সময়ে চৌকির নীচে একটি পাত্র রেখে দিতেন। রাতে সেই পাত্রে তিনি প্রস্রাব করতেন।

www.nagorikpathagar.org

এটাচড বাথ বা সংলগ্ন বাথরুম ইউরোপীয়দের উদ্ভাবন। শীতের রাতে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় ঠান্ডা বাতাস লেগে দেহে অসুখ সৃষ্টি হতে পারে। গেঁটে বাত, সর্দি জ্বর ইত্যাদি অসুখ দেখা দেয়ার আশংকা প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

চৌকির নীচে প্রস্রাব করার জন্যে পাত্র রেখে দেয়া মুসলমানদের সতর্কতা শিক্ষা দেয়। ফলে তারা সুস্থভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে সক্ষম হয়। মোফাসসেরদের মতে, রসূল (স.) কোনোপ্রকার রোগ অথবা প্রচন্ড শীতের সময়ে চৌকির নীচে প্রস্রাব করার পাত্র রেখে দিতেন, এটা নিয়মিত করতেন না। (রাহবারে জিন্দেগী)

পানির পাত্রের মুখ বেঁধে রাখা বা ঢেকে রাখা

রাতে পানির পাত্রের মুখ বেঁধে রাখতে হবে যাতে করে পোকামাকড়, সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি কোনো কিছু প্রবেশ করতে না পারে। (যাদুল মায়াদ)

পানির পাত্রের মুখে মুখ রেখে পানি পান করা নিষিদ্ধ। কারণ কোনো ক্ষতিকর পোকামাকড় ইত্যাদি মুখে প্রবেশ করতে পারে। এরকম সতর্কতা আধুনিক জীবনের অংশ।

ঘুম থেকে উঠে হাত ধোয়া

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরই হাত ধোয়ার জন্যে হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (রাহবারে জিন্দেগী)

ঘুমের ঘোরে হাত কোথায় লেগে যায় সে খবর থাকে না। এতে হাতে নানা রকম রোগজীবাণু লেগে যেতে পারে। জীবাণু লেগে যাওয়া হাত পানিতে প্রবেশ করালে সে পানিও দূষিত হয়ে যাবে। এ কারণে ঘুম থেকে জেগে হাত ধোয়ার জন্যে ইসলাম আদেশ দিয়েছে। অনেক কীট হাতের নখের ভেতর লুকিয়ে থাকে। এ হাত যদি না ধুয়ে পানিতে প্রবেশ করানো হয় তাহলে সেই কীটের ডিম পানিতে মিশে গিয়ে অন্য লোকদের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

শক্ত মাটিতে শয়ন করা

রসূল (স.) শক্ত মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন। কোমরের ব্যথার রোগীদের তক্তার ওপর শুয়ে আরাম করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি শক্ত মাটিতে অথবা তক্তার ওপর শয়ন করে সে কখনো গাঁটের ব্যথা বা কোমরের ব্যথায় আক্রান্ত হয় না। ইসলাম শত শত বছর আগে এ শিক্ষা দিয়েছে এবং রসূল (স.) নিজে আমল করে দেখিয়েছেন।

ঘুমানোর আগে বাতি নিভিয়ে দেয়া

ঘুমানোর আগে আলো নেভানোর জন্যে রসূল (স.) আদেশ দিয়েছেন। আলো না নেভানো হলে বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। হাদীসবিশারদ ওলামায়ে কেরাম বহুসংখ্যক হাদীসের বরাত দিয়ে এরকম কথাই উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এরকম এলাকায় ঘরের বাল্ব নেভানো প্রয়োজন। বাল্ব নেভানো হলে নিরাপদে ঘুমানো সম্ভব হবে। চোখের ওপর মন্দ প্রভাব পড়বে না। বাতি নিভিয়ে ঘুমালে আকস্মিক আগুন লেগে যাওয়ার আশংকা থাকে না। বর্তমান যুগে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা অনেক

www.nagorikpathagar.org

জায়গায় ঘটতে দেখা যায়। ঘরের রুমের মধ্যে যদি ধোঁয়ায় ভরে যায় তবে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের আশংকা থাকে।

সকাল বেলায় তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা

রসূল (স.) সকাল বেলায় তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করার জন্যে তাকিদ দিয়েছেন। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

এ উপদেশ কতো গুরুত্বপূর্ণ। জাতির উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে এ উপদেশের মাঝে। যেসব জাতি এ রহস্য এ চাবিকাঠি পেয়েছে, তারা আজ বিশ্বের অন্যান্য জাতির ওপর বিজয়ী হয়েছে, কর্তৃত্ব করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম থর্পের অভিজ্ঞতা

উইলিয়াম থর্প ছিলেন একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। তিনি তার পর্যবেক্ষণের আলোকে লেখেছেন, জাপান এবং জার্মানীর উন্নতির রহস্য হচ্ছে তারা পরিশ্রমী, একনিষ্ঠ, সৎ, আন্তরিক। তারা খুব সকালে কাজকর্ম শুরু করে এবং গভীর রাতে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করতে থাকে।

আমি একজন লোকের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। সে লোকটি খুব সকালে কাজ শুরু করে। সে সারাদিন সতেজ সজীব প্রাণবন্ত থাকে, আনন্দে থাকে। এ শ্রেণীর মানুষ সময়ের ধারার সাথে চলতে পারে, কিন্তু যারা বিপরীত ধারায় চলে তারা নিজেরাও সফলতা পায় না অন্য কাউকেও সফল করতে পারে না। সাফল্য এনে দিতে পারে না। বর্তমানে যদি আমরা সফলতার এ ধারা ব্যবহার করি, এ কর্মপন্থা প্রয়োগ করি, তবে আমরা অন্যান্য জাতির চেয়ে কিছুতেই পিছয়ে থাকবো না।

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং খুব সকালে জেগে ওঠার উপকারিতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সকল স্বাস্থ্যবিশারদ এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইংরেজী ভাষায় একটি বিখ্যাত কথা রয়েছে

Early to bed & early to rise, makes a man helthy welthy & wise.

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং ভোরে তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা মানুষের জন্যে স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমত্তা এবং সম্পদশালী হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

ইসলামে প্রত্যেক মানুষের জন্যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয, কিন্তু এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে তিন ওয়াক্ত নামায কর্মব্যস্ত সময়ের ভেতর আদায় করতে হয়। এক ওয়াক্ত নামায রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, এক ওয়াক্ত নামায ঘুম থেকে জেগে ওঠে আদায় করতে হয়। রাতে এবং সকালের এই দুই ওয়াক্ত নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। একই সাথে সময়ের শুরুতে নামায আদায়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এশার নামায আদায়ের পর পরই ঘুমিয়ে পড়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অপ্রয়োজনে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে বাজে কথায় বাজে কাজে সময় নষ্ট না করতে বলা হয়েছে। খুব সকালে সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে জাগার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এ দুই ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব প্রণিধানযোগ্য। রসূল (স.) প্রায়ই এশা এবং ফজরের নামাযের পর বলতেন, হে লোকসকল! আমার মন চায় তোমরা যখন নামায আদায় করতে থাকো সে সময় জংগলে গিয়ে শুকনো কাঠ যোগাড় করি। তারপর সেসব লোকের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই যারা এশার নামায আদায় করতে আসে না এবং সকালের নামাযের সময় বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে। মোনাফেকদের জন্যে এশা এবং ফজরের নামায খুব কষ্টকর। এ দুই নামাযের জন্যে যদি হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয় তবুও আসো। রসূল (স.) বলেছেন, প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করো, কারণ এর মধ্যে বড় রকমের কল্যাণ রয়েছে।

মৃত্যুশয্যায় রসূল (স.) তার সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-কে তিনটি বিশেষ অসিয়ত করেছিলেন। এ তিনটি অসিয়তের একটি ছিলো, যদি সারারাত জেগে এবাদাত করো তবুও খুব ভোরে অবশ্যই ফজরের নামায আদায় করবে। তিনি আরো বলেন, ফজরের নামায তখন আদায় করবে যখন নক্ষত্রের আলো বিদ্যমান থাকে। রসূল (স.)-এর সময়ে মহিলারা যখন ফজরের নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরে যেতো তখন তাদের চেনা যেতো না। কারণ তখনো বেশ অন্ধকার থাকতো।

রসূল (স.) যথাসময়ে এবং ওয়াক্তের শুরুতে নামায আদায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং এশা ও ফজরের নামাযের কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ দুই ওয়াক্তের নামাযের পাবন্দী করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষারই ব্যবস্থা করেছেন, তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করেছেন। খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি।

জাগ্রত থাকার সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

আল্লাহ তায়ালা শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে নাক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় অনেকে ভুল করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করে। রাতে ঘুমের মধ্যে মুখ বন্ধ থাকায় নাক দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। নিশ্বাস গ্রহণের ফলে নাকের ভেতর ধুলা ময়লা জমে যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার জন্যে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পরই নাক পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ইসলামেও নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদীসে রয়েছে, শয্যাত্যাগ করার পরই প্রথমে নাক পরিষ্কার করো, কারণ সারারাত নাকে শয়তান প্রবেশ করে থাকে।

আরবী অভিধান অনুযায়ী শয়তান তাকেই বলা হয় যে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। কষ্টদায়ক যন্ত্রণাদায়ক জিনিস বা প্রাণীকেও শয়তান বলা হয়। যেমন জাক্কুম বৃক্ষের চারাকে দূরে থেকে ফণা তোলা সাপের মতো মনে হয়। কোরআনে জাক্কুম বৃক্ষকে সাপের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। শয়তান অর্থ নোংরা এবং ক্ষতিকর জিনিসও বুঝানো হয়। হাদীসের অর্থ হচ্ছে, ঘুমানোর সময় নাকে ধুলোবালি, জীবাণু, ময়লা ইত্যাদি জমে যায়। দিনে মানুষ সচেতন থাকার কারণে সব সময় নাক পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু রাতে সেটা সম্ভব হয় না। এ কারণে নাকে ময়লা জমে। কাজেই ঘুম

www.nagorikpathagar.org

থেকে ওঠার পরই নাক পরিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে। একই সাথে হাতের তালু দিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে হবে। চোখ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। এ কাজের ফলে মানুষ ঘুমের কারণে সৃষ্ট অলসতা থেকে মুক্তি পায় এবং বেশ ঝরঝরে খোশ মেযাজ লাভ করে।

তারপর জুতো ঝেড়ে মুছে পরিধান করবে। কারণ জুতোর ভেতর বিষাক্ত কোনো পোকামাকড় লুকিয়ে থাকতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গ্রামে এ রকমের আশংকা বেশী।

রাতে এবং দিনে ব্যবহারের পোশাক যদি আলাদা থাকে তবে সে পোশাকও ঝেড়ে মুছে ভালোভাবে দেখে তারপর পরিধান করবে। কারণ রাতের অন্ধকারে কোনো বিষাক্ত পোকামাকড় পোশাকের ভেতর ঢুকে থাকতে পারে।

হাত না ধুয়ে পানির কোনো পাত্রে প্রবেশ করানো যাবে না। কারণ ঘুমের ঘোরে হাত কোথায় থাকে বলা যায় না।

স্বপ্ন, সুন্নতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ভালো স্বপ্ন দেখো তবে তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যতীত অন্য কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না, আর যদি খারাপ স্বপ্ন দেখো তবে তাও কারো কাছে প্রকাশ করবে না; বরং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরই আউযু বিল্লাহে মিনাশ শাইতানির রাজিম পাঠ করে তিন বার বাঁ দিকে থু থু নিক্ষেপ করবে। তারপর পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমাবে। এতে স্বপ্নের অপকারিতা থেকে রক্ষা পাবে। (রিয়াদুস সালেহীন)

স্বপ্নের প্রকারভেদ লাহুতি স্বপ্ন

স্বপ্নের এ রকমকে ইসলাম পছন্দ করে। কারণ এ শ্রেণীর স্বপ্ন অদৃশ্য জগত এবং রহস্য জগতের সংগে সম্পৃক্ত। এরকম স্বপ্ন দ্বারা মুসলমানরা পথনির্দেশ লাভ করে। এ রকম স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার ওপর উত্তম প্রভাব বিস্তার করে। এ রকম স্বপ্নই অন্য কারো কাছে প্রকাশ করে ব্যাখ্যা চাইতে বলা হয়েছে।

রসূল (স.)-এর স্বপ্ন ছিলো ওহী। তাঁর দেখা অসংখ্য স্বপ্ন ধর্মীয় বিষয় এবং ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট। মোমেনের স্বপ্নকে ইশারা ও ইলহাম বলা হয়ে থাকে এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশ।

নাসুতি স্বপ্ন

এ শ্রেণীর স্বপ্ন মানব জীবনের চিন্তাধারা, ঘটনাবলী এবং প্রেরণার সংগে জড়িত। ইসলামে এ শ্রেণীর স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। (খাব- হাকিকত ইয়া আফসানা)

স্বপ্ন দেখা কেন জরুরী?

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, স্বপ্ন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ সম্পন্ন করে। স্বপ্ন সম্পর্কে সক্রেটিস বলেছেন, স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের

www.nagorikpathagar.org

বিবেকের প্রতিনিধি। ভল্টেয়ার বলেছেন, স্বপ্ন হচ্ছে বিধ্বস্ত মেযাজের এলোমেলো সৃষ্টি। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন অনুভূতিহীন রাজপথ।

স্বপ্ন সম্পর্কে মানুষ যা ইচ্ছা তাই অনুভব করে। তবু স্বপ্ন হচ্ছে আকর্ষণের একটি আলাদা মাধ্যম। সাম্প্রতিককালে স্বপ্নকে বহু গ্রন্থের বিষয়বস্তু করা হয়েছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যার বহু প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেছে। আধুনিক গবেষণামতে মানুষ ঘুমের পঁচিশ শতাংশ সময় স্বপ্ন দেখে অতিবাহিত করে। আমাদের স্মৃতি, প্রেরণা এবং ব্যক্তিজীবনের সংগে তার সম্পর্ক প্রসংগে বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত মতামত পাওয়া না গেলেও মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। সহজ কথায় বুঝা যায়, এ স্বপ্ন মানুষকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এ কাজের জন্যে দু'টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যেন তারা জটিল পৃথিবীর সংগে মোকাবেলা করতে পারে।

প্রথম পদ্ধতির সম্পর্ক মস্তিষ্কের বাম দিকের সংগে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা মস্তিষ্কের এ অংশ ব্যবহার করি। এ অংশ প্রভাবব্যঞ্জকভাবে বিভিন্ন ঘটনা মোকাবেলা করে। অন্য অংশের সম্পর্ক মস্তিষ্কের ডান দিকের সংগে। এটি বাইরের ঘটনাবলীর সংগে সম্পৃক্ত। এ অবস্থায় অনুভূতি এবং প্রেরণা প্রভাবিত হয়। দিনের বেলায় তা শনাক্ত করা যায় না এবং পর্যালোচনাও করা যায় না। ফলে আমাদের আভ্যন্তরীণ চিন্তার সংগে মোট কতোটা তা সংশ্লিষ্ট, সেটা বুঝার উপায় থাকে না।

আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণা

আমেরিকার ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিশারদ ফ্রয়েড কার্ট রাইট বলেছেন, রাতে মানুষের মস্তিষ্কে বিভিন্ন তথ্য যথারীতি বিন্যস্ত হতে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয়। ফলে রাতে নতুন তথ্য পুরনো তথ্যের সাথে সমন্বিত হয়ে যায়. যেন আমরা অনাগত দিনের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।

মানুষই শুধু স্বপ্ন দেখে না, বরং কুকুর বিড়াল এবং অন্যান্য জীবজন্তুও স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন ছাড়া গভীর ঘুম কমই হয়ে থাকে। আমাদের ঘুমানোর পর শারীরিক মানসিক তৎপরতা চলতে থাকে। তন্দ্রার সময় যে হালকা সতর্কতার চিন্তা করা হয় সেটা একটা কল্পনা। গবেষকরা মানুষের চোখে পট্টি বেঁধে দিয়েছেন যেন চোখ খোলা থাকে। দেখা গেছে, এরকম লোকের চোখে তীব্র আলো পড়লেও তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

ঘুমের চারটি পর্যায়

ঘুমাতে যাওয়ার দশ মিনিট পর থেকে পরবর্তী ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ঘুমন্ত ব্যক্তি চারটি পর্যায় অতিক্রম করে। এর মধ্যে প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য আলাদা। এ সময়ে থাকে গভীর ঘুম। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাতে কষ্ট হয়। চতুর্থ পর্যায়ের শেষ দিক থেকে ঘুমের হালকাভাব শুরু হয়। এ অবস্থা থাকে দশ থেকে বিশ মিনিট। এ আধোঘুম আধো জাগরণে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা যায়। এ সময়ে কেউ কেউ ঘুমের মধ্যে হাঁটতে থাকে, কথা বলতে থাকে, কেউ কেউ বিছানা নষ্ট করে, কিন্তু হালকা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে এমন পর্যায়ে পৌছে, যে পর্যায়কে বিশেষজ্ঞরা চোখের তীব্র তৎপরতা নামে অভিহিত করেন। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় র‍্যাপিট আই এ্যাকশান। এ সময়ে পরিষ্কার

www.nagorikpathagar.org

স্বপ্ন দেখা যায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি পাশ পরিবর্তন বন্ধ করে দেয়। তার নাক ডাকাও বন্ধ হয়ে যায়। নিশ্বাসের স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে। অনেক সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিশ্বাস বেড়ে যায়। ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহ কাপড়ের পুঁটলির মতো ঢিলা হয়ে যায়। বাহু, পা এবং দেহের অধিকাংশ অংশ অবশ হয়ে পড়ে। ঘুমন্ত ব্যক্তির হাত নড়াচড়া করতে এবং চেহারার একটুখানি কাঁপুনি সৃষ্টি হতে পারে। চোখের পাতা একটু খোলা হলে দেখা যায় ঘুমন্ত ব্যক্তি যেন তাকিয়ে কোনো জিনিস দেখছে। কানের স্পর্শকাতরতা বেড়ে যায়, মনে হয় যেন সে কারো আওয়ায শুনছে।

এ সময়ে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা হলে প্রায় তাদের সবাই এমন স্বপ্নের কথা বলে যা বাস্তব চিন্তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন যদি সে বলতে চায় আমি এ রবিবারে সাঁতার কাটতে যেতে চাই। একথার পরিবর্তে সে বলে, ওহো আমি তো একটি বড়ো গোলাপী পাথরের মতো সাঁতার দিচ্ছিলাম। সাঁতারের পানি ছিলো সবুজ। দুই মিনিট পর চোখের তীব্র স্পন্দন শেষ হয়ে যায়, ঘুমন্ত ব্যক্তি আবার গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। এ ঘুমে চোখের তৎপরতা তীব্র হয় না।

রাতে প্রায় দেড় ঘন্টা পর পর ঘুমন্ত ব্যক্তি চার থেকে ছয়বার এ পর্যায়ে প্রবেশ করে। এতে চোখের স্পন্দন তীব্র হয় এবং প্রতিটি পর্যায় হয় আগের পর্যায়ের চেয়ে দীর্ঘ। চতুর্থ বা পঞ্চম পর্যায়ে এক ঘন্টা লেগে যায়। নব্বই মিনিটের এ তৎপরতা মানব জীবনের একটি মৌলিক স্পন্দন মনে হয়। দেহের স্পন্দন প্রতি নব্বই মিনিট পর কার্যক্রম চালাতে থাকে এবং হরমোন নিসরিত হয়। এতে মস্তিষ্কের নানারকম কার্যক্রমও শামিল হয়।

পল বেকনের চিন্তাধারা

বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ পল বেকন বলেছেন, প্রতি রাতে স্বপ্ন দেখার সময়ে মস্তিষ্কের ডান দিকের অংশ বাম দিকের অংশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। ফলে চিন্তা, শব্দ এবং অনুভূতির এক ঝড় ওঠে, যাকে স্বপ্ন নামে অভিহিত করা হয়। স্বপ্নের নদীতে রং বেরং-এর চিন্তার ছবি একটি অন্যটির সংগে ধাক্কা খায় (সকল স্বপ্নই রঙিন হয়ে থাকে)। এ সময়ে স্পর্শাতীত অনেক কিছু উপেক্ষা করা হয়। সেই অদ্ভুত স্বপ্ন জগতে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে উঁচু উঁচু বৃক্ষ জন্ম নেয়। ভীতবিহ্বল বিড়াল ছানা দশ ফুট উঁচু দৈত্যে পরিণত হয়। ভয়ও অনেক অনুভূত হয় এবং আনন্দও অনুভূত হতে থাকে। বাস্তব ঘটনাবলীর সংগে এর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন সকল মানুষের রয়েছে। বয়স যতো কম হয় স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন ততো বেশী। শিশু যতোক্ষণ ঘুমায় এর অর্ধেক সময় এমন অবস্থায় থাকে যাকে চোখের তীব্র তৎপরতা বলা যায়।

বিশেষজ্ঞরা এ রকম ওষুধ ব্যবহার করার কথা বলেছেন যে ওষুধ ব্যবহারে চোখের ঘুম চলে যায়। এ ওষুধ ব্যবহার করে দেখা গেছে, যারা স্বপ্ন দেখা থেকে বঞ্চিত থাকে তাদের ব্যক্তিত্বে বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। তারা অস্থিরতা বোধ করে এবং কোনো বিষয়ে বেশী সময় চিন্তা করতে পারে না। এ রকম এক ব্যক্তি, যিনি

www.nagorikpathagar.org

কয়েকদিন স্বপ্ন দেখেননি, তিনি নানারকম কল্পনায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এরকম আরেক ব্যক্তি হোটেলের বিল পরিশোধে ধোঁকা প্রতারণার আশ্রয় নিতে শুরু করেন। এ রকম লোক চোখের তীব্র তৎপরতা থেকে বঞ্চিত থাকার পর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অধিকাংশ সময় চোখের তীব্র তৎপরতা দীর্ঘ সময় বজায় থাকে। অনেক সময় সারা রাতের ঘুম এ অবস্থায় কেটে যায়।

বিষয়টির বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণের স্বার্থে যদিও এসব কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু অত্যধিক বেশী স্বপ্ন দেখাও ভালো নয়। আবার কম স্বপ্ন দেখাও খারাপ। দীর্ঘ সময় অপ্রয়োজনে যারা ঘুমিয়ে থাকে, জাগ্রত হওয়ার পর তারা খুবই ক্লান্তি অনুভব করে। কারণ যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনি ঘুমাবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্ন দেখবেন। এলকোহল বা এমপিটামিনস জাতীয় মাদক সেবনের ফলে রাতে নানারকম ভয়ানক স্বপ্ন দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, এসব মাদক স্বপ্নের আত্মিক অনুভূতি কমিয়ে দেয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা স্বপ্ন কেন দেখি? এর জবাবে বলা যায়, স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা নিজেদের সমস্যা সমাধানে অনেক সাহায্য লাভ করি। যেসব লোক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, যেমন কোনো চাকুরীর জন্যে কোথাও সাক্ষাৎকার দিবে বা নতুন কোনো বিদ্যা শিক্ষা করবে। এ শ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের ঘুমের সময় বেড়ে যায়, এতে চোখের তৎপরতা তীব্র রূপ ধারণ করে।

স্বপ্নের ওপর গবেষণা

স্বপ্ন সম্পর্কে যারা বছরের পর বছর গবেষণা করেছেন তারা অবাক হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে তার মস্তিষ্ক কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করে। আলবার্ট আইনস্টাইন, সংগীতজ্ঞ মোজার্ট, ঔপন্যাসিক এডগার এ্যালেনপো- এসব সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব স্বপ্নের মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করতেন। জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক কেকুলে কয়েক বছর চেষ্টা করেও বেঞ্জিনের আকৃতি নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। অবশেষে একরাতে স্বপ্নে দেখেন, একটি সাপ নিজের দেহ এঁকে বেঁকে মোচড় খাচ্ছে। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর ফ্রেডারিক চিন্তা করলেন সাপের মোচড়ানো এবং আঁকাবাঁকা হওয়ার রূপ ছিলো ৬টি। এরপর তিনি বেঞ্জিনের আকৃতি তৈরীর ফর্মূলা পেয়ে গেলেন। রসায়ন শাস্ত্রে ফ্রেডারিক কেকুলের এ আবিষ্কারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়।

অধিকাংশ স্বপ্ন সুবিন্যস্ত এবং সুশৃংখলভাবে দেখা হয়। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত স্বপ্ন হয়ে থাকে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ এটা হচ্ছে সূচনা। ঘুমাতে যাওয়ার আগে যেসব সমস্যা আমাদের মনে মগজে জাগরূক থাকে, ঘুমানোর পর সেসব সমস্যাকে ভিত্তি করেই স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। তারপর স্বপ্ন হয় অতীতের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে, কিন্তু অতীতের বিষয় নিয়ে হলেও সাম্প্রতিক বিষয় সে স্বপ্নের সংগে সংযুক্ত থাকে। আবার অধিকাংশ স্বপ্ন ভবিষ্যতের আশা আকাংখার সংগে যুক্ত থাকে (যেমন যদি আমি এ সমস্যার সম্মুখীন না হতাম তবে কেমন হতো)। অনেকের রাতের শেষ অংশের স্বপ্ন পূর্ববর্তী স্বপ্নসমূহের উপাদানে তৈরী হয়। এমনি করে এসব স্বপ্ন যেন

www.nagorikpathagar.org

অনুভূতি জগতের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সমাপ্তি। যদিও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার কয়েক মিনিট পর স্বপ্নের কথা মনে থাকে না, তবু কিছু কিছু স্বপ্ন মনে গেঁথে থাকে। পুরো স্বপ্ন মনে না থাকলেও কোনো কোনো অংশ ঠিকই মনে থাকে।

ডাক্তার মিল্টন ক্রেসারের অভিজ্ঞতা

আমেরিকার সিনসিনাটির ডাক্তার মিল্টন ক্রেসার তার কাছে আসা রোগীদের সংগে কথা বলে জেনেছেন যে, তাদের অধিকাংশ রাতে যে রকমের স্বপ্ন দেখেন পরদিন তাদের মন মেযাজ সে অনুযায়ী থাকে। অথচ কি স্বপ্ন দেখেছেন সেটা সাধারণত তারা মনে করতে পারেন না। এ ছাড়া যারা হালকা ঘুম ঘুমায় তারা সমস্যার কারণেই এরকম অবস্থার সম্মুখীন হয়। চোখের তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার কারণেও তারা ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না। এরা যে স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন স্পষ্ট তাদের মনে থাকে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আপনি যখন অত্যন্ত অস্থিরতার সম্মুখীন হবেন সে সময় অতীতের কথা আপনার মনে পড়বে যখন অস্থিরতা অনুভব করবেন তখন ঘুমের বড়ি না খেয়ে অমনিতে শুয়ে থাকুন এবং স্বপ্ন দেখুন।

স্বপ্ন সম্পর্কে যারা গবেষণা করছেন তারা জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক কেকুলের কথা মনে রাখবেন। তিনি বলেছেন, আসুন আমরা সবাই স্বপ্ন দেখতে শিখি, হয়তো এ স্বপ্ন দেখতে শেখার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত সত্য অবগত হতে পারবো। ফ্রেডারিক কেকুল বেঞ্জিনের আকৃতি নির্মাণপদ্ধতি ঘটনার পর তার কাছে আসা লোকদের একথা বলতেন।

আরামদায়ক বিছানা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ও বিজ্ঞান

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর শোয়ার এবং আরাম করার বিছানা ছিলো চামড়ার তৈরী। চামড়ার ভেতরে খেজুরের ছাল ভরা ছিলো। (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি রসূল (স.)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি এ অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলাম। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন কাঁদো কেন? আমি বললাম, কায়সার কেসরা মখমলের গদির ওপর শয়ন করছে, অথচ আপনি শুয়ে আছেন চাটাইয়ের ওপর। রসূল (স.) বললেন, এতে কান্নার কিছু নেই। তাদের জন্যে দুনিয়া আর আমাদের জন্যে আখেরাত। হযরত ওমর (রা.) থেকেও একই রকমের একটি বর্ণনা বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত হাফসা (রা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার ঘরে রসূল (স.)-এর বিছানা কেমন ছিলো? তিনি বলেন, একটি চট ছিলো। আমি সেটিকে দুই ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম, রসূল (স.) তার ওপর শয়ন করতেন। এক রাতে আমি কিছুটা আরাম হবে চিন্তায় সে চটটি চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম। সকালে রসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, গতরাতে আমার পিঠের নীচে কী বিছিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, সেই চটই তো বিছিয়েছি, তবে কিছুটা নরম করার চিন্তায় চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম। রসূল (স.) বললেন, আগের মতোই দুই ভাঁজ করে বিছাবে। চার ভাঁজের আরামের কারণে অতিনিদ্রায় গত রাতে আমি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে পারিনি।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার নিকসন ভিজিটরের গবেষণা

ডাক্তার নিকসন ভিজিটর নরম বিছানায় শয়ন সম্পর্কে গবেষণা করে স্বাস্থ্যের যেসব সম্ভাব্য ক্ষতি আবিষ্কার করেছেন তা নিম্নরূপ-

১. একজন সুস্থ সবল মানুষ আরামদায়ক নরম বিছানায় শয়ন করলে তার মাসল ঢিলা হয়ে যায়। সাধারণ জীবনের অভ্যাসে পার্থক্য দেখা দেয়।

২. অনেক নরম বিছানায় কিডনি প্রভাবিত হয়। প্রস্রাবের নালীতে জটিল ব্যাধি দেখা দেয়ার আশংকা থাকে।

৩. আরামদায়ক বিছানা মেরুদন্ডের হাড়ের ক্ষতি করে। আমি এ রকম রোগী পেয়েছি যারা আরামদায়ক বিছানার কারণে মেরুদন্ডের হাড়ের ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছে।

৪. শিশুদের হাড় থাকে নরম কোমল। নরম বিছানা ব্যবহারের কারণে তাদের হাড় বাঁকা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এ কারণে সারা জীবন তাদের কষ্ট পেতে হয়।

৫. আরামদায়ক বিছানার কারণে কোমরে ব্যথা হয়। এতে কোল এবং পিঠের মাসল ঢিলা হয়ে যায়। নিয়মিত নরম বিছানা ব্যবহার করা হলে এ রোগ বেড়ে যায়। (কিউর মেডিকেল)

অধিকাংশ সময় জুতো পরিধানের পরামর্শ

রসূল (স.) বলেছেন, অধিকাংশ সময় জুতো পরিধান করে থাকো। যারা জুতো পরিধান করে তারা যেন এক ধরনের সওয়ারীতে আরোহণ করে থাকে। (মামুলাতে নববী, আদাবে জিন্দেগী)

জুতো পরিধান করা অবস্থায় থাকলে পা কাঁটা থেকে রক্ষা পায়। উঁচু নীচু অসমতল জায়গায় নিরাপদ থাকা যায়। জুতো পরিধান করা হলে মানুষকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেখায়।

এশার নামাযের পর জাগ্রত থাকা এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে

এশার নামাযের পর জাগ্রত থাকতে এবং কথা বলতে রসূল (স.) নিষেধ করেছেন। এশার নামাযের পর সে ব্যক্তিই জাগতে পারে যার কোনো ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নেয়ার কথা থাকে অথবা জরুরী পারিবারিক বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, আদাবে জিন্দেগী)

রসূল (স.)-এর এ কথা নিসন্দেহে একটি মহৎ কথা। সারাদিন ক্লান্ত শ্রান্ত থাকার পর রাতে আল্লাহর দেয়া আরামের সময়ে তাড়াতাড়ি ঘুমালে সকালে তাড়াতাড়ি জাগতে পারবে। বেশী সময় ঘুমিয়ে থাকলে ঘুমন্ত অবস্থায় গায়ে সূর্যকিরণ পড়লে নানা রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে। রাতে দেরী করে ঘুমাতে গেলে এবং ঘুম পুরো না হলে অনিদ্রার কারণে অস্থিরতা, উদ্বেগ মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে। এ কারণে রসূল (স.) এশার নামাযের পর পরই ঘুমিয়ে পড়ার কথা বলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার নিকসন ভিজিটরের গবেষণা

রাতে দেরী করে ঘুমানোর কারণে রোগী হয়ে যারা আমার কাছে আসে, তাদের মধ্যে আমি নানা অংগ প্রত্যংগের রোগের কথা শুনেছি এবং মানসিক রোগের পরিচয় পেয়েছি।

এ শ্রেণীর রোগীদের আমি লক্ষ্য করেছি, তারা মানসিক অবসাদের শিকার। এদের কারো কারো মধ্যে আমি আত্মহত্যার প্রবণতাও লক্ষ্য করেছি।

মোটকথা, আল্লাহর বিধান হচ্ছে দিনের বেলায় কাজ করা এবং রাতে আরাম করা। এ নীতি কৌশল ভংগ করা হলে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। (কিউর মেডিকেল)

নাপাক অবস্থায় ঘুমানো

নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে যৌনাংগ ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ওযু করতে হবে। (বোখারী)

একবার স্ত্রী সহবাস করার পর পুনরায় আবার স্ত্রী সহবাস করতে চাইলে উভয় সহবাসের মাঝখানে ওযু করতে হবে। (মুসলিম)

প্রথমোক্ত হাদীসে যেহেতু ঘুমানোর কথা রয়েছে, ঘুমানোর জন্যে দেহের সকল অংগ প্রত্যংগের স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকা প্রয়োজন, কাজেই নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে লজ্জাস্থান ধুয়ে তারপর ওযু করবে এবং ঘুমাবে।

দেহের তাপমাত্রা যেহেতু খুবই অস্বাভাবিক থাকে এবং দ্বিতীয় বারের সহবাসে তাপমাত্রার পরিমাণ আরো বেড়ে যায়, এ কারণে ওযু করার ফলে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। (রিসার্চ রিপোর্ট)

জীবজন্তুর চামড়া বিছানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা

রসূল (স.) জীবজন্তুর চামড়া বিছাতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, মোসনাদে আহমদ, নাসাঈ)

এ নিষেধের কারণ হচ্ছে, জীব জন্তুর চামড়া বিছানোর কারণে মানুষের মধ্যে বন্য স্বভাব জন্ম নিতে পারে। আধুনিক প্যারা সাইকোলজি অনুযায়ী বুঝা যায়, পশুদের সংগে ওঠাবসা ও অবস্থান– এমনকি মৃত পশুদের সংগে সম্পর্ক রাখা হলেও দেহে পশুত্বের প্রভাব পড়তে পারে।

পশুদের চামড়া বিছানো হলে চামড়ায় বিদ্যমান জীবাণু মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। অনেক জীবাণু এমন রয়েছে যা কেমিক্যাল দ্বারাও ধ্বংস হয় না তারা বরং চামড়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

চামড়া বিছানো হলে এবং ব্যবহার করা হলে সে জীবাণু মানবদেহে স্থানান্তরিত হয় এবং মানুষ অসুখে পড়ে।

ইসলাম পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ ধর্মের শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। জীব জন্তুর চামড়ায় এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। যারা ইসলামের অনুসারী তারা অপবিত্রতা এবং অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে থাকুক ইসলাম সেটা চায় না।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ অধ্যায়

পোশাক

সাদা পোশাক

রসূল (স.) সাদা পোশাক সব সময় পছন্দ করতেন। (উসওয়ায়ে রসূল স.)

সাদা পোশাক সকল প্রকার মৌসুমী প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে পারে। প্রচণ্ড গরমের সময়েও সাদা পোশাক গরম হয় না। কারণ সাদা পোশাক ঘাম শুষে নেয় এবং শীতের সময় সাদা পোশাক ঠান্ডা হয় না।

ক্রোমোপ্যাথির নিয়ম

রং এবং আলো বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সাদা পোশাক ক্যান্সার থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিষেধক। বিশেষজ্ঞদের মতে যারা সাদা পোশাক পরিধান করবে তাদের গ্ল্যান্ডস ফুলে যাওয়া, ফাংগাল ইনফেকশন জাতীয় মারাত্মক কোনো রোগ হবে না। তারা স্কিন এলার্জি এবং হাই ব্লাড প্রেসারের রোগীদের সব সময় সাদা পোশাক পরিধান করার পরামর্শ দিয়েছেন। ক্রোমোপ্যাথির নিয়ম অনুযায়ী সাদা পোশাক মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড এবং চর্মের নিরাপত্তা বিধান করে। (উসূলে ক্রোমোপ্যাথি)

ইবনে বতুতার অভিজ্ঞতা

প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ভারত উপমহাদেশের জনসাধারণকে সাদা পোশাক পরিধান করতে দেখে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, ভারত উপমহাদেশের জনগণ সাদা পোশাক পছন্দ করে। দেহ মনের জন্যে এ পোশাক অত্যন্ত উপকারী এটা আমি অনুভব করেছি। (সফরনামা ইবনে বতুতা)

খলিল জিবরান এবং সাদা পোশাক

খলির জিবরান ছিলেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং অনেক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি সাদা পোশাককে গোলাপ ফুলের সাথে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেন, গোলাপ ফুলের সাদা পাঁপড়ি এবং আমার দেহের পোশাক দুটোই সমান। এ দুটোর মাধ্যমে আমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করি। সাদা পোশাক থেকে শান্তির উপকরণ পাওয়া যায়।

ডাক্তার লোহী কোনি

জার্মানীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ এবং চিকিৎসক ডাক্তার লোহী কোনি হাইড্রো থেরাপির আবিষ্কারক। এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সাদা পোশাক পরিধানের উপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন।

সূতী পোশাক

রসূল (স.) সূতী পোশাক পরিধান করতেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে মানুষ যতোই উন্নতি লাভ করুক না কেন, তারা আবার স্বভাবধর্মের দিকেই প্রত্যাবর্তন করছে। কৃত্রিম পোশাক পরিধানের কি ক্ষতি এবং সুন্নতি তরিকায় সূতী পোশাক পরিধানের কি উপকারিতা সেটা একটা আলাদা বিষয়। যদি কারো পোশাকে আগুন ধরে যায় তবে সূতী পোশাক তেমন পোড়াতে পারে না। এছাড়া সূতী পোশাক গরম শুষে নেয়। এ কারণে গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার জনগণের জন্যে সূতী পোশাক অত্যন্ত উপকারী। সূতী পোশাক পরিধানে অসুখ কম হয়। বিশেষত চর্মরোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায় পলিয়েস্টার এবং নাইলনের তৈরী পোশাক খুব কম সময়ে গরম হয়ে যায় এবং দেহ শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে রোগের কারণ হয়। সূতী পোশাক দেহের উষ্ণতার ভারসাম্য রক্ষা করে। এ পোশাক খুব দ্রুত শারীরিক এবং মানসিক রোগ থেকে মানুষকে মুক্ত করে।

পলিয়েস্টারের পোশাক ব্যবহারের কারণে দুটি মারাত্মক রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি হচ্ছে মহিলাদের লিকুরিয়া অন্যটি হচ্ছে পুরুষের যৌন রোগ। এ সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

মোটা পোশাক

রসূল (স.) মোটা পোশাক পরিধান করতেন। (মামুলাতে নববী)

সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর ওলীরা জীবনভর মোটা পোশাক পরিধান করে গেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান দীর্ঘ গবেষণার পর মোটা পোশাক পরিধানের অনেক উপকারিতা স্বীকার করেছে।

ডাক্তার লোথার এম-এর অভিজ্ঞতা

ডাক্তার লোথার জার্মানীর একজন বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, যখন থেকে সাধারণ মানুষ মোটা সূতী পোশাক ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে তখন থেকে তারা নিম্নোক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত হওয়া শুরু করেছে–

১. স্কিন ক্যান্সার ২. ব্রেস্ট ক্যান্সার ৩. স্কিন গ্ল্যান্ডস ক্যান্সার ৪. টিসুজ ক্যান্সার ৫. হরমোনাস ক্যান্সার ৬. এলার্জিক কেরামটিটিজ ৭. একজিমা ৮. এলার্জি। (তাহফীকে দিল্লী)

ডাক্তার লোথারের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ সঠিক। তিনি বছরের পর বছর যে গবেষণা করেছেন তার ফল কি বৃথা যেতে পারে?

এভাবে রসূল (স.)-এর তরীকা সকল গবেষণার ওপর বিজয়ী প্রমাণিত হচ্ছে।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

ঘটনাটি মুলতান কটন মিলের। আমার একজন বন্ধু উক্ত কটন মিলে চাকুরী করতেন। হঠাৎ একদিন শুনলাম তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ সেখানে তিনি বেশ মোটা অংকের বেতন পেতেন। চাকুরীতে ইস্তফা দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মিল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন থেকে জনগণের চাহিদা মেটাতে পুরুষ এবং নারীদের জন্যে পাতলা সুতী কাপড় তৈরী করবে। অথচ সূক্ষ্ম পাতলা পোশাক পরিধান করা সুন্নতের পরিপন্থী। আর আমি সুন্নত পরিপন্থী পোশাক তৈরীর কাজে সহায়তা করতে পারি না। এ কারণে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

একদিন কোথাও যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি লাক্সারিয়াস গাড়ী আমার পাশে এসে থেমে গেলো। গাড়ী থেকে আমার সেই বন্ধু ন্যমলেন। তিনি বললেন, সেই চাকুরী ছেড়ে দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা আমাকে আরো ভালো একটি চাকুরী মিলিয়ে দিয়েছেন। এ গাড়িও নতুন কর্মস্থল থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা আমাদের জন্যে যথেষ্ট শিক্ষণীয় এবং তাৎপর্যমন্ডিত নয় কি?

দেহের রং পরিবর্তন

আমাদের রক্তে মেলানিন নামের একটি উপাদান বিদ্যমান থাকে। এই উপাদানের কারণেই আমাদের স্বাভাবিক রং বজায় থাকে, কিন্তু কারো দেহের চামড়ায় যদি মাত্রাতিরিক্ত রোদের উত্তাপ, শীতের প্রকোপ কিংবা ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে, তখন স্কীনের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। সূক্ষ্ম এবং পাতলা পোশাক পরিধান করার ফলেই এরকম হয়ে থাকে।

পাগড়ি

রসূল (স.) তিন রং-এর পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সাদা, সবুজ, কালো। পাগড়ি হচ্ছে রসূল (স.)-এর সুন্নত। পাগড়ি ব্যবহার করার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

১. পাগড়ি ব্যবহারকারীর মাথা রোদের প্রখর উত্তাপ থেকে নিরাপদ থাকে। ২. পাগড়ি ব্যবহারকারী সর্দি থেকে রক্ষা পায়। ৩. মাথা ব্যথা রোধের জন্যে পাগড়ি অত্যন্ত উপকারী। যারা পাগড়ি ব্যবহার করে তাদের সাধারণত মাথাব্যথা হয় না। ৪. পাগড়ি মস্তিষ্কের শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ৫. পাগড়ির পেছনের ঝুলে থাকা অংশের কারণে ঘাড়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। স্পাইনাল কর্ডকে শীত, গরম এবং ঋতু পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। ৬. পাগড়ি ব্যবহারকারী ব্যক্তি মেনিনজাইটিস থেকে নিরাপদ থাকে। ৭. ফিজিওলজি বিশেষজ্ঞদের মতে স্পাইনাল কর্ড নিরাপদ থাকার কারণে দেহের নার্ভ সিস্টেম এবং মাসল সিস্টেম নিরাপদ এবং সংগঠিত থাকে।

সাদা পাগড়ি ব্যবহারের কারণে মস্তিষ্কের কোষসমূহ গরমের উত্তাপ এবং লু-হাওয়া থেকে রক্ষা পায়। সাদা পাগড়ি ব্যবহারকারী ব্যক্তি সানস্ট্রোকসহ মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকে। আমার পরিচিত ফয়সালাবাদের এক লোক বলেছেন, আমি স্থায়ী সর্দি এবং মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। একজন ডাক্তার আমাকে পাগড়ি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। আল্লাহর রহমতে এতেই আমার রোগ ভালো হয়ে যায়। পাগড়ি ব্যবহারের ফলে মানুষকে অভিজাত এবং অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হয়।

পাগড়ি এবং মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ

রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা পাগড়ি বাঁধো, এতে তোমাদের ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পাবে। (ফতহুল বারী)

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার আযিয আহমদ বলেন, উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্যে আমি বিদেশে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, লোকেরা মানসিক রোগ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে মাথায় পাগড়ির মতো একখন্ড কাপড় বেঁধে রাখছে। আমি দেখে বললাম,

www.nagorikpathagar.org

আরে এ তো পাগড়ি! তারা যেভাবে বেঁধেছিলো আমাদের রসূল (স.) সেভাবেই পাগড়ি বাঁধতেন। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেলো, মানসিক রোগ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশেই তারা এভাবে পাগড়ি বেঁধে রাখছে। আমি বললাম, আপনারা যেভাবে মাথায় কাপড় বেঁধেছেন এটা তো সেই পাগড়ির মতো, যে পাগড়ি আমাদের রসূল (স.) মাথায় বাঁধতেন। পাগড়ির মতো এ কাপড় তারা মাথায় এ উদ্দেশে বাঁধতেন যেন বিপদে পড়ার পর মানুষ ধৈর্য হারিয়ে না ফেলে। তাছাড়া এ পাগড়ি ব্যবহারের কারণে এদেশের মানুষ নানাপ্রকার মানসিক রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

শত শত বছর আগে আমাদের রসূল (স.) যে কথা বলেছিলেন, বর্তমান বিজ্ঞান সে বিষয়েই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সবুজ পোশাক

সাদা পোশাকের পাশাপাশি রসূল (স.) সবুজ পোশাকও পছন্দ করতেন। (যাদুল মায়াদ)

সকল প্রকারের পোশাক থেকে এক প্রকার আভা বের হয়। এ আভা দেহের সকল অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সবুজ বাগান, প্রস্ফুটিত ফুল ইত্যাদি দেখে মনে যেমন প্রশান্তি পাওয়া যায়, তেমনিভাবে সুন্দর কমনীয় পোশাকও দেহের শান্তি নিশ্চিত করে।

ক্রোমোপ্যাথি বিশেষজ্ঞদের মতে, সবুজ পোশাক দেহের নানারকম রোগের উপকার করে। যেমন– ১. পাকস্থলীর আলসার নিরাময় করে, ২. পাকস্থলীর পুরাতন রোগ নিরাময় করে, ৩. দেহের অংগ-প্রত্যংগ এবং মস্তিষ্কের খিঁচুনি দূর করে, ৪. অবসাদ বা ডিপ্রেশনের অবসান ঘটায়, ৫. হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে উচ্চ রক্তচাপ দূর করে, ৬. চর্মরোগ বিশেষত দেহের জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটায়।

রসূল (স.)-এর প্রতিটি পছন্দ কতোটা বিজ্ঞানসম্মত ছিলো তা ভেবে অবাক হতে হয়।

লাল পোশাক এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.) লাল পোশাক পছন্দ করতেন না। (মামুলাতে নববী)

এ বিষয়ে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। লাল রং পুরুষদের হরমোন ব্যবস্থার জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। লাল রং-এর ব্যবহারে দেহের হরমোন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ রং ব্যবহারের কারণে এক বিশেষ রকমের আর্দ্রতা দেহ থেকে বের হয়ে রক্তের সাথে মিশে যায়। মনস্তত্ত্ববিশারদদের মতে এবং ক্রোমোপ্যাথি অনুযায়ী লাল রং ব্যবহারের ফলে পুরুষদের নানা রোগ দেখা দেয়। তাছাড়া লাল রং পুরুষদের স্বভাবসম্মত পছন্দ পরিপন্থী। লাল রংয়ের প্রভাবে যেসব রোগ দেখা দিতে পারে তা হলো– ১. উচ্চ রক্তচাপ, ২. যৌন জড়তা, ৩. চর্মরোগ, ৪. গ্ল্যান্ডস ফুলে যাওয়া, ৫. থাইরয়েড গ্ল্যান্ড-এর ইনফেকশন ৬. কোমরের উপরের দিকে চুলকানি।

কোনো কোনো গ্রন্থে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা বিশেষ কারণে লাল রং ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু রসূল (স.)-এর হাদীস এবং তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, রসূল (স.) কিছুতেই লাল রং পছন্দ করতেন না।

www.nagorikpathagar.org

পায়ের গোড়ালির উপর পোশাক পরিধান

রসূল (স.) বলেছেন, লুঙ্গি পায়ের গোড়ালি এবং হাঁটুর মাঝামাঝি স্থান পর্যন্ত পরতে হবে। সর্বোচ্চ টাখনু বা গোড়ালি পর্যন্ত নামানো যেতে পারে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির পর যতটুকু নীচে নামানো হবে সেটুকু দোযখের আগুনে জ্বলবে। যে ব্যক্তি অহংকারের কারণে পায়ের গোড়ালির নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তার দিকে তাকাবেন না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, উসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (স.)।

আমার বন্ধু তাহের মুনির একজন ব্যবসায়ী। বেশ লেখাপড়া জানা মানুষ। তিনি বলেন, আমি একবার আমেরিকার মিশিগান স্টেট সফর করছিলাম। সেখানে আমার এক বন্ধু আমাকে একটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনাকে একটা মজাদার জিনিস দেখাবো। সে আমাকে এক বিরাট হেলথ সেন্টারে নিয়ে গেলো। সেখানে বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগ রয়েছে। একটি বিভাগের সামনে গিয়ে দেখলাম লেখা রয়েছে পোশাক বিভাগ। সেখানে আরো লেখা রয়েছে, আপনার পোশাক পায়ের গোড়ালির ওপর রাখুন। এতে পায়ের গোড়ালি ফুলে যাওয়া, লিভারের আভ্যন্তরীণ রোগ এবং উন্মাদনা থেকে রক্ষা পাবেন। আমি চমকে উঠলাম। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি মুসলমানদের হেলথ সেন্টার? সে বললো- জি না, এটি খৃস্টানদের হেলথ সেন্টার। এখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করা হয়। গবেষণায় ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শও অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে।

পোশাক যদি গোড়ালির নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করা হয়, তবে পায়ের এমন অংশ ঢাকা পড়ে থাকে যেখানে পানি এবং বাতাস লাগানো প্রয়োজন। সেই অংশ ঢেকে রাখা হলে দেহের ভেতর নানা প্রকার পরিবর্তন সূচিত হয়।

রেশমের পোশাক এবং আধুনিক বিজ্ঞান

পুরুষদের জন্যে রেশম ব্যবহার হারাম। (রাহবারে জিন্দেগী)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হলে দেখা যায়, রেশম শুকনো এবং এর প্রভাব গরম। রেশম গুটি তুঁত গাছে জন্মায়। একপর্যায়ে এসব পোকা বা গুটি মরে যায়।

রেশম ও আধুনিক বিজ্ঞান

ডাক্তার ব্রাউন রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের প্রসঙ্গে লিখেছেন, তিনি রেশমী পেশাক পরিধান করতেন। এ কারণে তার দেহে চরম উত্তাপজনিত অস্থিরতা লেগেই থাকতো। তিনি কথায় কথায় ক্ষেপে যেতেন। অথচ রেশমী পোষাক পরিধানের পূর্বে তিনি কখনো এরকম ছিলেন না।

রাজা চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করলে তারা কিছু ওষুধ দেন। খাওয়ার এবং বাইরে মালিশের ওষুধ দেয়া হয়, কিন্তু এতে রোগ নিরাময় হয়নি। তখনও তিনি রেশমী পোশাক পরিধান করতেন। একবার কিছু দিন রেশমী পোশাক ব্যবহার না করার পর তিনি কিছুটা আরাম অনুভব করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি লক্ষ্য করেন, রেশমী পোশাক

www.nagorikpathagar.org

পরিধান না করলেই তিনি ভালো থাকেন। রাজা বুঝতে পরলেন, প্রকৃতপক্ষে রেশমী পোশাকের কারণেই তার দেহে রোগ দেখা দেয়।

মহিলাদের পোশাক

মহিলাদের পায়ের গোড়ালির নীচে পর্যন্ত পোশাক ঝুলিয়ে রাখতে হবে। (মাদারেজুন নবুওত, মামুলাতে নববী)

মিশিগানে তাহের মুনিরের বর্ণিত একটি ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শরীয়ত মহিলাদের পায়ের গোড়ালির নীচে পর্যন্ত পোশাক পরিধানের আদেশ দিয়েছে। তাহের মুনির আরো বলেছেন, হেলথ সেন্টারের ডাক্তারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মহিলারা যদি পায়ের গোড়ালির উপরে পোশাক তোলে তবে তাদের ভেতর মহিলাসুলভ হরমোন কমে যাবে বা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে তাদের ভ্যাজাইনাল ইনফ্লামেশন, কোমর ব্যথা, আঙ্গিক দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেবে। তাহের মুনির বলেন, আমি আমাদের ঘরের মহিলাদের এ বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছি, মিশিগান হেলথ সেন্টারের ডাক্তারদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যেসব মহিলা সুন্নতের বরখেলাফ করে তাদের অবস্থা ডাক্তারদের বর্ণিত অবস্থার মতোই হয়ে যায়।

জামায় কলার ব্যবহার

কলার ব্যবহার ইসলামে পছন্দ করা হয়নি। (মামুলাতে নববী)

আধুনিক সভ্যতার সৌন্দর্য অনেক। আধুনিক সভ্যতার গৌরব করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু এটাও ঠিক, এর সৌন্দর্যের চেয়ে ক্ষতিকর দিক অনেক বেশী। অনেকে এসব ক্ষতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন, কিন্তু তবু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক সময় অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

পোশাকের কথাই ধরা যাক। পোশাকের ক্ষেত্রে শত রকমের ফ্যাশনের আবিষ্কার হয়েছে। অথচ হাদীসের আলোকে দেখা যায় রসূল (স.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে দ্বীনী ও দুনিয়াবী অনেক উপকারিতা বিদ্যমান। সুন্নত অনুযায়ী কলারের ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা জামার কলার এবং টাই ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অথচ কলার এবং টাই ব্যবহার করা হলে নানা রকম রোগের আশঙ্কা দেখা দেয়। কয়েকটি রোগের কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

ঘাড়ের রোগ

কলার ব্যবহারের ফলে ঘাড়ের সামনের দিকে ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া মানব দেহের উচ্চতা এবং বৃদ্ধিও এতে প্রভাবিত হয়। ছোট কলারওয়ালা পোশাক পরিধান করা হলে ঘাড় স্বাধীনভাবে ফেরানো যায় না। এছাড়াও নানারকমের সমস্যা দেখা দেয়।

রক্ত চলাচলে সমস্যা

মস্তিষ্ক কোষের মাধ্যমে আমাদের অন্তকরণ থেকে রক্ত চলাচল করে। জামার কলার যখন ঘাড়ের বা গ্রীবার চাপ সৃষ্টি করে তখন মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কমে যায়। পরিণামে মস্তিষ্কের দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, অনিদ্রা, চুল পড়া ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

www.nagorikpathagar.org

এমনকি মস্তিষ্ক কোষের চাপ সৃষ্টির ফলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যারা মস্তিষ্কের পরিশ্রম করে তারা যদি জামার কলার ব্যবহার ত্যাগ না করে তবে মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস পায়। এমনকি কারো কারো মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টিরও আশংকা থাকে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে জটিলতা

মানব দেহের রক্ত থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড বের করে দিয়ে দেহে অক্সিজেন প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে ফুসফুস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু গলাবন্ধ বা টাইট কলার ব্যবহারের কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসে অস্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা দেখা দেয়। এরকম দীর্ঘদিন পরিধানে যে কোন ব্যক্তি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো ব্যক্তি প্রথম প্রথম যখন গলাবন্ধ, টাই, ছদরিয়া, জ্যাকেট, শেরোয়ানী, কামিজ পরিধান করে তবে তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে। গ্রীবায় চাপ অনুভব করবে। মানসিক শান্তি দূর হয়ে যাবে। আমি একথা বলতে চাই না যে, কলার বা গলাবন্ধসম্পন্ন পোশাক পরিধান করা নাজায়েয, অথবা এরকম পোশাক ব্যবহার উপযোগী নয়; বরং এরকম পোশাক ব্যবহারে কলার যেন টাইট না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

মেন্স রিফর্ম পার্টির উদ্যোগে

উপরোক্ত আশঙ্কার কারণে ১৯৩০ সালে বৃটেনের একদল লোক পোশাক সংস্কারের উদ্দেশে মেন্সড্রেস রিফর্ম পার্টি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। তারা জামার কলারের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা চিকিৎসকদেরও শরণাপন্ন হন। চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন, আঁটসাঁট কলারের ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে, এটা মানব দেহের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। লন্ডনের চিকিৎসকরা ডেইলী মেইল পত্রিকার একজন রিপোর্টারকে একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে প্রদান করেন।

ডাক্তার আলফ্রেড সি জারডানের বিবৃতি

মেন্স রিফর্ম পার্টির অনারারি সেক্রেটারী ডাক্তার আলফ্রেড সি জারডান উক্ত বিবৃতিতে বলেন, টাইট পোশাক ব্যবহার মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের বেশী ক্ষতি করে। পুরুষরা কলার এবং পুরু টুপি ব্যবহারের কারণে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এতে মাথার সেই কোষের শিরায় রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয়। যে কোষ চুল উৎপাদন করে। তাছাড়া জামার কলারের ব্যবহার কাজের দক্ষতা যোগ্যতা কমিয়ে দেয়।

স্যার ডব্লিউ আয়বুথ নাথের বক্তব্য

স্যার ডব্লিউ আরবুথ নাথ বলেন, সংকীর্ণ কলার ব্যবহার মাথা বিশেষত মস্তিষ্ক থেকে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। গ্রীবাদেশের শিরা উপশিরাগুলো খুবই সূক্ষ্ম। তাই সেসব শিরা উপশিরায় অধিক চাপ সৃষ্টি হলে সেগুলো ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মাথা নীচু করা বা সামনে ঝুঁকে পড়ার সময়ে এ আশঙ্কা আরো বেড়ে যায়।

ডাক্তার গোল্ড সেলিবির বক্তব্য

লন্ডনের ডাক্তার গোল্ড সেলিবি বলেছেন, কলার ব্যবহার করা হলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে বাধার সৃষ্টি হয়। বাতাস যখন কার্বন নিয়ে বাইরে বের হতে চায় তখন কলারের বন্ধন তার পথ রুদ্ধ করে দেয়। এ দূষিত বাতাস সারা দেহ গরম করে তোলে এবং রক্ত

www.nagorikpathagar.org

বিষাক্ত করে ফেলে। মানব দেহের অংগ প্রত্যংগ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত পরিপুষ্ট হতে থাকে। জামার কলার ব্যবহার করা হলে গ্রীবায় এবং গলদেশে রোদ লাগে না। এতে দৈহিক পুষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। বিশেষত শিশুদের জন্যে কলার বা গলাবন্ধ অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি জামার কলার ব্যবহার করার রেওয়াজ না থাকতো তবে বর্তমান প্রজন্মের মানুষের আঙ্গিক উচ্চতায় এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে আরো অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতো। মানুষের দেহ হতো আরো মযবুত এবং মানুষ হতো আরো দীর্ঘাঙ্গী।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

এক ব্যক্তির সব সময় বদহজম হতো, মানসিক অস্থিরতা এবং বুকে ব্যথা অনুভব করতেন। এ ব্যক্তির পারিবারিক দর্জি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। লোকটি এর পর একজন অভিজ্ঞ দর্জির কাছে জামা তৈরীর জন্যে যায়। জামার কলার দেয়ার ফরমায়েশ শুনে দর্জি বলে, সাহেব, এরকম সংকীর্ণ কলারের জামা পরিধান করে আপনি তো মস্তিষ্ক এবং পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবেন। লোকটির সাথে সাথে বোধোদয় হলো এবং তিনি জামার সংকীর্ণ কলার ব্যবহার করা ছেড়ে দেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেছেন, মোমেনের সকল সৌন্দর্যের মধ্যে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হচ্ছে পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অল্পে তুষ্টি।

রসূল (স.) অপরিচ্ছন্ন ময়লা পোশাক খুবই অপছন্দ করতেন। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (স.), মাদারেজুন নবুওত)

মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা পোশাকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ পোশাকের পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক মানুষের সমগ্র জীবনের সাথেই রয়েছে। অপরিষ্কার পোশাক ব্যবহার করা হলে শিশুদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তারাও অপরিষ্কার পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠবে। তাছাড়া সামাজিকভাবেও অপরিষ্কার পোশাক নিন্দনীয়। অপরিষ্কার ময়লা পোশাক পরিধান করে কারো কাছে সম্মান পাওয়া যায় না। মানুষ এরকম লোককে ঘৃণা করে, অবজ্ঞার চোখে দেখে। এ ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি উভয়কে, অর্থাৎ যে ঘৃণা করলো এবং যাকে ঘৃণা করলো, উভয়কে মানসিক রোগী করে তুলতে পারে।

অপরিষ্কার পোশাক রোগজীবাণু ছড়ায় এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। জীবাণুর মাধ্যমে নানারকম রোগের সংক্রমণ ঘটে। ফলে সমগ্র সমাজে রোগব্যাধির বিস্তার ঘটার আশঙ্কা থাকে।

ইসলাম সমগ্র ইউরোপকে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিয়েছে। অথচ ইউরোপের ইতিহাসে এটা স্পষ্ট, তারা মাসের পর মাস গোসল করে না। কারণ ওসব দেশের অধিকাংশ এলাকা থাকে বরফাচ্ছাদিত। এ কারণে তারা গোসল করার চেয়ে দেহের

www.nagorikpathagar.org

বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শরীর পরিচ্ছন্ন এবং সুরভিত করার জন্যে তারা শুধুমাত্র বডি স্প্রে ব্যবহার করে। দেহের বাইরের অংশ পরিচ্ছন্ন রাখার এ শিক্ষা বিশ্বের মানুষকে ইসলামই দিয়েছে।

প্রখ্যাত সার্জন উইলিয়াম ক্যামফোরডাক জর্জ আলেকজান্ডারের চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বলেন, ইউরোপীয়রা পোশাকের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ছিলো অমনোযোগী। নখ কাটার মতো পোশাক পরিচ্ছন্ন করতেও তারা বিরক্তি বোধ করতো। তারপর তুর্কীরা ইউরোপীয়দের পোশাক পরিচ্ছন্ন করতে শিক্ষা দিয়েছিল। আর এ কথা কে না জানে যে, তুর্কীরা ছিলো মুসলমান।

লাঠির সুন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.)-এর হাতে লাঠি থাকতো। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

তাহের সাহেব নামের এক ব্যক্তি বলেন, আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলাম। একদিন এক লোককে দেখলাম মাথায় পাগড়ি হাতে লাঠি নিয়ে বীরদর্পে হেঁটে যাচ্ছেন। তার পরিধানে বিলকুল সুন্নতী লেবাস। আমি আমার মেজবানকে জিজ্ঞেস করলাম এ লোকটি কে? মেজবান জানালেন, উনি একজন আণবিক বিজ্ঞানী। এটমিক সেন্টারে ডিউটিতে যাচ্ছেন। আমি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। লোকটিকে বললাম, আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে সবাই ইহুদী, খৃস্টান। তাদের পোশাক আপনার পোশাক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সেখানে আপনি কিভাবে তাদের সংগে অবস্থান করেন? বিজ্ঞানী ভদ্রলোক গর্বিত ভংগিতে বললেন, ইহুদীদের ইহুদী ধর্ম বিশ্বাসের গর্ব রয়েছে, তারা তাদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করে গর্ববোধ করে। আমি মোহাম্মদী ধর্ম এবং মোহাম্মদী পোশাক পরিধান করে গর্বিত। জিজ্ঞেস করলাম আপনার হাতে লাঠি কেন? তিনি বললেন, লাঠি ডান হাতে থাকে। যে হাতে লাঠি থাকে সে হাত হয় মযবুত এবং শক্তিশালী। সে হাতে শক্তি বৃদ্ধি পায়। জীবনের নানাকাজে ডান হাতের প্রয়োজন এবং ব্যবহার বেশী, কাজেই ডান হাতের শক্তি লাঠির ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া লাঠি দেহের ভারসাম্য রক্ষা করায় শক্তি এবং সাহায্য যোগায়। লাঠি ধরে থাকার কারণে যেহেতু ডান হাতের পাকড়াও মযবুত হয়, এ কারণে এর প্রভাব ফিজিওলজি অনুযায়ী হৃৎপিন্ড এবং হৃৎপিন্ডের কোষের ওপর পড়ে। এতে হৃৎপিন্ড শক্তিশালী হয় এবং ভীরুতা দূর হয়। তাছাড়া লাঠির সাহায্যে ক্ষতিকর জীব জন্তুর আশংকা দূর হয়ে যায়।

লিপন গার্লিফানের তথ্য

স্যার লিপন গার্লিফান 'দি চিফস অব পাঞ্জাব' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে গ্রন্থে তিনি লেখেছেন, লাঠি হচ্ছে দেহের সহায়ক এবং সংগী। দেহের অংগ প্রত্যংগের ওপর লাঠির অসামান্য প্রভাব রয়েছে। যার হাতে সব সময় লাঠি থাকবে তার লাঠির প্রভাব দেহ এবং আত্মার ওপর পড়বে। হাতে লাঠি থাকা ব্যক্তি ভীরু কাপুরুষ হবে না। পাঞ্জাবের আমীর ওমারাহ এবং রাজপুরুষদের আমি দেখেছি, তারা হাতে লাঠি বা হান্টার রাখতেন। যাদের হাতে লাঠি বা হান্টার দেখেছি তারা সবাই ছিলেন সাহসী এবং দূরদর্শী।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতপক্ষে লাঠি সকল নবীর সুন্নত। এ সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির কাহিনী বিখ্যাত।

কখনো কখনো খালি পায়ে চলার আদেশ

হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) কখনো কখনো খালি পায়ে চলার আদেশ দিয়েছেন। (মামুলাতে নববী)

জুতো যেহেতু পা জড়িয়ে রাখে, এর ফলে পায়ে নানারকম রোগ হতে পারে। এক প্রকার জীবাণু পায়ে প্রবেশের সুযোগ পায়। যদি খালি পায়ে মাটিতে কিছুক্ষণ হাঁটা হয় তবে পায়ে আলো বাতাস লাগতে পারবে এবং পায়ে প্রবেশ করা ভাইরাস ধ্বংস করে দেবে। পায়ে লাগা মাটি এন্টিসেপটিক-এর কাজ করবে। জুতো যদি রবার এবং প্লাস্টিকের হয় তবে এ হাদীসের ওপর আমল খুবই উপকারী হবে। কারণ রবার এবং প্লাস্টিকের জুতো পা গরম করে দেয়। কাজেই খালি পায়ে মাটির ওপর হাঁটাচলা করা জরুরী।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে, প্রতিদিন সকালে খালি পায়ে মাটি এবং ঘাসের ওপর চলাচল করা আবশ্যক। এতে মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মস্তিষ্কের শুষ্কতা এবং অংগ প্রত্যংগে সজীবতা ও সবলতা সৃষ্টি হবে।

মহিলাদের সূক্ষ্ম পোশাকের ক্ষতি

রসূল (স.) বলেছেন, সেসব মহিলা জাহান্নামী যারা পোশাক পরিধান করেও উলংগ থাকে। এরা অন্যদেরও ওরকম পোশাক পরিধান করতে প্ররোচিত করে। এদের মাথা এক রকমের অহংকারে বুখতি উটের মতো বাঁকা হয়ে থাকে। এ সকল মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুবাস অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। (রিয়াদুস সালেহীন)

রসূল (স.)-এর কাছে একবার মিসরে তৈরী করা কিছু সূক্ষ্ম মখমল কাপড় এসেছিলো। তিনি সে মখমল কাপড় থেকে হযরত দেহইয়া কালবীকে দিয়ে বললেন, এটি দিয়ে তুমি জামা তৈরী করবে, আর এক অংশ দিয়ে বললেন, এটি দিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলবে সে যেন ওড়না তৈরী করে। তবে ওড়নার নীচে অন্য পোশাক পরিধান করতে বলবে, যাতে ভেতরের সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়ে পড়ে। (আবু দাউদ)

মহিলাদের সূক্ষ্ম পোশাক দ্বারা যেখানে লজ্জা শরম এবং পর্দার বিধান লংঘিত হয়, সেখানে এ পোশাকের অন্যান্য ক্ষতিও প্রকাশমান।

ডাক্তার লেড বিটারের সতর্কতা

এ ডাক্তার ছিলেন আত্মিক বিষয়ের বিশিষ্ট গবেষক। লেড বিটারের মন্তব্য অনুযায়ী যে পোশাক পরিধানের পর মহিলাদের দেহের গোপনীয়তা প্রকাশ পায়, সে পোশাক থেকে নোংরা এবং দুর্গন্ধ প্রকাশ পেতে আমি দেখেছি। (তাছাউরাতে ইসলাম)

আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির ক্ষতি

সূর্যের মধ্যে বিদ্যমান আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রচন্ড গরমে ত্বক এবং দেহের ক্ষতি করে। পোশাক যদি মোটা হয় তবে এ রশ্মি শরীরে লাগতে পারে না। যদি পোশাক সূক্ষ্ম হয় তবে এ সকল রশ্মি খুব শীঘ্র ত্বকের ক্ষতি করে। (মিছাক)

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে সাজসজ্জার অধিকার

হযরত আবুল আহওয়াসের পিতা বলেছেন, একবার আমি রসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমার দেহে ছিলো নিম্নমানের সস্তা পোশাক। রসূল (স.) বললেন, তোমার কি অর্থ সম্পদ আছে? আমি বললাম, হাঁ আছে। তিনি বললেন, কি রকমের অর্থ সম্পদ রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল প্রকার অর্থ সম্পদ দিয়েছেন। যেমন উট, গাভী, বকরি, ঘোড়া, ক্রীতদাস। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা কাউকে নেয়ামত তার মাঝে সেটার নিদর্শন প্রকাশিত থাকা উচিত।

এক পাটি জুতো পরিধান করবে না

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, এক পাটি জুতো পায়ে দিয়ে কেউ যেন পথ না চলে। হয় তো দুই পায়ে জুতো পরিধান করবে অথবা খালি পায়ে থাকবে।

এক পায়ে জুতো পরিধান করা এবং অন্য পা খালি থাকা মানবীয় চরিত্র এবং মর্যাদার পরিপন্থী।

ইসলাম মুসলমানদের মর্যাদা ও আত্মসচেতনতা শিক্ষা দেয়। যেসব মানুষ সমাজে এক পাটি জুতো পায়ে চলাচল করে কেউ তাদের ভালো চোখে দেখে না।

এক পায়ে জুতো এবং অন্য পা খালি থাকলে দুই পায়ের ভারসাম্য বজায় থাকে না। মানুষ বেঢপভাবে চলাচল করে। এতে মানসিকভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

মানব দেহ একটি নীতির অধীনে চলে। মস্তিষ্ক হচ্ছে দেহের কেন্দ্রস্থল। এক পায়ে জুতো থাকা অন্য পা খালি থাকা বিসদৃশ এবং বেমানান। ডাক্তার নিকসন বহু বছরের গবেষণায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মাঝে মাঝে খালি পায়ে থাকা এবং খালি পায়ে হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। এক পায়ে জুতো থাকা অন্য পা খালি থাকা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। এরকমের লোক পায়ের এক রকমের ব্যথায় আক্রান্ত হয় এবং একপর্যায়ে তারা খোঁড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। (কিউর মেডিকেল)

অন্যের কাপড় দ্বারা হাত না মোছা

অন্যের কাপড় দ্বারা হাত মুছবে না। (মোসনাদে আহমদ)

অন্যের কাপড় দ্বারা হাত মোছা হলে তা থেকে ছোঁয়াচে রোগের জীবাণু দেহে স্থানান্তরিত হতে পারে। বিশেষত নিম্নোক্ত রোগে আক্রান্তদের ব্যবহার করা কাপড় দ্বারা হাত মোছা যাবে না।

ব্যাকটেরিয়া বা রোগ জীবাণু বিস্তার করে এ রকম ছোঁয়াচে রোগের রোগীদের কাপড় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা যাদের হয়েছে তাদের ব্যবহৃত কাপড় দ্বারা হাত মোছা যাবে না।

কারো সাথে দেখা করার আদব

রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা যখন কারো সংগে দেখা করতে যাবে তখন নিজের পোশাক, জুতো ইত্যাদি ঠিক করে নেবে। (মোসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে মানুষের মর্যাদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অপরিষ্কার পোশাক ধোয়ার জন্যে রসূল (স.) গুরুত্বের সাথে আদেশ দিয়েছেন। কারণ পোশাক পরিচ্ছদ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে তবে মানুষের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা করে। মানুষের ঘৃণার কারণে একপ্রকার মানসিক রোগ জন্ম নেয়। এ রোগের কারণে মানুষ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সামাজিক জীবনে এ ধরনের বহু উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। এরকম মানুষ হতাশা এবং অবসাদে আক্রান্ত হয়।

বসে জুতো পরিধান করা

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, বসে জুতো পরিধান করবে, কখনো দাঁড়িয়ে জুতো পরিধান করবে না। (আবু দাউদ)

এ হাদীসের সতর্কতা লক্ষণীয়। কারণ দাঁড়ানো অবস্থায় জুতো পরিধান করা হলে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে না। জুতো পরিধানের সময় এক পায়ে চাপ বেশী পড়ে অন্য পায়ে চাপ পড়ে না। কাজেই দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে বসে জুতো পরিধান করা জরুরী।

অনেক সময় জুতোর ভেতর কোনো বিষাক্ত প্রাণী লুকিয়ে থাকে। পাথরের টুকরো, ইটের কণা ইত্যাদি থাকতে পারে। এ কারণে হঠাৎ করে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতোর ভেতর পা ঢোকানো হলে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু বসে জুতো পরিধান করা হলে জুতো হাতে নেয়ার পর জুতোর ভেতর ক্ষতিকর কিছু থাকলে তা দেখা যাবে।

জুতো এবং রোগ

আমার কাছে রক্তে সুগারের অথবা হেমোফেলিয়ার যতো রোগী আসে, অথবা চর্মরোগের যতো রোগী আসে, তাদের আমি পরামর্শ দেই তারা যেন ঘরের ভেতরে বাইরে জুতো পরিধান করে থাকে। কারণ ধুলোবালিতে অনেক রোগজীবাণু থাকে। সেসব জীবাণুর কোনোটি যদি ক্ষতস্থানে চলে যায় তবে সেপটিক হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। খালি পায়ে পথ চললে কোথাও যদি আঁচড় লাগে অথবা পায়ে কাঁটা বিঁধে, তবে এটা রক্তে সুগার আছে এমন রোগী বা হেমোফেলিয়া রোগীর জন্যে ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়।

মোটকথা জুতো পায়ের হেফাযতের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। (হিউমেন এন্ড হেলথ)

বর্তমান যুগে চারদিকে ব্যাপকহারে কেমিকেলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় মাটিও কেমিকেলযুক্ত হয়ে পড়ে। এসব কেমিকেলের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের পায়ের নিরাপত্তা দেয়া প্রয়োজন। সব সময় জুতো ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা পায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। পা যেন কেমিকেল শোষণ করতে না পারে। (আর্থ কেমিকেল)

www.nagorikpathagar.org

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

প্রাকৃতিক প্রয়োজন অর্থাৎ প্রস্রাব পায়খানা মানুষের একটি স্বাভাবিক কাজ। রসূল (স.) মানুষের প্রতিটি কাজে আদর্শ রেখে গেছেন। বর্তমান যুগের মানুষ আস্তে আস্তে আবারও রসূল (স.)-এর আদর্শের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছে। রসূল (স.) যেভাবে জীবন যাপন করেছেন এবং যেভাবে জীবন যাপন করার আদেশ দিয়েছেন, দুনিয়ার মানুষ তার মধ্যে নিজেদের শান্তি ও মুক্তি সন্ধান করছে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে দূরে যাওয়া

হাদীস গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায়, রসূল (স.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে ঘর থেকে অনেক দূরে যেতেন। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম স.)

বর্তমান কালের বিজ্ঞান অধিক পথ হাঁটাচলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমেরিকার বড়ো বড়ো হাসপাতালের চিকিৎসকরা এ প্রশ্ন তুলেছেন যে, প্রথমে কি পা সৃষ্টি হয়েছে নাকি চাকা সৃষ্টি হয়েছে? এটা স্পষ্ট যে, পা আগে সৃষ্টি হয়েছে। বায়োক্যামেস্ট্রির একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যখন থেকে শহর সৃষ্টি হয়েছে, জনবসতির প্রসার ঘটেছে, ক্ষেতখামার কমে গেছে, তখন থেকেই রোগের বিস্তার ঘটেছে। যখন থেকে বসবাসের জায়গা থেকে দূরে গিয়ে প্রস্রাব পায়খানা করার রেওয়াজ বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে গ্যাস, হৃদরোগ লিভারের অসুখ বেড়ে গেছে।

হাঁটার ফলে ইনটেসটাইন মুভমেন্ট, অর্থাৎ অন্ত্রের তৎপরতা বেড়ে যায়। এর ফলে দৈহিক সুস্থতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু বর্তমানকালের মানুষের দেহে নানা রোগ বাসা বাঁধার কারণে বায়তুল খালা অর্থাৎ লেট্রিনে বেশী সময় কাটাতে হয়।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে কাঁচা জমি নির্ধারণ

রসূল (স.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে কাঁচা বা নরম মাটি নির্ধারণ করতেন। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (স.)

বিখ্যাত লেখক লভাল পল 'উসূলে সিহ্হাত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, মানুষ মাটির মাধ্যমে টিকে থাকে, মাটিতেই তার অস্তিত্ব বিলীন হয়। যখন থেকে মাটিতে পায়খানা করা ত্যাগ করে মানুষ কমোড ব্যবহার শুরু করেছে, তখন থেকে পুরুষদের যৌন দুর্বলতা, পিত্ত পাথরী ইত্যাদি রোগ দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব পড়ে প্রোস্টেট গ্লান্ডের ওপর।

মানুষের দেহ থেকে যখন ময়লা বর্জ্য বের হয় তখন সে বর্জ্যের তেজস্ক্রিয়তা এবং জীবাণু মাটি শুষে নেয়, কিন্তু কোনো শক্ত জিনিস তা শুষে নিতে পারে না। ফলে সে

www.nagorikpathagar.org

তেজস্ক্রিয়তা এবং জীবাণুর প্রভাব দেহের ওপর সরাসরি পড়ে। মানব দেহ এতে রোগাক্রান্ত হয়ে যায়।

কিভাবে বসতে হয়

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে কিভাবে বসতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে। (মামুলাতে নববী, রাহবারে জিন্দেগী ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম স.)

রসূল (স.)-এর নির্দেশিত নিয়মে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বসা হলে নিম্নোক্ত উপকার পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে কিভাবে বসতে হবে এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে আমি ফিজিওলজির একজন অধ্যাপকের সংগে কথা বললে তিনি জানান, আমি মরক্কোয় অবস্থানের সময় জ্বরের ওষুধের জন্যে এক ইহুদী ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন খুবই বৃদ্ধ। তার কাছে খুবই কম রোগী আসতো। আমার নাম দেখে তিনি বললেন, তুমি মুসলমান? আমি বললাম হাঁ, পাকিস্তানী মুসলমান। তিনি বললেন, তোমাদের দেশের লোকেরা যদি তোমাদের নবীর একটি সুন্নতের ওপর আমল করে তাহলে কয়েকটি রোগ থেকে রক্ষা পাবে। আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কোন সুন্নত? তিনি বললেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে যদি রসূল (স.)-এর সুন্নত অনুযায়ী বসা হয় তবে এপেন্ডিসাইটিস, পাইলস এবং লিভারের অসুখ হবে না। যদি মুসলমানরা এ সুন্নত পালন করে তবে উল্লিখিত অসুখ থেকে রক্ষা পাবে।

পাকিস্তানী সেই অধ্যাপক বলেন, রসূল (স.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে কিভাবে বসতেন সে বিষয়টি জানার আমার আগ্রহ ছিলো। একজন আলেমে দ্বীনের কাছে আমি বিষয়টি জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম। প্রথম প্রথম সে তরীকা আমল করতে কষ্ট হলেও পরে আমি বুঝতে পারলাম। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত আমি রসূল (স.)-এর সে তরীকা অনুযায়ী আমল করছি।

আধুনিক বিজ্ঞান রসূল (স.)-এর উল্লিখিত সুন্নত সম্পর্কে গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, সুস্থতার জন্যে রসূল (স.)-এর এ তরীকার চেয়ে উত্তম তরীকা আর কিছু হতে পারে না।

এ তরীকা অনুসরণ করা হলে লিভারের রোগ, বদহজম, গ্যাস রোগ ইত্যাদি হয় না।

এস্তেঞ্জার জন্যে ঢিলাকুলুখের ব্যবহার

রসূল (স.) বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করতেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী মাটিতে এমোনিয়াম ক্লোরাইড এবং উঁচু শ্রেণীর জীবাণুরোধক বিদ্যমান রয়েছে। পায়খানা প্রস্রাব যেহেতু পুরোটাই বর্জ্য এবং জীবাণুতে পূর্ণ, এ কারণে এর কিছু অংশ দেহের কোনো অংশে লেগে থাকলে তা নানারকম রোগের আশংকা তৈরী করে।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার হালুক লিখেছেন, ঢিলা ব্যবহার করার বিষয় বৈজ্ঞানিক এবং গবেষকদের বিস্মিত করেছে। কারণ মাটির পুরো অংশই জীবাণুনাশক। ঢিলা ব্যবহার করা হলে দেহের গোপন অংশের সকল জীবাণু মারা যায়। এমনকি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ঢিলার ব্যবহার লজ্জাস্থানের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। যেসব রোগীর লজ্জাস্থানে জখম হয়েছে কিংবা আঁচড় লেগেছে, তাদের আমি মাটি ব্যবহার করিয়েছি। এতে দেখা গেছে তারা খুবই কম সময়ে আরোগ্য লাভ করেছে।

মোটকথা, মাটি থেকে সৃষ্ট মানুষ মাটির দ্বারাই সবচেয়ে সহজে সুস্থতা অর্জন করতে পারে। দুনিয়ার অন্য সকল ফর্মূলা মাটি ব্যবহারের কাছে তুচ্ছ।

টয়লেট পেপার এবং আধুনিক বিজ্ঞান

টয়লেট পেপার প্রস্তুতকারক একটি কারখানার একজন কর্মচারীর সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ নরম নাজুক কাগজ অর্থাৎ টয়লেট পেপার প্রস্তুতে কোনো ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় কিনা। প্রশ্নের জবাবে সে যে কথা বলেছিলো তা আমি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

কর্মচারী বললো, টয়লেট পেপার তৈরীতে অনেক কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো কেমিক্যাল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এর দ্বারা স্কিন ডিজিজ, একজিমা হতে পারে এবং চামড়ার রং-এ পরিবর্তন আসতে পারে।

বর্তমানে সমগ্র ইউরোপে টয়লেট পেপার ব্যবহার হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে এক খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, বর্তমানে ইউরোপে লজ্জাস্থানের রোগ বিশেষত ক্যান্সার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করছে। এ ক্যান্সার রোধ করার উপায় নির্ধারণের উদ্দেশে একটি গবেষণা বোর্ড এক বৈঠকে বসেছিলো। তারা মতামত পেশ করেছে, এ সব ক্যান্সার হওয়ার কারণ দুটি। প্রথমত টয়লেট পেপার ব্যবহার, দ্বিতীয় পানি ব্যবহার না করা।

সুতরাং ইউরোপ আমাদের টয়লেট পেপার দিয়ে উপকার করেছে নাকি ক্ষতি করেছে সে বিচারের দায়িত্ব আপনাদের।

ইউরোপীয়রা শুধুমাত্র টয়লেট পেপার ব্যবহার করে, পানি ব্যবহার করে না। যদি টয়লেট পেপার ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করা হয় তবে তেমন ক্ষতি হয় না।

এস্তেঞ্জার পর লেদা, হাড় ব্যবহার

লেদা, গোবর, হাড় দ্বারা তোমরা এস্তেঞ্জা করবে না। (যাদুল মায়াদ)

লেদার মধ্যে অসংখ্য জীবাণু থাকে। কারণ লেদ হচ্ছে বর্জ্য। তাই এস্তেঞ্জার পর লেদ ব্যবহার করা হলে জীবাণু দেহে সংক্রমিত হতে পারে।

পরিত্যক্ত হাড় বিভিন্ন জীবজন্তু চেটেপুটে খায়। জীব-জন্তুর লালাতে জীবাণু থাকায় সে জীবাণু হাড়ে লেগে যায়। তাছাড়া হাড়ের সাথে নানারকম ধুলোবালি লেগে থাকে। এস্তেঞ্জার পর যদি এ হাড় ব্যবহার করা হয় তাহলে হাড়ের সাথে লেগে থাকা জীবাণু দেহে স্থানান্তরিত হয়। হাড়ের টুকরো সাধারণত ধারালো হয়ে থাকে, কাজেই হাড় ব্যবহার করলে দেহ জখম হওয়ারও আশংকা দেখা দেয়।

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ

রসূল (স.) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম স.)

ইসলাম মুসলমানদের বসে প্রস্রাব করার আদেশ দিয়েছে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হলে বাইরের এবং ভেতরের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির আশংকা থাকে। প্রস্রাব জীবাণুতে পরিপূর্ণ থাকে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হলে প্রস্রাবের ছিটা দেহে এবং পোশাকে লেগে যায়। এছাড়া দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হলে প্রোস্টেট গ্রন্থির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, এতে একপর্যায়ে প্রস্রাব আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া প্রস্রাব কমে যেতে পারে। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হতে পারে।

গোসলখানায় প্রস্রাব করা নিষেধ

রসূল (স.) গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করে বলেছেন, গোসলখানায় প্রস্রাব করা হলে মনে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। 'সায়েন্স এন্ড হেলথ' নামের একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় আমি পড়েছি, গোসলখানায় প্রস্রাব করা হলে আত্মরতি বা হস্তমৈথুনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজ রসাতলে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

এছাড়া গোসলখানায় প্রস্রাব করা হলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ারও ঝুঁকি দেখা দেয়। গোসলখানায় প্রস্রাব করা হলে পিত্তপাথরী রোগ হতে পারে।

কাঁচা মাটি এবং ফ্লাশের পার্থক্য

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে রসূল (স.) সব সময় নরম মাটি তালাশ করতেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

নরম মাটি সবকিছু শুষে নেয়। যেহেতু প্রস্রাব পায়খানা জীবাণুযুক্ত বর্জ্য। এ কারণে প্রস্রাব পায়খানার জন্যে এমন মাটি দরকার যে মাটি প্রস্রাব পায়খানা শুষে নেবে। প্রস্রাবের ছিটা দেহের কোনো অংশে বা কাপড়ে লাগতে পারবে না।

ফ্লাশে এ ব্যবস্থা হতে পারে না। সেখানে প্রস্রাবের ছিটেফোঁটা দেহে এবং পোশাকে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া বর্জ্য শুষে নেয়ার ক্ষমতাও ফ্লাশের থাকে না। অথচ বর্জ্য থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা বের হয়, স্বাস্থ্যের জন্যে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এস্তেঞ্জার পর পানি ব্যবহার এবং হার্লে স্ট্রীট

আমার এক বন্ধু বলেন, তার এক নিকটাত্মীয় ইংল্যান্ডে থাকতো। সে তার বাসায় বেড়াতে এসে কয়েকদিন অবস্থান করে। তার ছোটো মেয়ে তার মাকে বললো, আম্মু আংকেল রং বেরঙের পায়খানা করে। শিশুটি বার বার একই কথা বলার পর টয়লেটে গিয়ে দেখা গেলো, ভদ্রলোক পায়খানার পর পানি ব্যবহার করে না বরং নানা রঙয়ের টয়লেট পেপার ব্যবহার করে।

প্রস্রাব পায়খানার পর যারা পানি ব্যবহার করে না তাদের দেহের বর্জ্য দেহে চুলে লেগে যায়, ফলে তারা নানারকমের রোগে আক্রান্ত হয়।

লন্ডনের হার্লে স্ট্রীটের ডাক্তার কেনান ডিউস ইউরোপীয়দের বলেছেন, তোমরা যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের পর পানি ব্যবহার না করেই জীবন যাপন করতে

www.nagorikpathagar.org

থাকো, তবে অচিরেই লজ্জাস্থানের ক্যান্সার, স্কিন ইনফেকশন এবং ভাইরাল ডিজিজে আক্রান্ত হবে।

পানি সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে আল্লাহর এক অসাধারণ নেয়ামত। সকল প্রকার অপিবত্রতা থেকে পানি ব্যবহার করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। ইসলাম স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এতোটা সুস্পষ্ট এবং খোলাখুলি বর্ণনা করেছে যে, এর মধ্যে আমাদের জীবনের সকল স্তরের, সকল অবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাচ্যের বিশিষ্ট গবেষক জ্যানেট মিলান বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। অন্যান্য সকল ধর্ম ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার আদর্শ গ্রহণ করেছে। দেহের কোনো অংশের অপবিত্রতা যদি পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা দূর করার চেষ্টা করা হয়, তবে সে অংশ কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। (সায়েন্স ও ছেহাত)

পানি ব্যবহারের ফলে দেহের সে অংশের উত্তাপ স্বাভাবিক হয়ে যায়। পানি ব্যবহার না করা হলে দেহের অংগ প্রত্যংগের স্বাভাবিক উত্তাপ হয় না, এতে মানুষ নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

প্রস্রাবে সতর্কতা

হাদীসে প্রস্রাবে অসতর্কতার মন্দ পরিণামের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। (রাহবারে জিন্দেগী)

রসূল (স.) বলেছেন, প্রস্রাবে সতর্ক হও, কারণ প্রস্রাবে অসতর্কতার কারণেই অধিকাংশ কবরে আযাব হয়ে থাকে। (রাহবারে জিন্দেগী)

জ্যানেট মিলান লিখেছেন, আমার কাছে উরুসন্ধির যতো রোগী আসে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি তারা কিভাবে প্রস্রাব করে। তাদের অধিকাংশের কথা থেকেই বোঝা যায়, তারা প্রস্রাবে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তারপর এমন রোগ নিয়ে আমার কাছে আসে যে রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। (সায়েন্স ও ছেহাত)

জিন্সের প্যান্টের বোতাম খুলে প্রস্রাব করার পর পরিষ্কার না করে যারা পুনরায় প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে নেয়, প্রস্রাবের কিছু অংশ তাদের দেহে এবং পোশাকে লেগে থাকে। এর ফলে নানা রকম চর্ম রোগ দেখা দেয়।

ইসলাম কতো সুন্দর এবং পবিত্র ধর্ম। এ ধর্ম তার অনুসারীদের নানা রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করে। ইউরোপের জনগণের অনেকেই বর্তমানে প্রস্রাব পায়খানার পর পানি ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে।

যেসব জায়গায় প্রস্রাব পায়খানা করা নিষিদ্ধ

কিছু কিছু জায়গায় প্রস্রাব পায়খানা করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। পুকুর, কুয়া, বিলে যদি প্রস্রাব পায়খানা করা হয় তবে সমগ্র পানিতে রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। কোনো প্রাণী সে পানি পান করলে টাইফয়েড, ভাইরাল জন্ডিস, প্যারাসাইটিস ইত্যাদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (স.)-এর হাদীসে প্রবাহমান পানিতে প্রস্রাব পায়খানা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সে পানিও মানুষ ও পশুপাখি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। সে পানি যদি দূষিত হয়ে যায় তবে নানারকম রোগ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকে। ভারত সরকার গংগায় দূষিত পানি নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে। যারা গঙ্গায় স্নান করতে যায় তাদেরও সে পানিতে প্রস্রাব পায়খানা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ছায়াদানকারী ফলদানকারী বৃক্ষ এবং পায়ে চলা পথে প্রস্রাব পায়খানা নিষিদ্ধ

যেসব গাছ ছায়া দেয় তার নীচে বসে মানুষ বিশ্রাম করে। এরকম গাছের নীচে মল ত্যাগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যেসব গাছে ফল ধরে তার নীচে মল ত্যাগ করাও নিন্দনীয়। কারণ গাছের ফল যদি নোংরা জিনিসের ওপর পড়ে তবে তা মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। পায়ে চলার পথে মানুষ হাঁটাচলা করে। যদি সে পথের ওপর কেউ মলত্যাগ করে তবে পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

যেদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয়

যেদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় কেউ যদি সেদিকে ফিরে প্রস্রাব করে তবে বাতাসের ঝাপটায় প্রস্রাব উড়ে এসে তার নিজের চেহারায় এবং দেহের অন্যান্য অংশে পড়বে। এতে দেহ এবং পোশাক নোংরা হবে। পরিণামে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেবে। কাজেই প্রস্রাবের জন্যে এরকম জায়গা নির্ধারণ করতে হবে যেদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয় না।

কোনো গর্তে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ

রসূল (স.) কোনো গর্তে বা ছিদ্রে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

কোনো গর্তে প্রস্রাব করলে গর্ত থেকে বিষাক্ত কোনো প্রাণী বের হয়ে প্রস্রাবকারীকে দংশন করতে পারে।

যে মাটিতে নাইট্রোজেন রয়েছে সেখানে প্রস্রাব করা হলে যেহেতু প্রস্রাবও একটি এসিড, এ কারণে নাইট্রোজেন এবং এসিড মিলিত হয়ে যে উত্তাপ সৃষ্টি হবে তাতে দেহের ক্ষতি হতে পারে।

নামাযের আগে এস্তেঞ্জা

নামাযের আগে প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রথমে পায়খানা প্রস্রাব সেরে নিয়ে তারপর নামায আদায় করবে। (মামুলাতে নববী)

এরকম নির্দেশ দেয়ার কারণ হচ্ছে, কখনো প্রস্রাব পায়খানা যেন চেপে রাখা না হয়। কেননা প্রস্রাব পায়খানা চেপে রাখলে নানা রকমের রোগ হতে পারে। এতে মস্তিষ্ক, পিত্ত, পাকস্থলী এবং স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রস্রাব পায়খানা চেপে রাখার পরিণামে অনেক সময় বমি এবং মাথা ঘোরার ব্যাধিও দেখা দিতে পারে।

মাটিতে হাত পরিষ্কার করা

মলত্যাগের পর রসূল (স.) মাটিতে ঘষে পানি দিয়ে হাত পরিষ্কার করতেন। (রাহবারে জিন্দেগী)

www.nagorikpathagar.org

মলত্যাগের পর হাত দিয়ে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করার কারণে হাতে জীবাণু লেগে থাকে। অনেক জীবাণু এমন রয়েছে যেগুলো শুধু পানি ব্যবহারে ধ্বংস হয় না, এ কারণে হাত মাটি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে, মাটি খুবই উন্নতমানের জীবাণুনাশক। মাটি ব্যবহারের ফলে সাধারণ জীবাণু সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়।

ডব্লিউ সি এবং কমোডের পার্থক্য

ইউরোপিয়ান ডব্লিউ সি যার ওপর চেয়ারের মতো বসে মলত্যাগ করা হয়। এ নিয়মে মলত্যাগ করা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এ নিয়মে মলত্যাগ করা হলে শরীর টান টান হয়ে থাকে। অস্বস্তিকর উপায়ে উপবেশন করা হয়। এতে বৃহদান্তে মল আটকে থাকে।

মলত্যাগের পরও অনেকের ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ঝরে। যেহেতু এভাবে বসা হলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ওপর চাপ সৃষ্টি হয় না, এ কারণে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের নানা রোগ দেখা দেয়ার আশংকা থেকে যায়। তাছাড়া এভাবে বসে মল ত্যাগ করা শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী।

পক্ষান্তরে কমোড স্বাভাবিক নিয়মের কিছুটা কাছাকাছি, এ কারণে কমোডে বসে মলত্যাগ করা কম ক্ষতিকর। তবে কাঁচা মাটি এবং নরম মাটিতে মলত্যাগের যে উপকার পাওয়া যায় কমোডে বসে তা কখনোই পাওয়া যায় না। যেহেতু নরম মাটি সর্বত্র পাওয়া যায় না, এ কারণে কমোড ব্যবহার অপেক্ষাকৃত উত্তম।

পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে বাম হাতের ব্যবহার

পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে বাম হাত ব্যবহার করো। (যাদুল মায়াদ)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডান হাত থেকে পজেটিভ রশ্মি এবং বাম হাত থেকে নেগেটিভ রশ্মি বের হয়। যদি এস্তেঞ্জার জন্যে ডান হাত ব্যবহার করা হয় তবে দেহের রশ্মি ব্যবস্থা উল্টে যাবে এবং এর প্রভাব মস্তিষ্ক এবং স্পিনাল কর্ডের ওপর পড়বে।

তাছাড়া খাবার মুখে তোলার জন্যে যেহেতু ডান হাত ব্যবহার করা হয়, এ কারণে এস্তেঞ্জার জন্যে ডান হাত ব্যবহার করা হলে জীবাণু খাদ্য এবং পানীয়ের সাথে মিশে ক্ষতির কারণ হওয়ার আশংকা থাকে।

কেবলামুখী হয়ে না বসা

কেবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে বসে মলত্যাগ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। (মামুলাতে নববী)

ডাক্তার ডারউইন, ডাক্তার লেড, ডাক্তার বেটার, ডাক্তার আলেকজান্ডারের কসমিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, কসমিক ওয়ার্ল্ড সিস্টেম মানুষের জীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কাবা ঘরের চারপাশে বিদ্যমান পজেটিভ রে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রস্রাব, পায়খানা এবং থুথু হচ্ছে নেগেটিভ রে-এর অংশ। কাজেই কাবার দিকে মুখ করে যদি প্রস্রাব পায়খানা করা হয় বা থুথু নিক্ষেপ করা হয়, তবে মানুষের জন্যে ক্রমাগত ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট ডাক্তার কামিন বিম উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মুসলমানদের কাবা থেকে ক্রমাগত পজেটিভ রশ্মি বের হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। আর এটা তো সবারই জানা, নেগেটিভ রশ্মির বিস্তার দেহের জন্যে অবশ্যই ক্ষতিকর।

ইসলামের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা এবং ইউরোপীয় সমাজ

প্রতিটি ধর্মই যদিও পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, কিন্তু এ বিষয়ে ইসলামের বিস্তারিত দিকনির্দেশনা সত্যিই অফুরন্ত কল্যাণকর। ইসলাম এ বিষয়ে এমন নীতিমালা দিয়েছে যে, অন্য কোনো ধর্মে এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীরা ছোটোখাটো বিষয়েও এরকম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, তা পাঠ করে অবাক হতে হয়। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামী নিয়ম কানুনের তাৎপর্য উপলব্ধি না করে অনেকে কুলুখ এবং এস্তেঞ্জার মাসআলা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এ সব নিয়ম কানুনের গুরুত্ব এবং উপকারিতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি যদিও খুব সাধারণ এবং হালকা বিষয় মনে হয়, কিন্তু এ বিষয়টি একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বর্তমান সভ্য যুগে উন্নত বিশ্বের মানুষেরা মলত্যাগ করার পর কাগজ, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে। কেউ কেউ পানিও ব্যবহার করে। অনুন্নত ও অমার্জিত রুচির মানুষেরা ঢিলা, পাথর বা পানি ব্যবহার করে, কিন্তু ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে পানির ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলে জানিয়ে দিয়েছে। পানি ব্যবহার করার ওপর অন্য কোনো ধর্ম বা জাতি এতোটা গুরুত্ব আরোপ করেনি।

একজন বিবেকসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবে যে, কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসক পথনির্দেশ না করা পর্যন্ত কোনো মানুষই এরকম বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার কথা এবং এ ব্যবস্থার উপকারের কথা চিন্তা করতে পারবে না।

মলত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা দুটি হাত পৃথক পৃথক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশেই দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের বাম হাতের চেয়ে ডান হাত অধিক শক্তিশালী। জীবজন্তুদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তারা প্রথমে ডান পা তোলে। এ কারণে ডান হাতকে আরবী ভাষায় ইয়ামিন বা বরকতসম্পন্ন হাত বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের পানাহারের জন্যে ডান হাত এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে বাম হাত দিয়েছেন। ইসলাম দুই হাতের ব্যবহারের নিয়ম এভাবেই উল্লেখ করেছে।

একজন অমুসলিমের ঘটনা

একজন মুসলমান ডাক্তার আমার কাছে একটি ঘটনা বলেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে, এক অমুসলিম ব্যক্তির উরুতে একবার আঘাত লেগে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিলো। চিকিৎসার জন্যে আমার কাছে এলে রক্ত ধুয়ে ফেলার জন্যে তাকে আমি একটি পাত্রে পরিষ্কার পানি দিলাম। সে ডান হাতে পানি নিয়ে ধুয়ে আবার ক্ষতস্থানে হাত লাগাচ্ছিলো। এতে কিছুক্ষণের মধ্যে পাত্রের পানি লাল হয়ে গেলো। আবার সেই পানি

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহার করছিলো। তাকে আবার পরিষ্কার পানি দিয়ে বললাম, ডান হাতে পানি ঢালো আর বাম হাত দিয়ে জখম পরিষ্কার করো। এতে ক্ষতস্থানও পরিষ্কার হবে অবশিষ্ট পানিও ভালো থাকবে। তাকে বললাম, ইসলামে ডান হাতের কাজ এবং বাম হাতের কাজ পৃথক করে দেয়া হয়েছে।

রসূল (স.) বলেছেন, যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে, গোসল করবে বা ওযু করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে। প্রস্রাব পায়খানার পর পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে বাম হাত কাজে লাগাবে। এছাড়া অন্য সকল কাজ ডান হাত দিয়ে শুরু করতে বলা হয়েছে।

মলত্যাগের পর প্রথমে কাগজ, কাপড়, পাথর ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর পানি ব্যবহার করা খুবই ভালো। শুধু পানি ব্যবহার করলেও চলে। তবে দুটোই ব্যবহার করা হলে বেশী পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। এ নিয়ম রসূল (স.) পছন্দ করেছেন। এ উদ্দেশে তিন টুকরো কাগজ বা পাথর ব্যবহার করা উত্তম। তিনটি সংখ্যা অধিকতর পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা যায়। ইসলামী পরিভাষায় এটাকেই এস্তেঞ্জা বলা হয়েছে। এ ঢিলা ব্যবহার নিয়ে অমুসলমান বা অজ্ঞ লোকেরা হাসি ঠাট্টা করে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা অর্জনে এতে আপত্তি বা সমস্যা কোথায়? এস্তেঞ্জা করার পর বাম হাত মাটি বা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা যেতে পারে। রসূল (স.) বলেছেন, মলত্যাগের পর হাড় বা গোবর দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে না, কারণ এগুলো জ্বিনের খাদ্য।

ইসলামের মলত্যাগ সম্পর্কিত বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তার পরিণাম

স্থানীয় এক বুযুর্গ ব্যক্তি আমাকে একবার একটি ঘটনা বলেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে, প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মুসলিম যুবক মলত্যাগের পর হাড়, গোবর ইত্যাদি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের ব্যাপারে রসূল (স.)-এর নিষেধের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এরপর সে যুবক মলত্যাগের পর হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা করলো। সেই হাড় ছিলো অপরিষ্কার। হাড়ের ভেতর ছিলো অত্যন্ত বিষাক্ত ছোটো ছোটো পিঁপড়া। হাড় ব্যবহারের সময় পায়ুপথে পিঁপড়া কামড় দিয়েছিলো। ফলে মারাত্মক যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। যুবক আমার কাছে এসে তার দোষ স্বীকার করে চিকিৎসা চাইলো। আমি বললাম, তুমি যে মহামানবের বাণীর প্রতি বিদ্রূপ করেছো তাঁর প্রতি দরূদ সালাম প্রেরণ করো এবং ভবিষ্যতে এরকম না করার সংকল্প নিয়ে তাওবা করো। যুবক তাই করলো। এর ফলে তার পায়ুপথের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেলো।

হাড় ও গোবরের মধ্যে বিষাক্ত রকমের পোকা এবং জীবাণু থাকে। হাড় গোবর নিজেরাই হচ্ছে নোংরা, তারা কিভাবে অন্যের নোংরা দূর করবে?

উন্নত ও ধনী দেশগুলোর গ্রামের মানুষও মলত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উদ্দেশে কাগজ এবং এ জাতীয় অন্য অনেক জিনিস ব্যবহার করে। মাটির ঢিলা ব্যবহার করা তাদের জন্যে অবাক করার মতো কথা, কিন্তু ইসলাম হচ্ছে একটি

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বজনীন ধর্ম। এ ধর্মের বিধান ধনী গরীব, শ্বেতাংগ কৃষ্ণাংগ, গ্রামের মানুষ শহরের মানুষ সকলের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। যেসব দেশে বেশী শীত আর যেসব দেশে বেশী গরম, সকল দেশেই একই নিয়ম প্রযোজ্য। বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ। যেসব মানুষ পেটের খাবার যোগাড় করতে পারে না তারা মলত্যাগের পর পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে টয়লেট পেপার ক্রয় করবে কিভাবে? এ রকম লোকদের মলত্যাগের জন্যে বন জংগল এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে তো আল্লাহর সৃষ্টি করা মাটিই বিনামূল্যে ব্যবস্থা হতে পারে এবং সেটা সহজলভ্যও বটে।

পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে কোথাও কোথাও বর্তমানে পানি ব্যবহার করা হয়। এর আগে কাগজ এবং কাপড় ব্যবহার করা হতো, কিন্তু পানি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন না করা হলে কোনো মুসলমান মনে স্বস্তি পায় না। মনে খুঁতখুঁতে অবস্থা বিরাজ করে। অসম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা নিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করাও ঘৃণার কাজ। মলত্যাগের পর পুরো পরিচ্ছন্ন না হয়ে গোসল করা হলে পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় না। কাজেই ইসলামের পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিভংগি কতো উঁচু, কতো রুচিশীল, সহজেই সেটা বুঝা যায়।

শুধু প্রস্রাব করার পরও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা আবশ্যক। প্রস্রাব করার পরও অনেকের কিছু প্রস্রাব প্রস্রাবের নালীতে অবশিষ্ট থাকে, তা পরে উরুতে পড়তে থাকে এবং উরু নোংরা হয়ে যায়। পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্যে মাটি, টয়লেট পেপার, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। মুসলমান ছাড়া অন্য জাতির লোকেরা পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতোটা সতর্ক নয়। তারা প্রস্রাব শেষ করার পরই উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্যান্টের বোতাম বন্ধ করে দেয়। পায়জামা এবং ইজারের ফিতা বেঁধে ফেলে। যারা ধূতি পরে তারা ধূতি ফাঁক করে প্রস্রাব সেরে পুরুষাংগ ঢেকে দেয়। এ কারণে প্রস্রাবের ফোঁটা তাদের পোশাকে উরুতে লেগে যায় এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। পরিণামে নানারকম চর্ম রোগ দেখা দেয়।

আমি দেখেছি, হিন্দুরা মলত্যাগের সময় পানির বদনা ঢালুতে রাখে। এতে প্রস্রাবের ছিটা পানিতে পড়ে, তারপর সে পানি দিয়েই শৌচ কাজ সম্পন্ন করে। অথচ মুসলমানরা মলত্যাগের পরও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে পবিত্র পানি ব্যবহার করে। এছাড়া তারা পানির বদনা বা লোটা এমন জায়গায় রাখে যেখানে প্রস্রাবের ছিটা পড়ার কোনো সুযোগ থাকে না। মোটকথা, পবিত্র পরিচ্ছন্ন পানি দিয়েই মুসলমানরা পবিত্রতা অর্জন করে। তাছাড়া তারা ওযুর পানি কখনোই মল্যাগের জায়গায় রাখে না।

একজন নামাযী মুসলমান তার শরীর এবং পোশাক সামান্য অপবিত্রতা থেকেও মুক্ত রাখার চেষ্টা করে থাকেন। অনেকে তো এতোটা সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, এক ফোঁটা পেশাব যদি দেহে বা পোশাকে লেগে যায় তবে সেটা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পান না। এরকম অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া মুসলমানদের স্বভাবের অংশে পরিণত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এক হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) একবার একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, কবরের মুর্দার ওপর আযাব হচ্ছে। আযাবের কারণ হলো, সে জীবদ্দশায় পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতো না।

মানুষের দেহ থেকে বের হওয়া বর্জ্য নিকৃষ্ট নোংরা, এ নোংরা বর্জ্য দেহে বা পোশাকে লেগে থাকলে গুরুতর রোগ হতে পারে। এ থেকে মুক্ত না থাকলে দেহে চর্মরোগ, জ্বালা পোড়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। বেঁচে থেকেও নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

প্রাসংগিকভাবে এখানে একটা কথা বলা সমীচীন মনে করছি। কিছু কিছু জায়গায় কোনো কোনো মুসলমানকে দেখা যায় জনসম্মুখে, প্রকাশ্য জায়গায় ঢিলা দিয়ে পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্যে লুংগির ভেতর হাত ঢুকিয়ে হাঁটাহাঁটি করেন, এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। ইসলাম এ রকম নির্লজ্জ কার্যক্রম মোটেই সমর্থন করে না। এ রকম নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড দেখেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে উৎকট সমালোচনা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। তারা বলে, রাখো ওসব, এসব হচ্ছে ঢিলা এস্তেঞ্জার মাসআলা। তারা ইসলামের কথা শুনতেই পারে না। অথচ সঠিক এবং সমীচীন পদ্ধতি হচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢিলা বা পানি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে। রসূল (স.)-এর অভ্যাস ছিলো এ রকমই। মলমূত্রের ছিটেফোঁটা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকা সকলের কর্তব্য। ছোটোখাটো অপবিত্রতা থেকে কেউ মুক্ত না থাকলে বড়ো বড়ো অপবিত্রতায় জড়িয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তারপর পবিত্রতা অর্জন হয় নামমাত্র। এতে প্রকৃত পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলেও ইসলামের পবিত্রতার নীতি অনেক কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় হাঁটাচলার সময়ে উরুতে ঘাম লেগে যায়। পানি দিয়ে দেহের সেই অংশ ধুয়ে ফেললে ঘাম এবং ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয, কিন্তু দেহ এবং পোশাক পবিত্র পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত নামায শুদ্ধ হয় না। এছাড়া দেহ এবং পোশাক পাক সাফ রাখা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। প্রতিটি মানুষকে প্রতিদিন একাধিকবার মলমূত্র ত্যাগ করতে হয়। এ নোংরা জিনিস দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ নোংরা দুর্গন্ধ থেকে যতো দূরে থাকা যায় ততোই কল্যাণ। নোংরা ময়লা আবর্জনার গন্ধ ও সংস্পর্শ মানব স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয় এবং এসব থেকে দূরে থাকা স্বাস্থ্যের জন্যে কল্যাণকর, কিন্তু এসব নোংরা আবর্জনার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও অনেকের অমনোযোগিতা এবং উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম ব্যতীত কোনো ধর্মেই এতোটা সতর্ক থাকার কথা বলা হয়নি। একমাত্র ইসলামই এ সম্পর্কে সর্বাধিক সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। মলমূত্রের মন্দ প্রভাব সম্পর্কে ইসলাম কল্যাণকর পরামর্শ দিয়েছে এবং অতুলনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং মলমূত্র ত্যাগ করার সুব্যবস্থা করার জন্যে লেট্রিন তৈরী করার গুরুত্ব অপরিসীম।

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার মানুষ মলমূত্র ত্যাগ করার স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলে। উন্নত দেশসমূহে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত এ নিয়ম মেনে আসা হয়েছে। অথচ উন্নত দেশেরই একশ্রেণীর তথাকথিত লোক এভাবে মলমূত্র ত্যাগ করা সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা শুরু করেছে এবং এ নিয়মকে বন্য নিয়ম, জংলী নিয়ম বলে অভিহিত করছে, কিন্তু চিন্তা করলে বুঝা যায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ নিয়ম স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী এবং পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি। রসূল (স.) ঘরে যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন তখন দু'টি ইটের ওপর পা রেখে বসতেন। এভাবে উপবেশন করা হলে দেহের ওপরের অংশের চাপ নীচে এসে পড়ে এবং বর্জ্য দেহ থেকে বের হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। পাকস্থলী এবং দেহের প্রাকৃতিক চাপ সৃষ্টির কারণে অন্ত্রের মুখ পুরোপুরি খুলে যায় এবং ময়লা বের হওয়া সহজ হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির লোকেরা স্বাভাবিক নিয়মেই মলত্যাগ করে। গ্রামের লোকেরা সাধারণত জংগলে গিয়ে মলত্যাগ করে। সেখানে এক জায়গায় মলত্যাগের পর অন্য জায়গায় শৌচ কাজ সম্পন্ন করা হয়। শহরের লোকেরা নিজেদের ঘরের ভেতরেই নানারকম লেট্রিন তৈরী করে। পাকা মাটি দিয়েই এসব লেট্রিন তৈরী করা হয়। মাটি থেকে এসব পায়খানা কিছুটা উঁচু হয়ে থাকে বলে দেহে বা পোশাকে প্রস্রাবের ছিটা পড়ে না।

কমোডও এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, মল সরাসরি নীচে চলে যায়। কমোডের ওপর বসে শৌচকর্ম সম্পন্ন করার ফলে মলের ওপরে পানি পড়ে সে জায়গাও পরিষ্কার হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করা হলেই দেহের সংশ্লিষ্ট অংশ পরিষ্কার এবং মলত্যাগকারী ব্যক্তি পবিত্র হয়ে যেতে পারে।

মলত্যাগ করার বা প্রস্রাব করার ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সেগুলো মেনে চলা হলে লজ্জা পাওয়ার কোনো শংকা থাকে না। এসব বিধানের মূলকথা হচ্ছে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময়ে অন্যের সামনে নগ্ন হওয়া যাবে না। জংগলেও গাছের আড়ালে বা পর্দা করে বসতে হবে। পায়খানা তৈরী করা হলেও পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় আমাকে কেউ দেখছে এরকম মনে হলে ভালোভাবে প্রস্রাব পায়খানা করা সম্ভব হয় না। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। অনেকের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তাদেরও একই রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

একবার পাটনায় আমার একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিলো। প্রতিনিধিদের মধ্যে মাদ্রাজের কয়েকজন হিন্দুও ছিলো। সম্মেলনের জায়গায় লেট্রিন ছিলো সারিবদ্ধ। আমি অবাক হলাম, মাদ্রাজী হিন্দুরা পায়খানা করার সময়েও সম্মেলনের বক্তৃতা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে গরম গরম আলোচনা করছিলো, কিন্তু রসূল (স.) বলেছেন, পায়খানায় বসে যারা কথা বলে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

বর্তমান যুগে অতীতের চেয়ে আধুনিক পদ্ধতির পায়খানা এবং কমোডের বেশ প্রচলন হয়েছে। আধুনিক মনমানসিকতাসম্পন্ন আফ্রিকান এবং এশীয়রাও এসব কমোড

www.nagorikpathagar.org

পছন্দ করেন। এসব লেট্রিন সাধারণত গোসলখানায় অথবা গোসলখানা সংলগ্ন জায়গায় তৈরী করা হয়। তবে গোসলখানা এবং লেট্রিন একই জায়গায় হওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। এ সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে নতুন পদ্ধতির পায়খানা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

কমোডের ওপর চেয়ারে বসার মতো করে বসা হয়। এভাবে বসা আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যের জন্যেও উপকারী, কিন্তু সুস্থ মানুষের জন্যে এভাবে বসা ক্ষতিকর। কারণ এভাবে বসা হলে পা খুলে বসা যায় না। দেহের নীচের অংশ এবং পাকস্থলীর ওপর পুরো চাপ সৃষ্টি না হওয়ার কারণে মল বের হবার অন্ত্রের মুখ ভালোভাবে খোলে না। এতে এক ধরনের বাধার সৃষ্টি হয়। ময়লা ভালোভাবে বের হতে পারে না। পরিণামে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতাও ভালোভাবে অর্জিত হয় না। যারা নিজের দেহে বা পোশাকে সামান্য পরিমাণ প্রস্রাবের ছিটা পড়াও পছন্দ করে না, তারা এভাবে বসা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

কমোড কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। একশ্রেণীর কমোডে পানি ব্যবহার করা হয় বাইরে থেকে। একশ্রেণীর কমোডের পাশে শিকল বা পাইপ লাগানো থাকে। শিকল বা পাইপে টান দেয়ার সাথে সাথে হাউজ থেকে পানি বের হয়ে নোংরা ময়লা নীচে চলে যায়। শিকল বা পাইপে টান দেয়া হলে দশ বারো সের পানি নেমে আসে। পরিভাষায় একে বলা হয় ফ্লাশ করা। একাধিকবার ব্যবহার হলে কয়েক মণ পানি ব্যয় হয়। যেসব এলাকায় পানির স্বল্পতা রয়েছে সেখানে এভাবে পানি ব্যবহার করা নিসন্দেহে অপচয়ের শামিল। বিত্তশালীরা যদি এভাবে পানির অপচয় করেন তাহলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না। এরকম কমোডে বসে শৌচ কাজ সম্পন্ন করা হলে পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় না বিধায় অন্য জায়গায় বসে শৌচ কাজ করতে হয়। এতে অতিরিক্ত পানির প্রয়োজন দেখা দেয়। দেহের মলসংযুক্ত এলাকা পরিচ্ছন্ন করার জন্যে বিশেষ রকমের কাগজ প্রয়োজন হয়। কাপড়, তুলা বা ঢিলা ব্যবহার করা যায় না। কারণ কমোডে এসব ফেলা হলে কমোডের নীচের অংশ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এ রকম কমোড যথেষ্ট ব্যয়বহুল। নিম্নবিত্তের লোকদের পক্ষে এরকম কমোড ক্রয় করার কথা চিন্তাও করা যায় না। টয়লেট পেপার ক্রয়েও টাকা খরচ করতে হয়। তাছাড়া কমোডের নীচের অংশ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মেথর এনে পরিষ্কার না করে সে কমোড ব্যবহার করা যায় না। কমোডে কোনোপ্রকার ত্রুটি দেখা দিলে অথবা বন্ধ হয়ে গেলে ময়লা ওপরের দিকে ভেসে ওঠে এবং সারা ঘর দুর্গন্ধে ভরে যায়। পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে।

আরেক রকম কমোড রয়েছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায়। এসব কমোড খুলে পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু এরকম কমোডও খুব একটা উপকারী নয়। একবার ময়লায় পূর্ণ হয়ে গেলে পরিষ্কার না করে পুনরায় ব্যবহার করা যায় না। এরকম কমোড হয় একাধিক সংখ্যক ঘরে রাখতে হয় অথবা ব্যবহার করার

www.nagorikpathagar.org

পর পরই মল পরিষ্কার করতে হয়। এরকম কমোডের সাথে প্রস্রাব জমা রাখার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়। এতেও অনেক টাকা ব্যয় হয়। কোনো কোনো আফ্রিকান এবং এশীয় দেশে এরকম কমোডের প্রচলন রয়েছে, যেসব কমোডে পা মুড়ে বসা যায়। এসব কমোডের ওপরে ফ্লাশ থাকে এবং এর ওপর বসে শৌচকাজও সম্পন্ন করা যায়। এরকম কমোড পরিচ্ছন্নতার জন্যে উপযুক্ত হলেও যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ।

আমরা একথা বলি না যে, ইসলাম কমোড ফ্লাশ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। আমরা বলতে চাই, ইসলাম পরিচ্ছন্নতার ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এমন পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে যা মানুষের সামর্থের বাইরে নয়। কারণ ইসলাম কাউকে তার সাধ্য এবং সামর্থের অতিরিক্ত কোনো কাজ করার আদেশ দেয় না।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশের ইংরেজী সংবাদপত্র গিনি টাইমস-এর ১৯৫৮ সালের ৭ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পিন ফোর্ড লিখেছেন, ইসলামের সৌন্দর্য প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ইসলামে মলত্যাগের পর কাগজ ব্যবহার না করে পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। মিস্টার পিন ফোর্ড ইসলামের ওপর বড়ো রকমের প্রশ্ন তুলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের এলাকায় সভ্য ও আধুনিক মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। ইসলামকে অনগ্রসর অসভ্য লোকদের ধর্ম বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু পরিণামে তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তার আলোকে বলা যায়, উপরোক্ত সমালোচনার কোনো ভিত্তি নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার যখন পতন হতে চলেছে ইসলামের ওপর এরকম নগ্ন হামলা প্রকৃতপক্ষে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির খড়কুটো আশ্রয় করে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টার শামিল।

লাগোসের সি এম এম গ্রামার স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জে ই ইভানস বিএসসি (লন্ডন) তার 'ট্রপিক্যাল হাইজিন' গ্রন্থে লিখেছেন, শৌচকর্মে কাগজের চেয়ে পানি ব্যবহার উত্তম। যে সকল ইউরোপীয় প্রাচ্য দেশসমূহে গিয়ে বসতি স্থাপন করে তারা সাধারণত: মলত্যাগের পর পানি ব্যবহার করে থাকে। যারা পানি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাদের এ অভ্যাস বজায় রাখা উচিত। মলত্যাগের পর কাগজ ব্যবহার করা হোক বা পানি ব্যবহার করা হোক, সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

ইসলামী রীতিতে শৌচকার্যের উপকারিতা ও গুরুত্ব স্বীকার করার পরও মিস্টার ইভানস একথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, কাগজ দিয়ে পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর যদি পানি ব্যবহার না করা হয় তাহলে দেহের সংশ্লিষ্ট অংশ পরিপূর্ণভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জনে সক্ষম হয় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কাগজ দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের পর পানি ব্যবহার না করে গোসলের টবে পানিতে বসা একজন মুসলমানের জন্যে মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। এমনকি একজন মুসলমান প্রস্রাব করার পরও পানি দিয়ে দেহের সংশ্লিষ্ট অংশ পরিষ্কার করে থাকেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, কাগজ দ্বারা, কাপড় দ্বারা যেভাবেই পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা হোক না কেন, দেহের সংশ্লিষ্ট অংশে কিছু

www.nagorikpathagar.org

না কিছু ময়লা থেকেই যায়। সে ময়লা একমাত্র পানি ব্যবহারের মাধ্যমেই পরিষ্কার হতে পারে। একথাও সত্য, দুনিয়াতে পানির চেয়ে সহজলভ্য এবং তৃপ্তিকর কোনো জিনিসই নেই।

প্রস্রাব সম্পর্কে রসূল (স.) আরো কিছু উপদেশ দিয়েছেন। সেসব উপদেশ মোটেই গুরুত্বহীন নয়। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রস্রাব করতে চায় তবে সে যেন উপযুক্ত জায়গা, অর্থাৎ আড়াল খুঁজে নেয়। কোনো নোংরা জায়গায় প্রস্রাব করা যাবে না, কারণ এতে করে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থেকে যাবে। এ রকম জায়গায়ও প্রস্রাব করা যাবে না যে জায়গা থেকে প্রস্রাব গড়িয়ে নিজের দিকে আসবে।

রসূল (স.) আরো বলেছেন, তোমরা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে না। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার ক্ষতিকর দিকের কথা চিন্তা করেই রসূল (স.) এ কাজ নিষেধ করেছেন। প্রথমত এরকম প্রস্রাব করা দৃষ্টিকটু। দ্বিতীয়ত এতে দেহে এবং পোশাকে প্রস্রাবের ছিটোফোঁটা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়ত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হলে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা যায় না, অথচ পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক। তবে যেখানে উপযুক্ত কোনো জায়গা পাওয়া না যায়, সেখানে পরিস্থিতি এবং পরিবেশের কারণে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যেতে পারে।

ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন হওয়া বা এস্তেঞ্জা করার ভালো প্রভাব স্বাস্থ্যের ওপরও পড়ে। অবিবাহিত যুবকদের মাঝে মাঝে স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। অধিক স্বপ্নদোষের কারণে অনেকের মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটে। রসূল (স.)-এর কাছে একজন যুবক অধিক স্বপ্নদোষের কথা বলায় তিনি তাকে পরামর্শ দেন, ঘুমোবার আগে পুরুষাংগ পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে শোবে। রসূল (স.) নিজে ওযু করে তারপর বিছানায় শয়ন করতেন।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে যারা প্রস্রাব করে না তাদের স্বপ্নদোষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। প্রস্রাব করার পর পানি দিয়ে পুরুষাংগ ভালোভাবে ধুয়ে ফেললে স্বপ্নদোষের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। কারণ প্রস্রাব করার কারণে প্রস্রাবের থলি খালি হয়ে যায় এবং পরিচ্ছন্নতার ফলে প্রস্রাবের নালী ঠান্ডা থাকে।

প্রস্রাব পায়খানা করার সময়ে কাউকে বাধা দেয়া হলেও তার স্বাস্থ্যের ওপর এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ে। একবার একজন বেদুঈন মদীনার মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করছিলো। সাহাবারা তাকে প্রহার করতে উদ্যত হন। রসূল (স.) সাহাবাদের বাধা দিয়ে বললেন, তাকে কাজ শেষ করতে দাও। তারপর তিনি পানির পাত্র আনিয়ে প্রস্রাব পরিষ্কার করার আদেশ দেন।

উপরোক্ত বিষয়ে লেখায় যেসব হাদীসের সাহায্য নেয়া হয়েছে সেসব হচ্ছে, মেশকাত শরীফ প্রথম খন্ড হাদীস নং ৪০৮, ৪৪৪, ৩১০, ২১৯, ৩২১, ৩৩৫, ৩০৯।

তাজরীদে বোখারী হাদীস নং ১৮৫, ১১৫, ১৫৯, ১২২, ১১৯, ১২০, ১২৯, ১২৬, ১২১, ১৫৫।

তিরমিযী, বাবে তাহারাত, পৃষ্ঠা ৩, প্রথম খন্ড।

সহীহ বোখারী, কেতাবুল ওযু, হাদীস নং ১৩৬, ১৩২, ১৪৬। (ইসলামী উসূলে ছেহেত)

www.nagorikpathagar.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দৃষ্টির হেফাযত ও আধুনিক বিজ্ঞান

দেখার জন্যে আল্লাহ তায়ালা চোখ দিয়েছেন। চোখ খোলা এবং বন্ধ করার ক্ষমতা মানুষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ক্ষমতা এজন্যে দেয়া হয়েছে, যাতে যখন ইচ্ছা চোখ খোলা যায় যখন ইচ্ছা চোখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু ক্ষমতা মানুষের থাকলেও আল্লাহর আদেশ যেখানে রয়েছে সেখানে চোখ খুলবে আর আল্লাহ যেখানে নিষেধ করেছেন যেখানে চোখ বন্ধ রাখবে।

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃষ্টির হেফাযত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন ঈমান দেবেন যে ঈমানের মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে। আধুনিক ফিরিঙ্গি মানুষদের ধারণা, দেখলে কী ক্ষতি? শুধু দেখাই তো। এতো কোনো খারাপ কাজ নয়, কিন্তু যারা এরকম যুক্তি দেখায় তারা কি এসব কথা ভেবে দেখেছে যে-

১. বাঘ সামনে এসে পড়লে মানুষের দেহমনে কেমন প্রতিক্রিয়া হয় চিন্তা করে দেখুন। ২. শিশু যখন তার মাকে দেখে তখন তার মন আনন্দে ভরে যায়, সে মনে তৃপ্তি অনুভব করে কেন? সে তো শুধু মাকেই দেখে। ৩. সবুজ রং এবং ফুল দেখে মন আনন্দ অনুভব করে কেন? ৪. কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখে মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় কেন? ৫. ক্ষত বিক্ষত জখমী কোন মানুষকে দেখে মনে অস্থিরতা, আতঙ্ক, উদ্বেগ সৃষ্টি হয় কেন? এমন কি কেউ কেউ সেই দৃশ্যের ভয়াবহতা সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যায় কেন? ৬. জৌলুসপূর্ণ দোকান, বিশাল সুরম্য ভবন বা অট্টালিকা দেখে বা সুন্দর গাড়ী দেখে মনে ঈর্ষা, আফসোস, হিংসা, লোভ এবং অস্থিরতা সৃষ্টি হয় কেন? এটা তো শুধু দেখা। ৭. কোনো সুন্দর চেহারা মনে দাগ কাটে কেন? ৮. যুবরাজ জাহাঙ্গীর একবার মিনাবাজারে ঘোরাফেরা করার সময়ে নবাব জয়েন খানের কন্যার প্রেমে পড়েন। জাহাঙ্গির মিনা বাজারের আঙ্গুরী পার্ক অতিক্রম করছিলেন। এ সময় এক সেবিকা এসে বলল, বাদশাহ আপনাকে স্মরণ করেছেন। জাহাঙ্গীরের হাতে তখন একজোড়া কবুতর ছিলো। এ সময় নবাব জয়েন খানের কন্যা সাহেব জামাল সামনের দিক থেকে আসছিলেন। জাহাঙ্গীর তার হাতে কবুতর দু'টি দিয়ে বলেন, এ দু'টি ধরে রাখো। আমি এখনি ফিরে আসছি। কিছুক্ষণ পর যুবরাজ জাহাঙ্গীর ফিরে এসে দেখেন, সাহেব জামালের হাতে একটি কবুতর। জিজ্ঞেস করলেন, আরেকটি কবুতর কোথায়? সাহেব জামাল সরলভাবে জানালো, আরেকটি উড়ে গেছে। জাহাঙ্গীর জানতে চাইলেন কিভাবে উড়ে গেছে? সাহেব জামাল হাতে ধরা অবশিষ্ট কবুতরটি উড়িয়ে দিয়ে বললো,

www.nagorikpathagar.org

এ ভাবে, এ ভাবে, বলা এবং কবুতর উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে জাহাঙ্গীর মুগ্ধ অভিভূত হন। এতেই নবাবকন্যা সাহেব জামালকে বিয়ে করেন।,

দেখে কি কিছুই হয় না? একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে দেখেই সবকিছু হয়।

৯. অবুঝ শিশুর হাতে এক টুকরো সাদা কাগজ এবং একটি কাগজের টাকা দিয়ে দেখুন। শিশুর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে দেখতে পাবেন। কাগজের টাকা তো শিশু শুধুই দেখেছে, এতেই তার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। মোট কথা, চোখ দেখে এবং চুরি করে, হাত অগ্রসর হয় এবং পাপ করে। ইসলামে এ কারণেই চেহারা ঢেকে রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। সহশিক্ষা সম্পর্কে একজন মন্তব্য করেছেন, খোলামেলা গোশত দেখে একটি শকুনের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, শকুন কি গোশতে মুখ দেবে নাকি মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে? কিছুতেই ফিরে যাবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, দৃষ্টির প্রভাব সরাসরি মস্তিষ্ক এবং হরমোন ব্যবস্থায় গিয়ে পড়ে। ফলে দেহের অংগ প্রত্যংগ প্রভাবিত হয় এবং মানুষকে নানা রোগ ও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ডাক্তার নিকলসন ডিউজের অভিজ্ঞতা

মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিকলসন ডিউজ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, দৃষ্টি যেখানে যায় সেখানে আটকে থাকে। তারপর স্নায়ু বা নাকের ওপর, মস্তিষ্কের ওপর এবং হরমোনের ওপর তার প্রভাব পড়ে।

স্ত্রী, বোন এবং মা, খালা ফুফু প্রমুখ নিকটাত্মীয় ব্যতীত বেগানা মহিলার প্রতি আকর্ষণের দৃষ্টিতে তাকালে হরমোন ব্যবস্থায় প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দৃষ্টির প্রভাবে এক ধরনের বিষাক্ত লালা সৃষ্টি হয়, ফলে সারাদেহ দ্রবীভূত হয়ে যায়। অত্যন্ত গরীব কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী কোনো লোককে দেখার পর গরীব লোকটার মনে ঈর্ষা হিংসার কারণে তার হরমোনে একই রকমের লালা তৈরী হয়। এতে তার অন্তর এবং অংগ প্রত্যংগ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এরকমের বিপজ্জনক অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে একমাত্র ইসলামী শিক্ষার আশ্রয় নেয়া।(ইসলাম আওর মোসতাশরেকীন)

এটা একটা প্রমাণিত সত্য যে, দৃষ্টির হেফাযত না করা হলে মানুষ অবসাদ, অস্থিরতা এবং হতাশার শিকার হয়। এ সব রোগের চিকিৎসা মোটেই সহজ নয়। কারণ দৃষ্টিশক্তি মানুষের চিন্তা এবং মনোভাব বিক্ষিপ্ত করে দেয়। এ বিক্ষিপ্ততা তার পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে। ফলে কেউ হয় লাইলী, কেউ হয় মজনু। ইসলাম হচ্ছে শান্তি স্বস্তির ধর্ম। যার মধ্যে ঈমান এবং তাকওয়ার ঘাটতি রয়েছে সে কাউকে ভালো অবস্থায় দেখার সাথে সাথে তার মধ্যে শত্রুতা এবং হিংসার মনোভাব সৃষ্টি হবে। ঈপ্সিত সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম না হলেই তারা হিংসায় জর্জরিত হবে, হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে। পর্যায়ক্রমে এরকম মানুষ মানসিক রোগের শিকার হয়।

www.nagorikpathagar.org

একজন লোক বলেন, আমি শুধু তিন দিন আমার দৃষ্টিকে গায়রে মাহরাম সুন্দরী নারী, সুরম্য ভবন এবং দামী দামী গাড়িঘোড়ার প্রতি নিবদ্ধ রেখেছিলাম। তিন দিন পর অনুভব করলাম, সারাদেহে ব্যথা, ক্লান্তি, অবসাদ, অস্থিরতা, মাথা ভারি হয়ে আছে, দেহের ভেতর অসম্ভব রকমের যন্ত্রণা, হাত পা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা দূর করার জন্যে ওষুধ ব্যবহার করে ক্ষণিকের জন্যে স্বস্তি পাই, কিন্তু পরে আবার একই রকমের অবস্থার সম্মুখীন হই। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্যে দৃষ্টির হেফাযতই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যা কিছু সুন্দর তা দেখবো, আর মনে মনে বলবো, এটা তো মাটি এটা তো কড়ি কাঠ। কিছুকাল পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রেখে জীবন যাপন করার ফলে আমি আপনা আপনি সুস্থ হয়ে উঠি।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্দশ অধ্যায়

পিতামাতার আনুগত্য ও আধুনিক বিজ্ঞান

আত্মিকবিশারদ ডাক্তার নিকলসন ডিউজ, মনস্তত্ত্ববিশারদ প্রফেসর মিলান কিস-এর গবেষণা রিপোর্ট গভীর মনযোগ দিয়ে পর্যালোচনা করা হলে বোঝা যায়, পিতামাতা বৃদ্ধ হলে তাদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। পিতামাতার ভালোবাসা এবং স্নেহ মমতার দৃষ্টি রশ্মি হয়ে সন্তানের ওপর পড়ে। ফলে সন্তান রোগমুক্ত এবং সুস্থ থাকে। তারা আরো লিখেছেন, পিতামাতার শুভ কামনার প্রভাব হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও সন্তানের ওপর পতিত হয়। পিতামাতা অসুস্থ হলেও তাদের অদৃশ্য রশ্মি নিষ্প্রভ বা দুর্বল হয় না; বরং বৃদ্ধি পায়।

পিতামাতা যদি কাছে থাকেন তাহলে তাদের ভালোবাসার রশ্মি দেহ এবং অংগ প্রত্যংগকে শক্তিমান করে। তাদের স্নেহ স্পর্শ সন্তানের মানসিক অস্থিরতা দূর করে দেয়। যখন আমি আমার মায়ের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই তখন আমার ভেতরে স্থিরতা, স্বস্তি এবং প্রশান্তির স্রোতধারা প্রবাহিত হয়।

পাশ্চাত্যের সকল বিশেষজ্ঞ গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সন্তানের আনুগত্য পিতামাতার অদৃশ্য আলোক রশ্মির ইউনিটে তোলপাড় সৃষ্টি করে। তারপর তা থেকে এক অদৃশ্য রশ্মি বের হয়ে সন্তানের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার কারণ ঘটে। সে রশ্মি সন্তানের চারদিকে এক মযবুত ব্যূহ তৈরী করে। তাকে নানা দুঃখ কষ্ট এবং সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। একইভাবে সন্তানের অবাধ্যতাও পিতামাতার অদৃশ্য আলোক রশ্মিতে তোলপাড় সৃষ্টি করে, কিন্তু যেহেতু সে রশ্মিতে পিতামাতার ক্রোধ, লোভ, ফরিয়াদ এবং দুশ্চিন্তা অন্তর্ভুক্ত থাকে, এ কারণে সেই রশ্মি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে সন্তানের ক্ষতি করে।

পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার এবং তার পরিণাম

প্রফেসর ডাক্তার নূর আহমদ নূর লিখেছেন, একজন চিকিৎসক হিসেবে চোখের সামনে নানা ধরনের মৃত্যুদৃশ্য আমাকে দেখতে হয়। এ সকল মৃত্যুর মধ্যে কিছু কিছু মৃত্যু আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রেখে যায়। আমি দেখেছি, যারা পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের পার্থিব জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেন। এমনকি যেসব রোগের কোনো চিকিৎসা নেই সেসব রোগও নিরাময় করে দেন। পিতামাতার আনুগত্যকারী সন্তানের মৃত্যু ভালোভাবে হয়। পক্ষান্তরে যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তারা

www.nagorikpathagar.org

পার্থিব জীবনেই শাস্তি ভোগ করে এবং কষ্টকর মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন। এখানে প্রত্যক্ষ কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

মায়ের দোয়া

আমি যখন এমবিবিএস এর প্রথম প্রফেশনাল পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, সে সময় হঠাৎ করে জ্বরে আক্রান্ত হই। গায়ে জ্বর নিয়ে এনাটমি বিষয়ের পরীক্ষা দিলাম। ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু একটি উত্তর ভুল হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ফিরলে মা পরীক্ষার কথা জানতে চাইলেন, তাকে বললাম, জ্বরের কারণে একটি প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখেছি। মা বললেন, আমি দোয়া করছি, ভুল উত্তরও ইনশাআল্লাহ সঠিক উত্তরে পরিণত হবে। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল আমি ক্লাসে প্রথম হয়েছি। প্রথম হওয়ার কারণে আমি পুরস্কারও পেয়েছি। মায়ের দোয়ার বরকতে আমি ভুল লিখেও নম্বর পেয়েছি এবং পুরো নম্বর পেয়ে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

একবার আমার পরিচিত একজন প্রফেসরের হার্ট এ্যাটাক হলো। তিনি গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হলেন। তার জীবন ছিলো সংকটাপন্ন। প্রফেসরের মা পুত্রের রোগশয্যায় বসে এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আমি আমার এ সন্তানের ওপর সন্তুষ্ট, তুমিও তার ওপর সন্তুষ্ট হও। আমরা রোগীর চিকিৎসা করছিলাম। প্রফেসরের মা সন্তানের জন্যে দোয়া করছিলেন। মৃত্যু মুহূর্তে প্রফেসর উচ্চস্বরে কালেমা পাঠ করে হাসলেন, তারপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পিতামাতার দোয়ার প্রভাব

১৯৬৭ সালের ঘটনা। মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্যে আমি পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর অনুগ্রহে এবং পিতামাতার দোয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রথম স্থান অধিকার করলাম, কিন্তু কিছু কারণে আমাকে চাকরি দেয়া হয়নি। ফলে আমি সউদী আরব চলে গেলাম। পিতামাতা মনে দুঃখ পেলেন। তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন আমি যেন সউদী আরব থেকে ফিরে আসি এবং মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্তি লাভ করি, কিন্তু বাস্তবে তা ছিলো প্রায় একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। পিতামাতার দোয়ার বরকতে আমি হজ্জে আকবর সম্পন্ন করার সৌভাগ্য লাভ করি এবং এক বছরের মধ্যে মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্তি পেয়ে যাই।

পিতামাতার দোয়ার কারণে মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি

আমার এক বন্ধু আছেন, যিনি করাচীতে এক ব্যাঙ্কের অফিসার। কয়েক বছর আগে তিনি মারাত্মক পান্ডু রোগে আক্রান্ত হন। এতে তিনি এতোই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, একদিন অজ্ঞান হয়ে যান। তার পেটে পানি জমে যায় এবং কিডনি অকেজো হয়ে পড়ে। তার কয়েকটি যুবতী মেয়েও ছিল। তিনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন।

www.nagorikpathagar.org

এ রোগের কোন চিকিৎসা না থাকায় তিনি আমাকে করাচীতে যাওয়ার জন্যে খবর দিলেন। মনে হচ্ছিলো তার জীবনের সময় শেষ। আমি করাচী গেলাম। বন্ধুর জীবনের শেষ অবস্থা দেখে এবং তার পারিবারিক অবস্থার কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলাম। আমার যাওয়ার আগে তাকে ১৮ জন ডাক্তার দেখেছেন এবং সবাই বলেছেন, এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। আমি ছিলাম উনিশ নম্বর চিকিৎসক। তাকে পরীক্ষা করে আমি উল্লিখিত ১৮ জনের মতোই মত দিই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সঠিক নিয়মে তার চিকিৎসা হয়নি।

আমি তার পিতামাতাকে বসিয়ে বললাম, আসুন আমরা দুই রাকাত নফল নামায আদায় করি। তারপর চিকিৎসা শুরু করবো। আল্লাহ্ তায়ালার ওপর আমার এ ভরসা এবং বিশ্বাস রয়েছে, রোগী সুস্থ হয়ে যাবেন। তার পিতামাতাকে বললাম, সন্তানের জন্যে পিতামাতার দোয়া ব্যর্থ হয় না। আল্লাহ তায়ালা সন্তানদের জন্যে পিতামাতার দোয়া অবশ্যই কবুল করেন। আমার কথার পর বন্ধুর পিতামাতা সঠিক নিয়তে আগের চিকিৎসাই চালিয়ে গেলেন এবং পুত্রের সুস্থতার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ক্রমাগত দোয়া করতে থাকলেন। তারা তিন দিন পর্যন্ত দোয়া করলেন। উপস্থিত লোকেরা জানিয়েছেন, তৃতীয় দিনে আল্লাহ তায়ালা রহমত করেন এবং কিডনি সচল হয়ে পেটের পানি বের হতে শুরু করে। এক সপ্তাহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

করাচী থেকে আমার ফিরে আসার চৌদ্দ দিন পর আমার বন্ধুর নিজের হাতে লেখা চিঠি পেলাম। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, তার পিতামাতার দোয়ার কারণেই তিনি সুস্থ এবং রোগমুক্ত হয়েছেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পান্ডুরোগ চিকিৎসায় ভালো হয় না, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছু করতে পারেন। তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

পিতামাতার বদদোয়ার কারণে মৃত্যুকালীন কষ্ট

আমার পিতার এক বন্ধু তার মা মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি তার মা মৃত্যুশয্যায় কষ্ট পেয়ে এক সময় নিসংগ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধানী ছিলাম, পিতামাতার সংগে যারা খারাপ ব্যবহার করে তাদের মৃত্যুকালীন অবস্থা কেমন হয়। মায়ের মৃত্যুর তিন বছর পর উক্ত ব্যক্তি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। আমার পিতা আমাকে তার বন্ধুর চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যান। আমি দেখলাম তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং কাঁদছেন। আমি তাকে সেবা শুশ্রূষা এবং খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে তার তিনটি সন্তান রয়েছে, অথচ তারা কেউ এ অসুস্থতার মধ্যেও পিতাকে একবার দেখতে আসেনি। নিসংগ অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে এক সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পাড়ার লোকেরা পরদিন সকালে দেখতে পায়, মৃত

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির লাশ অসংখ্য পিঁপড়ায় কামড়াচ্ছে। মায়ের সংগে খারাপ ব্যবহার করার শাস্তি তিনি দুনিয়াতেই পেয়ে যান।

আমার এলাকার এক যুবকের কথা বলছি। এ যুবকের হার্ট এ্যাটাক করেছিলো। এতো কষ্টের সাথে সে মৃত্যুবরণ করলো যে, গত ২০ বছরে আমি কাউকে এমন কষ্টকর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখিনি। তার চেহারা নীল হয়ে গিয়েছিলো। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছিলো। মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বের হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে। মৃত্যুর একদিন আগে তার অবস্থা এমন চরম আকার ধারণ করলো যে, তাকে দেখে হাসপাতালের অন্য রোগীরা ভয়ে শয্যা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলো। এ রকম অবস্থা দেখে তাকে দূরে আলাদা একটি কামরায় স্থানান্তর করা হয়। তার পিতা এসে আমাকে বললো, আমি তার কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারছি না। তাকে বিষের টিকা দিয়ে দিন ডাক্তার সাহেব, সে তাড়াতাড়ি মরে যাক। আমি তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কী এমন গুরুতর পাপ করেছে আমাকে বলুন। পিতা বললেন, সে তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্যে তার মাকে প্রহার করতো। আমি বাধা দিতাম, কিন্তু সে শুনতো না। তার মৃত্যুকালীন এ কষ্ট তার মায়ের বদ দোয়ার ফল।

আমার এক বন্ধু একবার তার আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখা করার জন্যে গ্রামে গেলেন। ফিরে এসে তিনি একটি ঘটনা জানান। ঘটনাটি হচ্ছে, এক গ্রামে এক কৃষক ব্যক্তির মা এবং পুত্রবধূর মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকতো। ঝগড়ার পর স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যেতো। তাকে অনেক বুঝিয়ে স্বামী আবার ফিরিয়ে আনতো। একবার স্ত্রী বাপের বাড়ী যাওয়ার পর স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে সে শর্ত দিলো, তুমি যদি তোমার মাকে মেরে ফেলতে পারো তবে আমি তোমার সংগে যাবো, অন্যথা যাবো না। মা এবং স্ত্রীর প্রতিনিয়ত ঝগড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে লোকটি মাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে কৃষক ক্ষেত থেকে ফসল কেটে বাজারে বিক্রি করতো। একদিন ফসলের বোঝা মাথায় তুলে দেয়ার কথা বলে মাকে ক্ষেতে নিয়ে গেলো। মাকে পাশে রেখে সে ফসল কাটতে লাগলো। এক পর্যায়ে একটি কুঠার তুলে মাকে আঘাত করতে উদ্যত হলো। সাথে সাথে মাটিতে তার পা আটকে গেলো এবং কুঠার হাত থেকে মাটিতে ছিটকে পড়লো। মা এ অবস্থা দেখে চিৎকার করে ছুটে গ্রামে ফিরে গেলেন। এদিকে কৃষক মাটিতে ধসে যাচ্ছিলো আর চিৎকার দিয়ে মাকে ডাকছিলো এবং মায়ের কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলো। ক্ষেত দূরে থাকায় কৃষকের চিৎকার লোকালয়ে পৌঁছুলো না। অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর কিছু লোক এসে দেখে বুক পর্যন্ত মাটি তাকে গিলে ফেলেছে। ইতিমধ্যে কৃষকের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো এবং সে মৃত্যুবরণ করলো। গ্রামের লোক তার লাশ তোলার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। মাটি তাকে ছাড়েনি। লোকটি সে মাটিতেই তলিয়ে গেলো।

এ তিনটি ঘটনাই সত্য ঘটনা। খুব বেশী দিনের আগের ঘটনা নয়। (ডাক্তার নূর আহমদ নূর)

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপের ঘটনা

ইংল্যান্ডের একটি চিকিৎসা সাময়িকী এক বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ করেছে। মেরি নামে এক মেয়েকে তার মা তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দেন। স্বামী ভালো উপার্জন করতো এবং সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিলো। এ দম্পতির একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মায়ের অন্য কোনো সন্তান না থাকায় কন্যার সংসারেই অবস্থান করছিলো। মা সংসারের নানা কাজ করতো এবং নাতনির লালন পালনে সহায়তা করতো। নাতনি বড় হয়ে গেলে মেরি এ সময় চিন্তা করলো, তার মায়ের অবস্থান ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। কাজেই মাকে সরিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মেরির মা বৃদ্ধভাতা পেতেন। মেরি মাকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ভর্তি করে দিলো। মেরির মা কিছুতেই মেয়ের সংসার ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে চাইলেন না। সংসারে তার প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন, নানাভাবে মেয়েকে বুঝালেন। মেরি যুক্তি দেখালো, আমাদের চার কামরার ঘর এখন আমাদেরই দরকার। মেরির কন্যা এলিজাবেথ নানীকে ভালোবাসতো। সে নানীকে যেতে দিতে রাযি ছিলো না, কিন্তু তার প্রতিবাদে কোনো কাজ হলো না। মেরি মাকে বুঝালো, আমরা তোমাকে মাঝে মাঝে দেখতে যাবো। প্রতি রবিবার তোমাকে বাসায় নিয়ে আসবো। বৃদ্ধাশ্রমে থাকলেও তোমার অযত্ন অমর্যাদা হবে না, কিন্তু তিনি বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার পর তার সাথে তারা আস্তে আস্তে দেখা সাক্ষাত করা কমিয়ে দেয়। রবিবার ছুটির দিন থাকায় সেদিন বাসায় মেহমান আসতো। মেহমানদের উপস্থিতিতে একজন বৃদ্ধার উপস্থিতি ভালো দেখায় না। বৃদ্ধাশ্রমে নিসংগ জীবনে বৃদ্ধা নাতনিকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখতো। নাতনির জন্যে অপেক্ষা করতো, কিন্তু কেউ আসতো না। মেরি এক চিঠিতে তার মাকে জানালো, আগামী বড়দিনে তোমাকে বাসায় নিয়ে আসবো, আমরা সবাই মিলে একত্রে বড় দিন পালন করবো।

মেরির মা পেনশনের টাকা থেকে জমা করে নাতনির জন্যে উলের টুপি, মাফলার এবং সোয়েটার তৈরী করলো। বড় দিনের আগের দিন ২৪ শে ডিসেম্বর ভীষণ তুষারপাত হচ্ছিলো। বৃদ্ধাশ্রমের বারান্দায় বসে মেরির মা তার নাতনির জন্যে পোশাক তৈরীর শেষ পর্যায়ে কাজ করছিলো। বারান্দায় বসার আরেকটি কারণ ছিলো, মেরি যখন তাকে নিতে আসবে তখন তাদের যেন বেশী সময় অপেক্ষা করতে না হয়।

ওল্ড হাউস বা বৃদ্ধাশ্রমের সেবিকা ন্যান্সি মেরির মাকে প্রচন্ড শীতের সময়ে বারান্দায় বসে না থেকে হিটার রয়েছে এরকম গরম রুমে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করলো, কিন্তু বৃদ্ধা রুমের ভেতর যেতে রাযি হলো না। ন্যান্সি একখানি কম্বল এনে বৃদ্ধার গায়ে জড়িয়ে দিলো। বারবার বলছিলো, আপনি ঘরে চলুন, এখানে বসে থাকলে ঠান্ডায় কষ্ট পাবেন। এসব কথা বলার পাশাপাশি ন্যান্সি বৃদ্ধাকে বার বার চা দিচ্ছিলো। সকাল হয়ে গেলো, কিন্তু মেরির বাসা থেকে কেউ তাকে নিতে এলো না।

বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, সারারাত জেগে থাকা এবং প্রচন্ড শীতে মেরির মায়ের কঠিন নিউমোনিয়া হলো। মেরিকে খবর দেয়া হলো। কিন্তু মেরির মাকে দেখতে আসার অবসর হয়নি। অবশ্য ফোনে মায়ের ভালো চিকিৎসার আগ্রহ প্রকাশ করে।

www.nagorikpathagar.org

ইতিমধ্যে মেরির মা মৃত্যুবরণ করলো। মেরি যেহেতু মাকে ভীষণ ভালোবাসতো, এ কারণে মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উত্তম ব্যবস্থা করলো।

কিছুদিন পর মেরি তার মায়ের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নেয়ার জন্যে বৃদ্ধাশ্রমে এলো। সেখানে ন্যান্সির কথা শুনে এবং মায়ের শেষ সময়ে সেবা যত্ন নেয়ার কারণে মেরি ন্যান্সির খুব প্রশংসা করলো। তারপর বৃদ্ধাশ্রমের চেয়ে অধিক বেতনের লোভ দেখিয়ে তাকে নিজের বাসায় চাকরি দেয়ার প্রস্তাব করলো। ন্যান্সি মেরির প্রস্তাব সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে বললো, আমি বিধাতার বিচার দেখার পর যাবো। আমি সেদিনই আপনার ঘরে যাবো যেদিন আপনার কন্যা এলিজাবেথ আপনাকে এ বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যাবে। সেদিন আপনার কন্যা এলিজাবেথের সেবা করার জন্যে আমি আপনার বাসায় যাবো।

এটি শুধু ঘটনা নয়; বরং বাস্তব সত্য। তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজে বর্তমানে বৃদ্ধ পিতামাতাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করা হয়। পিতামাতার সেবা দূরে থাক, সন্তানরা তাদের চেহারাও দেখতে চায় না।

মোহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পর হযরত ওয়ায়েস করনী ইসলামের পয়গাম শুনেছিলেন, পছন্দ করেছিলেন এবং মক্কায় গিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছাও করেছিলেন, কিন্তু তার বৃদ্ধ মা বেঁচে থাকার কারণে মায়ের খেদমত বাদ দিয়ে মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহশত। রসূল (স.) হযরত ওয়ায়েস করনীর কথা শুনে তাকে মায়ের খেদমত করার আদেশ দেন। ওহুদের যুদ্ধে রসূল (স.)-এর দাঁত ভেংগে যাওয়ার খবর পেয়ে ওয়ায়েস করনী নিজের দাঁত ভেংগে ফেলেন। রসূল (স.)-এর প্রতি তার ভালোবাসা কতো গভীর ছিলো, কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করতে পারেননি। কারণ গেলে মাকে নিসংগ রেখে যেতে হবে। রসূল (স.)-এর ওফাতের পরও ওয়ায়েস করনীর মা বেঁচে ছিলেন। এ কারণে রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি।

রসূল (স.)-এর সাহাবী হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, সাবালক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে রসূল (স.)-কে দেখতে হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর অবিচল থাকতে হবে। ওয়ায়েস করনী রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি, তার সামনে বসে ইসলাম গ্রহণও করতে পারেননি।

রসূল (স.)-এর সামনে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে তিনি মায়ের সেবা করাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রসূল (স.) তাঁর মজলিসে একাধিকবার ওয়ায়েস করনী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিবারই তাকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছেন।

ইসলাম ও পিতামাতার খেদমত

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের ফয়সালা হচ্ছে তোমরা শুধু তাঁর এবাদাত করবে, অন্য কারো এবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্, সন্তানের ওপর পিতামাতার হক কী? রসূল (স.) বললেন, পিতামাতাই তোমাদের জন্যে জান্নাত এবং জাহান্নাম। (ইবনে মাজা)

যদি পিতামাতার খেদমত করো তবে জান্নাত লাভ করবে। হযরত ওয়ায়েস করনী (র.) ঘরে থেকে মায়ের খেদমত করেছিলেন। জেহাদে অংশগ্রহণ না করেই তিনি সাহাবীর মর্যাদা পেয়েছিলেন। দুনিয়া আখেরাতে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যারা পিতামাতার সংগে খারাপ ব্যবহার করেছে তারা দোযখের উপযুক্ত হয়েছে। যারা পিতামাতার বার্ধক্যের সময়ে তাদের সেবা করবে না তারা নিজেদের সন্তানের কাছ থেকে বার্ধক্যে কিভাবে সেবাযত্ন আশা করতে পারে?

লাহোরে একজন রং ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯৫০ সালের দিকে তার ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হলো। লাখ লাখ টাকার ব্যবসা ছিলো তার। অর্থ সম্পদ বেশী হওয়ায় তার মনে অহংকার দেখা দিলো। মানুষকে মানুষ মনে করতো না। একদিন মা কাছে বসে উপদেশ দিয়ে বললেন, বাবা মানুষের সংগে ভালো ব্যবহার করো, অন্যদেরও মানুষ মনে করো। মায়ের এ উপদেশ তার এতো অসহ্য মনে হলো যে সে মাকে গালাগাল করলো শুধু তাই নয়, একপর্যায়ে মাকে থাপ্পড় দিলো। এ ঘটনার এক বছরের মধ্যে তার ব্যবসায় লোকসান দেখা দিলো। ধীরে ধীরে সব ব্যবসা বন্ধ হয়ে দোকানপাট সব বিক্রি হয়ে গেলো। বর্তমানে সে দু'বেলা রুটি খাওয়ার জন্যে মাজারের বাইরে বসে থাকে।

এ রকমের লোককে আল্লাহ্ তায়ালা বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখেন, যেন অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ রকমের লোককে আল্লাহ্ তায়ালা দৃষ্টান্ত করে রাখেন।

পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে একাধিক বার তাকিদ দিয়েছেন, নির্দেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তোমাদের প্রতিপালক এ ফয়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো এবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, আমি মানুষকে অসিয়ত করেছি তারা যেন নিজের প্রতিপালক এবং পিতামাতার শোকর আদায় করে।

কাজেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেমন জরুরী, একইভাবে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও করুরী।

এক লোক একদিন রসূল (স.)-এর দরবারে নিজের মায়ের খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ করেন। রসূল (স.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তোমার মায়ের অনুগ্রহের বিনিময় দিয়েছো? সে বললো, আমি তাকে কাঁধে তুলে হজ্জ করিয়েছি। রসূল (স.) বললেন, তুমি তার খেদমতের কিছুই আদায় করোনি। তাকে বার বার মায়ের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে বুঝতে পারলো, মা যদি বাড়াবাড়িও করে তবে তা সহ্য করে নেয়া তার জন্যে অত্যাবশ্যক। কোরআনের এক আয়াতে একথার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যদি তাদের মধ্যে একজন বা দু'জনই

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের সামনে বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের কখনো উহ্ শব্দ বলবে না এবং তাদের কখনো ধমক দেবে না।

যখন কোনো কষ্ট পায় তখনই মানুষ উহ্ শব্দ ব্যবহার করে। অর্থাৎ যদি পিতামাতা তোমাদের কোনো কষ্টও দেয় তবুও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের কর্তব্য। তাদের দেয়া কষ্টের বিনিময়ে ধমক দিতে কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে।

রসূল (স.) একদিন হঠাৎ বলেন, সে ব্যক্তি অপমানিত হোক, সে ব্যক্তি অপমানিত হোক, সে ব্যক্তি অপমানিত হোক। সাহাবারা জানতে চাইলেন কে সে ব্যক্তি? রসূল (স.) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারে। পিতামাতা শৈশবে লালন পালন করে যে খেদমত করেছেন, পিতামাতার সেবা সে খেদমতেরই প্রতিদান। উপকারের বিনিময়ে উপকার করার অভ্যাস পরিবারের গন্ডি থেকেই শুরু করা উচিত। রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে পারে না।

উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, উত্তম বিনিময় দেয়া জীবনের সকল পর্যায়ে প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

পিতামাতার জন্যে ব্যয়নির্বাহের ব্যাপারেও কোনো কোনো মানুষ প্রশ্ন তোলে। অথচ মানুষের স্বভাব তো এমনই হওয়া উচিত যে, কারো উপকার করলে তা খোলা মনে করবে। কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কী খরচ করবো? তাদের জবাব দাও, তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তার প্রথম হকদার তোমার পিতামাতা। পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করাও একজন মুসলমানের নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কাছে দোয়া করার নিয়ম এভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক, ওদের উভয়ের ওপর তুমি ঠিক সে রকম অনুগ্রহ করো যেরকম অনুগ্রহ তারা শৈশবে আমার ওপর করেছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি রসূল (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার কে? রসূল (স.) বললেন, তোমার মা। লোকটি বললো তারপর কে? রসূল (স.) বললেন, তোমার মা। লোকটি বললো তারপর কে? রসূল (স.) বললেন, তোমার বাবা। (আল আদাবুল মোফরাদ)

পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাদের মন যুগিয়ে চলা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করা এমন একটি প্রশিক্ষণ, যা প্রতিটি মানুষ সচ্চরিত্রতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে লাভ করে। পিতামাতার সংগে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা এবং গুরুজনদের সম্মান করার শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজে আসে। প্রসংগত উল্লেখ্য, পিতামাতা সব সময়েই সন্তানের জন্যে দোয়া করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চদশ অধ্যায়

মদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা লানত করেছেন মদের ওপর, মদপানকারীর ওপর, যে ব্যক্তি মদ তৈরী করে তার ওপর, যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে তার ওপর, যে ব্যক্তি মদ পান করায় তার ওপর, যে ব্যক্তি মদ বহন করে তার ওপর, যার জন্যে মদ পরিবহন করা হয় তার ওপর। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মেশকাত ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম স.)

মদ মানবতার নিকৃষ্ট শত্রু

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, তোমাকে তারা মদ এবং জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এ দু'টি জিনিসের মধ্যে জঘন্যতম অকল্যাণ রয়েছে, যদিও কিছু কল্যাণও রয়েছে, কিন্তু অকল্যাণের পরিমাণ কল্যাণের চেয়ে অধিক।

অধ্যাপক হার্শ-এর লিখিত গ্রন্থের পর্যালোচনা

স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হার্শ এ বিষয়ের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার আমেরিকা মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পরের বছরও তা বহাল রাখতে পারেনি। অথচ ইসলাম চৌদ্দশ বছর আগেই মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এ নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সভ্যতা সংস্কৃতি এবং মানবতাকে অনেক ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে।

কোরআনের তিনটি সূরায় মদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেটা পরে উল্লেখ করবো। দ্বিতীয়ত সূরা নেসার ৪৩ নং আয়াতে মদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত বিধান দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত সূরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে এ সম্পর্কিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কয়েকজন মোফাসসেরের মতে মদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যান্য আলেমদের মতে মদ সম্পর্কিত বিধানে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। একটি আদেশ অন্য আদেশের পরিপূরক। আপাতদৃষ্টিতে বর্ণনায় পার্থক্য দেখা গেলেও মৌলিক বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

মদ পান করা কিংবা মজুদ রাখার অনুমতি উল্লিখিত তিনটি সূরার একটিতেও দেয়া হয়নি। তিনটি সূরার বর্ণনাতেই মদ থেকে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ আলাদাভাবে বর্ণনা করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে মদের অপকারিতা বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যেহেতু আমরা কোরআনের আয়াতকে বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করছি, কাজেই উপরোক্ত আয়াতও বিজ্ঞানের আলোকেই ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.nagorikpathagar.org

মদ মানুষের দেহে কি রকম বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে মদের রাসায়নিক অংশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে।

রসায়ন বিজ্ঞানের আলোকে আমরা একথা জানি, মদের মধ্যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এলকোহলসহ আরো বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। খাদ্য পানীয় হজম করার ক্ষেত্রে মদের কোনো ভূমিকা নেই; বরং হজমের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। এ কারণেই মানবদেহের জন্যে মদ একটি ক্ষতিকর কেমিক্যাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মদের বিষাক্ত উপাদান মানুষের হৃৎপিন্ডে সরাসরি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

খাদ্যদ্রব্য হিসেবে মদের কোনোই গুরুত্ব নেই। যারা মদ পান করে তারা যদিও এটাকে এক প্রকার খাদ্য হিসেবে দাবী করে। মদ পেটের ভেতর পৌঁছার পর অন্যান্য খাদ্যের বিপরীতে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অবস্থার সৃষ্টি করে।

হজম ব্যবস্থার ওপর মদের প্রভাব

মদের প্রভাব প্রথমে পড়ে মুখের ওপর। সাধারণত মুখের ভেতর বিশেষ রকমের ফ্লোরা থাকে। এটা এক ধরনের লালা। মদের ঝাঁজের কারণে এ লালার শক্তি কমে যায়। ফলে দাঁতের মাঢ়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যারা নিয়মিত মদ পান করে তাদের দাঁত খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, কালচে রং ধারণ করে। মুখের পরে মদের প্রভাব পড়ে গলা এবং খাদ্যনালীর ওপর। এ দু'টি অংগ পরস্পর সংযুক্ত। এই খাদ্যনালী মানবদেহের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সম্পন্ন করে। খাদ্যনালীতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি পর্দা রয়েছে। ইংরেজীতে একে বলা হয় মুকাস মেমব্রেনস। এ স্পর্শকাতর পর্দার ওপর মদের প্রভাব পড়ে তীব্রভাবে। এতে ঐ পর্দায় এক প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হয়। ফলে গলা ও খাদ্যনালীতে দুর্বলতা দেখা দেয়। গলা ও খাদ্যনালীতে ক্যান্সার মদের কারণেই হয়ে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠান ঘাতকব্যাধি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা ১৯৮০ সালের পর থেকে মদের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী দৃঢ় কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

একথা তো সবাই জানে, মদের কারণে পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক তৈরী হয়। গ্যাস্ট্রিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, পাকস্থলীতে লিপিড নামের একটি চর্বি রয়েছে যা মদের দ্বারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লিপিড পাকস্থলী রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। লিপিড থাকার কারণে পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরাক এসিড কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। মদের কারণে গলায় এবং খাদ্যনালীতে ক্যান্সার হয় এটা নিশ্চিত প্রমাণিত, কিন্তু পাকস্থলীর ক্যান্সার মদের কারণে হয় কিনা এটা এখনো প্রমাণিত হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ইতিমধ্যে এ রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পাকস্থলীর ক্যান্সারও মদের কারণেই হয়ে থাকে।

মদপানের সবচেয়ে বেশী প্রভাব অত্যন্ত নাজুক ১২টি অন্ত্রের ওপর পড়ে। এটা হচ্ছে প্রচন্ড রাসায়নিক প্রভাব। মদ সেখানে রাসায়নিক প্রভাব বিস্তার করে যেখানে হজমের জন্যে লালা বের হয়। যারা নিয়মিত মদপান করে তাদের অন্ত্র এবং পিত্তের ঝিল্লি সব সময় রোগাক্রান্ত থাকে। অথবা এদের কাজ স্বাভাবিক থাকে না। এ অবস্থা

www.nagorikpathagar.org

গ্যাস এবং বদহজমের মাধ্যমে মদপানকারীকে সমস্যায় ফেলে। পাকস্থলীর এ সমস্যা অন্ত্রের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হজমের কম্পিউটার সদৃশ ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যায়। যদিও একজন সুস্থ সবল মানুষের যাবতীয় খাদ্যই হজম হয়ে যায়, কিন্তু এটা হজম ব্যবস্থাকে বিশেষ নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। মদ্যপায়ীদের এ ব্যবস্থার ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। হজম ব্যবস্থায় গোঁজামিল সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ মোটা হয়ে যায়। দেহকোষে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়। চর্বি অধিক পরিমাণে মায়োকর্ডিক টিস্যুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পরিণামে গুরুতর হৃদরোগ সৃষ্টি হয়।

মদের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়ে লিভারের ওপর। মানুষের লিভার হচ্ছে একটি স্পর্শকাতর ল্যাবরেটরির মতো। এ লিভারে মদের প্রতিটি ফোঁটা বিষের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লিভারের ওপর মদের প্রভাব দু'ভাবে হয়ে থাকে।

প্রথমত মদপান লিভারের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত করে। দ্বিতীয়ত লিভারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মদের বাধাহীন প্রভাবে লিভারকে একই কাজ বার বার সম্পন্ন করতে হয়। পর্যায়ক্রমিক পরিশ্রমের কারণে লিভার দুর্বল হয়ে যায়, পরিণামে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। একপর্যায়ে লিভার অকেজো এবং নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত মদপানের কারণে একে একে লিভারের সকল কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে পড়ে। লিভার রক্ত তৈরীর কাজ করে, কিন্তু মদ্যপায়ীর লিভার পরিমিত রক্ত উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে না। এ কারণেই দেখা যায়, যারা নিয়মিত মদ পান করে তারা ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যায়। যদিও বাইরে থেকে দেখলে তাদেরকে স্বাস্থ্যবান এবং সবল মনে হয়। কারণ তাদের শরীরের রক্ত তৈরীর কার্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। বিশেষত লিভারের যে শক্তির সাহায্যে দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা পায় এবং ইমোনো গ্লোবিন তৈরী হয়, সেটা মদ্যপায়ীদের বিশেষভাবে কমে যায়। এর ফলে তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে।

মদপানের ফলে লিভারের স্বাভাবিক তৎপরতা হঠাৎ করে কমে যাওয়ার কারণে বেহুশ হয়ে অজ্ঞানতার মধ্যে তার মৃত্যুও হয়। একে বলা হয় লিভারের ব্যাংকরাপথেসি। মদপানে লিভারের ক্ষতি হয়নি এরকম একজন লোকও পাওয়া যাবে না। বিষয়টি এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রক্ত চলাচল ব্যবস্থার ওপর মদের প্রভাব

রক্ত চলাচল ব্যবস্থার ওপর মদের প্রভাব দু'ভাবে পড়ে। এক, লিভারের সরাসরি প্রভাবে। দ্বিতীয়তঃ প্রভাব পড়ে মিকার্ডো টিস্যুর ওপর। এ প্রভাব পড়ার কারণে লিভার পরোক্ষভাবে রক্তের মধ্যে চর্বি খাদ্য মিশিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এর মধ্যে দুর্বলতা তৈরী হয়। পরিণামে প্রবাহিত রক্তে আর্টেরিওস ক্লোরোসিস ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন তৈরী হয়। অন্যদিকে মদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কারণে রক্ত প্রবাহের বিশেষ পদ্ধতিতে

www.nagorikpathagar.org

বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে পরিণামে মানসিক ক্লান্তি সৃষ্টি হয়। উপরন্তু মদের কারণে হৃৎপিন্ডে চর্বির অংশ জমা হয়। ফলে দেহের অংগসমূহে শিথিল ভাব তৈরী হয়। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মদ্যপায়ী লিভারের সমস্যায় আক্রান্ত হবার ফলে হয় তো হার্টফেল করে অথবা তার লিভার নষ্ট হয়ে যায়। যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয় তাদের জন্যে একফোঁটা মদও মারাত্মক ক্ষতি করে। এ রকম ব্যক্তি মদ স্পর্শ করলে বুঝতে হবে, সে জীবনের প্রতি কোনো ভালোবাসা রাখে না, অথবা নিজের দেহের কোনো অংশের ক্ষতির সে পরোয়া করে না।

একশ্রেণীর রসবোধসম্পন্ন মানুষ মনে করে, সামান্য পরিমাণ মদ পান করা হলে মন প্রফুল্ল হয় এবং ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এ কারণে এটাকে মদপানের উপকারিতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরকম চিন্তার কোনো গুরুত্ব নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মদের উপকারিতা সম্পর্কে এরকম কোনো কথা নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু লোক চিকিৎসাবিজ্ঞানের নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক তথ্য উপস্থাপন করে থাকে।

মদ কিডনির ওপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিডনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। কিডনি মানবদেহে চালুনির কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যে মদে এলকোহলের পরিমাণ কম থাকে সে মদও কিডনির জন্যে ক্ষতিকর। এ কারণেই দেখা যায়, যারা নিয়মিত বিয়ার পান করে তাদের অধিকাংশেরই কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর রহমত দিয়ে মানব জীবনকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করেছেন। যদি আমরা মহান আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান না করতাম তাহলে পান করার সাথে সাথেই বুঝতে পারতাম, মানবদেহের জন্যে মদ কতোটা ক্ষতিকর। কিছু লোক গালভরা দাবী করে, মদপানে তাদের নেশা হয় না, কিন্তু এ দাবী শিশুদের মতো অবুঝ লোকেরাই করতে পারে যা আত্মপ্রতারণার শামিল।

সামাজিক মনস্তত্ত্বের ওপর মদের প্রভাব

মদ কিভাবে সামাজিক সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত করে নীচে আমি সে সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করছি ঃ

১. যারা মদ পান করে তাদের মন মেযাজ থাকে রুক্ষ ও উগ্র। তারা সমাজে নানারকম ঝগড়া কলহের কারণ ঘটায়।

২. স্ত্রী তালাকের ঘটনা মদপানের কারণেই অধিক ঘটে। এসব তালাকের ফলে গুরুতর সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তালাকের পরিণামে সমাজে অপরাধপ্রবণ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমাজ জীবনে এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী।

৩. শ্রমিক এবং কারিগরদের মদের কারণে কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। তাদের দক্ষতা ও কর্ম নৈপুণ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। পরিণামে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. মদপানের কারণে সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা নষ্ট হয়। ফলে সামাজিক জীবনের ঐক্য শৃংখলা ধ্বংস হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত চারটি সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা করে চলেছেন। তারা নিজ নিজ সরকারকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যদি মদপানের প্রবণতা এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে জাতিগত প্রেরণা উদ্দীপনাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কোরআনের মদ সংক্রান্ত বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর কোনো সমাজ সংস্কারক বা কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে মদপান সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। যদিও তারা জানেন, মদপান সমস্যার কারণে সমাজের ভিত্তিমূলে ঘুণপোকা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সে ঘুণ সমাজকে কুরে কুরে খেতে থাকে। আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের কারণে মুসলিম সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী এ বিপদ থেকে নিরাপদ রয়েছে। (ডাক্তার হালুক বাকীর গবেষণা)

নেশা, স্বাস্থ্য, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, ইসলাম মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেছে। হালাল হারাম, জায়েয নাজায়েয বিষয় বিবেচনা করে ইসলাম মানুষের ওপর বড় রকমের অনুগ্রহ করেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে কিছু জিনিস হালাল এবং কিছু জিনিস হারাম করা হয়েছিলো বটে, কিন্তু হালাল হারাম নির্ধারণের কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। নেশাজাত জিনিসের ব্যাপারে তাওরাতে কোনো নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়নি; বরং মদের বিষয়ে প্রশংসা বাক্য লিখিত রয়েছে। হিন্দু ধর্মে আফিম, ভাং, চরস ইত্যাদি নেশাজাত জিনিস ব্যবহার করা ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে সোমরস বা ভাং পানের উপকার বর্ণনা করার প্রশংসা করা হয়েছে।

খৃস্টান অধ্যুষিত দেশসমূহে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মদের ব্যবহার এতো বেশী যে, মনে হয় সেসব অনুষ্ঠানে যেন মদের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। বড় দিন উপলক্ষে মদে ভেজানো রুটি তাদের এবাদাতগোজার নারী পুরুষ, শিশু যুবক ও বৃদ্ধদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ রুটি যীশুর গোশত এবং মদকে যীশুর রক্তের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।

বর্তমান যুগে উন্নত বা উন্নয়নশীল অমুসলিম দেশসমূহেও মদ এবং অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যকে জীবনের প্রয়োজনীয় অংশ মনে করা হয়। যুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষ সৈন্যদের পর্যাপ্ত পরিমাণে মদ সরবরাহ করে থাকে। এ কারণে যুদ্ধের সরঞ্জামের মধ্যে বিপুল পরিমাণ মদও পরিবহন করা হয়। ইসলামে সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্য– আফিম, চরস, ভাং, মদ ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। পরিমাণ কম বেশী যা-ই হোক, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সূরা বাকারার ২৭তম রুকুতে বলা হয়েছে, লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। তবে এতে মানুষের জন্যে উপকারও আছে, কিন্তু তার পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। (সূরা বাকারা)

সূরা মায়েদার ১২তম রুকুতে বলা হয়েছে, হে মোমেনরা, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক সর ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? (সূরা মায়েদা)

রসূল (স.) বলেছেন, যে জিনিস বেশী নেশা সৃষ্টি করে তা স্পল্প পরিমাণে ব্যবহার করাও হারাম।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই ইসলামে হালাম হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। মদ এবং অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যাদির মন্দ প্রভাব মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর পড়ে। এ প্রভাব কিভাবে পড়ে সেটা বর্তমান যুগের ককটেল পার্টিতে গেলেই বুঝা যায়।

কেউ কেউ বর্তমানে মদের ব্যাপক প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করে থাকে। তারা বলে, শীতকালে শীত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সামান্য কিছু পরিমাণ মদ পান করা দূষণীয় নয়। অধিক মদ পান করা হলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, এ কারণে অধিক মদ পান নিষিদ্ধ, কিন্তু যারা এরকম যুক্তি দেখায় তারা বুঝতে পারে না যে, মদ হচ্ছে এক প্রকারের কাদা, এ কেউ যদি একবার এতে জড়িয়ে যায় তবে সেই কাদা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কাদায় ক্রমেই নীচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকে। ক্ষতিকর কোনো জিনিসের অল্প পরিমাণ থেকে যদি মানুষ বিরত না থাকে তবে অধিক ব্যবহারের ক্ষতি থেকেও মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ছোট পাপ করার ফলে বড় পাপের সাহস মনে তৈরী হয়ে যায়।

মহানবী (স.) হারাম জিনিসকে সরকারী চারণভূমির সাথে তুলনা করেছেন। সরকারী চারণভূমির ধারে কাছেও পশু চারণ বিপজ্জনক। কাজেই সেই চারণভূমির ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না।

এ উদাহরণ দিয়ে রসূল (স.) মানুষের প্রবৃত্তিকে পশুর সাথে তুলনা করেছেন। কেননা প্রবৃত্তি মন্দ কাজে মানুষকে প্ররোচিত করে। সরকারী চারণভূমির কাছাকাছি যাওয়া পশু সেই চারণভূমিতে মুখ লাগানোর চেষ্টা করে কিছু খায়। একপর্যায়ে এক পা ভেতরে ঢোকায়। তারপর ধীরে ধীরে সেই চারণভূমির ভেতরে প্রবেশ করে। অবশেষে কেউ পিটিয়ে বের না করা পর্যন্ত সেখান থেকে বের হতে চায় না।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন জীব হওয়ার কারণে নিজেই নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। অন্য মানুষ তার ওপর জোর খাটাতে পারে না। মানুষের এই স্বাধীনতা অন্যান্য বিবেকহীন জীবের চেয়ে তার জন্যে মারাত্মক প্রমাণিত হয়। ভারতের মধ্য প্রদেশের রাহটুল জেলার এক গ্রামের এক পানশালায় কয়েকজন মদ্যপায়ী এ মর্মে বাজি ধরেছিলো যে, কম সময়ে কে দশ বোতল মদ পান করতে পারবে। একজন লোক বাজিতে জিতে গেলো, কিন্তু দশ বোতল মদ পান শেষ করার পর পরই সে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। (বার্তা সংস্থা এপিপি, দিল্লী থেকে ১৯৬০)

অভিজ্ঞতা বলে, নেশার জগতে জড়িয়ে যাওয়া মানুষ খুব কম ক্ষেত্রেই সে জগত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যারা অল্প মদ পান করে তারা পর্যায়ক্রমে অধিক মদপানে অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরিণামে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ধ্বংস করে।

www.nagorikpathagar.org

১৯৮৫ সালে বার্তা সংস্থা স্টার পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার রোলোহারজার লেখেছেন, মদের প্রভাব অধিকাংশই মস্তিষ্কের ওপর পড়ে। মদ পান করার সাথে সাথে তা রক্তের সাথে মিশে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডে মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সামান্য পরিমাণ মদও প্রতিক্রিয়াবিহীন থাকে না।

মদের মন্দ প্রভাবের কারণে মুসলমানরা মদকে উম্মুল খাবায়েছ, অর্থাৎ সকল দুষ্কর্মের উৎসমূল আখ্যায়িত করেছে। শুধু মদ নয়, সকল নেশাজাত দ্রব্যই দুষ্কর্মের মূল। কারণ প্রতিটি নেশাজাত জিনিসই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আফিম, ভাং, চরস ইত্যাদি নেশাজাত দ্রব্য মানুষের রক্তে একপ্রকার জোশ সৃষ্টি করে। মদ পান করার পর সে ব্যক্তি হুশ জ্ঞান হারিয়ে কখনো গালাগাল করতে থাকে, কখনো নিজের জীবন বিসর্জন দিতে যায়, কখনো কাউকে প্রহার করতে যায়, কখনো কাঁদে, কখনো ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। নেশায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি এমন বিস্ময়কর আচরণ শুরু করে যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষ সে ব্যক্তিকে দেখাও পছন্দ করে না।

মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের এ থেকে বিরত রাখার জন্যে জাপানী পুলিশ একবার একটি ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলো। নেশায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির কর্মতৎপরতা ভিডিও করে রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা এ ব্যবস্থা করেন। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে আসার পর তার নেশাগ্রস্ত অবস্থার কর্মতৎপরতা তাকে দেখানো হলে সে তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। মাথা নীচু করে থাকে।

এখানে সমাজের অন্য একটি বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে। মদপানে অভ্যস্ত একজন লোক তার সংগীকেও মদপানে বাধ্য করে। মদের নেশায় আচ্ছন্ন হওয়ার পর মদ্যপায়ী ব্যক্তি উদার, খোশ মেযাজ, মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয়কারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অনেক সময় মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি নেশায় মাতাল হয়ে মদপানে অনভ্যস্ত অপরিচিত ব্যক্তির মুখেও মদ ঢেলে দেয়।

বোম্বাইতে আমি নিজে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। মিল কারখানার নারী এবং পুরুষ শ্রমিকরা বেতন পাওয়ার সাথে সাথে নিজের সন্তানসহ মদ-তাড়ির দোকানে চলে যায়। সেখানে নিজে মদ পান করে এবং ছোট শিশুদের মেরে মেরে মদ তাড়ি পান করায়। এ কারণেই ইসলাম মদপানের মজলিসের কাছে যেতেও নিষেধ করেছে।

ইউরোপ আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাযক্রম দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তারা কোকেন, ভাং, চরস, আফিম, ঘুমের ওষুধ বিভিন্ন দেশে আমদানী রফতানী সম্পর্কে কঠোর ভূমিকা পালন করে। মদের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনেও তারা পালন করে বিশেষ ভূমিকা। এসব অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড, অর্থ জরিমানাসহ নানারকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে, কিন্তু তাদের দেশে মদের ব্যাপক ব্যবহারের ভয়ানক ক্ষতি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নির্বিকার। তারা মনে করে মদ তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির অংগ।

www.nagorikpathagar.org

১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের একটি কমিশন এ বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, যারা আফিম এবং অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যের ব্যবসা করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যেসব দেশ এরকম ব্যক্তিদের শাস্তি দিয়েছে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তুরস্ক, ইরান এবং অন্য কয়েকটি দেশে এরকম ব্যবসায়ীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৮৫ সালে আমেরিকায় এক ব্যবসায়ীকে এ রকম দু'টি অপরাধের কারণে বিশ বছর করে মোট চল্লিশ বছর কারাদণ্ড দিয়ে এ শাস্তি একই সাথে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা ১৯৬১ সালের মে মাসে জেনেভা কনভেনশনে এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে যে, বর্তমানে মাদক নিয়ন্ত্রণে যে ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় এবং চোরাচালান অপরাধে জড়িতদের আরো কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। (জেনেভা, ৫ই জুন, ১৯৬১ পিপিএ)

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ সংস্থা মানুষের সেবা করছে বলে দাবী করে, কিন্তু এ সংস্থা মাদকের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে রাযি নয়। কারণ জাতিসংঘকে যারা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করে তারা মাদকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় না। জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা জনমতের বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস রাখে না, সে সিদ্ধান্ত যতোই বাস্তবসম্মত হোক না কেন। অথচ আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বড় বড় দেশের পুলিশ, বিচার বিভাগ প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদনে কিশোর অপরাধের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে। এসব প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কিশোর কিশোরীদের মধ্যে মদের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অবৈধ যৌন সংসর্গ, অবৈধ সন্তান ধারণ, দূরারোগ্য ঘাতক ব্যাধি, বেপরোয়া গাড়ী চালনা ইত্যাদি দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পচ্ছে। অথচ জাতিসংঘ এ সকল অপরাধ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

১৯৫৮ সালের ৫ই জুলাই মস্কো থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছে, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ লেনিনগ্রাডের ক্রোফ কারখানায় শ্রমিকদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণে বলেন, মদ আমাদের সামাজিক জীবনে ধ্বংসাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করছে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য খোকলা করে দিচ্ছে, পারিবারিক জীবন ধ্বংস করছে। অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীনভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো।

১৯৫৮ সালের ১৫ই অক্টোবর মস্কো রেডিওর খবরে প্রকাশ, মদের বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন যুদ্ধ করার অংগীকার যিনি করেছিলেন সেই সমাজতান্ত্রিক নেতা মাত্র তিন মাস পর তার জন্মভূমির কালিনোফোকায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় এ দৈত্যের সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন। সে বক্তৃতায় অসহায়ের মতো ক্রুশ্চেভ বলেন, আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নে মদ নিষিদ্ধকরণ আইন বাস্তবায়িত করতে চাই না। মদ পান আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির অংশ। কেউ আমাদের সমাজের লোকদের মদপানে বাধা দিতে

www.nagorikpathagar.org

পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অনুরোধ করছি, মানুষ যেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। আমরা নতুন একটি আইন করতে যাচ্ছি। সে আইন অনুযায়ী মদ্যপায়ী মদের কারখানা থেকে সর্বোচ্চ মাত্র এক বোতল মদ নেয়ার অধিকার পাবে। একই সাথে ক্রুশ্চেভ বলেন, যদি আরো এক বোতল পান করার কারো ইচ্ছা হয় তবে তাকে অন্য কারখানায় যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, এক মদের কারখানা থেকে অন্য মদের কারখানায় যাওয়ার পথে জেলখানায় যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

১৯৫৯ সালের ১০ই জুলাই তারিখে দৈনিক প্রাভদায় সন্তান রয়েছে এমন মায়েদের প্রকাশিত এক চিঠিতে একটি দাবী পেশ করা হয়। উক্ত চিঠিতে জানানো দাবী হচ্ছে, নিয়মিত মদপানের ফলে অসুস্থ লোকদের সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই চিকিৎসার আংশিক ব্যয়ভার আমরা বহন করবো। তারা আরো উল্লেখ করেছেন, ভদকার মূল্য বৃদ্ধি করা, মাতলামি করা হলে জেলখানায় নেয়া ইত্যাদি পদক্ষেপ মদ্যপায়ীদের ওপর কার্যকর প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। কোনো মা তার সন্তানকে, কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে জেলখানায় পাঠাতে চায় না। এ সকল মদ্যপায়ীর বেতন ভাতা যেন আমাদের কাছে পাঠানো হয়। কারণ নিয়মিত যারা মদ পান করে তারা নিজেদের প্রাপ্ত ভাতার পুরোটাই মদের পেছনে ব্যয় করে। এমনকি নিজেদের পোশাক বিক্রির টাকা দিয়েও তারা মদ পান করে। এমনকি এরা মদের পয়সা যোগাতে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রীও বিক্রি করে।

১৯৬১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রুশ সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ায় বার্তা সংস্থা রয়টার পরিবেশিত এক খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, মিস্টার ক্রুশ্চেভ এক কৃষক সমাবেশে বক্তৃতায় বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি রাজ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। সবচয়ে বড় কথা হচ্ছে, মদ্যপায়ী, মুনাফাখোর এবং যারা মানুষের রক্ত শোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও মদপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের পদস্থ কর্মকর্তারাও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে অবৈধ পন্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী মদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। ১৯৬১ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে বার্তা সংস্থা পিপিএ এবং ডিপিএ পোল্যান্ডের রাজধানী থেকে একটি খবর পরিবেশন করে। সে খবরে বলা হয়েছে, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সরকারী মালিকানাধীন মদ উৎপাদন কারখানার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের বাসভবনে এক ভোজসভায় মিলিত হন। সেখানে দেশের প্রধান আইনজীবীও যোগদান করেন। এক সময় পিপাসা লাগলে তিনি ঠান্ডা পানি চান। এক পর্যায়ে তিনি বাবুর্চিখানায় গিয়ে পানির নল ঘোরান, কিন্তু পানির পরিবর্তে গ্লাসে ভদকা এসে পড়ে। কারণ মদ কারখানার তত্ত্বাধায়ক অবৈধ উপায়ে নিজের বাসভবনে ভদকা সরবরাহের লাইন স্থাপন করেন। সরকারী সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে পরে সেই তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

ফ্রান্সে মদের বিরুদ্ধে জনমত জোরদার হতে শুরু করলে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে মদ প্রস্তুতকারক কারখানাসমূহের মালিকদের সভাপতির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করেন। তারা প্রেসিডেন্টের কাছে এ দাবী জানান, মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনি ঘোষণা দিন যে, মদ হচ্ছে আমাদের জাতীয় পানীয়। মদপান যে স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর, এ সম্পর্কিত বহু উদাহরণ প্রত্যেক দেশেই পাওয়া যাবে, কিন্তু যেসব দেশে মদ ব্যাপকভাবে পান করা হয় সেসব দেশের ক্ষতির চিত্র দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

ফ্রান্সে হোটেলসমূহে খুব কম দামে মদ পাওয়া যায়। অথচ সাদা পানি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালের এক রিপোর্টে জানা যায়, মদপানের কারণে সৃষ্ট মারাত্মক রোগে প্রতিবছর ফ্রান্সে পনের হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। এর কয়েকগুণ বেশী লোক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। প্রতি পঁয়ত্রিশ মিনিটে একজন লোক মদপানজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একবার সৌদী বাদশাহ্ শাহ্ সউদকে সৌদী আরবে মদ নিষিদ্ধ করায় প্রশংসা করে বলেন, আমেরিকায় প্রতিবছর ৬৮ হাজার মানুষ মদপানের কারণে মৃত্যুবরণ করে।

উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যান সামনে নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, সমগ্র বিশ্বে মদ পানের কারণে প্রতিবছর কতো সংখ্যক মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং খৃস্টান অধ্যুষিত দেশে প্রতিবছর ইংরেজী নববর্ষে এবং বড়দিনে (পঁচিশে ডিসেম্বর) সাধারণ মানুষ তো বটেই, ধর্মীয় নেতারাও মদ পানে মেতে ওঠেন। নীতি-নৈতিকতা সংযমের কোনো বালাই থাকে না। এ সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরীরা যেরকম বেহায়াপনা বেলেল্লাপনায় মেতে ওঠে, পরদিনের সংবাদপত্রসমূহে তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

পারিবারিক জীবনে মদের অশুভ প্রভাব সম্পর্কে আমেরিকার আরিজোনা অংগরাজ্যের এলকোহল এডুকেশন কমিটি এবং মদ সংস্কারক কমিটির উদ্যোগে একটি রিপোর্ট প্রণীত হয়। ডক্টর এওয়ার্ড এম স্কট প্রণীত উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এ রাজ্যে ৫৬ শতাংশ পুরুষ মদপানের পরিণামে স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটায়।

ভ্যাটিক্যান সিটির বিখ্যাত সংবাদপত্র অবজারভেটিভ রোমানো ১৯৬০ সালের ২০ নভেম্বর ককটেল মদের বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, ককটেল মদ মাঝে মধ্যে পান করা যেতে পারে, কিন্তু নিয়মিত ককটেল মদপান দৈহিক এবং চারিত্রিক অধপতন ত্বরান্বিত করে। ককটেল মদ নানারকম শারীরিক রোগের জন্ম দেয়। এ মদপানের কারণে লিভার, কিডনি, হার্ট দুর্বল হয়ে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে, রাতে ঘুম হয় না, ঘুমালেও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

১৯৫৯ সালের ১৯ জুলাই মস্কোর এক মাতাল ড্রাইভারের গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনটি স্কুল বালক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। আদালত সে ড্রাইভারকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। উচ্চ আদালতে আপীল করার পরও মৃত্যুদন্ড রহিত হয়নি; বরং উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখে। এসব দেশ যদি মদের ক্ষতি এবং ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মদ্যপান বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতো, কি যে ভালো হতো।

রসূল (স.) মদ পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মদ পান করবে না কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের উৎস। সাধারণত মদপানের কাজে ব্যবহার হয় এ রকম পাত্র ব্যবহার করতেও রসূল (স.) নিষেধ করেছেন।

মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহারও মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে। এসব হচ্ছে সিগারেট, চা, আইসক্রিম এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য। উল্লিখিত পাঁচটি জিনিস ধূমপান, চা, আইসক্রিম, মদ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যকে অনেকেই নেশাজাত জিনিস মনে করে না। বিশেষত ধূমপান, চা, আইসক্রিম তো নেশাজাত জিনিস হিসেবে অনেকেই মানতে চায় না। এ কারণে শিশু যুবক, বৃদ্ধ, নারী পুরুষ সবাই এসব জিনিসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এসব জিনিসকে মনে করা হয় জীবনের অংশ। কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে দাবী করা যায়, উল্লিখিত পাঁচটি জিনিসই স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিয়ে এবং আধুনিক বিজ্ঞান

বালেগ হওয়ার পর বিয়ে করা সুন্নত। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষ সাবালক হওয়ার পর পরই তার বিয়ে করানো উচিত। যদি না করানো হয় তবে কি ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে নীচে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

ডাক্তার ওয়াচার লোহাক-এর তথ্য

ডাক্তার ওয়াচার লোহাক সিডনির বিশিষ্ট চিকিৎসক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বালেগ হওয়ার পর যদি দেরীতে বিয়ে করানো হয় তবে দেহের যৌন হরমোনের প্রবাহ কমে যায়। ধীরে ধীরে যৌন ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে, এডরিনাল গ্লান্ডে সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিয়ে না করানো হলে সামাজিক জীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। পরে বিয়ে করানোর পরও এ সমস্যার শেষ হয় না। বদভ্যাস রপ্ত হওয়ার পর এর খেসারত দিতে হয় জীবনভর। এমনি করে সমাজজীবনে অশান্তি বিশৃংখলা দেখা দেয়।

বর্তমানে সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে যুব সমাজের নৈতিক অধপতন। যৌন জীবনে বিশৃংখলা এবং নির্লজ্জতার প্রসার ঘটে চলেছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে প্রাপ্তবয়সে বিয়ের ব্যবস্থা করা, কিন্তু আধুনিক সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিয়ে কঠিন এবং ব্যভিচার সহজ হয়ে ওঠেছে। বর্তমানে সমগ্র ইউরোপ যৌন কেলেংকারিতে জড়িত। ইউরোপের প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই নিশ্চিন্তে অনৈতিক জীবন যাপন করেন। ইসলাম কি খৃস্টধর্মের মতো ধর্ম? মোটেই নয়। ইসলাম মানুষকে সরল সহজ পথ নির্দেশ করেছে।

খতনা

খতনা নির্ভেজাল ইসলামী নিদর্শন। অন্য কোনো ধর্মে খতনার প্রচলন নেই। যেসব ধর্মের লোকেরা খতনা করে না তারা এমন রোগে আক্রান্ত হয়, যে রোগে খতনা করা লোকেরা আক্রান্ত হয় না।

ডাক্তার ওয়াচার খতনা সম্পর্কে গবেষণা করে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা নিম্নরূপ–

১. যারা খতনা করে তাদের পুরুষাংগে ক্যান্সার হওয়ার আশংকা থাকে না।

২. খতনা না করা হলে প্রস্রাব বন্ধ এবং কিডনিতে পাথর হওয়ার আশংকা থাকে। খতনা না করার কারণে কিডনিতে পাথর হওয়া রোগীর সংখ্যা অনেক।

www.nagorikpathagar.org

৩. খতনা করার ফলে অশ্লীল যৌন চিন্তা ও যৌন আকাংখা থেকে মন মুক্ত থাকে।

৪. খতনা না করার কারণে যৌনাংগে দূরারোগ্য ব্যাধি দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে যৌনাংগে একজিমা, এলার্জি তৈরী হয়।

৫. খতনাবিহীন পুরুষের রোগ সহজেই মহিলাদের যৌনাংগে সংক্রমিত হয়।

৬. খতনাবিহীন লোকেরা খুব সহজে সিফিলিস, গনোরিয়ার মতো ঘাতক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। (সায়েন্স আওর দুনিয়া)

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, খতনাবিহীন ব্যক্তির সন্তান জন্ম হয় না। তার যৌনশক্তি কমে যায়। ফলে স্বামী স্ত্রী স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে ন্যায্য যৌন সুখ থেকে বঞ্চিত হয়।

খতনা এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতি

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে নিজস্ব পরিবেশ অনুযায়ী খতনার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। নাভি কাটা, শিশুকে গোসল করানো, শাল দুধ খাওয়ানো ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে প্রচলিত, কিন্তু খতনা সুন্নতে ইবরাহীমী। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যেই খতনার প্রচলন দেখা যায়। এটাকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধান মনে করা হয়। খৃস্টানরা যদিও এ সুন্নত ত্যাগ করেছে, কিন্তু মুসলমান এবং ইহুদীরা এ সুন্নত যথারীতি পালন করে চলেছে।

পাশ্চাত্যের খৃস্টানদের ধারণা. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগেও খতনার প্রচলন ছিলো, কিন্তু তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর আদেশ মোতাবেক হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর আশি বছর বয়সের সময় খতনা করেন এবং নিজের পরিবারের পুরুষদের খতনা করান। আল্লাহর কাছে তিনি যেসব অংগীকার করেছিলেন সেসব অংগীকারের মধ্যে এটাও ছিলো, ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে এ সুন্নতের প্রচলন অব্যাহত রাখবেন। এ অংগীকারের অংশ হিসেবেই হযরত ঈসার জন্মের অষ্টম দিনে তার খতনা করা হয়। যদিও ঈসায়ী ধর্মের অনুসারীরা পরবর্তীকালে এ সুন্নত ত্যাগ করেছে। খৃস্টান লেখক সেক্সপিয়র তার ওথেলো নাটকে নায়কের আত্মহত্যার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, নায়ক নিজের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং চিৎকার করে বলেছে, ওই মেয়ে, আমি খতনা করা এক কুকুরের পেট এভাবেই চিরে দিয়েছিলাম।

পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরা খতনার উপকারিতা উপলব্ধি করে, কিন্তু খৃস্টানদের খতনার প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার কারণে তারা এর ব্যাপক প্রচলনের কথা বলতে ভয় পান। তবে কিছু কিছু রোগীকে তারা খতনা করার জন্যে ব্যবস্থাপত্র দেন। কারণ খতনা না করে তাদের উপায় থাকে না।

বর্তমান যুগে রোগীর দেহে অন্যজনের রক্ত দেয়ার প্রচলন ব্যাপকতা পেয়েছে, কিন্তু রোগীর দেহে সুস্থ সবল মানুষের রক্তই দিতে হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কোনো কোনো রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রোগীর দেহে বিশেষ অংশ থেকে রক্ত বের করা সেই রোগীর জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। এতে রোগী তাড়াতাড়ি

www.nagorikpathagar.org

সুস্থ হয়ে ওঠে। শৈশবে খতনা করা হলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। শিশুর দেহে এবং যৌনাংগে দূরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে না।

যেসব জাতির শিশুদের খতনা করা হয় না সেসব শিশুদের মায়েদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শিশুর যৌনাংগের মাথার অংশের চামড়া কেটে না ফেলা হলে শিশুর প্রস্রাব এবং ঘাম একত্রিত হয়ে যৌনাংগে চুলকানি সৃষ্টি করে। এর ফলে শিশুর মস্তিষ্কে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যৌবনে যৌনশক্তিতে এর প্রভাব পড়ে।

শিশুর যৌনাংগের ত্বক অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এ ত্বকের স্পর্শকাতরতা শিশুর বালেগ হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এ ত্বক ছেদনের ফলে পুরুষাংগ দৃঢ়তা লাভ করে। দেখা গেছে অনেক খতনাবিহীন ব্যক্তির সন্তান জন্ম নেয় না। জন্ম নিলেও শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটে। চিকিৎসকদের মতে খতনা করা হলে এ রকম সমস্যা দূর হয়ে যায়।

শিশু জন্ম গ্রহণের সাত আট দিনের মধ্যে তার খতনা করা সবচেয়ে উপকারী। এটা ইসলামী শরীয়ত এবং হযরত মূসার শরীয়তের বিধান। নবজাত শিশুর খতনা করা হলে ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বয়স বেড়ে গেলে শিশুর দুষ্টামি বেড়ে যায়, সে সময় জখম তাড়াতাড়ি ভালো হয় না। যতোই বয়স বাড়তে থাকে দেরীতে খতনা করা ততোই কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দেয়। (ইসলামী উসূলে ছেহাত)

বদনযর ও আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) নিজের ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন। মেয়েটির চেহারায় ছিলো নপুংসকতার ছাপ। তিনি বললেন, ওকে ফুঁ দেয়ার ব্যবস্থা করো, কারণ সে বদনযরের শিকার হয়েছে। (বোখারী মুসলিম)

অন্য হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেন, আল আইনু হাক্কুন, অর্থাৎ বদনযর সত্য।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) জ্বিনদের দুষ্কর্ম এবং বদনযর লাগা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হয়। রসূল (স.) তখন এ দু'টি সূরার ওপর আমল শুরু করেন এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য আমল ত্যাগ করেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

আল্লাহ তায়ালা কোনো কোনো মানুষের চোখে এমন প্রভাব রেখেছেন, যখন সে পূর্ণ দৃষ্টিতে কোনো জিনিসের দিকে তাকায় তখন সে জিনিসের ক্ষতি হয়।

রসূল (স.) বলেন, কোনো জিনিস যদি তাকদীরের ওপর প্রাধান্য পেতো তবে সেটা হতো বদনযর। এমন লোকও দেখা গেছে যাদের একবারের দৃষ্টি মানুষ, পশু এমনকি নিষ্প্রাণ জিনিসও ধ্বংস করে দেয়। তবে কোরআন পাঠ করে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এবার আমরা দেখবো আধুনিক বিজ্ঞান বদনযর স্বীকার করে কী-না, কিংবা বিজ্ঞান এ সম্পর্কে কী বলে?

স্টিফেন কোলনের বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দৃষ্টি

জার্মানীর রাজধানী ফ্রাংকফুর্টে বিস্ময়কর যোগ্যতাসম্পন্ন ২১ বছর বয়স্ক এক যুবক ছিলো। তার চোখ দু'টি ছিলো রহস্যময়। বিজ্ঞানীরা তার চোখের দৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

স্টিফেনের চোখের দৃষ্টি এতোটা তীব্র ছিলো যে, সে যে কিছুর দিকে তাকাতো তা তছনছ হয়ে যেতো। স্টিফেন একবার একটি বৃন্ধ দরোজার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সেই বন্ধ দরোজা সাথে সাথে ভেংগে পড়ে যায়। একটি শক্ত খুঁটির দিকে ষ্টিফেন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। এতে খুঁটির ওপর দাগ পড়ে যায়। আরো কিছুক্ষণ তাকানোর পর সে খুঁটি ভেংগে পড়ে।

এ যুবকের চোখের দৃষ্টি ছিলো সাধারণ মানুষের চোখের দৃষ্টির চেয়ে আলাদা। তার চোখ এতোটা তীব্র এতোটা গরম কেন ছিলো? এ সম্পর্কে প্যারাসাইকোলাজি রিপোর্ট পর্যালোচনা করা যাক।

প্যারা সাইকোলজিস্টের গবেষণা

যে জ্ঞান দেখা যায় না, যে জ্ঞান সুপ্ত বা গোপন থাকে, সে জ্ঞানের নাম প্যারাসাইকোলজি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিটি মানুষের চোখ থেকে অপার্থিব রশ্মি বের হয়, যার মধ্যে ইমোশনাল এনার্জির বিদ্যুৎ মিশ্রিত থাকে। এ বিদ্যুৎ দেহ দ্রুত শুষে নেয় এবং তা দেহের নির্মাণ অথবা ধ্বংসের কারণ হয়। এ ইমোশনাল এনার্জির বিদ্যুৎ যদি ইতিবাচক হয় তবে মানুষের উপকার হয় আর যদি নেতিবাচক হয় তবে মানুষের ক্ষতি হয়। যেসব মানুষের দৃষ্টি দ্বারা বদনযর লাগে তাদের দৃষ্টিতে থাকে নেতিবাচক উপাদান। সে দৃষ্টিতে এমন শক্তি থাকে যা দেহ ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

এ ব্যক্তির বদনযরের কারণে অন্য একজন ফর্সা মানুষের চেহারা কালো হয়ে যায়। কারণ বদনযরের কারণে যার প্রতি তাকিয়েছে তার রক্তে মেলানিন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সে ব্যক্তির ত্বক কালো হয়ে যায়।

রসূল (স.)-এর এ বাণী সত্য– বদনযর ঠেকানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে কোরআন পাঠ করা। বিশেষত সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করে এক্ষেত্রে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তদশ অধ্যায়

দাড়ি ও আধুনিক বিজ্ঞান

শেভ করার ক্ষতি

দাড়ি রাখা সুন্নত। এ সুন্নত পালন না করা প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যবিধি পালন না করার শামিল। দাড়ির উপকারিতা এবং সৌন্দর্য সূর্যালোকের চেয়ে স্পষ্ট। এখানে দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিষয়ক উপকারিতা এবং শেভ করার ক্ষতিসমূহ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ডাক্তার মূর-এর অভিমত

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর মূর শেভ, ব্লেড এবং সাবান সম্পর্কে বহু বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জিত তথ্য দিল্লীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সাময়িকী 'ছেহেত'-এ লেখেছেন।

ত্বকের রোগ

শেভ করার কারণে ত্বকের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় সম্ভবত অন্য কোনো কারণে এতো ক্ষতি হয় না। শেভ করার জন্যে ব্যবহার করা ব্লেড বার বার ত্বকের ওপর চালানো হয়। প্রত্যেক মানুষ এটাই চায়, তার চেহারায় একগাছি দাড়িও যেন না থাকে। এতে চেহারার সৌন্দর্য ফুটে ওঠবে। বার বার ধারালো অস্ত্র দিয়ে চেহারার ত্বক পরিষ্কার করা হয়। এতে চেহারার ত্বক স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে এবং নানারকম রোগ তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কম ধারালো ব্লেড দিয়ে শেভ করা হলে ত্বক খরখরে হয়ে যায়। চেহারা জখম হয়। খোলা চোখে সে জখম দেখা যায় না। তবে জ্বালা অনুভূত হয়। ত্বকের চামড়া উঠে গেলে সেই জায়গা দিয়ে জীবাণু ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পায়। যারা দাড়ি শেভ করে এমনি করে তারা নানারকমের রোগে আক্রান্ত হয়। তাদের অনেকের চেহারায় প্রথমে মামুলি ফুসকুড়ি দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে সে ফুসকুড়ি সাইকোসিস বারবেক-এর মতো মারাত্মক চর্ম রোগে পরিণত হয়।

এছাড়া চেহারায় এবং দেহের অন্যান্য জায়গায় যেসব রোগ দেখা দেয় সেসব হচ্ছে একনে ভালগারিস, ডেন্ডরাফ সিবোরহোয়েস, একনে রোসাকিয়া, রিনোপাইমা, বয়েলস, একজিমা, আর্টিকারিয়া, এলার্জি।

আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির ক্ষতি

আলট্রাভায়োলেট রশ্মি অনুভূতিশীল ত্বকের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়। কারণ এ রশ্মি সূর্য কিরণের সাথে মিশে দেহের ত্বকে খুব শীঘ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে ত্বকের রং কালো হয়ে যায়। এছাড়া নানারকম রোগ দেখা দেয়।

ক্রমাগত শেভ-এর প্রতিক্রিয়া

ক্রমাগত শেভ করার ফলে পিটুইটারি গ্লান্ডে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ গ্লান্ডের ক্ষতির কারণে নার্ভ সিস্টেম এবং যৌন জীবন প্রভাবিত হয়। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, নিয়মিত শেভ করার অভ্যাস যারা ত্যাগ করেছে তারা উল্লিখিত রোগ এবং অন্যান্য রোগ থেকে মুক্ত জীবন যাপনে সক্ষম হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টাদশ অধ্যায়

শরয়ী পর্দা এবং তার নৈতিক প্রভাব

কারো আত্মীয়স্বজন কি অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতে পারে? ইসলাম নিকটাত্মীয়দের সাথে পর্দা করার আদেশ কেন দিয়েছে? এর জবাব হচ্ছে, পর্দা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই আদেশ দিয়েছেন। পর্দা ইসলামের মৌলিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম পর্দার বিধান মেনে চলা মুসলমানদের প্রতি ইসলামের আদেশ। যতোদিন পর্দার ব্যবস্থা করা হয় ততোদিন শান্তি নিরাপত্তা এবং শালীন পরিবেশ বজায় থাকে। যে ঘর থেকে পর্দা ওঠে যায় সে ঘর নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা এবং অশান্তির আকরে পরিণত হয়।

আমি এরকম বহু ঘটনা জানি, যেসব ঘটনা পর্দাহীনতার কারণে বা কম পর্দা করার কারণে ঘটেছে। পর্দা না করার কারণে যেসব চারিত্রিক অধপতনের ঘটনা ঘটে তা হিসাব করে শেষ করা যাবে না। এখানে একজন ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ববিদের বিবরণ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ডাক্তার স্টিফেন ক্লার্ক

সিসিলির বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ স্টিফেন ক্লার্ক তার গবেষণার আলোকে লেখেছেন, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পরপুরুষের নির্বাধে যখন তখন ঘরে যাওয়া আসা, সাধারণ আত্মীয় স্বজনের ঘরে অবাধ যাতায়াত, ওঠাবসা, গল্প করা, এসব কিছুই আমার দৃষ্টিতে ক্ষতিকর। এর প্রভাব বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। অবাধ মেলামেশায় নারীদের আমি পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখেছি। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ব্যভিচার অশ্লীলতা বেড়ে যায়। বহু সাজানো সংসার আমি ভেংগে যেতে দেখেছি, বহু আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে দেখেছি, নারী পুরুষকে জেলে যেতে দেখেছি।। এসব ঘটনার মূল কারণ নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অবাধে একে অন্যের ঘরে যাওয়া আসা। (উইকলি সান)

একজন অমুসলিম ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দা না করায় এতো বড় ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ রসূল (স.) পর্দার আদেশ দিয়ে মুসলমানদের এ সকল ক্ষতি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমার ক্ষুদ্র জীবনে আমি এরকম বহু ঘটনা দেখেছি, যেসব ঘটনা দেখে আমি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছি, কি কারণে ইসলামী শরীয়তে পর্দার বিধানকে এতোটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের অবাধ মেলামেশা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ইসলাম নারীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম নারীদের যতোটা মর্যাদা দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মে ততোটা দেয়া হয়নি।

১. ইসলাম কি নারীদের নগ্ন করেছে; নাকি সম্মানজনক পোশাক দিয়েছে?

২. ইসলাম কি নারীদের বাজারের পণ্য করেছে নাকি ঘরের রাণী করেছে?

৩. ইসলাম কি নারীদের মজলিসের প্রদর্শনী করেছে নাকি ঘরের চাঁদ করেছে?

৪. নারী কি শুধু রাজদরবার এবং মজলিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ?

৫. নারী জাতি কি শুধু দাসীর জীবন যাপন করবে?

৬. ইউরোপ কি নারীকে বাজারের পণ্যে পরিণত করেনি?

৭. ইউরোপ নারীকে বেশী মর্যাদা দিয়েছে নাকি ইসলাম বেশী মর্যাদা দিয়েছে?

৮. ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে ইউরোপীয় নারীদের ইজ্জত কি নিরাপদ থাকে?

একদিকে যখন মুসলিম নারীদের মান সম্মান, ইজ্জত আব্রুর কথা চিন্তা করি অন্যদিকে ইউরোপীয় নারীদের অবস্থা যখন দেখি, তখন আমার সামনে যে বিষয়গুলো পরিষ্কার প্রকাশ পায় সেসব হচ্ছে-

ইসলাম নারীকে ঘরকন্নার মর্যাদা দিয়েছে। এ নারী যখন ঘরের বাইরে গিয়ে স্বাধীন জীবন বেছে নেয় তখন অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন তার ভাগ্য লিখনে পরিণত হয়। তার মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হয়। তারপর এ নারী হয়ে পড়ে সমাজের খেলার পুতুল। ইউরোপীয় নারীদের কি কিছুতেই মর্যাদাসম্পন্ন বলা যায়? তারা কি শান্তিতে আছে? কেন তাদের অধিকাংশের ভাগ্যে তালাক এবং আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে?

একটি প্রশ্ন কয়েকটি উত্তর

কেউ কেউ প্রশ্ন করে, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় ক্ষতি কী?

এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ-

১. নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে নির্লজ্জতা বৃদ্ধি পায় এবং দেশের প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে যায়।

২. ঘরের শান্তি উধাও হয়ে যায়। কেননা উইলিয়াম যতোই উদার মনের মানুষ হোক না কেন, সে কতোদিন এ অবস্থা মেনে নেবে যে, তার বিবাহিতা স্ত্রী রাতের পর রাত ঘরের বাইরে কাটাবে। উইলিয়ামের স্ত্রী আজ রাতে টমের সাথে ঘুমায়, কাল মামের সাথে ঘুমায়। উইলিয়ামের টাকা পানাহার করে অথচ টমের মামের জীমের বিছানা গরম রাখে। একটি পশুও এতোটা আত্মমর্যাদাবোধহীন হতে পারে না। একটি পশুও তার মাদী পশুর কাছে অন্য নর পশুকে আসতে দেয় না। স্ত্রী যদি উচ্ছৃংখল হয়ে যায় তবে ঘর কে সামলাবে? শিশু সন্তানের দেখাশোনা কে করবে? স্বামী শান্তির সন্ধানে কোথায় যাবে? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন বা উভয়ে যদি উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করে তাহলে উভয়েই দাম্পত্য জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত থাকে এবং উভয়েই মানসিক অস্থিরতার শিকার হয়। যে স্বামী সারাক্ষণ এরকম চিন্তায় চিন্তিত থাকে, তার স্ত্রীর

www.nagorikpathagar.org

সাথে এখন কোন পুরুষ অন্তরংগ সময় কাটাচ্ছে, যে স্ত্রী স্বামীর পরনারী সংসর্গের সন্দেহে সারাক্ষণ চিন্তিত থাকে, তারা কাজকর্ম করবে কখন?,

৩. মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ধরা যাক কলেজের একটি মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়লে পড়ালেখা বাদ দিয়ে সে ঘরে বসে থাকবে। আমেরিকায় এ রকম ঘটনা অহরহ ঘটতে দেখা যায়। কোনো কলেজে বা স্কুলে একশ জন ছাত্রী ভর্তি হলে বছরের শেষে তাদের সংখ্যা ২০ জনে নেমে আসে।

৪. বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, আমেরিকায় এক বছরে বিশ লাখ দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তানের যে অবস্থা হয় সেকথা বলার মতো নয়।

৫. বহুসংখ্যক মেয়ে বিবাহ থেকে বঞ্চিত হয় এবং জন্তু জানোয়ারের মতো অবাধ উচ্ছৃংখল যৌন জীবন বেছে নেয়। ফলে সমাজে পাপ অনাচার বেড়ে যায়। যে কুমারী মাতার দু'তিনটি সন্তান রয়েছে তাকে কে বিয়ে করবে?

৬. জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৩ সালে আমেরিকায় আনুমানিক ২০ লাখ জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। (টাইম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৩)

এর আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণকারী জারজ সন্তানের সংখ্যা ২৩ লাখ। সন্তানের জন্যে পিতামাতার গভীর ভালোবাসাই সন্তান লালন পালনের মূলকথা। যেসব সন্তানের পিতৃপরিচয় নেই তাদের কে পালন করবে? সরকার করবে? খুব ভালো কথা, কিন্তু সন্তানদের শিষ্টাচার, আদব কায়দা, চারিত্রিক গুণাবলী, ভদ্রতা সভ্যতা কে শিক্ষা দেবে? এটা স্পষ্ট বুঝা যায়, এসব জারজ সন্তান বড় হয়ে সমাজের জন্যে অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। দায়িত্ববান একজন পিতার তত্ত্বাবধানেই কেবল একটি সন্তান উচ্ছৃংখল জীবন যাপন থেকে রক্ষা পেতে পারে। যেখানে পারিবারিক জীবন নেই, পিতার শাসন নেই, স্নেহ নেই, সেখানে শিক্ষা দীক্ষার কথা চিন্তাই করা যায় না।

৭. একটি রোগ আরেকটি রোগের জন্ম দেয়। ধরা যাক, একজন যুবক নিজের জীবনের বুনিয়াদ নিজের হাতে ধ্বংস করছে। ফল কী হবে? তার নানাপ্রকার রোগ দেখা দেবে। মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, রক্তশূন্যতা। চরিত্রের ক্ষেত্রে, একই কথা প্রযোজ্য। একটি যুবক উচ্ছৃংখল হলে মেয়েদের নিয়ে খেলতে চাইবে। এ খেলার জন্যে টাকা প্রয়োজন। যদি ঘর থেকে সে টাকা পাওয়া না যায় তখন কী করবে? তখন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, পকেটমার এসব করবে। আমেরিকা বিশ্বের সমৃদ্ধশালী দেশ। সেখানে মাথাপিছু বার্ষিক আয় কয়েক হাজার ডলার।

বৃটেনে মাথাপিছু বার্ষিক আয় কয়েক হাজার পাউন্ড। পাকিস্তানে মাথা পিছু বার্ষিক আয় কয়েক হাজার টাকা, কিন্তু আমেরিকার সামাজিক পরিবেশ কেমন? সেখানে প্রতি মিনিটে একটি হত্যাকান্ড ঘটে, আটটি চুরির ঘটনা ঘটে, দু'জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। একমাত্র নিউইয়র্ক শহরে প্রতি মাসে ২৫ হাজার গাড়ী চুরির ঘটনা ঘটে। এ অধপতন শুধু নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফল। একটি মেয়ের সাথে একটি সন্ধ্যা কাটানোর জন্যে, মদ, নাচ, সিনেমা ইত্যাদি খরচ বাবদ বহু ডলার ব্যয় করতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

এতো টাকা কোথা থেকে আসবে? যদি আজ কোথাও থেকে ব্যবস্থা হলো আগামীকাল কী হবে? উপায় হচ্ছে গাড়ী চুরি, ব্যাংক ডাকাতি। এসব কাজ আমেরিকায় প্রতিনিয়ত হচ্ছে। পাকিস্তানের কোনো কোনো শহরেও এসব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। ইংরেজী সিনেমার আমদানী যদি বন্ধ না করা হয়, মদ, নাচ যদি বন্ধ না করা হয়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে যদি পাঠ্যপুস্তকে উন্নত চরিত্র গঠনের উপাদান সন্নিবেশিত না করা হয়, তবে এখানেও আমেরিকার মতো অবস্থা হতে দেরী হবে না। আল্লাহ তায়ালা তার অনুগ্রহে আমাদের এরকম পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন।

আমেরিকার সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি ঘটনা

১. তিন মাস আগে আমেরিকার একটি শহরে একদল বরযাত্রী এমনভাবে একটি বাজার অতিক্রম করলো যে, তাদের সবাই ছিলো উলংগ।

২. ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ক্লাবে মেয়েরা কোমর পর্যন্ত মাত্র ছয় ইঞ্চি কাপড় পরিধান করে, কিন্তু ওপরের দিকে থাকে সম্পূর্ণ নগ্ন। পাকিস্তানেও এরকম বহু মেয়ে রয়েছে যারা নাচের সময় উর্ধাংগের বসন খুলে ফেলে। এসব মেয়ে বিত্তশালীদের আদরের দুলালী।

৩. এক লোক একদিন নিউইয়র্কের একটি দোকানে প্রবেশ করলো। সেখানে আঠারো বছর বয়স্কা এক যুবতী সেলস গার্ল হিসেবে কাজ করছিলো। ক্রেতার ছদ্মবেশে প্রবেশকারী লোকটি মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে তার কাপড় খুলে ফেলে তাকে ধর্ষণে উদ্যত হয়। মেয়েটি চিৎকার শুরু করলো, কিন্তু কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না। একপর্যায়ে মেয়েটি আত্মরক্ষার জন্যে নগ্নভাবে শহরের রাস্তায় দৌড়াতে লাগলো। আক্রমণকারীও তাকে অনুসরণ করলো। তারপর তাকে ধরে ফেললো এবং মেয়েটির গায়ে একটি কোট চাপিয়ে দিয়ে তাকে মারতে মারতে দোকানের দিকে টানতে শুরু করলো। সেখানে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে গেলো, কিন্তু কেউ মেয়েটির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। একপর্যায়ে পুলিশ এগিয়ে এলো এবং আক্রমণকারীর হাত থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করলো।

এ ঘটনার কয়েকদিন আগে এক দুর্বৃত্ত একটি ফ্লাটে প্রবেশ করে একটি মেয়েকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে। ছুরিকাঘাতে মেয়েটিকে হত্যা করার দৃশ্যও উৎসুক লোকেরা প্রত্যক্ষ করলো, কিন্তু কেউ মেয়েটির সাহায্যে এগিয়ে এলো না। (পাকিস্তান টাইমস)

৪. নিউইয়র্কের উচ্চ আদালত ২৯ বছর বয়স্ক ভানসন মোসলে নামের এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। এ লোকটির অপরাধ ছিলো সে কিশোরী মেয়েদের হত্যার পর তার মৃতদেহ ধর্ষণ করতো। একই নিয়মে সে একটি মেয়েকে নগ্ন করে তার পোশাকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করে। এ দুর্বৃত্ত মেয়েদের হত্যা করার জন্যে চাকু ব্যবহার করতো। গ্রেফতার হওয়ার আগের দিন বিকেলে এ দুর্বৃত্ত নিজের সাদা রঙের গাড়ীতে চড়ে ঘর থেকে বের হয়। পথে সে দেখলো একটি মেয়ে ড্রাইভ করে যাচ্ছে। সে মেয়েটিকে অনুসরণ করলো। এক সময় মেয়েটি নিজের বাড়ীর সামনে থামে। গাড়ী থেকে বের হওয়ার পর দুর্বৃত্ত মেয়েটির ওপর হামলা করে এবং

www.nagorikpathagar.org

উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করতে থাকে। মেয়েটি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিলো। মেয়েটি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পর এ দুর্বৃত্ত তাকে ধর্ষণ করে। তারপর ঘরে ফিরে এসে চাকু ধুয়ে সিন্দুকে রেখে পোশাক পরিবর্তন করে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন অন্য শিকার অনুসন্ধানের সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সে পুলিশের জিজ্ঞাসার জবাবে সব কথা অকপটে স্বীকার করে। (সাপ্তাহিক তামীর)

৫. ফ্রান্সের পুলিশ হাসপাতালে কর্মরত এক যুবককে গ্রেফতার করলো। অবসর সময় সে গাড়ী চুরি এবং শিশু হত্যার কাজে ব্যয় করতো। নয়টি শিশু হত্যা ঘটনার পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। (সাপ্তাহিক তামীর)

৬. আমেরিকায় আত্মহত্যার ঘটনা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৩ সালের শেষের ছয় মাসে সেখানে লস এঞ্জেলস শহরে ৭৫ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে। (পাকিস্তান টাইমস)

১৯৬৪ সালের ৯ই মের ঘটনা। একজন লোক প্যাসিফিক এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে সফর করছিলো। সে বিমানে যাত্রী সংখ্যা ছিলো চুয়াল্লিশ। বর্ণিত যাত্রী জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। সে পিস্তল বের করে ছয় রাউন্ড গুলী বর্ষণ করে বিমানের পাইলটকে হত্যা করে। বিমানটি ভেংগে পড়ে সকল যাত্রী নিহত হলো। পরে জানা গেছে, আততায়ী দুর্বৃত্ত এ ঘটনার আগে ৫০ হাজার ডলারের জীবনবীমা করেছিলো। সে বীমার টাকা লোকটির স্ত্রী পাবে, এ উদ্দেশ্যে সে স্ত্রীকে নমিনি করেছিলো। (পাকিস্তান টাইমস ১০ মে ১৯৬৪)

বিশ্বজুড়ে একক আওয়ায

ইসলামের ওপর বিশ্বাসী বিশ্বমানবের মধ্যে বিশ্বাসের ঐক্য বিদ্যমান। মুসলমানরা বিশ্বাস করে তাদের আল্লাহ তায়ালা এক, রসূল এক, কোরআন এক, কেবলা এক। এক ও অভিন্ন জীবনাদর্শের কারণে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা অভিন্ন চিন্তা ও ধ্যান ধারণা পোষণ করে। আদর্শ ও বিশ্বাসের ঐক্যের কারণে কোটি কোটি মানুষ একই ধর্মের অনুসরণ করছে। যদি এ বিশ্বাস কখনো শিথিল হয়ে যায় তাহলে গোটা সমাজের শান্তি শৃংখলা নষ্ট হবে। সব কিছু মুখ থুবড়ে পড়বে। ধর্ম এমন এক শক্তি যে শক্তি বড় বড় বীর পুরুষদের বিদ্রোহী দুর্বৃত্তদের মাথা দুর্বল মানুষের সামনে নত করে দেয়। বাঘের গলায় বকরীর দাসত্বের শিকল পরিয়ে দেয়। ক্ষুধার্ত মানুষ বাজারে এ কারণে ডাকাতি থেকে বিরত থাকে না যে এটা পাপ বরং এ কারণে বিরত থাকে যে, এ কাজ আল্লাহর পছন্দ নয়। বিত্তশালীরা গরীব মেসকীনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সাহায্য করে। যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন লাখ লাখ যুবক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবন দিয়ে দেয়। যারা পাপ অন্যায় অপকর্মে সমাজকে কলুষিত করে, জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।

বিশেষত যারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মোটা অংকের বেতন গ্রহণ করে, অথচ জনগণের বিশ্বাসের অমর্যাদা করে কথা বলে, তাদের বিশ্বাসের অবমাননা করে, তাদের বিবেকের কণ্ঠস্বর ইসলামের ওপর আঘাত করে।

www.nagorikpathagar.org

একথা সবাই জানে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা প্রতি রাতে হোটেলে, ক্লাবে, বারে বারাঙ্গনাদের সাথে নাচে, মদ খায়। এরা নামায কালাম, আল্লাহ তায়ালা, রসূল থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। এদের দেখাদেখি যদি আমাদের যুব সমাজ ধর্মের বন্ধন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন কী হবে?

কোরআন জানিয়ে দিয়েছে, জীবনের এসকল বিলাসিতা, অবৈধ সুখ ভোগ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ জাতীয় কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রত্যেক রসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের পাপাচারের কারণেই অতীতের বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে।

কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতো, আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী, কাজেই আমাদের কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না। (সূরা সাবা)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, আর আমি যখন ওদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠে। তাদের বলা হবে, আজ আর্তনাদ করো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না। আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হতো, কিন্তু তোমরা পেছন ফিরে সরে পড়তে। দম্ভভরে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করতে। (সূরা মোমেনুন)

বর্তমানে ইসলামের শত্রু হচ্ছে ইউরোপ এবং তার নগ্ন সভ্যতা। এ ইউরোপ নগ্নতা বেহায়াপনা এবং মিথ্যা মূল্যবোধের প্রচার প্রসারের জন্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে, কিন্তু বিশ্বের বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এসব বিষয়ে চিন্তাও করে না। তারা ভেবে দেখে না, সত্য যখন নির্বাসনে চলে যায় তখন মিথ্যার জয়জয়কার প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সে সময় মানবতা চিৎকার করতে থাকে। (ইসলাম ও আধুনিক যুগ)

www.nagorikpathagar.org

উনবিংশ অধ্যায়

ভালো নামের প্রভাব

ভালো নাম এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.) বলেছেন, হে লোকসকল, রোজ কেয়ামতে তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামের সাথে সম্পর্ক রেখে ডাকা হবে। কাজেই তোমরা নিজের ভালো নাম রাখো। (আবু দাউদ)

রসূল (স.) আরো বলেন, যে নামের মধ্যে মানুষের আল্লাহর বান্দা হওয়ার কথা রয়েছে এবং যে নামে আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ পায় সে নাম আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। (বোখারী)

হযরত আবু ওহায়ব (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা নবীদের নামে নিজেদের নাম রাখো। আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান। সবচেয়ে সত্য নাম হচ্ছে হারেস এবং হুমাম। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

নাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য

আধুনিক বিজ্ঞান ভালো নাম রাখার ওপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। বিজ্ঞানের পছন্দ প্রকৃতপক্ষে নামের শব্দ এবং তার প্রভাবের কারণে।

প্যারাসাইকোলজি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর প্যারল মাস্টার তার সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ করেছেন যে, নাম জীবনের ওপর বেশ প্রভাব ফেলে। এমনকি নামের শব্দের অর্থেরও উপকারিতা এবং প্রভাব রয়েছে। প্রফেসর প্যারল বলেন, আমি রহীম এবং পারভেজ নামের তুলনা করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, রহীম নাম থেকে সবুজ আলোকরশ্মি বের হচ্ছে।

তিনি বলেন, আউযু বিল্লাহর উপকারিতা সম্পর্কেও আমি গবেষণা করেছি। শক্তি প্রকৃতপক্ষে শব্দের মধ্যে রয়েছে। সে শব্দ নাম হিসেবে হোক অথবা অন্য কোনোভাবে হোক।

নামই মানুষের আমলকে পুণ্যশীল অথবা কুৎসিত করে দেয়। ফেরাউন, নমরুদ হচ্ছে কয়েকটি শব্দমাত্র, কিন্তু এসব শব্দের মন্দ ব্যঞ্জনা শ্রোতার মনে ঘৃণা এবং অন্ধকার তৈরী করে। মনে বিস্ময়কর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

শব্দের শক্তির একটি বিস্ময়কর ঘটনা

একজন লোক একবার আমার কাছে চিকিৎসার উদ্দেশে এসেছিলো। কথায় কথায় সে লোক নিজের একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বললো। সে বললো, আমার গাধার পেটের কাছে গভীর একটি জখম হয়ে গিয়েছিলো। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল

www.nagorikpathagar.org

হয়নি। জখমের জায়গা থেকে পোকা বের হতে লাগলো। এক লোক আমাকে পরামর্শ দিলো, তুমি যদি চাও যে তোমার গাধা সুস্থ হোক, তার জখমের পোকা ভালো হোক, তবে তিন জন সুদখোরের নাম একটি কাগজে লেখে গাধার গলায় বেঁধে দাও। প্রথমে আমি কথাটার গুরুত্ব দিলাম না কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে অগত্যা তাই করলাম। আপনি শুনে অবাক হবেন, মাত্র তিন দিনে গাধার জখম ভালো হয়ে গেলো এবং জখমে কিলবিল করা পোকাগুলো মরে গেলো।

বদ আমল কি মানুষকে বিষাক্ত করে তোলে? কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী বদ আমল কি মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট করে দেয়? সুদ খাওয়ার ফলে লোকগুলো কি এতোটাই বিষাক্ত ও ঘৃণিত হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের নামও বিষাক্ত হয়ে গেলো?

শব্দের শক্তি সম্পর্কে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করেছেন। তাদের সে গবেষণা সম্পর্কে আসলেই পড়াশোনা করা উচিত।

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের আধ্যাত্মিক গবেষণা

পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মানুষের দেহ থেকে নানা রং-এর রশ্মি বের হয়। সে রশ্মি দেহের আশপাশে একটি বৃত্ত তৈরী করে। এ রশ্মি পাপী পুণ্যবান প্রতিটি মানুষের দেহেই বিদ্যমান থাকে। তবে পার্থক্য হচ্ছে, পাপী এবং পুণ্যবানের দেহ থেকে বের হওয়া রশ্মির রংয়ে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের কাজ অনুযায়ী তার দেহ থেকে রং নির্গত হয়। প্রতিটি মানুষ নিজের কাজকর্ম অনুযায়ী নিজের চারপাশে একটি পরিবেশ তৈরী করে। বদকার বা পাপীর পরিবেশ হয় দেয়ালের মতো শক্ত, সে দেয়াল থেকে কোনো ফরিয়াদ বা দোয়া বাইরে বের হয় না এবং ভালো কোনো প্রভাবও ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এরকম মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। সম্ভবত কোরআনে বর্ণিত হেজাব, গেশাওয়া, ছতর, গুলফুন শব্দ দ্বারা এ পরিবেশের কথাই বুঝানো হয়েছে।

ডাক্তার ক্যারিংটন লিখেছেন, মানুষের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হয় তো অন্যদের তার প্রতি আকৃষ্ট করে অথবা দূরে সরিয়ে দেয়।

এরকমের রশ্মি অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি, কারো কাছ থেকে মানুষ দূরে সরে যায় আবার কারো কাছে দূর থেকে ছুটে আসে। এ রশ্মি মাটির দেহ এবং অভ্যন্তরের আত্মা থেকে বের হয়। পুণ্যশীল মানুষ অন্যদের নিজেদের আত্মার শক্তিতে আকৃষ্ট করে থাকে। মানুষ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণে তাদের কাছে ছুটে যায়। নানা উপঢৌকন নিয়ে হাযির হয়।

কসমিক ওয়ার্ল্ড

কসমিক ওয়ার্ল্ড হচ্ছে এমন জগত, যেখান থেকে আত্মা বা রূহ আসে আবার সেখানে ফিরে যায়। জ্বিন ও ফেরেশতারা সেখানে অবস্থান করে। নীচের স্তরে পাপীরা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ করে। উঁচুস্তরে আল্লাহর নবী এবং তাঁর প্রিয় বান্দারা অবস্থান করেন।

www.nagorikpathagar.org

দোয়ার দর্শন ও এবাদাত

দোয়া এবং এবাদাতের বিশেষত্ব বুঝার জন্যে দু'টি জিনিসের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রূহানীয়াত বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতিটি শব্দের একটি বিশেষ রং এবং একটি বিশেষ শক্তি রয়েছে। তারা অক্ষর লেখে তৃতীয় নয়ন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, আলিফের রং লাল, বা'র রং নীল, ওয়াও-এর রং সবুজ, সিন-এর রং হলুদ। এ সকল অক্ষরের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছেন, এসব অক্ষর পাঠ করা হলে অসুখ ভালো হয়ে যায়। কোনো কোনো অক্ষর পাঠ করা হলে বিচ্ছুর দংশন আরোগ্য হয়। কোনো কোনো অক্ষর পাঠ করে সাপ ধরা যায়। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আওলিয়ায়ে কেরামের রূহানী শক্তি বেশী থাকে। এ কারণে তাদের উচ্চারিত শব্দে অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি সে কথা দিয়ে তারা দূরারোগ্য ব্যাধিও নিরাময় করতে পারেন। আসমানে হযরত জিবরাঈলের শক্তি অন্য সকল ফেরেশতার চেয়ে অধিক। সে শক্তিমান ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহর যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, সে আসমানী কেতাবের প্রতিটি শব্দ শক্তির এক একটি ভান্ডার।

পাদ্রী লিডবেটের ছিলেন ইউরোপের বিশিষ্ট দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। ১৯৩৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আত্মার শক্তিতে দূর দূরান্তে উড়ে যেতেন এবং গোপন জিনিস দেখতে পেতেন। তিনি 'দি মাস্টারস এন্ড দি পাথ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সে গ্রন্থে তিনি লেখেছেন, প্রতিটি শব্দ ইথারে একটি পৃথক অবয়ব গ্রহণ করে। যেমন ঘৃণা শব্দ এমন ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করে যা বীভৎস। একবার আমি সেই আকৃতি দেখেছিলাম। তারপর থেকে সে শব্দ উচ্চারণ করার আমার সাহস হয়নি। সেই দৃশ্য দেখে আমি ভীষণ কুপিত হয়ে পড়েছিলাম।

উল্লিখিত গ্রন্থে এরকম আরো দু'টি ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

১. এক মজলিসে বসে কয়েকজন লোক কথা বলছিলেন। কিছু দূরে বসে আমি তাদের রূহানী আকৃতি পর্যবেক্ষণ করলাম। একজন লোক কি কথায় হা হা করে অট্টহাসি হাসলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, সে ব্যক্তির রূহানী আকৃতি ধূসর রং-এর মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেছে। এ দেখে আমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিই।

২. এক লোকের রূহানী আকৃতিতে আমি অসংখ্য ফোঁড়া দেখতে পাই। সেসব ফোঁড়া থেকে অনবরত পুঁজ বের হচ্ছিলো। আমি তাকে কাছে ডেকে যবুর গ্রন্থের কয়েকটি আয়াত পাঠ করতে দিই। প্রায় দুই মাস পর তার রূহানী আকৃতি পরিষ্কার রোগমুক্ত হয়ে গেলো।

ইলহামী শব্দ এবং আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এমন এক অপার্থিব শক্তি রয়েছে যা উচ্চারণ করা হলে আমাদের অস্থিরতা দূর এবং রোগ উপশম হয়ে যায়। মুসলমানরা এদিক থেকে ভাগ্যবান যে, তাদের কাছে আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। যেমন রহীম, করিম, গাফুর, খাবির ইত্যাদি। প্রয়োজন অনুযায়ী এসব নামে আল্লাহকে ডাকা যায়। এ সুযোগ অন্য কোনো ধর্মে নেই। খৃষ্টানদের কাছে গড শব্দ এবং হিন্দুদের কাছে রাম

www.nagorikpathagar.org

শব্দ রয়েছে। শব্দের শক্তি উচ্চারণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অর্থ দিয়ে পাওয়া যায় না। অর্থ উচ্চারণ করা হলে্ সে শব্দের প্রভাব বিদ্যমান থাকে না। যে শক্তি ইয়া রহীমে রয়েছে, সে শক্তি হে মেহেরবান শব্দে থাকে না। এ কারণেই অন্য কোনো ভাষায় নামায হয় না। আল্লাহর কোরআনের শব্দে এবং রসূল (স.)-এর বর্ণিত দোয়ায় যে শক্তি রয়েছে সে শক্তি অনূদিত শব্দে থাকে না।

প্রতিটি শব্দ হচ্ছে একটি ইউনিট বা এটম। আভ্যন্তরীণ প্রেরণার শক্তি সে শব্দকে বিদ্যুতায়িত করে। সে শব্দের প্রভাব মাটির পৃথিবীতে এবং কসমিক ওয়ার্ল্ডে প্রকাশিত হয়। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে গালি। গালি তলোয়ার বা তোপ নয়; বরং কয়েকটি শব্দ মাত্র, কিন্তু এ গালি উচ্চারণের সাথে সাথে যাকে উদ্দেশ করে এ শব্দসমূহ উচ্চারিত হয়েছে, তার দেহমনে আগুন ধরে যায়। এ আগুন কোথা থেকে আসে? এ আগুন আসে উচ্চারিত শব্দ থেকে। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে চিৎকার। দুঃখী একজন মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত চিৎকার চারদিকের পরিবেশ অশান্ত চঞ্চল করে তোলে। আরেকটি উদাহরণ সেনা সদস্যদের উদ্দেশে দেয়া কোনো জেনারেলের বক্তৃতা। তার বক্তৃতার ভাষার শব্দে সাধারণ সৈনিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা মৃত্যুর মুখে এমনকি উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা করে না।

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, বাইদি ওয়ার্ড অব দি লর্ড হয়ার দি হেভেনস মেইড। অর্থাৎ আল্লাহর একটি শব্দ উচ্চারণে আকাশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমে আল্লাহ তায়ালা যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। সে সময় যমীন ছিলো বিরানভূমি। সমুদ্র ছিলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আল্লাহর সিংহাসন পানির ওপর ভাসমান ছিলো। গড সেইড লেট দেয়ার বি লাইট এন্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বললেন, আলো হও, সাথে সাথে চারদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আল্লাহর উচ্চারিত একটি শব্দের মাধ্যমেই লক্ষ কোটি গ্রহ নক্ষত্র, জীবজগত প্রাণী জগত সৃষ্টি হয়। নিখিলবিশ্ব অম্লান আলোয় ভরে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

বিংশ অধ্যায়

যেনা ব্যভিচার ও আধুনিক বিজ্ঞান

যেনা ব্যভিচার সকল রোগের উৎস

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেন, চোখের যেনা হচ্ছে (কামভাব নিয়ে) তাকানো। কানের যেনা হচ্ছে (কামভাব নিয়ে) কথা শোনা। মুখের যেনা হচ্ছে (কামভাবের সাথে) কথা বলা। হাতের যেনা হচ্ছে (কামভাবের সাথে) ধরা। পায়ের যেনা হচ্ছে (কামভাবের সাথে) পথ চলা। অন্তকরণের যেনা হচ্ছে- আকাংখা এবং লোভ করা (তারপর যেনা সংঘটিত হয়, অথচ এই যেনা হারাম)। (মুসলিম, হায়াতুল মুসলেমিন, ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

ইসলাম ফেতরাত বা স্বভাবের ধর্ম। মুসলমানরা যদি সঠিকভাবে ইসলামের ফরমান অনুযায়ী জীবন যাপন করে তাহলে তারা সব সময় শান্তি, নিরাপত্তা এবং শান্তিতে থাকে। মুসলমান যখন ইহুদী খৃস্টানদের জীবন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে তখন অধপতন এবং পথভ্রষ্টতার গভীর গুহায় গিয়ে পড়ে। বিবাহ বিশেষত প্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে যৌন জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের উপায়। বিয়ে না করা পর্যন্ত ইসলাম যৌন জীবনের পবিত্রতা রক্ষার্থে দৃষ্টির হেফাযত, রোযার মাধ্যমে আত্মসংযম এবং লজ্জাস্থানের হেফাযতের বিধান জারি করেছে। এসব কিছু এ জন্যেই করা হয়েছে যেন মানুষ যেনা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে।

স্বভাবসম্মত এ সকল ব্যবস্থা থেকে মানুষ যখন দূরে সরে যাবে তখন তারা নানারকম বিপদ মসিবত এবং রোগের সম্মুখীন হবে। অস্থিরতা এবং সামাজিক জীবনে অপমান লাঞ্ছনার শিকার হবে।

ইউরোপের বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক পল স্টিফেনসন এক বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যদি ইউরোপ শুধু ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে তবে আমি তাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দেবো।

মুসলমান শান্তিকামী ও শান্তিপ্রিয় জাতি। বর্তমানে তাদের মধ্যে এতো অশান্তি এতো বিশৃংখলার কারণ হচ্ছে, মুসলমানরা ইসলামের বিধানকে ঠাট্টা পরিহাস এবং স্বভাবধর্ম উপেক্ষা করছে। মুসলমানরা আজ যেসব জাতিকে নিজেদের নেতা এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা নিজেরাই স্বভাবধর্মের বিদ্রোহী। কিভাবে তারা অন্যের কল্যাণ করবে?

ইউরোপে ব্যভিচারের ধ্বংসকারিতা

জজ বেন লিন্ডসে আমেরিকার ডেনভার আদালতের জুভেনাইল কোর্টের চেয়ারম্যান। তিনি তার পদমর্যাদার কারণে আমেরিকার যুবকদের চারিত্রিক অবস্থা

www.nagorikpathagar.org

পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। তিনি 'রিভল্ট অব মডার্ন ইউথ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে লেখেছেন, আমেরিকায় শিশুরা কম বয়সে সাবালক হয়ে যায় এবং কচি বয়সে তাদের মধ্যে যৌন অনুভূতি জাগ্রত হয়। নিজের মতের সমর্থনে তিনি একটি জরিপ রিপোর্ট তুলে ধরেছেন। তিনি ৩১২টি বালিকার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এদের মধ্যে ২৫৫ জন বালিকা এগারো থেকে তেরো বছরের মধ্যে সাবালিকা হয়েছে। তাদের মধ্যে যৌন অনুভূতি জেগে ওঠেছে এবং একজন ১৮ বছরের যুবতীর মতোই তারা যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। (রিভল্ট অব মডার্ন ইউথ, পৃষ্ঠা ৮২-৮৬)

ডাক্তার এডিথ হুকার তার লেখা 'ল' অব সেক্স' গ্রন্থে লেখেছেন, শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন বিত্তশালী পরিবারের মধ্যে এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে, সাত আট বছরের বালিকারা সমবয়সী বালকদের সাথে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে। মাঝে মধ্যে তারা দেহমিলনেও লিপ্ত হয়।

তিনি আরো লেখেছেন, সাত বছরের একটি বালিকা তার বড় ভাই এবং ভাইয়ের কয়েকজন বন্ধুর সাথে দৈহিক মিলন ঘটিয়েছে। অন্য এক ঘটনায় দেখা গেছে, দুটি বালিকা এবং তিনটি বালক পারস্পরিক দেহ মিলন ঘটিয়েছে। এরা সবাই প্রতিবেশী। তারা অন্যান্য অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদেরও তাদের মতো দেহ সংসর্গে উদ্বুদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশী দশ বছরের। নয় বছর বয়সের অন্য একটি বালিকার প্রেমের কথা সে বেশ গর্বের সাথে প্রকাশ করেছে। সে বলে, আমি আমার প্রেমিকের চোখে বেশ আকর্ষণীয়। (ল' এন্ড সেক্স- পৃষ্ঠা ৩৩৮)

বাল্টিমোরের একজন ডাক্তার জানান, এক বছরের মধ্যে এ শহরে এক হাজারের বেশী এরকম ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, যেসব ঘটনায় বারো বছরের কম বয়সী মেয়েদের সংগে দেহমিলন ঘটানো হয়েছে- (ল' এন্ড সেক্স- পৃষ্ঠা ১৭৭)

আমেরিকার সমাজে চারদিকে যৌন সুড়সুড়ির উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমেরিকার একজন লেখক লেখেছেন, আমাদের সমাজে বর্তমানে ছেলেমেয়েরা অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। দশ পনের বছর বয়সেই তাদের মধ্যে অন্যের সাথে প্রেম করার চিন্তা জাগে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের যৌন সম্পর্কের কারণে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকারা তাদের যৌন সংগীর সংগে পালিয়ে যায় অথবা বিয়ে করে ফেলে। প্রেমে ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে যেসব বালক বালিকা কিশোর কিশোরীর মধ্যে যৌন অনুভূতি জাগ্রত হয়, তাদের এ অনুভূতির প্রথম জাগরণ কেন্দ্র হচ্ছে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দুই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে শুধু ছাত্র বা শুধু ছাত্রীরা ভর্তি হয়। অন্য শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে।

যেসব প্রতিষ্ঠানে শুধু ছাত্র বা শুধু ছাত্রী ভর্তি হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানে সমকামিতা এবং হস্তমৈথুনের জোয়ার দেখা দেয়। কারণ এসব শিশুর যৌন উত্তেজনা শৈশবেই

www.nagorikpathagar.org

উস্কে দেয়া হয়েছে। সে উত্তেজনা প্রশমনের খোলামেলা ব্যবস্থাও চারদিকে রয়েছে। ডাক্তার হুকার লেখেছেন্‌ এ শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– স্কুল কলেজ, নার্সদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ রকম ঘটনা অর্থাৎ সমকামিতা ও হস্তমৈথুনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। বালকের সাথে বালক বালিকার সাথে বালিকা সমমৈথুন সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে। দেহের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। বালিকারা সমগোত্রীয় বালিকাদের সাথে যৌন সুখ বিনিময় করছে। পরিণামে তারা হোমো সেক্সুয়াল বা সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে জীবনে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও সমকামিতার মহামারী সম্পর্কে জানা যায়।

ডাক্তার লোরি তার লেখা 'হার সেলফ' গ্রন্থে লেখেছেন, একবার এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক চল্লিশটি পরিবারকে গোপনে জানিয়েছেন, তাদের সন্তানের চারিত্রিক অধপতন এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে যে, তাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা কোনোক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। (হার সেলফ, পৃষ্ঠা ১৭৯)

যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার প্রচলন রয়েছে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা আরো ভয়াবহ। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বালক বালিকা কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির উপাদান যেমন রয়েছে, তেমনি সে উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থাও অত্যন্ত সহজলভ্য। তারা শৈশবে গড়ে ওঠা অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়। ছেলেমেয়েরা অশ্লীল যৌন সাহিত্য পাঠ করার সুযোগ পায়। যৌন উত্তেজক সাহিত্য, তথাকথিত শিল্প সাময়িকী, যৌন জীবনের সমস্যা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী, জন্মনিরোধ ব্যবস্থা– সবকিছু হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে এসব অত্যন্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকার 'হেনরিক ভন লুইন' লেখেছেন, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নোংরা অশ্লীল সাহিত্যের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। অতীতে এরকম খোলামেলাভাবে এসব সাহিত্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতে দেখা যায়নি। এ সাহিত্যে যৌন বিষয়ের ওপর বিতর্ক অনুষ্ঠানের নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা সে বিতর্কে অংশ নেয়ার পর বাস্তবে সেসব অনুশীলনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

দ্রুতবেগে হাঁটা

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আমি কাউকে দেখিনি। দেখে মনে হতো তাঁর চেহারা যেন সূর্যের মতো ঝলমল করছে। তাঁর চেয়ে জোরে হাঁটতে কাউকে আমি দেখিনি। তাঁর হাঁটার সময়ে যমীন যেন সংকুচিত হয়ে যেতো। অর্থাৎ এ মাত্র এখানে আবার ওখানে। তাঁর সংগে হাঁটতে গিয়ে আমরা কুলিয়ে উঠতে পারতাম না। আমাদের কষ্ট হতো অথচ তিনি স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতেন। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, রসূল (স.) তাঁর কর্মপদ্ধতি দ্বারা সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছেন তারা যেন সব কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে। (আখবারে জাহান)

হযরত ওমর (রা.) একদিন এক যুবককে খুব ধীরে হাঁটতে দেখে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি অসুখ? যুবক বললো, কোনো অসুখ নেই। হযরত ওমর (রা.) যুবককে প্রহার করার জন্যে চাবুক তুললেন, কিন্তু প্রহার করলেন না। তাকে ধমক দিয়ে বললেন, পূর্ণ শক্তিতে পথ চলো।

রসূল (স.) দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলতেন, পথ চলায় পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো যেন তিনি ওপর থেকে নীচের দিকে নামছেন।

হাকিম এস এম ইকবালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

ইউরোপ সফরের সময় আমি লক্ষ্য করেছি, মানুষ খুব দ্রুত হাঁটছে। কাউকে দেখে তো মনে হয়, সে ছুটছে। তারা দ্রুত পথ চলে সময় বাঁচায়। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সময় হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণেই তারা দুনিয়ার সফল জাতি। পাকিস্তানে মুসলমানদের দেখছি তারা ধীরে ধীরে ঢিলেঢালাভাবে হাঁটে। দেখে মনে হয় তাদের কাছে সময়ের কোনো মূল্য নেই। এ কারণেই বর্তমানে মুসলমানরা সব দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

একবিংশ অধ্যায়

শিশুদের প্রশিক্ষণ

রসূল (স.) বলেছেন, দাসদাসীরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন। তোমরা নিজেরা যা খাবে তাদের তাই খেতে দেবে। যা পরিধান করবে তাদের তাই পরিধান করাবে। তাদের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপাবে না। যদি অর্পিত কাজ তাদের পক্ষে করা সম্ভব না হয়, তবে তোমরা তাদের সাহায্য করবে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) তাঁর পিতাসহ একটি কাফেলার সংগে নানার বাড়ী যাচ্ছিলেন। এক মরুপ্রান্তরে রাত যাপনের জন্যে কাফেলার লোকেরা তাঁবু স্থাপন করলো। রাতে বনু কয়েস গোত্র কাফেলার লোকদের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করে। তারা কাফেলার কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। হযরত যায়েদ ছিলেন সে সময় বালক। হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম ইবনে হোযাম যায়েদকে কিনে নেন। খাদিজা (রা.) ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত মহিলা।

হযরত খাদিজা (রা.) একবার ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিমের বাড়ীতে যাওয়ার পর যায়েদকে সেখানে দেখে লালন পালনের জন্যে চেয়ে নেন। রসূল (স.)-এর সংগে হযরত খাদিজা (রা.)-এর বিয়ের পর যায়েদ রসূল (স.)-এর সংসারে এসে পড়েন।

এদিকে সন্তান হারিয়ে যায়েদের পিতা ছিলেন দিশাহারা। তিনি চারদিকে সন্তানের সন্ধান করতে থাকেন। যায়েদের গোত্রের কিছু লোক হজ্জ করার জন্যে মক্কায় গিয়ে তাকে সেখানে দেখতে পান। তারা যায়েদকে তার পিতার ব্যাকুলতার কথা জানান। যায়েদ তাদের বলেন, আমার বাবাকে আমার জন্যে চিন্তা করতে নিষেধ করবেন, আমি এখানে ভালো লোকদের সান্নিধ্যে বেশ শান্তিতে আছি। এ খবর পাওয়ার পর যায়েদের পিতা মুক্তিপণের অর্থ এবং নিজের ভাইকে সংগে নিয়ে মক্কায় রসূল (স.)-এর কাছে যান। রসূল (স.) তাদের আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, আমরা যায়েদকে আমাদের সংগে নিতে এসেছি। আপনি যা টাকা নিবেন নিন তবু আমাদের সন্তানকে মুক্ত করে দিন।

রসূল (স.) বললেন, যায়েদ যদি যেতে চায় যাক, কোনো টাকা পয়সা আপনাদের দিতে হবে না। সে যদি যেতে না চায় তবে আমি তাকে জোর করে আপনাদের সংগে পাঠাতে পারি না।

যায়েদের পিতা এবং চাচা এ কথায় রাযি হলে রসূল (স.) যায়েদকে ডেকে এনে বললেন, এদের তুমি চেনো? যায়েদ বললেন, ওনাদের একজন আমার পিতা এবং

www.nagorikpathagar.org

অন্যজন আমার চাচা। রসূল (স.) বললেন, ওরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। যায়েদ বললেন, আপনাকে ছেড়ে আমি কিভাবে যেতে পারি, আপনি তো আমার পিতা আমার চাচা দু'টোই। যায়েদের পিতা এবং চাচা বললেন, মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন ছেড়ে গোলাম হয়ে থাকাই তোমার পছন্দ? হযরত যায়েদ বললেন, হাঁ তাই। কারণ আজ পর্যন্ত আমি ওনার মতো দয়ালু এবং ভালো মানুষ কোথাও দেখিনি। রসূল (স.) একথা শুনে যায়েদকে আদর করে বললেন, ও তো আমার পুত্র। এ কথা শুনে যায়েদের পিতা এবং চাচা খুব খুশী হলেন। তারা যায়েদকে মক্কায় রেখে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

এ ঘটনা থেকে জানা যায়, রসূল (স.) যায়েদের সংগে কতোটা স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। এও জানা যায়, একটি শিশুর সংগে কি রকমের আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত।

হযরত আনাস (রা.) শৈশবে দশ বছর যাবত রসূল (স.)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি বলেন, এ দশ বছরের মধ্যে রসূল (স.) আমাকে কোনো শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা, ক্রুদ্ধ চোখে কখনো আমার প্রতি তাকাননি। শৈশবে শিশুদের নানা দুষ্টুমিতে অভিভাবকরা বিরক্ত হন, অনেক সময় প্রহারও করেন। দীর্ঘ দশ বছর সময়ে হযরত আনাস (রা.) কোনো ভুল করেননি, কোনো অন্যায় করেননি, এটা চিন্তা করা যায় না, কিন্তু এ সময়ে তার প্রতি রসূল (স.)-এর আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ আমাদের জন্যে একটি উদাহরণ। আমরা বুঝতে পারি, শিক্ষা নিতে পারি যে, শিশুরা স্নেহ পাওয়ার উপযুক্ত এবং তাদের সংগে স্নেহপূর্ণ আচরণই করা কর্তব্য।

রসূল (স.) হযরত হাসান হোসাইনের সংগেও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি নামাযের সাজদায় গেলে হাসান হোসাইন তাঁর পিঠে ওঠে বসতেন। তারা নেমে না যাওয়া পর্যন্ত রসূল (স.) সাজদা থেকে মাথা তুলতেন না।

আকরা ইবনে হাবেস নামের এক গ্রাম্য লোক একবার রসূল (স.)-এর কাছে এসেছিলো। সে সময় রসূল (স.) হাসান হোসাইনকে আদর করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে আকরা ইবনে হাবেস বললো, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকে কখনো এভাবে আদর করিনি। রসূল (স.) বললেন, তোমার মন থেকে স্নেহ ভালোবাসা উধাও হয়ে গেলে আমি কী করতে পারি?

শিশুর জন্মের আগে এবং জন্মের পরে

শিশুর জন্মের আগেই ইসলাম তার অধিকার সংরক্ষণ করেছে। শরীয়তে এ কারণেই বিয়ের পাত্রী নির্বাচনে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অর্থ সম্পদের চেয়ে দ্বীন এবং ধর্মীয় আভিজাত্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। মা যদি ধার্মিক হয় তবে সেই মা শিশুকে ভালো শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

শিশুর জন্মের পর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দিতে হবে। এমনি করে জীবনের প্রথম দিনেই তাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত করা হয়। জন্মের সাত দিন পর শিশুর মাথার চুল কামিয়ে সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য দান করতে হবে এবং তার আকীকা করতে হবে। একই সময়ে শিশুর নাম রাখতে হবে। নাম যেন

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর এবং অর্থ যেন ভালো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণত দেখা যায়, ভালো নাম রাখা না হলে পরবর্তীতে নামের একাংশ ধরে বিকৃত নামে ড়াকা হয়। এ কারণে অনেক সময় মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে। রসূল (স.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন তোমাদের নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই তোমরা শিশুদের ভালো নাম রাখো।

রোগ এবং চিকিৎসা

গ্রামে এবং পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে দুর্বল বিশ্বাসের অধিকাংশ লোকেরা তাদের শিশু সন্তানের অসুস্থতায় চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে টোটকা চিকিৎসার আশ্রয় নেয়। রসূল (স.) বলেছেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা রোগ দিয়েছেন এবং ওষুধও দিয়েছেন। কাজেই তোমরা চিকিৎসা করাও। তবে হারাম বা নিষিদ্ধ জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করাবে না।

রসূল (স.) অসুস্থতার সময় চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অলসতা তিনি অপছন্দ করেছেন। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, প্রথম দিকে অবহেলা অমনোযোগিতার কারণে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এরকম অমনোযোগিতা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অবহেলার শামিল। ফলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হবেন।

মায়ের দুধ শিশুর অধিকার। শিশু নিয়মিত মায়ের দুধ পান করলে মায়ের স্তন ক্যান্সার হওয়ার আশংকা থাকে না। শিশুকে নিজের স্তনের দুধ পান করানো মায়ের শরীয়ত নির্ধারিত দায়িত্ব। শিশুর জন্যে মায়ের মমত্ববোধ প্রকাশের ফলে মায়ের প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। এ সকল উপকারিতা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে ফ্যাশন সচেতন মহিলারা সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না। কবি আকবর এলাহাবাদী লেখেছেন–

শৈশবকালে গন্ধ কিভাবে আসবে
মাতা পিতার আদরের
গুঁড়ো দুধ পায় কৌটা থেকে
শিক্ষা হচ্ছে সরকারের।

শিশু ও পরিবেশ

শিশুর মন হচ্ছে একটি স্বচ্ছ স্লেটের মতো। সমাজ এবং ঘরের পরিবেশ যেমন থাকে সে পরিবেশের ছাপ শিশু হৃদয়ে পড়ে। শিশুর ভবিষ্যত জীবনে তা প্রভাব বিস্তার করে। পরিচ্ছন্ন চারিত্রিক পরিবেশে নেশামুক্ত জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার শিশুর রয়েছে। শিশুর লালন পালনে পিতামাতা এবং সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো রকমের সংকীর্ণতা সমাজ এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিতে পারে।

বর্তমানে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, শিশুদের জন্যে সব রকমের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু এটা তো সবাই জানে, বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাবে মায়েরা অফিস আদালতে কাজ করতে উৎসাহী হওয়ায় তারা শিশুকে সময় দিতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই শিশুকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুকে কিছুতেই বুঝতে দেয়া যাবে না তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শিশুকে কোনো কিছু বুঝাতে হলে নরমভাবে বুঝাতে হবে। অহেতুক তাদের শাসন করা যাবে না। ধমক দেয়া যাবে না। অন্য কারো সামনে শিশুকে অপমান করা যাবে না। পরিবারের সকল শিশুর সংগে সমান আচরণ করতে হবে। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, শিশুকে সোহাগ চুম্বন দেয়ার ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রাখতে হবে। তা না হলে শিশুর হীনমন্যতা বোধ জাগ্রত হতে পারে। যাকে বেশী আদর করা হবে অন্য শিশু তাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

শিশুদের সামনে বড়োরা অশালীন আচরণ যেন না করেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অশালীন কথা বলা থেকেও বিরত থাকতে হবে। শিশুকে সত্য কথা বলার উপদেশ দেয়া হলে নিজেও সত্য কথা বলতে হবে। পিতামাতা হচ্ছে শিশুর জন্যে আদর্শ। শিশুরা পিতামাতাকেই অনুকরণ অনুসরণ করে থাকে। পিতামাতার কথার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলে শিশুরাও সে বৈপরীত্যের শিকার হবে এবং সে রকম আচরণ শিক্ষা করবে। শিশু যদি ভালো কাজ করে তবে তার প্রশংসা করতে হবে। এতে তার মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং সে উৎসাহিত হবে। ভবিষ্যতে শিশুর ভালো কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। যদি শিশু কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে তবে তার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করবেন। অযথা প্রহার এবং মারপিট করা হলে এর ফল ভালো হয় না।

শিশু যদি কোনো বিষয়ে দুর্বল থাকে তবে সে বিষয়টি আকর্ষণীয় করে তার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। জোর করা হলে বা চাপ সৃষ্টি করা হলে তার মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হবে না; বরং শিশু সে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করবে, তার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে। সে জেদী হয়ে গড়ে ওঠবে। এটা পর্যায়ক্রমে অমানবিক বিষয়ে পরিণত হবে। কাজেই শিশুকে নরম ভাষায় ভদ্রভাবে প্রশিক্ষণ দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নরম স্বভাব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পরিবারের পরিবেশ যদি ধর্মীয় হয় তবে শিশু সে পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে। কারণ শিশুর মনে পরিবেশের প্রভাব তীব্রভাবে পড়ে। শিশুকে রেডিও, টিভি, গেমস এবং সিনেমা থেকে দূরে রাখতে হবে। চারিত্রিক মাপকাঠিতে উন্নত ব্যক্তিরাই জীবনে উচ্চ মর্যাদালাভে সক্ষম হতে পারে। ইদানীং একটা অভিযোগ শোনা যায়, শিশুরা বেপরোয়া বেয়াড়াভাবে গড়ে ওঠছে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, শিশুরা বড়োদের আচরণ লক্ষ্য করে নিজেদের স্বভাবে সে রকম আচরণ রপ্ত করে। একপর্যায়ে বড়োদের প্রতি ছোটোদের শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। শিশুকে প্রথমে কালেমা শিক্ষা দিতে হবে। সাত বছর বয়স হলে নামাযের তাকিদ দিতে হবে। দশ বছর বয়স হলে নামাযের জন্যে কড়াকড়ি করতে হবে। পিতামাতাকে যেন শিশু এ সময়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। দশ বছর বয়স হলে শিশুর বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশে নাটকে সিনেমায় ফ্যাশন হিসেবে শিশুদের অধিকার রক্ষার অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এসব কেবলই ফ্যাশন। কোটি কোটি টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় করা হয়, কিন্তু যেসব শিশু দামী গাড়ীতে বসে থাকা সুন্দর সুন্দর পোশাকের সমবয়সীদের দিকে হতাশা এবং বঞ্চনার দৃষ্টিতে তাকায়, তাদের জন্যে কি করা হয় সেদিকে কেউ লক্ষ্য রাখে না।

একশ্রেণীর শিশু ঐশ্বর্যের মধ্যে বড়ো হচ্ছে অন্য শ্রেণী ধুলোবালির মধ্যে অমানবিকভাবে বেড়ে ওঠছে। এমনি করে কর্মজীবনে এরা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গড়ে ওঠে। কাজেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্রেণী বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। এ জন্যে কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আমাদের দেশে এতীম, বিকলাঙ্গ এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে এরকম প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে তারা সচ্ছল এবং সক্ষম শিশুদের পাশাপাশি সমানভাবে বেড়ে ওঠবে। পবিত্র কোরআনে সেসব এবাদাতগোযার লোকদেরও ধ্বংসের খবর দেয়া হয়েছে যারা এতীমদের ধাক্কা দেয় এবং অসহায় লোকদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বস্তুত তোমরা এতীমকে সম্মান করো না এবং অভাবগ্রস্তদের উৎসাহিত করো না।' (সূরা ফাজর আয়াত ১৭-১৮)

একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে বেড়ে ওঠে তারা সৃষ্টিশীল নাগরিক হয় না; বরং তারা ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহিত হয়ে থাকে। সমাজে আমরা এর বেশ কিছু নিদর্শন দেখতে পাই।

এতীম এবং বেওয়ারিস শিশুদের মডার্ণ হোমস

এ সকল শিশু আবাসস্থলের নাম হচ্ছে এসওএস শিশুপল্লী। ইংরেজী পরিভাষা অনুযয়ী মূল কথা হচ্ছে, সেভ আওয়ার সোলস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এসব শিশুপল্লী গড়ে ওঠে। সে সময় বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিলো। বিশ বছর বয়স্ক এক যুবক, যুবকের নাম হারমান মাইজ, এ যুবকের উদ্যোগে এ শিশুপল্লী গড়ে ওঠে। মেডিকেল কলেজের এ যুবক ছাত্র নিজেও ছিলো পিতৃহীন। বেওয়ারিস শিশুদের জন্যে নিজের ভেতর তীব্র মনোবেদনা এবং যন্ত্রণা অনুভব করেছিলো। তারপর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো এতীম শিশুদের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে। ১৯৪৯ সালে অস্ট্রিয়ার আমিট নামক জায়গায় হারমান মাইজএর আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রথম শিশুপল্লী গড়ে উঠে। এ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত। বর্তমানে বিশ্বের ১২৫টি দেশের বিভিন্ন শহরে ১৩৪৫টি শিশুপল্লী রয়েছে। উল্লেখযোগ্য অঞ্চলসমূহ হচ্ছে ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। এ শিশুপল্লী স্কুল পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছে। সময় যতোই যাচ্ছে ততোই এসও এস শিশুপল্লীর সংখ্যা ততোই বাড়ছে। এসব পল্লীর উদ্দেশ্য ও মূলনীতি নিম্নরূপ-

www.nagorikpathagar.org

প্রচলিত এতীমখানার চেয়ে এসব শিশুপল্লী সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে বেওয়ারিস শিশুদের জন্যে মায়ের ব্যবস্থা করা হয়। শিশুর স্নেহময় পরিবেশে বেড়ে ওঠার জন্যে মায়ের স্নেহ অত্যন্ত জরুরী।

এ পল্লীতে পরিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে। দশ বারোটি শিশুকে নিয়ে একটি পরিবার গড়ে তোলা হয়। এসব শিশু ভাইবোনের মতো পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ মমতায় বেড়ে ওঠে।

প্রতিটি পরিবারের জন্যে একটি করে ঘর রয়েছে। প্রতিটি শিশুপল্লী এরকম ১০টি ঘরের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। মায়ের জন্যে রয়েছে আলাদা কক্ষ। প্রতিটি বেডরুমে চার পাঁচ জন শিশু বসবাস করে।

প্রতিটি শিশুপল্লীতে দশ থেকে পনেরটি ঘর থাকে। সাধারণত বড়ো শহরের অথবা শহরের নিকটবর্তী আকর্ষণীয় ও মনোরম পরিবেশে এসব শিশুপল্লী গড়ে ওঠে।

এসব শিশুপল্লীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা। প্রতিটি শিশুপল্লীতে একটি করে স্কুল থাকে। এছাড়া শিশুদের হস্তশিল্পসহ অন্যান্য কাজ শেখানোর জন্যে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষার জন্যে প্রতিটি শিশুপল্লীতে মাসজিদ রয়েছে। সেখানে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া শিশুপল্লীতে থাকে খেলার মাঠ, বাগান, ডিসপেনসারি, দোকান ইত্যাদি সুবিধা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৭ সালে লাহোরে মিসেস সুরাইয়ার হাতে প্রথম এসওএস শিশুপল্লী গড়ে ওঠে। লাহোরের ফিরোজপুর রোডে এ পল্লীর অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এসওএস শিশুপল্লী পাকিস্তানে ১৪টি প্রকল্পে কাজ করছে। এসব প্রকল্প যেসব শহরে রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, লাহোর, করাচী, ফয়সালাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, সারগোদা, এসওএস ভকেশনাল সেন্টার- রাওয়ালপিন্ডি, এসওএস রুরাল স্পোর্ট প্রোগ্রাম- কাসুর।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বালকদের ইউথ হোমসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে অবস্থানের সময় উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তাদের শিক্ষা দেয়া হয় অথবা বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এসওএস ভিলেজ লাহোর

এ ভিলেজ পাকিস্তানে প্রথম ভিলেজ, যা ১৯৭৭ সালে মিসেস সুরাইয়ার হাতে স্থাপিত হয়েছিলো। ৭০ বর্গকিলোমিটারের ওপর স্থাপিত এ ভিলেজের জমি দান করেছে পাঞ্জাব সরকার। এখানে ১৫টি ঘর রয়েছে। বর্তমানে এখানে ১৫০টি শিশু লালিত পালিত হচ্ছে। এখানে শিশুরা সব রকমের সুযোগ সুবিধা লাভ করছে। খেলার মাঠ, স্কুল, নার্সারী, মাসজিদ, দোলনা, ডাক্তারখানা, কম্যুনিটি সেন্টার ইত্যাদি। এ যাবত এ পল্লী থেকে দুই হাজার শিশু বের হয়েছে এবং তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১০টি মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ভিলেজের ভেতরে একটি স্কুল রয়েছে। সেখানে প্রাইমারী থেকে সেকেন্ডারী পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এটি লাহোরের অল্প কয়েকটি স্কুলের অন্যতম

www.nagorikpathagar.org

যেখানে কম্পিউটার সায়েন্স শিক্ষা দেয়া হয়। ২০০২ সালে লাহোরে একমাত্র এ স্কুল থেকেই শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার সায়েন্সে পরীক্ষা দিয়েছে। এখানে রয়েছে সায়েন্স ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরী এবং স্নেহশীল শিক্ষক। এখানে বর্তমানে এক হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এদের মধ্যে এসওএস শিশু পল্লীর ছেলেমেয়েরা সংখ্যা প্রায় দুইশ।

এ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় বিভিন্ন মানুষের দান করা অর্থে নির্বাহ হয়।

এসওএস ভিলেজে ভর্তি হওয়ার গুরুত্ব

এসওএস শিশুপল্লীতে এতীম এবং বেওয়ারিস শিশুদের ভর্তি করা হয়। নবজাত শিশু থেকে দশ বছর বয়েসী শিশুরা এখানে ভর্তির সুযোগ পায়। এসওএস শিশুপল্লী থেকে বের হয়ে তারা পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, যেমন পাকিস্তান স্টীল মিলস, বিএএফ একাডেমী ইত্যাদিতে মনোনীত হয়েছে। এক যুবক পাকিস্তান আর্মিতে কমিশন লাভ করেছে। এছাড়া ইলেকট্রিশিয়ান, টেইলার মাস্টার, ওয়েলডার এবং স্কিলড ওয়ার্কার হিসেবেও তারা দক্ষতা অর্জন করেছে। শিশুদের অধিকতর প্রশিক্ষণের জন্যে তাদের আর্ট এন্ড ক্রাফট, ডিজাইনিং, হস্তশিল্প ইত্যাদি কারিগরি কাজে দক্ষতা অনুযায়ী মনোনয়ন দেয়া হয়।

সন্দেহ নেই, ইসলাম একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ পেশ করেছে, কিন্তু আমাদের দেশ এখনো এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের লক্ষ্যে আগামী দিনের এসব বংশধরদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কোরআনে এ কাজের বিনিময় দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি কি তাদের কথা চিন্তা করে দেখেছো যারা দ্বীনকে অবিশ্বাস করে? এরা তারাই যারা এতীমকে ধাক্কা দেয়। (সূরা মাউন)'

কাজেই সমাজে বসবাসকারী আশেপাশের বেওয়ারিস এতীম শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য। তাদের এ রকমের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেয়া উচিত যেন তারা ভালোভাবে জীবন কাটানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে অধিক পরিমাণে দান করা উচিত। যেন কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সরাসরি দানের অর্থ জমা দেয়া যায়।

শিশুদের প্রশিক্ষণ এবং ইউরোপের ডে-কেয়ার সেন্টার

বস্তুবাদী জীবন ইউরোপের মানুষদের অত্যন্ত ব্যস্ত এবং অস্থির করে তুলেছে। তারা নিজেদের সন্তান প্রতিপালন, সন্তানদের প্রশিক্ষণ এবং স্নেহ ভালোবাসা দেয়ার সময়টুকুও পায় না। ইসলাম শিশু সন্তানকে পিতামাতার কোলের অংশে পরিণত করেছে। অথচ ইউরোপ যান্ত্রিকভাবে শিশুদের লালন পালন করতে গিয়ে তাদের মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। শিশুর প্রতি মাতৃস্নেহের প্রভাবের কথা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। ইউরোপের মায়েরা তাদের সন্তানদের ডে-কেয়ার সেন্টারে জমা দিয়ে অফিসের কাজে বেরিয়ে যায়। সেখানে মেশিনের সাহায্যে শিশুদের দেখাশোনা করা হয়। মায়েরা বিকেলে ঘরে ফেরার সময় সন্তানদের সংগে নিয়ে আসে। ফলে ইউরোপে সন্তানরা বিদ্রোহী, স্বার্থপর এবং অপরাধ জগতের সাথে জড়িয়ে পড়ে। (উইকলি মেডিকেল সার্ভে)

www.nagorikpathagar.org

বারো বছরের সন্তানের কীর্তি

অস্ট্রিয়ার বারো বছর বয়েসী এক সন্তান তার পিতামাতার বিরুদ্ধে এক লাখ ডলার জরিমানা দাবী করেছে। পুত্রের অভিযোগ হচ্ছে, বাম হাত অবশ অবস্থায় তাকে কেন জন্ম দেয়া হলো। কেননা এ কারণে সে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পেছনে পড়ে যায় এবং পুরস্কারলাভে ব্যর্থ হয়। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য মিস্টার ক্লার্ড পিপার এক তথ্যে প্রকাশ করেছে, ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় দশ হাজার ডাক্তারের কাছে ভুয়া ডিগ্রী ছিলো। অথচ তারা নিয়মিত প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছিলো। (দৈনিক জং, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪)

আমেরিকার হাইস্কুলসমূহে প্রতি দুইজন ছাত্রের মধ্যে একজন মদ পান করে। প্রতি চার জনের মধ্যে একজন ধূমপান করে। প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন হাসিস ব্যবহার করে।

অন্য এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, আমেরিকায় প্রতি সাত মিনিটে একটি বালক নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে গ্রেফতার হয়। প্রতি আট সেকেন্ডে একজন বালক স্কুল ত্যাগ করে। প্রতি ২৭ সেকেন্ডে একটি বালিকা গর্ভবতী হয়। প্রতি ৪৭ সেকেন্ডে একটি বালিকার সংগে বাড়াবাড়ি করা হয়। প্রতি ৩৬ মিনিটে একজন আমেরিকান আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে হয়তো জখম অথবা নিহত হয়।

বৃটেনে ১৯৮৬ সালে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের সংগে যৌন সম্পর্কের ১২০০ ঘটনা ঘটেছে। এসব শিশুর বয়স ছিলো পাঁচ বছরের কম। বৃটেনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুরা প্রতি বছর ৯ কোটি পাউন্ড সিগারেট পানে ব্যয় করে। এ পরিস্থিতির জন্যে দায়ী হচ্ছে সহশিক্ষা এবং যৌনতা সম্বলিত চলচ্চিত্র। (দৈনিক জং, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৭)

জার্মানীতে পুরুষের সংগে পুরুষের এবং মহিলাদের সংগে মহিলাদের বিয়ের দাবী জোরালো হয়ে ওঠেছে। বার্লিনে এ দাবীর সমর্থনে ৫০০ সমকামী নারী পুরুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ১৯৮৪ সালে এক জরিপে দেখা গেছে, শুধু সানফ্রান্সিসকোতে ৭০ হাজার সমকামিতা সমর্থক রয়েছে। সমকামিতার সমর্থকরা কলোরাডোতে তাদের প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপন করেছে।

আমার এক প্রগতিশীল বন্ধুর বাড়ী সিন্ধু প্রদেশে। তিনি সমাজতন্ত্রের এমন ঘোর সমর্থক যে, সুযোগ পেলেই তিনি সমাজতন্ত্রের সমর্থনে কথা বলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা তিনি এখনো তার অন্তরে লালন করেন। তাই সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র থাকাকালে নারী স্বাধীনতার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমাদের, এখানে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি।

www.nagorikpathagar.org

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিধবা মহিলাদের জীবন

ইসলাম এবং ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভংগি

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, বিপন্ন চেহারার যে নারী স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পরও সন্তানদের প্রতি তাকিয়ে ধৈর্যধারণ করেছে, সে এবং আমি জান্নাতে একই জায়গায় থাকবো।

ইসলাম কুমারী এবং বিধবা নারীদের অনেক অধিকার দিয়েছে। বিধবা নারীদের জীবনকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছে। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে রসূল (স.) নিজে বিধবা নারীদের বিয়ে করেছেন। এরকম কাজ ইসলামে পছন্দনীয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইউরোপীয় নারীদের জীবন

ইউরোপ কি নারীদের মর্যাদার নাকি অমর্যাদার আসন দিয়েছে? ইউরোপে নারীরা শ্রমিক, ড্রাইভার, সুইপার, সেক্রেটারী, রিসেপশনিস্ট, ওয়েটার, এয়ার হোস্টেস এমনকি বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। এটা কি নারী স্বাধীনতা নাকি ক্রীতদাসীর মতো কাজ? অন্যদিকে ইসলাম নারীদের করেছে ঘরের রাণী। এছাড়া তাদের জান্নাতের হুরদের নেত্রীর মর্যাদায় আসীন করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের ইস্টার শহরে এক নারী আদালতে এ মর্মে মামলা করেছে যে, স্বামীর কাছ থেকে আমার অধিকার আদায় করে দেয়া হোক। বিধবা অবস্থায় আমি তাকে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু বিয়ের আগে সে জানতো না আমি বিধবা। যখন সে জেনেছে তখন আমাকে তালাক দিয়েছে। কাজেই তার কাছ থেকে আমার অধিকার আদায় করে দেয়া হোক। (হিউম্যান এন্ড ইসলাম)

ইউরোপে এরকম বহু ঘটনা রয়েছে। সেখানে বিধবাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়, অধিকার বঞ্চিত করা হয়।

হিন্দুধর্মে বিধবাদের জীবন–
ইবনে বতুতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

পর্যটক ইবনে বতুতা তার ভ্রমণ কাহিনীতে লেখেছেন– আমি একবার একদল লোক দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে নারী পুরুষ শিশু সব শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। সেখানে দেখতে পেলাম সুন্দর দামী পোশাক পরিহিত দু'জন মহিলা। উপস্থিত লোকেরা তাদের নিজেদের মৃত আত্মীয়স্বজনকে পৌছে দেয়ার জন্যে নানারকম খবর জানাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, এ দুই জন নারী বিধবা। তারা সোমনাথ মন্দিরে সতী হওয়ার জন্যে যাচ্ছে। এ দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি। এক বিশাল অগ্নিকুন্ড

www.nagorikpathagar.org

সাজানো হয়েছে। তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দুই মহিলা তাদের সওয়ারী থেকে নামলো এবং কি যেন পাঠ করে আগুনে ঝাঁপ দিলো। উপস্থিত সবাই একটি শব্দ বার বার উচ্চারণ করলো। তারপর সে মহিলাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার জায়গায় কেরোসিন তেল, কাঠ ছুঁড়তে লাগলো যেন তারা ভালোভাবে পুড়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে আমি সহ্য করতে পারলাম না। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে আসার পরও দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ছিলাম। (ইবনে বতুতার সফরনামা)

কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়। তখন বলা হয়েছিলো, যেহেতু পরিবার পুঁজি এবং ব্যক্তিস্বার্থের নিয়ামক, এ কারণে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সূতিকাগার পরিবার প্রথা বিলোপ করা হচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কার্লমার্কসের সহযোগী এঙ্গেলস তার রচিত 'পরিবার' গ্রন্থের শুরুতে লেখেছেন, পরিবার হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফসল, যা একটি বংশধারাকে অন্য বংশধারার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকার দেয়। পরিবারে স্ত্রীর ওপর স্বামী এ কারণেই কর্তৃত্ব করে যেহেতু স্বামী অর্থ উপার্জন করে। এঙ্গেলস তার এ মতাদর্শ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যদি উত্তরাধিকার প্রথা এবং ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ এবং নারীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের সমান করা যায়, তবে পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্যে কোনো প্রকার অর্থনৈতিক প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। সন্তান সম্পর্কে এঙ্গেলস লেখেছেন, নারী পুরুষের মেলামেশার ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাদের রাষ্ট্র লালন পালন করবে। এঙ্গেলস নারী পুরুষের মেলামেশাকে নিছক যৌনতানির্ভর একটি স্বাভাবিক ব্যাপার আখ্যায়িত করে লেখেছেন, এ যৌন সম্পর্ক পরস্পর উত্তেজনা ও আকাংখা বজায় থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে, এটা বৈধ। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ যখন বজায় থাকবে না, একজন অন্যজনের মাধ্যমে তার যৌন কামনা নিবৃত্ত করতে যখন আগ্রহ বোধ করবে না, তখন দু'জন আলাদা হয়ে যাবে।

এ দর্শনের ওপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্রীরা রাশিয়ায় সম্মিলিত ও সামাজিক জীবন যাপনের সূচনা করেছিলো। এ দৃষ্টিভংগিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত সোভিয়েট প্রতিনিধি মাদাম কোলনটাই এ বলে আখ্যায়িত করেছেন যে, ভালোবাসা হচ্ছে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি, মানুষ পিপাসা নিবারণের জন্যে তা পান করে। আপনারা পানি পান করেন, কিন্তু গ্লাসের কথা ভুলে যান। ঠিক তেমনি নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করে, তারপর উভয়ে উভয়কে ভুলে যায়।

দৃষ্টিভংগির আলোকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত দু'টি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। ১. জন্মগ্রহণ করা সকল সন্তান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে। ২. ধর্মীয় রীতিতে অনুষ্ঠিত সকল বিবাহ অবৈধ ঘোষিত হলো। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে একজন অন্যজনকে শুধু একটি কার্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেই চলবে।

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক জীবন যাপন করার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে পরিবারকে প্রাক্তন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরিবার ধ্বংস করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা হলো–

১. সতের থেকে বত্রিশ বছর বয়সের সকল মহিলা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত, এসব মহিলার মধ্যে যারা বিবাহিত তাদের ওপর স্বামীদের অধিকার রহিত করা হলো।

২. শিশুদের মধ্যে এমন প্রবণতা তৈরী করতে হবে যে, তারা সরকারের পক্ষে পিতামাতার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করবে।

৩. প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীকে যে কাজ দেয়া হবে, বাধ্যতামূলকভাবে তাদের তা করতে হবে। স্বামীকে এক শহরে কাজে নিযুক্ত করা হলে স্ত্রীকে অন্য শহরে কাজে নিযুক্ত করা হবে।

৪. এরকম পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর যৌন জীবনে সমস্যা দেখা দেয়ায় সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত দেয়, স্বামী স্ত্রী নিজ নিজ কর্মস্থলে ভিন্ন মানুষের সংগে যৌন মিলন সম্পন্ন করবে। স্ত্রী নতুন কাউকে স্বামী হিসেবে বেছে নেবে, স্বামী নতুন কাউকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নেবে। জারজ সন্তানকেও বৈধ সন্তানের মতো সমান অধিকার দেয়া হবে।

৫. মহিলাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য গর্ভপাত কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

ফলাফল

এসব আইনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে একজন গ্রন্থকার লেখেছেন, বেওয়ারিস সন্তান পালনকারী সরকারী সংস্থা ছাড়াও ৫০ লাখ শিশু পথে পথে ঘুরছে। তারা খেতে পায় না, তাদের ঘুমানোর জন্যে মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই। এগারো বারো বছর বয়েসী লাখ লাখ মেয়ে রুশ যুবকদের যৌন চাহিদা মেটানোর জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকে। রুশ সরকার এটাকে প্রাইভেট বিজনেস হিসেবে অভিহিত করেছে এবং তাদের বেশ্যাবৃত্তির আয়ের ওপর করারোপ করেছে। লেনিনের স্ত্রীর ধারণা অনুযায়ী এরকম শিশুর সংখ্যা ৭০ লাখে পৌঁছে গেছে। শিশুদের অপরাধপ্রবণতা এতো বেড়ে গেছে যে, ১৯৩৫ সালের ৭ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সরকারী বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাদের কাউন্সিল যৌথভাবে একথা স্বীকার করেছে, বারো বছরের বেশী বয়সের বালকদের পূর্ণ বয়স্ক লোকদের মতো শাস্তি দেয়া হোক।

১৯৩৪ সালে গৃহীত এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, একমাত্র মস্কোতে ৫৭ হাজার সন্তান অন্যান্য শহরে ১ লাখ ৫৪ হাজার বেওয়ারিস সন্তান রয়েছে। এছাড়া মফস্বল এলাকায় উক্ত সময়ে ২ লাখ ৪২ হাজার ৭৭৯টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, গর্ভপাতের সংখ্যা ৩ লাখ ২৪ হাজার ১৯৪। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে আসা সন্তানদের চার ভাগের তিন ভাগকেই পৃথিবীর আলো দেখার আগে হত্যা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

তালাকের সংখ্যা এতো বেড়ে গেছে যে, ১৯৩৫ সালে প্রথম পাঁচ মাসে রেজিস্ট্রিভুক্ত বিবাহের সংখ্যার তুলনায় তালাকের সংখ্যা ছিলো ৩৮ ভাগ বেশী। ১৯৩৬ সালের মে মাসে এ সংখ্যা ৩ দশমিক ৪৪-এ উন্নীত হয়েছে।

অতপর বোধোদয়

নারী স্বাধীনতার এরকম ভয়াবহ ফলাফল সামনে আসার পর সমাজতন্ত্রীদের বোধোদয় ঘটে। ১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই সংখ্যায় বিখ্যাত সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ায় লেখা হলো, এবার সময় এসেছে দাম্পত্য জীবনের অনৈতিকতা ও অবিশ্বস্ততার রাশ টেনে ধরার। মানুষকে জানাতে হবে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততা সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের নৈতিকতা পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এতোদিন পর সরকারী প্রচার মাধ্যমে গর্ভপাত, তালাক এবং যৌন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হলো। পিতামাতার অধিকার স্বীকার করা হলো। তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হলো। যেসব সাহিত্যে গর্ভপাত কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষতিকর দিকগুলোর কথা লেখা হয়েছে সেসব সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার করা হলো। পিতামাতার স্নেহ ভালোবাসার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হলো। পারিবারিক জীবনের সৌন্দর্য ও উপকারিতা সম্পর্কে মানুষের মনে ধারণা বদ্ধমূল করা হলো। সরকারের পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হলো, বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন করে পরিবার এবং সংসারের উপকারিতা সম্পর্কে যেন মানুষকে ধারণা দেয়া হয়। এক বছর আগে যেসব সংবাদপত্র, সাময়িকীতে প্রগতিশীল লেখকরা পারিবারিক জীবনের মন্দ দিক এবং অকল্যাণ সম্পর্কে প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখতেন, তারা এখন বিপরীত কথা লেখতে লাগলেন। তারা অধিক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মানুষদের বুঝাতে লাগলেন যে, সুস্থ ও মযবুত পারিবারিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রথম সোপান। যারা অন্যায়ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

বিচার বিভাগের সুপারিশ

বিচার বিভাগের সরকারী মুখপাত্র বিবাহের স্থায়িত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করে লেখেছেন, স্বামী স্ত্রী দীর্ঘদিন দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকার মধ্যেই রয়েছে বিবাহের সার্থকতা। স্বেচ্ছাচারী বাধাবন্ধনহীন যৌন উন্মাদনা হচ্ছে বুর্জোয়া সংস্কৃতি। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিবাসীদের স্বাধীন যৌন জীবন যাপন থেকে দূরে থাকতে হবে।

১৯৩৬ সালে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং জীববিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান স্টৌলজ যেসব সুপারিশ প্রণয়ন করেন তা হলো–

১. বিয়ে একটি সামাজিক কর্তব্য। এ যাবত বিবাহ বিচ্ছেদ সহজ কাজ হিসেবে গণ্য হয়েছে, এখন সময় এসেছে বিবাহ বিচ্ছেদ কঠিন করতে হবে।

২. একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গর্ভপাতের বৈধতার কোনো সুযোগ নেই।

www.nagorikpathagar.org

৩. সমাজতান্ত্রিক নারী নিসন্দেহে পুরুষের সমতূল্য, সমমর্যাদার অধিকারী, কিন্তু প্রকৃতি তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সে দায়িত্ব তারা উপেক্ষা করতে পারে না। মা হওয়া নারীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মানুষ হিসেবে একজন নারীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তার আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে সে একজন মা।

তারপর বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পারিবারিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশে সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসীরা যেসব আইন তৈরী করেছে এবং যেসব সংস্কার জারি করেছে তা হলো–

১. পোস্টকার্ডের মাধ্যমে তালাক দেয়ার পদ্ধতি বাতিল করা হলো।

২. তালাকের ওপর ফি নির্ধারণ করা হলো। প্রথমবার তালাক দিলে ৫০ রুবল, দ্বিতীয় বার ১৫০ রুবল এবং তৃতীয় বার ৩০০ রুবল পরিশোধ করতে হবে। কোনো কোনো অবস্থায় এর পরিমাণ দুই হাজার রুবল নির্ধারণ করা হয়।

৩. তালাককে একটি অপছন্দনীয় কাজ হিসেবে গণ্য করার জন্যে যে ব্যক্তি তালাক দেবে, তার পাসপোর্টেও তালাক দেয়ার অভ্যাস এবং সে কয়বার তালাক দিয়েছে সে কথা লেখে দিতে হবে।

৪. বৈধ অবৈধ সন্তানের মধ্যেকার পার্থক্য পুনর্বহাল করা হলো।

৫. গর্ভপাত হত্যা অপরাধের মতো গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হলো। এমনকি যারা গর্ভপাতের পরামর্শ দেবে তাদের জন্যে দুই বছরের শাস্তির বিধান করা হলো।

৬. অবিবাহিত নারী পুরুষ এবং তিনটির কম সন্তান যাদের রয়েছে এরকম দম্পতির ওপর কর আরোপ করা হলো।

৭. সন্তান জন্মদান উৎসাহিত করার জন্যে গর্ভবতী মহিলাদের মাতৃকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হলো। শিশুদের জন্যে ভাতার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলো।

৮. যেসব শিশু কিশোরকে আগে গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে উৎসাহিত করা হতো তাদের শিক্ষা দেয়া হলো, পিতামাতাকে সম্মান করা এবং তাদের ভালোবাসা সন্তানের কর্তব্য। যদিও এটা প্রাচীনকালের রীতি, তবু এ রীতি মেনে চলতে হবে।

৯. স্ট্যালিন শিশুদের সংগে মেলামেশা শুরু করেন এবং তাদের সংগে ছবি তোলেন। এমনি করে বিশ বছরের মধ্যে সমাজতন্ত্রীরা তাদের পরিবার জীবন এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের সমাজতান্ত্রিক দর্শন ত্যাগ করে। এতে প্রমাণিত হয়, তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়েছিলো। স্কুল কলেজে সহশিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। কেননা সহশিক্ষার কারণে নারী পুরুষের মধ্যে মানসিক নৈরাজ্য এবং চারিত্রিক অধপতন দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে দেশের সামগ্রিক শক্তি এবং সামরিক শক্তিও দারুণ প্রভাবিত হয়।

সমাজতন্ত্রীরাই এসব কিছু করেছিলো, কিন্তু আসল ভুল শোধরানো হয়নি। নারীদের ওপর শ্রমের দায়িত্ব বহাল রাখা হয়। ফলে এতো রকমের সংস্কার করার পরও পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি।

www.nagorikpathagar.org

গর্বাচেভের গ্রন্থ পেরস্ত্রয়কা

রাশিয়ার এরকম পরিণতি লক্ষ্য করে সোভিয়েট ইউনিয়নের শেষ শাসক গর্বাচেভ পেরস্ত্রয়কা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্ব জুড়ে গ্রন্থটি পঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে গর্বাচেভ লেখেছেন, 'পশ্চিমী সমাজে নারীকে ঘর থেকে বের করা হয়েছে। নারীদের স্বাধীনতা দেয়ার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কিছু উপকার হয়েছে একথা সত্য। কারণ পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছে, কিন্তু উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কর্মক্ষেত্রে সব নারীর অংশগ্রহণের ফলে আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার কারণে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা নারী স্বাধীনতাজনিত উপকারের চেয়ে অনেক বেশী। এ কারণে আমি আমাদের দেশে পেরেস্ত্রয়কা নামে একটি আন্দোলন শুরু করেছি। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঘরের বাইরে বের হওয়া নারীদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিভাবে এটা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। এটা এ কারণেই প্রয়োজন যেন পারিবারিক জীবন ধ্বংসের কারণে আমাদের জাতীয় জীবন ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।'

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিণতি ইতিহাসে সব জাতির মাঝে একই রকম লক্ষ্য করা গেছে। যেসব জাতির নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে তাদের মানসিক এবং শারীরিক শক্তি নিশেষ হয়ে যায়। তারা জ্ঞানচর্চা, গবেষণা এবং সৃষ্টিশীল কাজের উপযুক্ত থাকে না। কর্মক্ষেত্রেও তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। শক্তিশালী এবং সৃষ্টিশীলতার যোগ্যতাসম্পন্ন জাতিসমূহের মোকাবেলায় এরা থাকে পশ্চাৎপদ।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডাক্তারের জরিপ

এ সম্পর্কে আমি এখানে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের গবেষণার সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ডিসিয়াম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের জীবন যাপন রীতি সম্পর্কে গবেষণা করেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এ অধ্যয়নের পরে তিনি বিভিন্ন সমাজ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে 'সেক্স কালচার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেছেন, গবেষণার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীতি হয়েছি যে, প্রতিটি মানবগোষ্ঠী দু'টি জিনিসের ওপর টিকে থাকে। একটি হচ্ছে তাদের সামাজিক ব্যবস্থা, অন্যটি হচ্ছে অর্জিত শক্তি। এ শক্তি তারা অর্জন করে সুশৃংখল জীবন যাপনের মাধ্যমে। তারা নিজেদের যৌন জীবন বিধিবদ্ধ এবং পরিশীলিত করে। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় যদি উচ্চতর দেখা যায়, তবে অনুসন্ধানে দেখা যায় তারা পরিশীলিত যৌন জীবন যাপন করে। যৌন জীবন যাপনে অনুসৃত আচরণের ফলেই একটি জাতির সাংস্কৃতিক মান নির্ণয় ও নিরূপণ করা যায়। ৬০টি গোত্রের সাংস্কৃতিক রুচি ও আচরণ পর্যালোচনার পর তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে–

ক. যেসব গোত্র বিয়ের আগে যৌন জীবনকে বল্গাহীন করেছে, অতিমাত্রায় যৌন স্বাধীনতা ভোগ করেছে, তারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

খ. যেসব গোত্র বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কিছু না কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মধ্যম মানে অবস্থান করছে।

গ. বিয়ের পূর্বে যারা যৌন উদ্দামতা উচ্ছৃংখলতা থেকে নিজেদের মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রেখেছে, বিবাহপূর্ব যৌন মিলনকে যারা পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তারাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, তারাই সফলতা লাভ করেছে।

তিনি আরো লেখেছেন, মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে, যৌন জীবনের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করার ফলে জনগণের চিন্তা চেতনা, কর্মশক্তি ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যেসব জাতি নারী পুরুষের যৌন উন্মাদনা চরিতার্থ করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়, তাদের চিন্তা ও কর্মশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। রোমকদের ক্ষেত্রে এরকমই হয়েছিলো। তারা পশুদের মতো বাধা বন্ধনহীন যৌন জীবন যাপন করতো। ফলে সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজের প্রতি মনযোগী হওয়ার মতো শক্তি তাদের অবশিষ্ট ছিলো না। তারা দৈহিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো।

লেখক তার 'সেক্স কালচার' গ্রন্থের শেষদিকে লেখেছেন, কোনো জাতি যদি চায় যে তাদের শক্তি বেশীদিন টিকে থাকুক অথবা শক্তি বৃদ্ধি পাক, তবে তাদের উচিত সুশৃংখল ও পরিশীলিত জীবন যাপন শুরু করা। আইনগতভাবে নারী পুরুষের সমতা বিধান করা। তারপর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন সাধন করা দরকার, যাতে সমাজে যৌন আচরণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজ সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। তাছাড়া তাদের সামনে গড়ে ওঠবে উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যত। তারা উন্নত সংস্কৃতি তৈরী করতে পারবে। তারা এমন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বলাভে সক্ষম হবে যা আজ পর্যন্ত কেউ লাভ করতে পারেনি।

অবশেষে যা হলো

নারী স্বাধীনতা এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের কাজ করার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাশ্চাত্য সমাজে জায়গীরদারী ব্যবস্থার পরিবর্তে যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো, তখন সস্তা শ্রমের জন্যে পুঁজিবাদীরা মহিলাদের ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলো। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লাখ লাখ পুরুষ নিহত হওয়ায় নারীদের জীবিকার সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিকরা মানুষ এবং বিশ্বজগতকে স্রেফ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগিতে চিন্তা করার ফলে আগে থেকেই পাশ্চাত্য সমাজে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিলো। এসব কারণে পাশ্চাত্যের নারী সমাজকে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়া হয়, কিন্তু আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আমাদের মন মানসিকতা পাশ্চাত্যের ছাঁচে গড়ে ওঠেছে। ভারতে সহশিক্ষা ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদীদের চেষ্টার ফলে নগ্নতা অশ্লীলতা বিস্তারের পরিণামে আমাদের দেশেও নারী স্বাধীনতা এবং নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এসব কারণে আমাদের সামাজিক কাঠামো অবনতিশীল হয়ে পড়েছে। ফলে আধুনিকতার স্রোতধারায় আমাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা, সামাজিক মূল্যবোধ, সহজ সরল জীবন যাপন, পরোপকার এসব কিছু কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে। নারী স্বাধীনতা সৃষ্টির মূলে রয়েছে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে ধস নামানোর গভীর ষড়যন্ত্র। যদি আমরা নিজেদের কল্যাণ ও স্বার্থচিন্তায় উদ্যোগী না হই তবে অতল গভীর অন্ধকার থেকে উদ্ধার পাওয়া হবে আমাদের জন্যে দুঃসাধ্য। (সমাজ, আধুনিকতা ও ইসলাম)

বিধবা নারীদের ইদ্দত

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। (সূরা আল বাকারা)

গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের মেয়াদ হচ্ছে তাদের গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। (সূরা আত তালাক)

যেসব তালাকপ্রাপ্তা মহিলার হায়েয হয় তারা তালাকের পর তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। (সূরা আল বাকারা)

এন মেরি মোমিলের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া

এন মেরি মোমিল লেখেছেন, বিধবা হওয়ার পর নারীর ইদ্দত পালন করা জরুরী। কারণ নারী গর্ভবতী নাকি গর্ভবতী নয় এটা জানতে হবে। এছাড়া এ সময়ে নারীর পরবর্তী বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বাছাইয়েরও প্রয়োজন রয়েছে। ইদ্দত পালনের জন্যে সময় এ কারণেও দরকার যে, সন্তান পালনের জন্যে বিধবা নারীর উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা এ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

www.nagorikpathagar.org

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিশুদের জন্যে মায়ের দুধ

মায়ের দুধ উত্তম খাদ্য

মায়ের বুকের দুধ পান করলে শিশু মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে বেড়ে ওঠে। বারোটি উন্নয়নশীল দেশে শিশু মৃত্যুর হার রোধ করার উদ্দেশে ইউনিসেফ একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর নামকরণ করা হয় 'মায়ের দুধই সেরা'। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মায়ের দুধ না পাওয়ার কারণে প্রতিবছর ১০ লাখ শিশুর মৃত্যু ঘটে। কয়েক মিলিয়ন শিশু মায়ের দুধ না পাওয়ার কারণে ইনফেকশনের শিকার হয় এবং নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পংগু হয়ে যায়। এ কর্মসূচী যেসব দেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো সেগুলো হচ্ছে, পাকিস্তান, বিলোটিয়া, ব্রাজিল, মিসর, ঘানা, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং তুরস্ক। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের দুধ খাওয়ানোর বিজ্ঞানসম্মত সুযোগ বৃদ্ধি করা। জাতিসংঘের সাহায্যপুষ্ট এ সংস্থার বক্তব্য হচ্ছে বহু হাসপাতালে মায়ের দুধ না পাওয়ার কারণে শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে দুধ সরবরাহ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে ইউনিসেফ জানিয়েছে, মায়ের বুকের দুধ যেসব শিশু পান করে তাদের বোতলের দুধ পান করা শিশুদের চেয়ে শতকরা দশ ভাগ কম হাসপাতালে নিতে হয়। একথা একশভাগ প্রমাণিত হয়েছে যে, যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তারা মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকে। কারণ মায়ের দুধ স্বাভাবিকভাবে শিশুদের পুষ্টি এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। ইউনিসেফ নারী সংগঠনগুলোর কাছে অনুরোধ জানিয়েছে তারা যেন ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালায় যে, মায়ের দুধ পান করা শিশুর স্বাভাবিক অধিকার। বিশেষত গর্ভবতী মায়েদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে হবে, তারা যেন তাদের সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ানোর মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তারা মেধাবী হয়

যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তারা অধিক মেধাবী হয়ে গড়ে ওঠে। তারা নানা প্রকার রোগ থেকে মুক্ত থাকে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করেনি তারা স্কুলের ক্লাসে প্রায়ই চুপচাপ থাকে। তাদের বন্ধুর সংখ্যাও কম। গবেষণা অনুযায়ী মস্তিষ্ক রোগ সিজোফ্রেনিয়ার শিকার ৭০ ভাগ শিশুর আইকিউ রেকর্ড করা হয়েছে ১১০ এবং গাভীর দুধপানকারী শিশুদের আইকিউ রেকর্ড করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে ১০০। একজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞের হিসাব অনুযায়ী মায়ের দুধের মধ্যে এমন কিছু অংশ থাকে, যা শিশুর মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অথচ গাভীর দুধে এ রকম শক্তি থাকে না। (রিসার্চ রিপোর্ট)

যেসব মা শিশুকে দুধ পান করায় তাদের স্তন ক্যান্সার কম হয়

বর্তমানে দেখা যায়, কোনো মহিলার স্তনে গুটি দেখা দিলে সে মহিলা আশংকা করে তার স্তনে ক্যান্সার হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা ধারণা করা ভুল যে, তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে এবং চিকিৎসা অর্থহীন। কেউ কেউ স্তনের গুটি দেখানোর জন্যে ডাক্তারের কাছে যেতে দেরী করে। অথচ এটা হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে যদি কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয় তবে বিষয়টি জটিল হয়ে যায়। তার ক্যান্সার হওয়ার আশংকা প্রবল হয়।

স্তনে গুটি দেখা দিলে অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে ডাক্তারের সংগে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। গুটি ছোটো থাকার সময়ে চিকিৎসায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশী বয়সে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে এর সাথে অন্য সমস্যা যুক্ত হয়ে মৃত্যু ত্বরান্বিত হতে পারে। স্তন ক্যান্সার শুনতে যতোটা গুরুতর মনে হয় বাস্তবে কিন্তু ততোটা গুরুতর নয়। বৃটেনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় এ রোগে আক্রান্ত রোগীদের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয়েছে। বলাবাহুল্য, মহিলাদের যেসব গুটি দেখা দেয় তার ১০টির মধ্যে একটি ক্যান্সার বাকি ৯টি সাধারণ গুটি বা ফুসকুড়ি। যাদের স্তনে ক্যান্সার হয় তাদের অধিকাংশেরই স্তন কেটে ফেলার প্রয়োজন হয় না। যেসব মহিলার তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তাদের শতকরা ৮৫ ভাগ স্তন ক্যান্সার হওয়ার পরও ৫ বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সময়ে তারা থাকে সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে রোগীর আত্মবিশ্বাসও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাকে চিন্তা করতে হবে, আমার কিছু হবে না, আমি পরাজিত হবো না। বর্তমানে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তদের জন্যে বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। যেসব উপায় অনুসরণ করা হলে স্তন ক্যান্সার রোধ করা যায় এখানে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে।

মোটাসোটা মহিলাদের স্তন ক্যান্সার বেশী হয়ে থাকে। সুস্থ থাকার সময় থেকেই এদের চর্বিযুক্ত খাবার কম খেতে হবে। ওযন কমাতে হবে। খাদ্য তালিকায় সবজি, তরকারি, ডাল বাড়িয়ে দিতে হবে।

২. ত্রিশ বছর বয়স হওয়ার আগে যদি মহিলাদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৩. যেসব মহিলা সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ায় তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের অধিকাংশ সুস্থ হওয়ার পর বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। ডাক্তার এস এ এর রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। (ফিড এন্ড চাইল্ড)

www.nagorikpathagar.org

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পুরুষ বনাম নারী

মানুষের শরীর মাসল, গোশত চর্বি ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরী। এসকল উপাদানের পরিমিত বিন্যাসকে বলা হয় 'বডি কম্পোজিশন'। এ বিন্যাসের কারণে দেহ নড়াচড়া করার এবং খেলাধুলার যোগ্যতা তৈরী হয়। খেলাধুলায় সফল কিংবা ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে দেহের চর্বির কমবেশী হওয়া বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

নারী দেহের ওযনের শতকরা প্রায় ৭৭ ভাগ চর্বি। পুরুষদেহে এর পরিমাণ মাত্র ১৩ ভাগ। তবে দশ বছর বয়স পর্যন্ত নারী এবং পুরুষের দেহে চর্বির পরিমাণে পার্থক্য থাকে না, কিন্তু দশ বছরের পর থেকে নারী দেহে চর্বির পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে এ পরিমাণ বেড়ে যায়।

মানবদেহ যেহেতু মাসল, হাড় এবং চামড়া সংশ্লিষ্ট চর্বির সংগে যুক্ত, এ কারণে দেখা যায়, পুরুষের বাহুতে শতকরা ৭৬ ভাগ মাসল এবং ১৭ ভাগ চর্বি বিদ্যমান থাকে। নারীদেহে এ পরিমাণের বিন্যাস রয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৬১ ভাগ এবং ৩৩ ভাগ।

মানবদেহ হচ্ছে কোষের সমষ্টি। মাসলের শক্তি নির্ভর করে কোষের সংকোচন এবং প্রসারণের ওপর। দ্রুত প্রসারমান কোষ দ্রুত স্পন্দিত হয় না এবং শক্তি রাখে না। তবে এ কোষ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজ করার উপযুক্ত থাকে।

মানবদেহের মাসলে যেহেতু দ্রুত এবং ধীরে প্রসারণশীল মাসল থাকে, এ কারণে তাদের সংখ্যা বিন্যাসের অবস্থা জেনে মাসলের যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। নারী পুরুষের মাসলের পরিমাণে কোনো পার্থক্য থাকে না। তবে মাসলের শক্তিতে পার্থক্য থাকে। সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের শারীরিক কাঠামোর বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করে জানা গেছে, পুরুষদের মোকাবেলায় নারীদের মাসলের শক্তি শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। এ বিন্যাস খেলোয়াড় পুরুষ এবং নারীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। ১৯৮৪ সালে জাপানের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের পর্যালোচনা অনুযায়ী নারীদের বাহুর মাসলের শক্তি পুরুষদের মাসলের শক্তির চেয়ে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। একইভাবে নারীদের পায়ের মাসলের শক্তি পুরুষদের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ।

শক্তিকে গতি এবং সরলতার সৃষ্টি বলা হয়েছে। শক্তি গতিশীল হওয়া ব্যতীত শক্তিতে পরিণত হয় না। গতিশীলতা শক্তি ব্যতীত তৈরী হয় না। এটা সাধারণ পর্যবেক্ষণের কথা যে, যদি ওযন কম হয় তবে সেই ওযন দ্রুত ওঠানো যায়। ওযন যতো বেশী হবে ততো ওঠাতে দেরী হবে এবং বেশী সময় ব্যয় হবে।

www.nagorikpathagar.org

একটি পরীক্ষায় এটা বুঝা গেছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সাধারণত একটি ভারি জিনিস মহিলারা পুরুষের তুলনায় দেরীতে উত্তোলন করে।

গতির পার্থক্য

খেলোয়াড়দের গতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ এবং সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নারী পুরুষ খেলোয়াড়দের দৌড় প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় প্রমাণিত হয়েছে, ৫০ মিটার দৌড়ে নারীর গতি পুরুষের চেয়ে শতকরা ৮১ ভাগ। ১০০ মিটার দৌড়ে এ অনুপাত ৭০ ভাগ। ৫০ মিটার দৌড়ে নারীদের ৪ থেকে ৫ সেকেন্ড গতির দৌড় এবং পুরুষদের ৬ থেকে ৭ সেকেন্ডের দৌড়ে এই অনুপাত প্রযোজ্য। ১০০ মিটার দৌড়ে এ অনুপাত যথাক্রমে ০, ৫ এবং ১ দশমিক ৭।

শক্তি পরীক্ষায়ও পুরুষদের পাল্লা ভারি। দেখা গেছে, নারীরা পুরুষের সমান ভারি জিনিস যদিও উত্তোলন করতে পারে, কিন্তু পুরুষদের তুলনায় নারীদের শক্তি লাগে বেশী।

ধৈর্য শক্তি, সহ্য করার শক্তি বা স্টেমিনার অর্থ হচ্ছে, এক ব্যক্তি একই রকমের কাজ কতো সময় যাবত করতে পারে। এ ধৈর্য শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত সামগ্রিক শারীরিক ধৈর্য শক্তি, দ্বিতীয়ত, মাসলের ধৈর্য শক্তি। সামগ্রিক শারীরিক শক্তির সর্বোত্তম প্রমাণ ম্যারাথন দৌড়ে পাওয়া যায়। ম্যারাথনে যারা দৌড়ায় তাদের দেহে অধিকতর অক্সিজেন প্রবেশ করাতে হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ব্যবস্থা এবং রক্ত চলাচল ব্যবস্থার মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন হবে। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা প্রায় ৬৫ শতাংশ অক্সিজেন গ্রহণ করে। এ হিসেবে দেখা যায়, একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এক মিনিটে তিন লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারী এ সময়ে গ্রহণ করে মাত্র দুই লিটার অক্সিজেন।

মোটা লোকেরা পাতলা লোকদের তুলনায় অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে। এ কারণে দৈহিক শক্তিকে শারীরিক ওযন এবং অক্সিজেন আকর্ষণে ভারসাম্য নিরূপণকারী বিবেচনা করা হয়েছে। একজন সাধারণ পুরুষ তার দেহে কিলোগ্রামের হিসেবে প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০ মিলিলিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে একই সময়ে একজন নারী গ্রহণ করে এক মিলিলিটার।

ধৈর্যশক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতি

ধৈর্যশক্তি পরীক্ষার কাজে ভারোত্তোলন একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। এতে দেখা গেছে, একজন পুরুষের তুলনায় একজন নারী শতকরা ৬০ ভাগ ভারোত্তোলন করতে পারে।

মাসলে রক্ত চলাচলে মাসলের সংগে সহ্যশক্তি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নারীর বাহুমূলের মাসলে রক্তপ্রবাহ পুরুষের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ, কিন্তু মাসলের প্রত্যেক অংশে এ রক্তপ্রবাহের পরিমাণ শতকরা ৯৩ ভাগ।

এ কথা সর্বজনবিদিত, পুরুষ যে গতিশক্তিতে অন্যের মোকাবেলা করতে পারে নারী তা পারে না। লম্বা দৌড়ে নারীদের রেকর্ড পুরুষদের তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ। সাঁতারের ক্ষেত্রেও একই রকম পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীড়াবিদ নয় এমন নারীরা পুরুষের তুলনায় ৭৫ থেকে ৮৫ ভাগ গতিতে দৌড়াতে পারে। অবশ্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ গতি বৃদ্ধি করা যায়, তবে বাড়লেও ৯০ শতাংশের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাবে না। নারীদেহে পুরুষদেহের তুলনায় অধিক চর্বি এবং কম মাসল থাকে। নারীদেহে শক্তি এবং গতিও থাকে কম। মোটকথা, শারীরিক মানসিক এমন বহু পার্থক্য রয়েছে যার কারণে নারীরা শুধু খেলাধুলা নয়; বরং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষের মোকাবেলা করতে পারে না।

এ সমস্যা সমাধানের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, পুরুষের ওপর নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অপচেষ্টা বন্ধ করে নারীকে তার প্রকৃত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে। সে দায়িত্ব কর্তব্য আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পুরুষদেরও তাদের জন্যে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। (ইউরোপের প্রশ্নের জবাব)

দেহের অধিকার

১. মাত্রাতিরিক্ত এবাদাত করে নিজের দেহকে কষ্ট দেয়ার দরকার নেই। সারা রাত জেগে থাকা এবং সারাদিন রোযা রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের দেহকে আরাম দিতে হবে।

২. নিজের প্রবৃত্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যাবে না যে, আমার প্রবৃত্তি খবিস হয়ে গেছে; বরং বলতে হবে, আমার প্রবৃত্তি কাহিল হয়ে গেছে।

৩. প্রবৃত্তিকে মোহমুক্ত করতে হবে, অর্থসম্পদের লোভ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৪. নিজের প্রবৃত্তিকে সহ্য শক্তিতে অধিক পরীক্ষার সম্মুখীন করা যাবে না।

৫. নিজের প্রবৃত্তির সংগে জেহাদ করতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহর বিধি নিষেধের অনুসারী করে গড়ে তুলতে হবে। (মিনহাজুল মুসলেমীন)

পৃথিবীতে যতো ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে তার অধিকাংশেই সামাজিক অধিকারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মই পিতামাতার অধিকারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

স্বাভাবিক চিন্তা করা হলেই বুঝা যায়, পিতামাতার অধিকার কতো বেশী। ইসলামও পিতামাতার অধিকার স্বীকার করে, তবে ইসলামে এ অধিকারের বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম পিতামাতার অধিকারের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোনো বিষয় অপূর্ণ রাখেনি। এছাড়া মানুষের ওপর মানুষের অধিকার এবং জীবজন্তুর ওপর মানুষের অধিকারেরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিজের দেহের অধিকারও অস্বীকার করা হয়নি। এ অধিকার উপেক্ষা করা মানুষের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। রসূল (স.)-এর হাদীস থেকে জানা যায়, প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের দেহের ওপর এবং দেহের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগের ওপর অধিকার রয়েছে। সহীহ বোখারীতে সংকলিত এক হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেন, নিসন্দেহে তোমার দেহের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেন, তোমার ওপর তোমার দেহের এবং তোমার চোখের অধিকার রয়েছে।

অন্যান্য ধর্মের মাঝে দেখা যায়, নিজের দেহের অংগ প্রত্যংগকে অধিক থেকে অধিকতর কষ্ট দেয়া তাকওয়া পরহেযগারী বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রবৃত্তির চাহিদা অস্বাভাবিক উপায়ে বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। দুনিয়ার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জনজীবন থেকে দূরে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়, কিন্তু ইসলাম এ ধরনের সকল অস্বাভাবিক পদ্ধতির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, নিজেকে আমানবিকভাবে কষ্ট দেয়া, অস্বাভাবিক উপায়ে সংযম পালন করা এবাদাতের পথ নয়; বরং ইসলাম এর ঘোর বিরোধী।

ইসলামে প্রবৃত্তিকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। ইসলামী শরীয়ত চায় প্রবৃত্তির সকল অধিকার আদায় করা হোক এবং প্রবৃত্তিকে সজীব সক্রিয় ও কর্মক্ষম রাখা হোক। তবে প্রবৃত্তিকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী রাখতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিভংগি প্রবৃত্তিকে হত্যা করা নয়; বরং নিয়ন্ত্রণে রাখাই হচ্ছে তাকওয়া। আত্মার পরিশুদ্ধিই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এর উদাহরণ হচ্ছে একখানি তলোয়ার। এ তলোয়ার দিয়ে নির্দোষ কোনো লোককে হত্যা করা যায়। এ কারণেই প্রাচীনকালের বিভিন্ন শরীয়তে বলা হয়েছে, তলোয়ার ভেংগে ফেলে দাও অথবা এমনভাবে তৈরী করে যেন ওর মধ্যে কোনো শক্তি বিদ্যমান না থাকে, কিন্তু ইসলামের কথা হচ্ছে, তলোয়ারকে ভালো অবস্থায় রাখো এবং তাকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী করে দাও। এর ফলে মযলুম অত্যাচারিতদের সহায়তায় এ তলোয়ার কাজে আসবে।

রসূল (স.) কখনো প্রবৃত্তিকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অনুমতি দিতেন না। তিনি তাকিদ দিয়ে বলতেন দুনিয়ায় খাও, ভালো পোশাক পরিধান করো, বিয়ে করো, কিন্তু সব সময় ইসলামী শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকার চেষ্টা করবে এবং ভারসাম্য বজায় রাখবে।

এবাদাত নিসন্দেহে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম, কিন্তু দেহের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া এবাদাত ইসলাম পছন্দ করে না, অনুমোদনও করে না।

রসূল (স.)-এর কাছে আসা দুই জন সাহাবী

রসূল (স.)-এর কাছে একদিন তাঁর দুই জন সাহাবী এলেন। তাদের একজন বললেন, আমি পানাহার ত্যাগ করেছি। অন্যজন বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কখনো বিয়ে করবো না। একথা শুনে রসূল (স.) বললেন, কিন্তু আমি তো দু'টোই করি। আমি পানাহারও করি, বিবাহও করেছি। রসূল (স.)-এর অনুমোদন না পেয়ে উক্ত দুইজন সাহাবী নিজেদের সংযম ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। আরবে কয়েকদিন পর্যন্ত একাধারে রোযা রাখার প্রথা ছিলো। কোনো কোনো সাহাবীও এরকম ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু রসূল (স.) তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবাদাত বন্দেগীর ক্ষেত্রে সমকালের লোকদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্টতার অধিকারী। তিনি একবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,

www.nagorikpathagar.org

সারারাত এবাদাত করবেন এবং সারাদিন রোযা রাখবেন। রসূল (স.) এ খবর পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, একথা কি সত্য? তিনি বললেন, হাঁ। রসূল (স.) বললেন, তোমার ওপর তোমার দেহের হক রয়েছে, চোখের হক রয়েছে, স্ত্রীর হক রয়েছে। প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখাই যথেষ্ট।

রসূল (স.)-এর তাকিদ

রসূল (স.) সব সময় একথার ওপর জোর দিতেন যে, অন্য ধর্মের অনুসারীদের মতো তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে বঞ্চিত করবে না। নফসের মধ্যে আত্মশুদ্ধির বৈশিষ্ট্য অর্জন করো। নফসের দাবী পূরণ করা এবং তার পাশাপাশি আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই সার্থকতা রয়েছে। ইসলামে দ্বীনের পাশাপাশি দুনিয়ার কল্যাণের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়েছে। মানুষদের এ দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদেরকে দুনিয়ায় সাফল্য ও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও ক্ষমা করো এবং তোমার সন্তুষ্টি দিয়ে ধন্য করো। এমনি করে দুনিয়ার কাজকর্ম যদি শরীয়তের আওতায় হয় তবে এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। রসূল (স.) আল্লাহর এবাদাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি নবুওতের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের বেশী সময় তিনি এবাদাত করছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা মোযযাম্মেলে এ সম্পর্কে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করেন, তিনি যেন নিজের নফসের অধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি রাতে কেয়াম করো, তবে রাতের কিছু সময় কেয়াম করবে।

এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূল (স.)-এর এবাদাতের কারণে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চাইছিলেন, রসূল যেন তার নিজের নফসের অধিকারও আদায় করেন, অর্থাৎ আরাম করেন। রাতে যেন বিশ্রামও নেন। এতে নফস এবং দেহ বাড়াবাড়ির শিকার হবে না; বরং তারা তাদের অধিকার পাবে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ইসলামী শরীয়তের বিধান

ইসলামী শরীয়ত এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, মানুষ যেন আল্লাহর সীমানার আওতায় থেকে এ দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন কাটায়, যাতে করে সকল মানুষের অধিকার আদায় করা যায় এবং নিজের নফসের ওপরও যেন যুলুম বা বাড়াবাড়ি না হয়।

ইসলাম স্বভাবসম্মত ধর্ম। ইসলামী শরীয়তের কোনো বিধানই মানব স্বভাব পরিপন্থী নয়। ইসলাম যখন ভারসাম্য এবং ন্যায়পরায়ণতার পরামর্শ দেয় তখন মধ্যমপন্থাকে উত্তম বলে অভিহিত করে। এর ফলে ইসলাম স্বভাবের দাবীই পূরণ করে।

ন্যায়পরায়ণতা

প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির অধিকার সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত ন্যায়পরায়ণতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একদিকে মানুষের সকল অধিকার আদায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, একই সংগে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, প্রবৃত্তিকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী হতে হবে। প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধির পথনির্দেশ করেছে এবং সে পথ অনুকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা যেন বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকে আল্লাহর এবাদাত করি এবং অন্যদের অধিকার প্রদান করি।

বাড়াবাড়ি করা ধ্বংসাত্মক কাজ

বৃটেনের একজন প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসক দীর্ঘসময় যাবত কাজ করতেন। ঘুমানোর জন্যে তিনি খুব কমই সময় পেতেন। হঠাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। জাপানে বেশী কাজ করা একটি সাধারণ ব্যাপার। বেশী পরিশ্রমের কারণে অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। একজন জাপানী সতের মাস যাবত কোনো প্রকার ছুটি ভোগ করেনি। এ সময়ে একাধারে কাজ করেছে। ফলে সে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছে। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এসব ঘটনায় প্রমাণিত হয়, বাড়াবাড়ি কোনো ক্ষেত্রেই কল্যাণকর নয়। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অতিরিক্ত কাজ, অতিরিক্ত পরিশ্রম মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ব্যস্ত সড়কে যারা গাড়ী চালায় তাদের হৃৎপিন্ডে আক্রমণের কারণে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানুষ যদি অধিক পরিশ্রম করে, সামাজিক পর্যায়ে মেলামেশা এবং ভাব বিনিময়ের সুযোগ কম পায়, তবে গুরুতর রোগের আশংকা বেশী দেখা দেয়। বিশেষত দায়িত্ব যখন বেশী এবং বিশ্রামের সুযোগ কম থাকে, তখন এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

www.nagorikpathagar.org

পক্ষান্তরে যারা সামাজিকভাবে মেলামেশার সুযোগ পায় তাদের ওপর চাপ কম থাকে এবং তারা সুস্থ্ থাকে। এছাড়া বেশী পরিশ্রম করে যদি ভুল খাবার গ্রহণ করে এবং ব্যায়াম না করে, তাহলেও সমস্যা দেখা দেয়। একাগ্রতার সাথে অধিক কাজ করা হলে কষ্টের কারণ তৈরী হয়।

এসব কষ্টের মধ্যে রয়েছে অংগ প্রত্যংগ এবং হরমোন সমস্যা। অবিশ্রান্তভাবে কাজ করলে হৃৎপিন্ড মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়, রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায়, ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা বেড়ে যায়, দেহে চর্বি এবং চিনির মাত্রাধিক্য দেখা দেয়।

এছাড়া কাজে যদি দক্ষতা না থাকে, কাজের পরিবেশ ভালো না হয়, খাবার পরিমিতি না হয়, তাহলেও সমস্যা দেখা দেয়। অকাল্য মৃত্যু রোধ করার জন্যে এ সকল ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন। (ডাক্তার এস এ কে মোশাহেদাত)

www.nagorikpathagar.org

ষড়বিংশ অধ্যায়

পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা

কুকুর সম্পর্কে সতর্কতা

রসূল (স.) বলেছেন, ঘরে যদি কোথাও কুকর বসে তবে কুকুর তাড়িয়ে দিয়ে সে জায়গায় পানি ছিটিয়ে দাও। (মুসলিম)

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী কুকুরের মধ্যে এমন জীবাণু থাকে যেসব জীবাণু খুব শীঘ্র বিস্তার লাভ করে, আশেপাশের পরিবেশ দূষিত করে। কুকুর যেখানে বসে সেখানেই জীবাণু ছড়ায়। কুকুর যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে সে জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে, বাতাসের মাধ্যমে পরিবারের লোকদের আক্রান্ত করে। কাজেই কুকর ঘর থেকে বের করে দিয়ে সে জায়গায় পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ফলে জীবাণু ধ্বংস হবে এবং পরিবারের লোকেরা রোগ থেকে রক্ষা পাবে। কুকুরের দেহ থেকে বের হওয়া জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে সিজোফ্রেনিয়া রোগও হতে পারে। (মালুমাতে তিব্বে জাদিদ)

প্রস্রাবের পাত্র ঘরে না রাখা

রসূল (স.) বলেছেন, এ রকম পাত্র ঘরের ভেতর রাখা যাবে না যে পাত্রে প্রস্রাব থাকে। কেননা এরকম পাত্র যে ঘরে রাখা হয় সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (তাবারানী)

আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে, প্রস্রাবের কারণে অনেক রোগের বিস্তার ঘটে। প্রস্রাব যদি খোলা অবস্থায় রাখা হয় অথবা সুস্থ লোকদের পাশে রাখা হয় তবে ঘরের সুস্থ মানুষ সে রোগে আক্রান্ত হয় যে রোগের জীবাণু প্রস্রাবের ভেতর রয়েছে।

এ কারণে রসূল (স.) প্রস্রাব সম্পর্কে সতর্কতার আদেশ দিয়েছেন।

ঘরের বরতনসমূহের বিবরণ

ওযু করার জন্যে পানির বরতন ঢেকে রাখতে হবে। (মেশকাত)

পান করার পানির বরতন, ওযুর পানির বরতন এবং এস্তেনজার পানির বরতন আলাদা রাখতে হবে এবং সব বরতন ঢেকে রাখতে হবে। (হাকেম, মেশকাত)

ইসলামে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী (স.)-এর হাদীসে রয়েছে 'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংগ'। উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করা হলে ইসলামের পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়তার বিষয়ে ধারণা করা যায়।

ওযুর বরতনের সংগে পান করা পানি বা খাবার বরতনের সামঞ্জস্য নেই।

www.nagorikpathagar.org

এস্তেনজার জন্যে ব্যবহার করা বরতন খাবার পানির বরতনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পানির বরতন সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। ফলে বিষাক্ত কোনো পোকা মাকড়, বিষাক্ত কীট বা রোগজীবাণুর প্রকোপের আশংকা থাকবে না।

মোট কথা, ইসলামের শিক্ষার মধ্যে রয়েছে বেশুমার হেকমত, পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা।

মানুষের সেবায় ওয়াকফ করা

আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা খুব ভালো কাজ। কেউ যখন কোনো জিনিস ওয়াকফ করে তখন ওয়াকফকৃত সেই জিনিসের লাভ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। ওয়াকফ করা জিনিস বিক্রি করা যাবে না এবং কাউকে দানও করা যাবে না। উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা যাবে না। ওয়াকফকৃত সম্পদের মোতাওয়াল্লী যৌক্তিক পন্থায় ইনসাফসম্মতভাবে সে সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন। তার বন্ধুদেরও খাওয়াতে পারবেন। (বোখারী)

রসূল (স.)-এর সমগ্র জীবন আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ। সাহাবায়ে কেরামের জীবনেও আত্মত্যাগের বহু উদাহরণ রয়েছে। হযরত ওসমান (রা.) পানিভরা একটি কূপ ক্রয় করে সেটি ওয়াকফ করে দিয়েছেন। অনেক সাহাবা বাগান ক্রয় করে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসিয়ার যুগে মুসলমানরা কূপ খনন করেছেন, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরী করেছেন, সরাইখানা নির্মাণ করেছেন। বিধবা এবং এতীমদের লালন পালনের জন্যে বিশেষ ঘর তৈরী করেছেন। এসব কিছু ওয়াকফ করার কৃতিত্ব এককভাবে মুসলমানদের।

ইউরোপীয়দের জীবন পর্যালোচনা

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ইংরেজরা মানুষের জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অসংখ্য হাসপাতাল, সরাইখানা, পশু চিকিৎসালয় নির্মাণ করেছিলো। লেডী ওয়েলিংটন হাসপাতাল, গংগারাম হাসপাতালের মতো বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের অবদান। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে লক্ষ কোটি মানুষ উপকার লাভ করে। এসব কর্মকাণ্ডের ভিত্তি ইসলাম স্থাপন করেছে। ওয়াকফ হচ্ছে সমাজকল্যাণের উদ্দেশে ইসলামেরই প্রবর্তিত একটি বহুল সমাদৃত ব্যবস্থা।

যাঁতা ও চরকার ব্যবহার

আরাম আয়েশের জীবন যাপন মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। হযরত ফাতেমা (রা.) নিজে যাঁতা ঘোরাতেন, নিজে পানি বহন করে আনতেন, নিজে ঘর ঝাড়ু দিতেন। যারা এমন কাজ করে তারা নানাপ্রকার রোগ থেকে রক্ষা পায়। এসব কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণে বর্তমানে আমরা নানা প্রকার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছি।

ডাক্তার এডওয়ার্ড ব্রাউন

ডাক্তার এডওয়ার্ড ব্রাউন লেখেছেন, যাঁতা ঘোরানো, পানি বহন করা, ঘর ঝাড়ু দেয়া এ ধরনের কায়িক পরিশ্রমের কাজ মহিলাদের স্তন ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। এ

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণীর মহিলাদের রক্তে গাঢ়তা দেখা দেয় না, পেটে চর্বি হয় না, দেহকোষ সচল থাকে, কিন্তু যান্ত্রিক যুগে আমাদের মহিলাদের এসব উপকারিতা থেকে দূরে সরিয়ে অসুখের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। (দি এরাবিয়ান মেডিসিন)

দুনিয়ায় পাপের শাস্তি

মোসনাদে আহমদে সংকলিত একটি হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেছেন, নিসন্দেহে মানুষ পাপের কারণে জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।

ইবনে আবিদ্দুনইয়া বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলো। তিনি জবাবে বলেন, মানুষ বৈধ কাজের মতো ব্যভিচার করছে, মদ পান করছে, বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। এসব কাজের কারণে আল্লাহ তায়ালা নাখোশ হন। তিনি মাটিকে আদেশ দেন সে যেন কেঁপে ওঠে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, নেক কাজ করা হলে চেহারা ও অন্তর হয় নূরানী। জীবিকায় আসে প্রশস্ততা, দেহে আসে শক্তি এবং মানুষের মনে তার জন্যে ভালোবাসা তৈরী হয়। পক্ষান্তরে পাপ করা হলে চেহারা হয় মাধুর্যহীন, অন্তরে অন্ধকার, দেহে অলসতা, জীবিকায় সংকীর্ণতা এবং মানুষের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

মুসলমানরা মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস করে, পাপ করলে আখেরাতে শাস্তি তো ভোগ করতে হবে উপরন্তু এর ফলে দুনিয়ার জীবনেও নানারকম অসুখ দেখা দেবে।

অনেক পাপ করার ফলে মানসিক রোগ দেখা দেয়। অনেক পাপের ফলে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। অনেক পাপের ফলে জীবিকা কমে যায়। বিপদ এবং অস্থিরতা বেড়ে যায়।

একজন বিশিষ্ট প্যাথলজিস্টের বিশ্লেষণ

প্যাথলজির একজন চিকিৎসক বলেছেন, আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, পাপ করার কারণে অস্থিরতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং মানসিক রোগ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে পাপ করার কারণে রক্তে হিস্টাসিন বেড়ে যায়। ফলে মস্তিষ্কের কোষ প্রভাবিত হয়। মানুষ নানারকম ধ্বংসাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তবিংশ অধ্যায়

চলচ্চিত্র এবং ইসলামী শিক্ষা

ইসলাম একটি পবিত্র এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান। এ জীবনবিধান জীবনযাপনে মানুষকে নানাভাবে পথনির্দেশ প্রদান করে। ইসলামের বিধানের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দৃষ্টির হেফাযত। বেগানা কোনো নারীকে দেখার পর যেসব ক্ষতি হয় এসবের মধ্যে বড়ো ক্ষতি হচ্ছে, এতে ঈমানের মিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। এটা তখন হয় যখন সে বেগানা নারী চোখের আড়ালে চলে যায়। ওলামায়ে কেরামের মতে, বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার টিভি, ভিসিআর, ডিশের মাধ্যমেও বেগানা নারীদের দেখা নিষিদ্ধ। একইভাবে একজন মুসলমানের লজ্জাস্থান দেখাও ইসলামের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত হওয়ার মতো কাজ। ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব কাজে সীমালংঘন করা হয় সেসব কাজই অভিশপ্ত। ফিল্ম দেখার পর ঈমানের হেফাযত, দৃষ্টির হেফাযত কখনোই সম্ভব নয়। নীল ছবির কারণে ইউরোপীয় সমাজের কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত করা যাচ্ছে।

আধুনিক সমাজ এবং ব্লু ফিল্ম

যারা ব্লু ফিল্ম দেখে তারা অন্যান্য আরো অনেক গুনাহের কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরা নেশাজাত জিনিস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যারা ব্লু ফিল্ম দেখে তারা যৌন অতৃপ্তির শিকার হওয়ার কারণেই এ কাজ করে। অন্যের যৌনকর্ম দেখে এরা বিকৃত আনন্দ অনুভব করে।

ব্লু ফিল্ম দেখার কারণসমূহ

মনোবিজ্ঞানীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, যেসব ছাত্রছাত্রী ব্লু ফিল্ম দেখে তাদের সামনে জীবনের কোনো মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে না। যারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী, যারা পরীক্ষায় নকল করে পাস করতে চায়, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে উদাসীন, এরাই সাধারণত বেশী বেশী ব্লু ফিল্ম দেখে। এরা এ মনোভাব পোষণ করে যে, তাদের কেউ ভালোবাসে না, এছাড়াও তারা নানারকম হীনমন্যতায় ভোগে। এক ধরনের অতৃপ্তিবোধ থেকেই এরা মানসিক উত্তেজনায় ভুগতে থাকে। এরা নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার করে, অন্যের ওপর যুলম করে, অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ী চালায়। নানাপ্রকার অপরাধ করে বিকৃত আনন্দ যারা অনুভব করে সেসব আনন্দের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্লু ফিল্ম দেখা।

বলা হয়ে থাকে, কোকেন মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে মানসিক স্বাধীনতার আকাশে পৌঁছে দেয়, কিন্তু সেখানে তারা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। এ কারণে তাদের হেরোইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ছাত্র জীবনে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

www.nagorikpathagar.org

দেখেছি, সার্জারি ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী জায়গায় অন্যান্য জরুরী ইনজেকশনের পাশাপাশি মরফিন, প্যাথেড্রিন, হেরোইনও থাকতো।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ এবং সপ্তম দশক থেকে এসব ওষুধ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্লু ফিল্মের মতোই এখন হেরোইনের জয় জয়কার।

পিতামাতার ভূমিকা

ব্লু ফিল্মের প্রতি উঠতি বয়সের যুবকদের ঝুঁকে পড়া একদিকে যেমন সত্য, তেমনি এসব যুবকের বিত্তশালী অভিভাবকরাও এদিকে আকৃষ্ট। এসব বিত্তশালীর জীবনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই লক্ষ্য নেই। তারা জানে না, তাদের সন্তানরা কী করছে। তাদের দুর্গের মতো সুরক্ষিত ভবনের কোথায় কী হচ্ছে তারা তা জানে না। নেশার আসর বসেছে কিনা সে খবরও তাদের নেই। সন্তানদের পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়াই এসব বিত্তবান অভিভাবক নিজেদের কর্তব্য মনে করে। এসব প্রভাবশালী পিতা মেধাবী ছাত্রদের জন্যে সংরক্ষিত ছাত্রবৃত্তির টাকার জোরে নিজের সন্তানের জন্যে বাগিয়ে নেয়। তারপর সন্তানরা মনে করে তাদের পিতার টাকা আছে, কাজেই আরাম আয়েশ এবং বিলাসিতার অধিকার তাদেরই রয়েছে।

সমাজ জীবনে ব্লু ফিল্মের প্রভাবের সংগে মদ, হেরোইন এবং অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যের আলোচনা অনেকের কাছে অপ্রাসংগিক মনে হবে, কিন্তু জীবন যাপনের এসব উদ্ভট বিষয় পরস্পর গভীরভাবে সংযুক্ত। বিশেষ ধরণের সমাজ পরিবেশে এসব নোংরামি জন্ম নেয়। যে সময় নবজাত শিশু সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া হতো, সেই জাহেলী যুগের আরবে এটাই সমাজের একমাত্র দুষ্কর্ম ছিলো। সেসব কিছু চিন্তা না করে সে যুগের সত্যিকার চিত্র চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

সুস্থ জীবনের উদ্দেশ্য

যেখানে যুবকদের জীবনের শুরুতে নেশাজাত দ্রব্য প্রবেশ করেনি, শৈশব থেকে যৌবনের সুবর্ণ সময়ে তাদের যৌন জীবন সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয়, যৌন জীবন সম্পর্কে তাদের কৌতূহল ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া হয় না, যুবকদের মনে মগযে যেখানে থাকে সুস্থ চিন্তা, সুস্থ আদর্শ এবং জীবনবোধ, যুবকরা নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে যেখানে অগ্রাধিকার দেয়, যাদের অন্তরে চারিত্রিক মূল্যবোধ বিশেষ গুরুত্ব পায়, সুস্থ সুন্দর পরিবেশে যারা নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে, এ সকল যুবক যদি হঠাৎ করে নগ্নছবি দেখে ফেলে তবে পুনরায় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে না। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা তাদের প্রতারিত করতে পারে না। তবে প্রথম অভিজ্ঞতা নেশাজাত পানীয়ের প্রথম গ্লাসের গলাধকরণ করার মতোই হয়ে থাকে। যুবকের পুরো অস্তিত্বের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেয়।

পক্ষান্তরে যাদের জীবনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, চারিত্রিক মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব নেই, তাদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয় খুব দ্রুত। প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা এদের নেশাগ্রস্ত করে তোলে। উন্নতমানের মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে যদি দেশী মদ পান করতে দেয়া হয়, তবে সে মদ্যপায়ী দেশী মদই বার বার পান করতে আগ্রহ প্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

করে। কারণ দেশী মদেও নেশা হয়ে থাকে, কিন্তু দেশী মদের নেশা কেটে যাওয়ার পর বলে, নেশা খুব নিম্নমানের।

নগ্নছবির প্রভাব

নগ্নছবি দেখা এক ধরনের নেশা। নগ্নছবি যারা দেখে তাদের মধ্যে সকল রকমের নারী পুরুষ রয়েছে। ৮ বছরের বালক থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত। নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীর মানুষই এ ছবি দেখে। তবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় এ ছবি দেখতে কম আগ্রহী হয়। ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের পুরুষ এ ছবি বেশী দেখে। বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় শ্রেণীর পুরুষই এদের মধ্যে রয়েছে। এদের মধ্যে যৌনশক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এছাড়া তারাও দেখে যাদের যৌনশক্তি কমে গেছে এবং তাদের স্ত্রীরাও গর্ভ ধারণের ক্ষমতা হারিয়েছে। অর্থাৎ যেসব মহিলার বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ ইংরেজী ছবি, হিন্দি ছবি অথবা ফিচার ফিল্মের কিছু কিছু নগ্ন দৃশ্য দেখে যদি সেসব ছবিকে নগ্ন ছবি বিবেচনা করা হয়, তবে বুঝা যায় আধুনিক যুগে কতো মানুষ এসব ছবি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আর্ট ফিল্মের দিক থেকে সেসব ছবি যতো উচ্চমানেরই হোক না কেন, যদি ওতে নগ্ন নারী দেহ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে তবে একশ্রেণীর দর্শকের কাছে সেসব ছবির ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়। জীবনের শুরুতে যারা এসব ছবি দ্বারা প্রভাবিত হয় তারা নিজেদের জীবনকে সেই ছাঁচে গড়ে তুলতে চাইবে। বিশেষত যারা যৌন জীবন শুরু করেছে বা শুরু করতে যাচ্ছে, এসব ছবির প্রভাব তাদের দাম্পত্য জীবনে অবশ্যই পড়বে।

১৮ বছর বয়সের বেশকিছু যুবকের সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে যেসব মন্দ অভ্যাস গড়ে ওঠেছে সেসবের মধ্যে নগ্ন ছবি দেখার প্রবণতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এসব একথা প্রমাণিত হয়েছে, নগ্ন ছবি দেখার অভ্যাস নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারের চেয়ে অধিকহারে সমাজকে প্রভাবিত করছে। এ প্রভাব সমাজকে চার ভাগে ভাগ করছে–

১. যারা কখনোই নগ্ন ছবি দেখেনি।

২. যারা কখনো কখনো নগ্ন ছবি দেখেছে অথবা মাত্র একবার দেখেছে।

৩. যারা নিয়মিত নগ্ন ছবি দেখে, তবে না দেখেও থাকতে পারে।

৪. যারা নগ্ন ছবি দেখার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না।

এ ছবি একাও দেখা হয় আবার বন্ধু বান্ধবীর সংগেও দেখা হয়। তবে এসব ছবি সাধারণত দল বেঁধেই বেশী দেখা হয়।

নগ্নছবি দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম নগ্নছবি দেখার সুযোগ আকস্মিকভাবে পাওয়া যায়। কারো ড্রয়িংরুমে বা কোনো সিনেমা হলে সিনেমা দেখার সময়ে ফিচার ফিল্মের সংগে নগ্নছবির কিছু দৃশ্য জুড়ে দেয়া হয়। অনেক সময় শিশুদের নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। সকল বয়সের দর্শকদের জন্যে তৈরী করা সার্টিফিকেটযুক্ত ছবিতেও হঠাৎ আপত্তিকর কিছু অংশ জুড়ে দেয়া হয়। এ সময় অভিভাবকদের

www.nagorikpathagar.org

বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ছোটো শহরের সিনেমা হলেও এরকম ঘটনা ঘটে। সেসব হলে অভিভাবকরা স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে যান না; বরং একা গিয়ে এসব ছবি দেখে আসে।

অন্য একটি উপায় হচ্ছে, একদল যুবক একত্রিত হয়ে এসব ছবি দেখে। তারা গর্ব করে বলে আমার ওপর এ ছবির কোনো প্রভাব পড়েনি। অথচ কথাটি সত্য নয়। জীবনে প্রথম যে বালক ধূমপান করেছে সে যেমন বাহাদুরি ফলায়, আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি, আমার সমবয়েসীদের চেয়ে আমি পিছিয়ে নেই। এরকমই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয় নগ্নছবি দেখার পর।

সোশ্যাল ড্রিংকার

মদপানের ক্ষেত্রে একটি পরিভাষা হচ্ছে 'সোশ্যাল ড্রিংকার'। অর্থাৎ এমন নারী বা পুরুষ যারা পরিবেশ তৈরী করার পর মদ পান করে। এরকম মদ্যপায়ীদের ক্যাজুয়েল ড্রিংকারও বলা হয়। অর্থাৎ যারা মাঝে মধ্যে মদপান করে। আমাদের দেশে একটি পরিভাষা ব্যবহার হয়, সেটি হচ্ছে সংগত। যারা সংগতে আসক্ত তারা সব রকমের শারীরিক নেশার স্বাদ উপভোগ করে। এরা সুযোগ পেলেই নগ্নছবিও দেখে। সুযোগ না পেলে আত্মরতি বা হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়। এ শ্রেণীর লোক এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদপানে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে ভোর পর্যন্ত তারা মদ পান করতে থাকে। ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক হলগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই নগ্নছবি অর্ধনগ্নছবি চব্বিশ ঘন্টা চলতে থাকে। নির্দিষ্ট কিছু কক্ষে অতি গোপনে এসব চালানো হয়।

কৌতূহলী অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের চিত্তবিনোদন

যেসব পরিবারে শিশুদের শাসন করার মতো কেউ থাকে না সেখানে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু কিশোররাও ব্লু ফিল্ম বা নগ্ন ছবি দেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পাড়ার বা মহল্লার দোকান থেকে তারা এসব ছবি সংগ্রহ করে। এলাকার দোকানে এসব ছবি গোপনে চলতে দেখে এরা কৌতূহলী হয় এবং এক সময় টিভি সেট ও ক্যাসেট ভাড়া করে নিজেদের ঘরে এনে দেখে।

একুশ বছর বয়স্ক এক যুবকের কাহিনী

একুশ বছরের এক যুবক স্বীকার করেছে, সে ৮ বছর বয়সে প্রথমে নগ্নছবি দেখেছে। সে এক কারখানায় কাজ করতো, সেখানে তার অন্য একজন সমবয়েসী সংগীও ছিলো। তারা তাদের ওস্তাদের সংগে এ ফিল্ম দেখেছে। তারপর সে প্রতিদিন ৬ থেকে ৮টি ছবি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিজেই সে এসব ছবি দেখার আয়োজন করতো। অর্থাৎ টিভি সেট ভাড়া এনে ক্যাসেট ভাড়া এনে এসব ছবি দেখতো। এসব ছবির মধ্যে তিন প্রকারের ছবি সে দেখতো। সিংগেল এক্স, ডবল এক্স এবং ট্রিপল এক্স। সিংগেল এক্স ছবিতে যৌনতার সামান্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যেতো, তারপর যা কিছু হতো পর্দার অন্তরালে। ডবল এক্স ছবিতে নগ্ন নারীদেহ দেখানো হতো তারপর যৌনকর্ম চলতো পর্দার অন্তরালে। ট্রিপল এক্স ছবিতে যৌনকর্মের পাশবিক চিত্র খোলামেলাভাবে দেখানো হতো।

www.nagorikpathagar.org

এ শ্রেণীভেদের বিষয়ে সবাই অবগত। একজন সাধারণ দোকানীও এসব শ্রেণীভেদের কথা জানে এবং সকল শ্রেণীর ছবিই দেখে। ২৮ বছর বয়স্ক অন্য এক যুবক আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছিলো। এক সময় সে একটি মেডিকেল স্টোরের মালিক ছিলো। আমার কাছে যে সময় সে চিকিৎসার জন্যে এসেছে তখন সে ছিলো সম্পূর্ণ বেকার। সে দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একা একা নিয়মিত নগ্নছবি দেখতো। তারপর রাত ২টা পর্যন্ত বন্ধুদের সংগে এসব ছবি দেখতো। তারপর একসময় এ যুবক বিয়ে করে। বিয়ের পর স্বাভাবিকভাবে সে স্ত্রীর সংগে যৌন সংগম করতে সক্ষম হতো না। নগ্নছবি দেখার আগে তার দেহ মনে যৌন উত্তেজনা জাগ্রত হতো না। সে চাইতো তার স্ত্রীও তার সংগে সেসব ছবি দেখুক। কিন্তু স্ত্রী একপর্যায়ে বিরক্ত হলো। সে নগ্নছবিতে অভিনয়কারিণী নারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে লাগলো। কারণ ওসব নারীদেহ এবং ওসব নারীর যৌনকর্ম দেখার পরই তার স্বামী তাকে ব্যবহার করে, তার দেহে স্বাভাবিক উত্তেজনা তৈরী হয়। আত্মসম্মান সচেতন কোনো মহিলার পক্ষে এটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কারণ সে যুবকের স্ত্রী নিজেকে সেক্স মেশিন হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখে অসম্মান বোধ করতো। এতে মনে হয় একজন যুবতীর নারী হিসেবে স্বামীর কাছে আলাদা কোনো আবেদন নেই। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ক্রমে ব্যবধান বৃদ্ধি পেলো। একপর্যায়ে যুবক বাধ্য হয়ে চিকিৎসা করাতে এলো। তার স্ত্রী তাকে ঘৃণা করতো অথচ যুবক নগ্নছবি না দেখে স্ত্রীর সংগে যৌন মিলনে সক্ষম হচ্ছিলো না।

ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মতোই নগ্নছবি যারা দেখে তারা মনে করে, যখন ইচ্ছা করবো তখনই এ ছবি দেখার অভ্যাস ছেড়ে দেবো, কিন্তু কখনোই সে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না। তবে তারা নিজেকে প্রতারণামূলকভাবে প্রবোধ দেয়, এখন আর আগের মতো বেশী তো দেখি না বরং অনেক কমিয়ে দিয়েছি।

পঁচিশ বছর বয়স্কা একজন মহিলার কথা

আমার কাছে ২৫ বছর বয়স্কা মানসিক ভারসাম্যহীন একজন মহিলাকে চিকিৎসার জন্যে আনা হয়। এ মহিলার স্বামী প্রতিদিন রাত ১২টায় নগ্নছবি দেখা শুরু করতো। বাচ্চারা ঘুমিয়েছে নিশ্চিত হলে তার স্বামী ভিসিডিতে নগ্নছবি চালু করতো। এ সময়ে স্বামী তার স্ত্রীকে তার সংগে নগ্নছবি দেখতে বাধ্য করতো। ছবি দেখার পর স্বামী চাইতো নগ্নছবির নারীরা যৌনসংগীকে যেভাবে তৃপ্তি দেয়, স্ত্রীও তাকে সেভাবে তৃপ্তি দেয়ার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু গ্রামের লেখাপড়া না জানা সেই মহিলা এতে রাজি হতো না। মহিলা মাঝে মধ্যে আল্লাহর এবাদাত করতো। নিয়মিত স্বামীর চাপে নগ্নছবি দেখা সে মনে করতো পাপ এবং সে মনে করতো, এসব ছবি দেখে সে চোখের পাপ করছে। তাছাড়া নগ্নছবির নারীরা যৌনসংগীকে যেভাবে তৃপ্তি দেয় মহিলা সেভাবে স্বামীকে তৃপ্ত করার কোনো সাড়া নিজের মন থেকে পাচ্ছিলো না। অন্যদিকে বেশী রাতে ঘুমানোর কারণে মহিলার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতো, তার ঘুম পুরো হতো না। ফলে মহিলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীর এরকম গুরুতর অসুস্থতার কারণ যে স্বামীর অত্যাচার, স্বামী একথা বুঝতে পারেনি। গভীর রাত পর্যন্ত নিয়মিত নগ্নছবি দেখার কারণে স্ত্রীর ঘুমের ক্ষতি হচ্ছে, স্ত্রীর এ সমালোচনা স্বামী মানতে রাযি নয়। কারণ স্ত্রীর সমালোচনা মেনে নিলে স্বামীকে অপরাধী হতে হয়। স্বামী নিজের অপরাধ স্বীকার করবে না। স্ত্রীর অব্যাহত সমালোচনার পর স্বামী শব্দহীনভাবে একটি বা দু'টি নগ্নছবির ক্যাসেট উপভোগ করতো। এরকম ছবি না দেখে স্বামী ঘুমাতেই পারতো না। প্রতিদিন বিকেল থেকেই তার মনে চিন্তা জাগতো কখন নগ্নছবি দেখবে। নেশাগ্রস্ত মদ্যপ যেমন বিকেল থেকেই সূর্যাস্তের অপেক্ষা করে, কখন রাত হবে আর মদের বোতল নিয়ে বসবে, নগ্নছবির নেশাও ঠিক একই রকম। এসব নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নেশা ত্যাগ করার কথা কখনো চিন্তাও করে না, চেষ্টাও করে না।

একজন ড্রাইভারের স্বীকারোক্তি

৩৮ বছর বয়স্ক একজন ড্রাইভার আমার কাছে একবার চিকিৎসার জন্যে আসে। সে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের গাড়ী চালায়। সে আমাকে বলেছে, গত ৫ বছর যাবত প্রতি মাসে নিয়মিত দু'বার সে এসব নগ্নছবি দেখে। সে এর বেশী না দেখার কারণ, ঘরে এসব ছবি এনে দেখার ব্যয় অনেক বেশী। অথচ সিনেমা হলে মাত্র দশ টাকায় নগ্নছবি দেখা যায়, কিন্তু সিনেমা দেখে না লোকলজ্জায়। কারণ নগ্নছবি দেখে হল থেকে বেরিয়ে আসার পর পরিচিত বন্ধু বান্ধবরা অনেক সময় উচ্চ:স্বরে জিজ্ঞেস করে, কি হে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়নি তো? এ কথা শুনে অন্যরা খিলখিল করে হাসে। এ ড্রাইভার এখনো বিয়ে করেনি। চিকিৎসার জন্যে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিয়ের পরে কী হবে? এ ড্রাইভারের চিন্তা হচ্ছে, দাম্পত্য জীবনের যৌনসংগীর কাছে লজ্জিত হতে হবে। অথচ সে যে পাপ করছে, পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সে চিন্তা একবারও তার মনে জাগেনি।

একজন লেকচারারের কাহিনী

৩৫ বছর বয়স্ক একজন গৃহবধূ কলেজে শিক্ষকতা করতেন। মহিলা ছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের লেকচারার। বিয়ের বেশ কিছুদিন পরও তিনি দাম্পত্য জীবনে স্বামী সহবাসে ভীষণ ভয় পেতেন। স্বামী তাকে একজন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে নিয়ে গেলেন। সে চিকিৎসক দুই মিনিটের সাক্ষাৎকারে মহিলার স্বামীকে পরামর্শ দিলেন, আপনি তাকে নগ্নছবি অর্থাৎ ব্লু ফিল্ম দেখাতে শুরু করুন। এতে যৌন মিলনের স্বাদ ভয়ের ওপর প্রাধান্য পাবে। অথচ সে চিকিৎসক মহিলার শৈশব কৈশোরের জীবন যাপন সম্পর্কে কিছুই জানতে চাইলেন না। মহিলার আত্মীয়স্বজন কারো মৃত্যুর খবর তাকে জানতে দিতো না। চড়ুই পাখি এবং কুকুর বেড়ালের যৌন মিলনও কখনো তাকে দেখতে দেয়া হয়নি। তার দেহে আভ্যন্তরীণ কোনো জটিলতা আছে কিনা সেটাও সে চিকিৎসক জানতে চাননি। চিকিৎসক ডাক্তার জে উলফির রেফারেন্সে ফ্রয়েডীয় যুগের এক মহিলার কাহিনী শোনালেন। সে মহিলার স্বামীসহবাসে কষ্ট হতো। এ কষ্টের কারণ ছিলো মানসিক জড়তা। মানসিক জড়তা, ফ্রিজিডিটি অর্থাৎ যৌন শীতলতার কারণ

www.nagorikpathagar.org

ছিলো মানসিক বাধা, কিন্তু এ ধারণা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। এ শ্রেণীর রোগীদের অতীত জীবন যাপন যাচাই না করে ঢালাওভাবে ব্লু ফিল্ম দেখার পরামর্শ দেয়া হলে হিতে বিপরীত হতে দেখা যায়। এরকম পরামর্শ দেয়া ঠিক সে রকমের ঘটনা, যাতে বাসররাতে স্ত্রীর সংগে যৌন মিলনে ব্যর্থ এক যুবককে তার অভিভাবকরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে পতিতালয়ে পাঠিয়েছিলো। ফলে সে যুবক পরবর্তীকালে পতিতালয়ে যাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। অথচ স্ত্রীর কাছে সে ব্যর্থই থেকে গেলো।

দশম শ্রেণী পাস ২১ বছরের এক যুবক অষ্টম শ্রেণী থেকে ব্লু ফিল্ম দেখা শুরু করে। এসব ফিল্ম দেখার সময় সে হিন্দী ছবির নায়িকাদের নিজের স্ত্রী ভেবে তাদের সংগে মনে মনে যৌন সংগম করতো। পরবর্তীকালে স্বাভাবিক হিন্দী সিনেমা দেখার সময়েও সে যুবক কল্পনায় নায়িকাদের নগ্ন করতো। আধুনিক যুগের হিন্দী ছবির নায়িকারা আগের দিনের নায়িকাদের মতো শালীনতার সাথে অভিনয় করে না। আগের দিনের হিন্দী ছবির নায়িকারা উরু দোলানো পেট কাঁপানো নাচও নাচতো না। ভালোবাসার দৃশ্যে নগ্নপ্রায় হয়ে অভিনয় করতো না। ফলে সে সব ছবি দেখার পর যুবক নিজেকে ওসব নায়িকার বেডরুমে কল্পনা করতো।

যৌন সমস্যায় যুবকদের বীর্য স্খলনের স্বাভাবিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া যেতে পারে। নাটকীয় ছবি এবং ফিজিওলজির নীতির মাধ্যমে এ বিষয়টি তাদের বুঝানো যায়। ফলে যৌন সমস্যাগ্রস্ত যুবকদের অস্থিরতা এবং হতাশা কমে যাবে। তারা সবকিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। তবে জটিল যৌন সমস্যায় রোগীর ইচ্ছা আকাংখা, জীবনদর্শন, ধর্মের প্রভাব ও নৈতিকতা সম্পর্কিত তথ্য জেনে নিতে হবে। বিবাহ বহির্ভূত যৌনজীবন, সমকামিতার প্রতি আগ্রহ, চতুষ্পদ প্রাণীদের দ্বারা যৌন জীবনের চাহিদা পূরণ, ব্লু ফিল্ম দেখার অভ্যাস এসব বিষয় সম্পর্কে রোগীর মনোভাব জানা আবশ্যক। .

নগ্নছবি যারা দেখে তাদের স্বভাব কেমন হয়

যারা নিয়মিত নগ্নছবি দেখে তাদের চিন্তা চেতনার পুরোটাই আবর্তিত হতে থাকে যৌনতাকে ঘিরে। সব সময় তারা যৌন তৃপ্তি খুঁজতে থাকে। বিপরীত লিংগের পেছনে তারা ঘুর ঘুর করে। তার প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যে কোনো অজুহাতে তাদের দেহ ছুঁয়ে দিতে চায়। বন্ধুবান্ধবদের সংগে যৌন বিষয়ে গল্প করে। একে অন্যকে যৌন বিষয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। এতে ঘুমের মধ্যেও যৌন চেতনা অনুভব করে। তারা সুস্থ চিন্তা খুব কমই করতে পারে। তাদের চিন্তার বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে থাকে যৌনসংগম। এরা নিজেদের মধ্যে নগ্নছবি আদান প্রদান করে। এরকম পরিস্থিতি মোটর গ্যারেজে কাজ করে, পোশাকে তেল মবিলের দাগ রয়েছে এরকম লোকের ক্ষেত্রে যেমন হয়। ধোপদুরস্ত পোশাক পরিহিত ফিটফাট লোকের ক্ষেত্রেও একই রকম হয়ে থাকে।

নগ্নছবি দেখার প্রভাব

স্বাভাবিক যৌন সংগম যৌনসংগীর সম্মতিতে নির্দিষ্ট সময়ে এমনিতেই ঘটে, কিন্তু নগ্ন ছায়াছবি দেখে উত্তেজিত হওয়া যুবক উপযুক্ত সময়ে যৌনসংগী খুঁজে পায় না।

www.nagorikpathagar.org

সুস্থ চিন্তার মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে যৌনসংগীর সংস্পর্শে যায়। কিছুক্ষণ শৃংগার করার মাধ্যমে তাদের উভয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাস গরম হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক যৌন সংগম ঘটে, কিন্তু নিয়মিত নগ্ন ছায়াছবি দেখে যারা অভ্যস্ত তাদের যৌন তৃপ্তি এতো সহজে ঘটে না। তারা একাধিক নগ্ন নারীদেহ না দেখে উত্তেজিত হতে পারে না। তারপর তারা যৌনসংগীকে পাশবিক উপায়ে ব্যবহার না করে তৃপ্তি পায় না। যৌন মিলনের ক্ষেত্রে তারা যৌনসংগীর সেসব অংগ ব্যবহার করতে চায় যেসব অংগ যৌন সংগমের জন্যে সৃষ্টি হয়নি।

দ্বিতীয় প্রভাব হচ্ছে, নগ্ন ছায়াছবি মানব দেহকে এমন একটি ডিসপোজেবল সিরিঞ্জে পরিণত করে যার মধ্যেকার ওষুধ প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশনার বিপরীত উপায়ে ঢেলে দেয়া হয়। ফলে যথাসময়ে সে সিরিঞ্জ কাজ করে না, সোজা হয় না, সময়ের আগেই ভেতরের ওষুধ বেরিয়ে পড়ে। সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট, ঘরের বারান্দা যেখানেই এসব ছবি দেখা হয় সেখানেই বীর্যস্খলনের অভ্যাস তৈরী হয়।

তৃতীয় প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। নগ্নছবি দেখে যারা অভ্যস্ত তারা স্ত্রী সান্নিধ্যে তৃপ্তি পায় না। কারণ গৃহবধূরা নগ্ন ছায়াছবির গণিকাদের মতো যৌন সংগমে পারদর্শী হয় না। ফলে এসব স্বামী সারাক্ষণ যৌন অতৃপ্তিতে ভোগে। যৌন তৃপ্তির জন্যে ঘরের বাইরে অন্যের সান্নিধ্য খুঁজে বেড়ায়।

চতুর্থ প্রভাব হচ্ছে, নগ্নছবি দেখায় অভ্যস্তদের পুরুষাংগে সব সময় এক ধরনের পদার্থ আটকে থাকে। এতে তারা সারাক্ষণ যৌন উত্তেজনা বোধ করে আর নারীদের পেছনে ঘুর ঘুর করে। নারীদের দেখে শিস দেয়, অশ্লীল মন্তব্য করে, অশালীন ইংগিত করে। সুযোগ পেলেই নারীদের গোসলখানায়, বেডরুমে উঁকি দেয়। সুযোগ পেলেই নারীদের দেহ ছুঁয়ে দেয়। সব সময় যৌন চিন্তা মনকে ঘিরে রাখে। নগ্ন নারীর ছবি বুকে চেপে ঘুমায়। যৌন বিষয়ের বর্ণনা সম্বলিত বই পাঠ করে। এসব কিছুর মাধ্যমে অপার্থিব আনন্দ অনুভব করে।

ব্লু ফিল্ম বা নগ্নছবি দেখার অভ্যাস যাদের গড়ে ওঠে তারা একই সময়ে আরো নানারকম বদভ্যাসের শিকার হয়। যেমন তারা নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এরা কোনো বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে না। পতিতা নারীদের সান্নিধ্যে সময় কাটায়। নৈতিক, চারিত্রিক মূল্যবোধ বলে এদের মধ্যে কিছু বিদ্যমান থাকে না। এরা সব সময় হীনমন্যতায় ভোগে।

পরিবর্তন অসম্ভব

এরকম পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রায় একেবারেই অসম্ভব। টয়লেটের দেয়ালে যারা ছবি আঁকে, অশ্লীল মন্তব্য লেখে, তাদের লেখাও বন্ধ করা যাবে না, নগ্নছবি যারা তৈরী করে, যারা বিক্রি করে, যারা দেখে, তাদের কাউকেই বাধা দেয়া যাবে না। এদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। টয়লেট শিল্পীদের কলমের এবং তুলির সুস্থ ব্যবহার তাহলেই নিশ্চিত করা যাবে। মানুষের মনে সুস্থ চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হলে নগ্নছবির বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

দোয়া

❑ দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে সব সময় হালাল পন্থায় উপার্জন করা জীবিকা ভোগ ব্যবহার করতে হবে। (মিনহাজুল মুসলেমীন, মুসলিম- কেতাবুয যাকাত)

❑ আল্লাহকে নিজের কাছাকাছি অনুভব করবে এবং আল্লাহর কাছে সরাসরি সাহায্য চাইবে। (সূরা বাকারা)

❑ দোয়া করার সময় মনে মনে বিশ্বাস পোষণ করবে যে, এ দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। (সূরা মোমেন)

❑ দোয়া করার সময় বিনয়ে বিগলিত হবে এবং চুপিসারে দোয়া করবে। (সূরা আ'রাফ)

❑ দোয়া করার সময় আল্লাহকে নিজের কাছে অনুভব করবে, আল্লাহর নৈকট্য অনুভব না হলে দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী, হাকেম, মিনহাজুল মুসলেমীন)

❑ স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে বেশী করে দোয়া করবে। এতে বিপদের সময়ে দোয়া কবুল হবে। (তিরমিযী, হাকেম, মিনহাজুল মুসলেমিন)

❑ মৃত্যুর জন্যে কখনো দোয়া করবে না। (বোখারী, মুসলিম, মিনহাজুল মুসলেমীন)

❑ দোয়া হচ্ছে এবাদাত। কাজেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করবে না। (মোসনাদে আহমদ, তিরমিযী, মিনহাজুল মুসলেমীন)

দোয়া এবাদাতের অলংকার

দুনিয়া সুখ শান্তি আরাম আয়েশ ভোগ করার জায়গা নয়। দুনিয়া হচ্ছে দুঃখ কষ্টের জায়গা। দুনিয়ায় আমরা এমন কোনো মানুষ দেখতে পাবো না যার জীবনে কোনো সমস্যা নেই। মানুষের জীবনে এরকম নাজুক সময়ও আসে যখন তার কারো না কারো সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু দুনিয়ার কারো পক্ষে তাকে সাহায্য করা, তার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। এ সময় মানুষের মনমগয হাত, পা, এমনকি সমগ্র দেহমন সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করে। যাঁর রাজত্ব বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান। বান্দাকে তার বিপদের সময় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটি শিক্ষা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদের মাধ্যমে দিয়েছেন, সে শিক্ষা হচ্ছে দোয়া। এ দোয়া হচ্ছে এবাদাতের অলংকার।

www.nagorikpathagar.org

দোয়া মোমেনের অস্ত্র

তাবারানীতে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেছেন, দোয়া হচ্ছে মোমেনের অস্ত্র।

কখনো কখনো দেখা যায়, মোমেনের ইচ্ছা পূরণ হয় না। প্রকৃতপক্ষে মোমেনকে পরীক্ষায় ফেলে আল্লাহ তায়ালা তার পাপ মার্জনা করতে চান। মোমেনের জন্যে এটাই আল্লাহ তায়ালা সমীচীন মনে করেন। কারণ দোয়া কবুল করে মোমেনের বিপদ দূর করা আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে সমীচীন মনে করেন না। এরকম অবস্থায় অপরিপক্ক ঈমানের অধিকারীদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা আমার আবেদন শোনেননি। এরকম ক্ষেত্রে কাফেরদের দোয়া দৃশ্যত কবুল হয়। তাই বলে কাফেরদের মিথ্যা উপাস্যরা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে এমন নয়; বরং ওসব বেঈমানের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুটা সুযোগ দেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তাদের সুযোগ দিয়ে থাকি বটে, তবে আমার পাকড়াও থেকে তারা কেউ রক্ষা পাবে না।

মোমেনের দূরদর্শিতা

মোমেনকে সবসময়ই বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, তার ওপর যতো বিপদ আসে, তাকে যতো প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, এসব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে পাপ থেকে মুক্ত করা। রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে কল্যাণ দিতে চান তার ওপর বিপদ অবতীর্ণ করেন।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।

মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন শুধু আল্লাহর কাছেই দোয়া করে। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, আমি তাদের এর সওয়াব দান করবো।

তিরমিযীর হাদীসে রয়েছে, দোয়া হচ্ছে এবাদাতের অলংকার। তিরমিযীর অন্য এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর কাছে দোয়ার বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। কারণ দোয়া হচ্ছে এবাদাতের অলংকার এবং নির্যাস। অনুগত বান্দা আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। প্রিয়জনের গুরুত্ব সর্বত্র রয়েছে। তিরমিযীর আরো এক হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে না, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। কারণ দোয়া না করা, আল্লাহর কাছে আবেদন না করা অহংকারের নিদর্শন।

তিরমিযীর আরেক হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত মর্যাদা সচেতন এবং অত্যন্ত সম্মানিত। বান্দা যখন তাঁর সামনে হাত তোলে, তিনি সেই হাত খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

দোয়ার শর্তাবলী

দোয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

১. তাওহীদ এবং সুন্নতের অনুসরণ। যে ব্যক্তি সুন্নতের অধিক অনুসরণ করবে তার দোয়া ততো বেশী কবুল হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. এখলাস বা নিষ্ঠা থাকতে হবে। খাঁটি মনে দোয়া করতে হবে। লোক দেখানো দোয়া করা হলে সে দোয়া কবুল হবে না।

৩. বৈধ উপায়ে জীবিকা উপার্জন করতে হবে। মানুষের পানাহার এবং পোশাক যখন হালাল পন্থায় অর্জিত টাকায় সম্পন্ন হবে, তখন দোয়া অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে।

৪. কখনো মিথ্যা কথা বলা যাবে না। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে সে মোনাফেক। এ মোনাফেক হচ্ছে অহংকারী। অহংকারী ব্যক্তি মোশরেক। মোশরেকের দোয়া কবুল হবে না।

৫. যে দোয়ার মাধ্যমে পাপের আশংকা থাকে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে দোয়া কবুল হবে না। রসূল (স.) বলেছেন, বান্দা যতোদিন পর্যন্ত পাপ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার পথ পরিহার না করবে, ততেদিন তার কোনো দোয়া কবুল হবে না।

৬. দোয়ার ফল পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়ো করা যাবে না। অনেক লোক দোয়া করে এবং খুব শীঘ্র দোয়ার ফল পেতে চায়। এরকম করা উচিত নয়।

৭. যা কিছু পাওয়া সম্ভব সে রকম জিনিসের দোয়া করতে হবে। যদিও আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন তবু তিনি তাঁর আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ করেন না।

দোয়ার আদব

ওযু অবস্থায় দোয়া করতে হবে। তাবারানীর এক হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করেছে তারপর দুই রাকাত নামায আদায়ের পর তার প্রতিপালকের কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেছে, আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করবেন। সে দোয়ার ফল তাড়াতাড়িও প্রকাশ পেতে পারে আবার দেরীতেও প্রকাশ পেতে পারে। কেবলামুখী হয়ে দোয়া করতে হবে। কেবলামুখী হয়ে বসার পর আপনি যে দোয়া করবেন তার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করুন। এমন অভিনিবেশ সহকারে এবং নিষ্ঠার সংগে দোয়া করবেন যেন মনোযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়। রসূল (স.) বলেছেন, মনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা অমনোযোগী ব্যক্তির দোয়া এবং যে ক্রীড়াচ্ছলে দোয়া করে তার দোয়া কবুল করেন না।

সব সময় দোয়া করতে থাকবে। বান্দা সব সময় দোয়া করবে আল্লাহ তায়ালা এটা পছন্দ করেন।

দোয়া করার সময় যতোটা সম্ভব কান্নাকাটি করবে। বিনয়ে বিগলিত হয়ে দোয়া করবে। কারণ আল্লাহর কাছে কোনো কিছুরই অভাব নেই। এ প্রসংগে কোরআনের এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে বিনয়ে বিগলিত হয়ে কাতরভাবে এবং চুপি চুপি দোয়া করো।

দোয়া করার আগে আল্লাহর গুণগান করবে। আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা সম্বলিত বাক্য উচ্চারণ করবে। দোয়ার শেষেও আল্লাহর প্রশংসা করবে।

www.nagorikpathagar.org

দোয়ার শুরুতে এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করাও জরুরী। কারণ দরূদ পাঠ ব্যতীত দোয়া কবুল হয় না; বরং এ রকম দোয়া আসমান যমীনের মাঝখানে ঝুলে থাকে।

দোয়া করার সময় হাতের তালু চেহারার দিকে ফিরিয়ে রাখবে এবং দুই হাত একত্রিত করবে। রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

দোয়ার শব্দ বার বার উচ্চারণ করবে। রসূল (স.) দোয়া করার সময় দোয়ার কথাগুলো তিন বার উচ্চারণ করতেন।

যে জিনিসের প্রয়োজন হবে সে জিনিস একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। তিরমিযীর হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেন, প্রত্যেক মানুষ তার প্রয়োজনের কথা একমাত্র আল্লাহর কাছে জানাবে। যদি তার জুতোর ফিতা ছিঁড়ে যায়, তাও শুধু আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

দোয়া শেষ হওয়ার পর আমীন বলতে হবে। আমীন অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করো। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, আমীন হচ্ছে মোমেন বান্দার ওপর আল্লাহর একটি সীলমোহর। দোয়া করার পর দুই হাত মুখের ওপর ফিরাবে।

এমন জায়গায় দোয়া করবে যেখানে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ বিরাজ করে, মানসিক শান্তি বজায় থাকে। রসূল (স.) এ কারণেই এবাদাতের জন্যে নির্জন হেরা গুহা মনোনীত করেছিলেন।

কোরআনে রয়েছে, আল্লাহর বিশেষ বিশেষ নাম স্মরণ করে দোয়া করো। আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে সেসব নাম ধরে দোয়া করো।

পূর্ণ ভরসার সাথে দোয়া করবে। মনে মনে একথা চিন্তা ও বিশ্বাস করবে, আমার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। আল্লাহর কাছে কেউ যখন দোয়া করবে তখন যেন এ রকম না বলে, এ জিনিস আমাকে দাও, অমুককে দিয়ো না। দোয়ার মধ্যে খেয়ানত করা উচিত নয়। অর্থাৎ শুধু নিজের জন্যে নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্যে এবং মুসলিম বিশ্বের জন্যে দোয়া করবে।

দোয়া কবুলের জায়গাসমূহ

সকল জায়গাতেই দোয়া কবুল হয়ে থাকে, কিন্তু এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে খুব শীঘ্র দোয়া কবুল হয়। যেমন বায়তুল্লাহ শরীফ। (তিরমিযী)

কারণ এখানে একটি নেকী করা হলে অন্য জায়গায় এক লাখ নেকীর সওয়াব পাওয়া যায়। তারপর রয়েছে বায়তুল মাকদেস। (আবু দাউদ)

এখানে একটি নেকী করা হলে অন্য জায়গায় পঞ্চাশ হাজার নেকীর সওয়াব পাওয়া যায়।

এরপর রয়েছে মাসজিদে নববী। রসূল (স.)-এর রওজা মোবারক এবং মিম্বরের মাঝামাঝি জায়গা রিয়াযুল জান্নাত– জান্নাতের বাগান। সেখানে একটি নেকী করা হলে অন্য জায়গায় পঞ্চাশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

এ তিনটি মাসজিদ এমন পবিত্র জায়গা, যেখানে অনেক বড়ো বড়ো নবী রসূল নামায আদায় করেছেন এবং দোয়া করেছেন। এছাড়া নিম্নোক্ত জায়গাসমূহে দোয়া করা হলে তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে থাকে।

বায়তুল্লাহর ভেতরের রোকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী জায়গা, সাফা ও মারওয়ার সাঈর স্থান, আরাফাত ময়দান, মুজদালাফা, মিনা, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে, জুমার সারারাত, অর্ধেক রাতের সময়, শবে কদরে, আযান একামতের মাঝখানে, জেহাদের কাতার সজ্জিত করার সময়, ফরয নামায আদায় করার পর, সাজদার সময়, আরাফার দিন, রমযানে ইফতারের সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, সাহরীর সময়, অন্ধকার থাকার সময়, যমযমের পানি পান করার সময়। (জাওহারে দোয়া)

দোয়া সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে আধুনিক যুগের বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন।

দোয়া ও চিকিৎসা

দোয়া হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক ইতিবাচক কথা বলেছেন। পাপানুভূতি উদ্বেগ, ভয় এবং অস্থিরতার কারণ হতে পারে। মানুষের মন থেকে এসব দূরীকরণে দোয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উইলিয়াম জেমস বলেছেন, দোয়া মানুষের বাহ্যিক জীবনে পরিবর্তন সাধন করুক বা না করুক, কিন্তু আভ্যন্তরীণ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। ধর্ম মানুষের মনে এ বিশ্বাস জাগরূক করে দেয় যে, অন্য কোনো উপায়ে যে ফল পাওয়া সম্ভব নয়; দোয়ার মাধ্যমে তা নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়।

ফ্রেডারিক মায়েজার বলেছেন, আমাদের জন্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আমাদের চারপাশে একটি রূহানী জগত রয়েছে। বস্তুজগতের সংগে এ রূহানী জগতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রূহানী জগতের কারণেই বস্তু জগতের অবস্থান বিদ্যমান। আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস এ রূহানী জগত। আমাদের দেহ যেমন বস্তুজগত থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনি আমাদের অভ্যন্তর রূহানী জগত থেকে শক্তি লাভ করে। আমাদের অভ্যন্তর যে রূহানী শক্তি আকর্ষণের ব্যবস্থা করে সেটাই হচ্ছে দোয়া। এ কার্যক্রম আমাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয় না। কাজ সম্পন্ন হয় ঠিকই, কিন্তু কিভাবে হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। ফলাফল সামনে প্রকাশ পাওয়ার পর আমরা স্বীকার করি, আমরা যা পেতে চেয়েছি সেটা দোয়ার মাধ্যমে পেয়েছি। এমনি করে আমরা বিশ্বাসের শক্তি লাভ করি। ফলে আমরা অনেক কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারি। আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত পাওয়ার পর সে অনুভূতির কারণে সকল বিষয় সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভংগি বদলে যায়। যে কোনো সমস্যা সমাধানের একটি পদ্ধতি মানুষের মনে চিহ্নিত হয়। সে পদ্ধতি আত্মস্থ করে মানুষ নিজের উদ্দেশ্য অর্জন করে। গরুর ওলানে দুধ কিভাবে তৈরী হয় বিজ্ঞান এটা বুঝতে যেমন অক্ষম, ঠিক তেমনি দোয়ার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা চেতনা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, মানুষ সে কথা বুঝতে অক্ষম।

www.nagorikpathagar.org

সবকিছু যখন আমরা আল্লাহর নূরে দেখতে শুরু করি এবং সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ লক্ষ্য করি, তখন সবকিছুর মধ্যে আমাদের জন্যে উন্নত অর্থ প্রকাশ পায়। একটি ফুল দেখে একজন কবি যা অনুভব করে, একজন সাধারণ মানুষের অনুভূতি কখনো সে রকম হয় না। ঠিক তেমনি সব মানুষ বস্তুর গুরুত্ব ঈমান এবং তাকওয়ার মতো অনুভব করে না। একটি বই পাঠ করে পাঠকদের নানাজন নানারকম অনুভূতি লাভ করে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বই বুঝতে পারে তাকে কে পাঠ করছে এবং কোন পাঠককে কি রকম উপকার সরবরাহ করতে হবে। প্রত্যেক পাঠক তার দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী একটি বই থেকে উপকার লাভ করে।

বিশ্বাসের গুরুত্ব

বিখ্যাত কবি মুনির নিয়াজী লিখেছেন, আমি একবার সুন্দরবনে গেলাম। সেখানে গাছপালার সাথে কথা বলতে লাগলাম। দেখলাম, এতে আমার ভেতরে এক চমৎকার অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। আমার অন্য সংগীদের মনে এরকম চমৎকার অনুভূতি জাগেনি।

একই রকম পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জনের অনুভূতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মনের এ অনুভূতি মানুষের বিশ্বাসের সংগে সংযুক্ত। বিশ্বাস মানুষের চিন্তা এবং অনুভূতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে মানুষের অন্তর্গত বিষয়ের প্রভাবে বাহ্যিক ও বস্তুগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। দোয়ার ফলে বস্তুগত এবং বাহ্যিক পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেয়া। এ বিশ্বাসের কার্যকারিতার জন্যে ব্যক্তি মানুষের উচিত ধৈর্য ধারণ এবং তাকওয়া অনুসরণ। কারণ রূহানী জীবন শুধু চিন্তা ও কর্ম নয়; বরং সেটি হচ্ছে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা। রূহানী জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং সে পথে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হওয়া। শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয় বরং কর্মক্ষেত্রেও এরকমই প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন মানুষ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সব কাজ করে, তার চাওয়া পাওয়ার মূলে যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি চিন্তা কার্যকর থাকে, তখন সে শান্তি ও নিরাপত্তা আনন্দ অনুভব করে।

নিবেদিত চিত্তের দোয়া

একজন মানুষ যখন এভাবে দোয়া করে, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি জানো, ভালো জিনিস কী। তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তুমি যা ভালো মনে করো সেটা আমাকে দাও, যখন ইচ্ছা করো তখন দেবে। আমার সম্পর্কে তোমার যা মন চায় তুমি তাই করো। যেখানে তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে সেখানে রাখো যে কাজে তোমার নৈকট্য পাওয়া যাবে এবং যে কাজে কোনো অকল্যাণ নেই। তোমার জন্যে যদি আমি নিস্ব দরিদ্র হয়ে যাই তবে এটা তুমি ব্যতীত ধনী হওয়ার চেয়ে উত্তম। আমি তোমার সংগে এ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানো তুমি বিহীন জান্নাতে অবস্থানের চেয়ে অনেক ভালো মনে করি। তুমি যেখানে থাকো সেটাই হচ্ছে প্রকৃত জান্নাত। তুমি যেখানে নেই সেখানেই মৃত্যু সেখানেই জাহান্নাম।

www.nagorikpathagar.org

একজন জার্মান মহিলার অনুভূতি

একজন জার্মান মহিলা তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, একদিন আমি সমুদ্রের তীরে একা বসেছিলাম। সে সময় অন্তর প্রশস্তকারী এবং জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত চিন্তা আমার আমার মনে এক প্রচন্ড তোলপাড় সৃষ্টি করে। আমি উদার অনন্ত আকাশের নীচে অন্তহীন সমুদ্রের সামনে অসহায়ভাবে বসে রইলাম। আমার রূহ থেকে দোয়ার শব্দ উচ্চারিত হতে লাগলো। জীবনে আমি প্রথম দোয়ার গুরুত্ব অনুভব করলাম। আমি অনুভব করলাম, দোয়া হচ্ছে জীবনের নিসংগতা থেকে সর্বশক্তিমান একক সত্তার প্রতি প্রত্যাবর্তনের অন্য নাম।

লেড বেটারের অভিমত

সাধারণত মনে করা হয়, দোয়া হচ্ছে সেসব কথা যাতে একজন লোক নিজের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, চিকিৎসার ও রূহানী ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে সাহায্য কামনা করেন। এ সাহায্য তার প্রতিপালকের কাছে কামনা করা হয়। 'ইনভিজিবল হেলপারস' গ্রন্থে লেড বেটার লেখেছেন, দোয়া কসমিক ওয়ার্ল্ডে শক্তিভান্ডারের মুখ খুলে দেয়। এ হচ্ছে একটি বড়ো রকমের মানসিক এবং আত্মিক প্রচেষ্টা। এ বিশ্বজগত একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি প্রচেষ্টারই এখানে কোনো না কোনো ফলাফল রয়েছে। এখানে কর্মের সংগে ফলপ্রাপ্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

ইউরোপীয় সাধক লেড বেটার আরো লেখেছেন, নিবেদিত চিত্তের প্রতিটি আবেদনেরই সাড়া পাওয়া যায়। যদি সাড়া না পাওয়া যেতো তবে এ বিশ্বজগত মৃত মনে হতো। দোয়া করা এবং দোয়া কবুল হওয়া একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আর ডব্লিউ ট্রাইন যথার্থই বলেছেন, প্রতিটি চিন্তা হচ্ছে একটি স্রোতধারা। মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়ার পর সেই স্রোত উপযুক্ত বিনিময় নিয়ে ফিরে আসে। দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে প্রথমে নিজের দোষ, ভুলত্রুটি স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয়ত অন্তরের গভীর থেকে তাওবা করতে হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ওইসব ভুল, পাপ অন্যায় না করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। নিজের চিন্তায়, কর্মে, চরিত্রে কার্যকর পরিবর্তন আনতে হবে। উপরন্তু তাওহীদ এবং রেসালাতের ওপর সুদৃঢ় ঈমান স্থাপন করতে হবে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, অস্থির ব্যক্তির আবেদনের জবাব আমি ব্যতীত আর কে দেবে? (সূরা নামল)

আল্লাহ তায়ালা পরম করুণাময়। তিনি অতি দয়ালু। তিনি তাঁর বান্দাদের বলছেন, 'তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর স্বীকারোক্তি

আল্লাহর অস্তিত্বই তাঁর গুণাবলী এবং রহমতের প্রমাণ পেশ করে। যদি আমরা আল্লাহর রহমতের শোকর আদায় না করি তবে এর অর্থ হবে, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নিতে চাই না। মানুষ যদিও মুখে তাওহীদের কথা স্বীকার করে, কিন্তু কাজকর্মে তাওহীদের বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটায় না। এটা মূলত তাওহীদ অস্বীকার

www.nagorikpathagar.org

করার নামান্তর। যদি আমরা আল্লাহকে স্বীকার করি তবে কথায় কাজে তা প্রমাণ করতে হবে। যদি আল্লাহকে আমরা দয়ালু দাতা মনে করি তবে খাঁটি মনে তাওবা করতে হবে। বলাবাহুল্য, অস্থিরভাবে, নিবেদিত চিত্তে যে দোয়া করা হয় তা অবশ্যই কবুল হয়। একথা মনে রাখতে হবে, যেসব দোয়া করা হয় তার কিছু কিছু আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপকারার্থ সংগে সংগে কবুল করেন। অনেক দোয়া দেরীতে কবুল করা হয়। সেই দোয়ার বিনিময় বান্দার পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। যদি আমরা দোয়া করে উপকার না পাই তবে এরকম চিন্তা করা যাবে না যে, দোয়া কবুল হয়নি। অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন। বান্দার ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরিমাণ যাচাই করতে চান। বান্দার ঈমান ও তাকওয়া কতোটা পরিপক্ক সেটা পরীক্ষা করেন। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো জাহাজ আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা যদি চান তবে বাতাস বন্ধ করে দিয়ে জাহাজসমূহকে সমুদ্রের বুকে নিশ্চল করে রাখতে পারেন। এতে ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের জন্যে রয়েছে শিক্ষা। অথবা আল্লাহ তায়ালা মোসাফেরদের তাদের মন্দ কাজের শাস্তিস্বরূপ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অধিকাংশ মানুষকে ক্ষমা করে দেন।' (সূরা শূরা)

আমার জীবনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। তিনি ঝড়ের গতিবেগ সম্পর্কে সচেতন। মানুষ যদি তাঁর ওপর ভরসা করে তবে তিনি মানুষকে তার মনযিলে মকসুদে খুব সহজে পৌঁছে দেন, কিন্তু মানুষ নিজের কাজকর্মের ফলাফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে, আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করার পরিবর্তে নিজের আকাংখা অনুযায়ী ফল লাভের চেষ্টা করে। প্রত্যাশার বিপরীত ফলাফল পেলেই মানুষ অস্থির হয়ে যায়, তারপর শান্তির জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়।

মার্কিন এলিস বলেছেন, মানুষ যদি প্রথমেই তার আকাংখাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসারী করে বলতো, হে আমার প্রতিপালক, তোমার যা কিছু পছন্দ সেটা আমারও পছন্দ। তোমার কাজের মধ্যেই আমার কল্যাণ রয়েছে, তাহলে মানুষের মধ্যে কোনো অস্থিরতা থাকতো না।

এ প্রসংগে কোরআন কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা আমার সংগে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে আমি তাদের উন্নতির পথ দেখাই। আর আল্লাহ তায়ালা সব সময় পুণ্যশীলদের সংগে রয়েছেন।

আমাদের অসুস্থ হয়ে পড়া অথবা পেরেশানী বা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে, কোনো না কোনো স্বভাবসম্মত চারিত্রিক বা আত্মিক বিধানের বিরোধিতা। কোরআনে বলা হয়েছে, 'নাফরমানদের ওপর তাদের কৃতকর্মের কারণে কোনো না কোনো বিপদ অবতীর্ণ হতে থাকে। পুণ্যশীলদের সামনে পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছি, যারা তাকে সব সময় আমার অনুমতিক্রমে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে।' (সূরা রা'দ)

www.nagorikpathagar.org

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'সূর্য উদয়ের আগে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, রাত এবং দিনের প্রান্তভাগে আল্লাহকে স্মরণ করো, যেন তোমরা তৃপ্তি লাভ করতে পারো।'

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, দুনিয়া আমাদের কাছে এতো প্রিয় যে, আমরা আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার কাজে মগ্ন হয়ে পড়ি। শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহর বান্দাদের অধিকার নস্যাৎ করতেও ভয় পাই না। দুনিয়ায় উপার্জন করা নিষিদ্ধ নয়; বরং হালাল জীবিকা অর্জন করে নিজের এবং সন্তানদের অন্ন সংস্থান করা পুণ্যের কাজ। হালাল জীবিকা দ্বারা গরীব মেসকীনদের সাহায্য করা মুক্তির উপায়, কিন্তু আল্লাহর পথ ত্যাগ করা, উপার্জনে মগ্ন থাকা, আল্লাহর নাফরমানী করা, আল্লাহকে ভুলে থাকা পাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, অর্থ সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার সৌন্দর্য। আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে সেসব চিরস্থায়ী।

মানুষ সম্ভবত বিশ্বাস করে না যে, এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন চিরস্থায়ী। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, মৃত্যু পরবর্তী জীবনই হচ্ছে আসল জীবন। কোরআনে আরো বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু হিসেবে স্বীকার করে এবং এর ওপর অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না এবং জান্নাত পাওয়ার পর আনন্দিত হও। আমি এ জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে তোমাদের বন্ধু হিসেবে থাকবো। তোমরা যা চাইবে সেখানে তা-ই পাবে।'

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'পরিচ্ছন্ন আমলসম্পন্ন ঈমানদারদের আমি পরিতৃপ্ত জীবন এবং উত্তম পরিণামের সুসংবাদ দিচ্ছি।'

দোয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

আমরা যখন বিপদে পড়ি এবং বিনয়ে বিগলিত হয়ে দোয়া করার জন্যে আল্লাহর কাছে হাত তুলি, তখন আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিতে প্রচন্ড স্রোতধারা সৃষ্টি হয়। এ স্রোতধারা আমাদের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করে। এ সময় আমাদের সাহায্য করার জন্যে মস্তিষ্ক এগিয়ে আসে। মস্তিষ্কের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হলে আমাদের সকল কষ্ট দূর হয়ে যায়। যেমন আমরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন উদ্বিগ্ন হই, কী করবো, কিভাবে এ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবো। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমরা পথের দিশা খুঁজতে থাকি। এমতাবস্থায় বিবেক আমাদের এমন পথনির্দেশ দেয় যে, আমরা সে পথ অনুসরণ করে কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করি। এসব উপায় আমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুস্থতা দিয়েছেন। এ কারণে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যদি আমরা এ রকম অবস্থায় বলি, অমুক চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের কারণে আমরা সুস্থতা লাভ করেছি, সেটা হবে জ্বলজ্যান্ত শেরেক। সুস্থতা দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। অসুস্থ থাকা এবং রোগাক্রান্ত থাকার সময়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা করাই ঈমানদার হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

এ প্রসংগে কোরআনে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা, আল্লাহর সামনে নত হও, তাঁকে সাজদা করো, তাঁর এবাদাত্ করো, পুণ্যকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করো। এতে তোমরা সফলতা লাভ করবে।'

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তায়ালা পুণ্যশীল বান্দাদের সকল উদ্বেগ থেকে সফলতার সাথে মুক্ত করেন। তাদের কোনো প্রকার দুঃখকষ্ট অস্থিরতা থাকে না।' অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'যেসব ঈমানদার তাদের ঈমানকে যুলমের কালিমা দ্বারা কলুষিত করেনি, তারা শান্তি নিরাপত্তা এবং হেদায়াতের নেয়ামত লাভ করবে।'

আল্লাহর সাহায্য

পুণ্য বা সৎকাজ করার মাধ্যমে আমরা সেই শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি যে শক্তি করুণা ও দয়ার উৎস এবং ঈমানের মহাশক্তি। সে শক্তির প্রতি যখন আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করি তখন সে শক্তি আমাদের সাহায্য করে। এ প্রসংগে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা আল্লাহকে প্রভু স্বীকার করলো এবং এ বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকলো, তারা সকল ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে।' (১৩-৬৪)

ট্রাইনের বিশ্লেষণ

'দি টিউন উইথ দি ইনফিনিট' নামক গ্রন্থে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ট্রাইন লেখেছেন, আল্লাহর সত্যিকার আনুগত্যই হচ্ছে প্রকৃত দূরদর্শিতা। যে ব্যক্তির মধ্যে এ দূরদর্শিতা রয়েছে সে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত শক্তির সঠিক ব্যবহার জানে এবং তার ওপর মহাবিশ্বের ভান্ডারের মুখ খুলে দেয়া হয় এবং সে ভান্ডার থেকে সে প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্পদ লাভ করে।

যদিও আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার সকল দোয়া কবুল করেন, কিন্তু বান্দার কাজের সংগে দোয়া কবুল হওয়ার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারদের দোয়া শ্রবণ করেন এবং তাদের প্রতি অধিক রহমত দান করেন।' (আয়াত ৪২-২৫)

দোয়ার মনস্তাত্ত্বিক দিক

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে দোয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত অবসাদ ও হতাশা দূরীকরণে দোয়া সবচেয়ে কার্যকর প্রতিষেধক। দোয়া কিভাবে মানসিক রোগসমূহে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা প্রয়োগ করে আসুন সে বিষয়ে আলোচনা করি।

কষ্টকর অনুভূতির প্রকাশ

এক ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করে তখন সে আল্লাহকে নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করে। তার অহংকার বিনয়ে পরিণত হয়। সে একান্ত বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে আবেদন করে হে আল্লাহ তায়ালা, আমি বড়োই গুনাহগার। একথা বলার সংগে সংগে তার মানস পর্দায় পাপ এবং ভুলত্রুটির সকল ঘটনা ভেসে ওঠে। সেই ভেসে ওঠা হয় তার জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক। কারণ তার মনে সে সময় জেগে ওঠে আল্লাহর পাকড়াও করার ভয়। এ ভয়ে তার দু'চোখে প্রবাহিত হতে থাকে অবিরল অশ্রুধারা। সাধারণ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি এসব

www.nagorikpathagar.org

ঘটনা স্মরণ করতে চায় না, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের মনোজেগত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে অধিক খবর রাখেন। এ কারণে যখন বান্দা বিনয়ে বিগলিত হয়ে ক্ষমার আবেদন জানায়, তখন বান্দার চোখের অশ্রুধারা তার মনের আহাজারি এবং হাহাকার কমিয়ে দেয়। মনস্তত্ত্বের ভাষায় এটাকে বলা হয় ক্যাথারসিম। ফ্রয়েডের চিন্তাধারা অনুযায়ী মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাসমূহের সমাধানে এ কাজ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

কর্মধারার পরিবর্তন

দোয়া করার সময় মানুষ যখন নিজের পাপ, অন্যায় এবং ভুলত্রুটি স্বীকার করে, ভবিষ্যতে সেসব পাপ না করার স্বীকারোক্তি করে, এর ফলে তার ভবিষ্যত কর্মধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়।

আশা

বান্দা আল্লাহর কাছে এ জন্যেই দোয়া করে যে, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়ালাই তার সমস্যাসমূহ সমাধান করে দিতে পারেন এবং তিনিই এসব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এরকম আশার কারণে বান্দা তার ভবিষ্যত সমস্যার সমাধানে আশাবাদী হয় এবং নিজের উদ্বেগ ও হতাশার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

অখন্ড মনোযোগ

রোগীরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে তখন আমি লক্ষ্য করেছি, তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং হতাশা অনেকাংশে কমে যায়। আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক অখন্ড মনোযোগের কারণে তার মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। কেউ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে তখন সে নিজেকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত মনে করে। এ সময়ে তার মনে পারিপার্শ্বিক অন্য কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না। ফলে মানসিক অস্থিরতা এবং উদ্বেগ আপনা আপনি দূর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমি আমার রোগীদের বিনয় নম্রতার সংগে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দোয়া করার পরামর্শ দিয়ে থাকি।

আত্মসমালোচনা

দোয়া করার সময় মানুষ নিজের পাপ, অন্যায় এবং ভুলভ্রান্তির কথা স্বীকার করে। পাপ অন্যায়ের কথা স্বীকার করার সময়ে সেসব পাপের ক্ষতি সম্পর্কেও সে ধারণা লাভ করে। ফলে বান্দার মধ্যে দূরদৃষ্টি দূরদর্শিতা সৃষ্টি হয়। নিজের সমস্যা সমাধানের জন্যে বান্দা ভবিষ্যত কর্মপন্থার ব্যাপারে সতর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সময় ভয় ভীতির পরিবর্তে তার মনে আশাবাদ জেগে ওঠে। সমস্যা সমাধানের জন্যে সে ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে। নিজের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা কাজে লাগায়।

মানসিক প্রশান্তি লাভ

দোয়া করার সময় বান্দার মনে এক প্রকার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয়। নিজের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্যে যেসব চেষ্টা করে তার ফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়। শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহর কাছ থেকে সেসব কাজের ভালো ফলও আশা করে। ফলে সে পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। এ মানসিক শান্তি ব্যক্তির চিকিৎসার কাজে বিশেষ উপকারী। কাজেই দোয়া এমন একটি অস্ত্র, যা রোগীকে হতাশা থেকে রক্ষা করে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নাফরমানীর কারণে নানারকম আযাব

পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে। রসূল (স.) সাহাবাদের সম্বোধন করে বলেছেন, হে মোহাজের ও আনসাররা, পাঁচটি জিনিসে জড়িত হওয়া থেকে দূরে থাকো।

১. কোনো জাতির মধ্যে বেহায়াপনা নির্লজ্জতা যখন সর্বজনীন হয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে প্লেগ এবং এমন নতুন রোগ দেখা দেয় যে রোগ আগে কখনো ছিলো না।

২. যারা ওযনে কম দেয় তারা দুর্ভিক্ষ, শাসন কর্তৃপক্ষের যুলুম অত্যাচার এবং এ ধরনের নানারকম কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়।

৩. যারা যাকাত দেয়া বন্ধ করে তাদের ওপর বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি চতুষ্পদ জন্তু এবং আল্লাহর অন্যান্য মাখলুক না থাকতো তবে তাদের ওপর কখনোই বৃষ্টি বর্ষিত হতো না।

৪. মানুষ যখন আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রসূল (স.)-এর সাথে কৃত অংগীকার ভংগ করে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ওপর অন্য জাতির শত্রুদের চাপিয়ে দেন।

৫. শাসকরা যখন আল্লাহর কেতাবের বিধান ত্যাগ করে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ এবং যুদ্ধ দেখা দেয়।

আমেরিকায় দুর্ঘটনা

আমেরিকায় কয়েক বছর আগে এমন সব দুর্ঘটনা ঘটেছে যেসব দুর্ঘটনা আমাদের সকলের জন্যেই শিক্ষণীয়।

১. আমেরিকার মিসিসিপি নদীতে প্রতি বছর প্লাবন দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবে পানি প্রবাহ থাকে দেড় লাখ কিউসেক। কিন্তু দুই হাজার সালে পানি প্রবাহ সাড়ে সাত লাখ কিউসেকে উন্নীত হয়েছে। রাজ্যের সকল বাঁধের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে থাকে। সেই বন্যা ও প্লাবনের ফলে আশেপাশের সাতটি রাজ্য প্লাবিত হয়। ত্রিশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত টিভি বক্তৃতায় গির্জার পাদ্রীদের আল্লাহর কাছে দোয়া করার আবেদন জানিয়েছেন যেন জনগণ এ জাতীয় বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে।

২. টেক্সাস রাজ্যে প্রবাহিত টর্নেডোর প্রলয়ংকরী ক্ষমতা ছিলো ১০টি নাইট্রোজেন বোমার চেয়েও অধিক। সে ঝড়ে বহু ঘরের ছাদ উড়ে যায়, বহু গাড়ী উড়িয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় নিক্ষিপ্ত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সুসজ্জিত জনপদ বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো কয়েক মিলিয়ন ডলার। আল্লাহু আকবর।

৩. ১৯৯৪ সালের ১৭ জানুয়ারী ক্যালিফোর্নিয়া অংগ রাজ্যের লস এঞ্জেলসে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। সে সময় আমেরিকা বাগদাদের পবিত্র ভূমিতে বোমা বর্ষণ করেছিলো। আল্লাহু আকবর।

৪. এ ভূমিকম্প সম্পর্কে আগাম সতর্কবাণী ঘোষণা করাও সম্ভব হয়নি। ভূমিকম্পের সতর্ক সংকেতদানকারী ইপি সেন্টার ছিলো মাটির নয় কিলোমিটার গভীরে। প্রকৌশলী এবং ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা ছিলো, সহসা কোনো ভূমিকম্পের

www.nagorikpathagar.org

সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আল্লাহর কুদরত সে প্রকৌশলীদের ধারণা অসত্য প্রমাণিত করে দিয়েছিলো। ৪৫ সেকেন্ডব্যাপী সংঘটিত সে ভূমিকম্পে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহু আকবর।

এ ভূমিকম্পে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিলো কম। সরকারী সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিলো তুলনামূলক অনেক বেশী। যেসব ভবন চিরস্থায়ী নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছিলো, যেমন হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, হাইওয়ে সেতু ইত্যাদির ক্ষতি হয়েছিলো ব্যাপক। আমি নিজের চোখে সে ভূমিকম্পে ক্ষতির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি। দুই মিটার চওড়া খুঁটি খড়কুটোর মতো ভেংগে উড়ে অন্যত্র গিয়ে পড়েছিলো। হাইওয়ের সেতু একশ ফুট উঁচু থেকে নীচে ভেংগে গুঁড়ো হয়ে পড়েছিলো। সরকারী হিসাবে সে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো কয়েক মিলিয়ন ডলার। আমেরিকা কুয়েতের পক্ষ নিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে মুনাফা করেছিলো, এ ভূমিকম্পের ক্ষতি ছিলো সেই মুনাফার সমপরিমাণ। আল্লাহু আকবর।

ক্যালিফোর্নিয়া অংগ রাজ্যে ভূমিকম্পের হুমকি এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যদি সেখানে বড়ো রকমের কোনো ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তবে হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীদের অনাচার কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কোরআনের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, অতীতে বহু অবাধ্য জাতির ওপর হঠাৎ করে আল্লাহর আযাব এসে পড়েছিলো এবং তারা চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

আমি লস এঞ্জেলসের রাস্তার মোড়ে বড়ো বড়ো মেটালিক বোর্ড দেখেছি। সেসব বোর্ডে লেখা ছিলো ওহ গড। জনগণকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে, সরকারী ব্যবস্থাপনায় মানুষকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই এসব বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহু আকবর।

শিক্ষণীয় বিষয়

সুপার পাওয়ার যখন আল্লাহর শক্তির সামনে তুচ্ছ হয়ে যায় তখন আল্লাহর সামনে আমাদের কতোটা বিনীত এবং নতজানু হওয়া আবশ্যক চিন্তা করলেই তা বুঝা যাবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের সাহায্য করেন তবে সুপার পাওয়ার আমাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে সক্ষম হবে না। এ প্রসংগে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না শুধু আমাকেই ভয় করো।

www.nagorikpathagar.org

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বিবিধ

গালি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

ইসলাম গালাগাল এবং অশ্লীলতার বিষয়ে নানাভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ না করে গালির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। কারণ হাদীসগ্রন্থসমূহে সহজেই এ বিষয়ক হাদীস পাওয়া যাবে।

প্যারা সাইকোলজিক বিশ্লেষণ

ইউরোপীয় একজন বিশিষ্ট নেতা লেখেছেন–

Each word as it is uttered makes little form In etheric matter. The word "hate" for instance Produces a horrible form so much so that having seen its shape. I naver use the word when I saw the form discomfort.

অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ ইথারে একটি বিশেষ অবয়ব ধারণ করে। যেমন ঘৃণা শব্দ এতোটা ভয়ানক প্রতিচ্ছবি ধারণ করে যে, একবার আমি তা দেখে পরে আর সে শব্দ ব্যবহার করার সাহস হয়নি। সে শব্দ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হয়েছি।

প্রতিটি শব্দ হচ্ছে একটি ইউনিট বা এটম। সে শব্দকে আভ্যন্তরীণ প্রেরণার বিদ্যুৎ ঝলসে দেয়, আলোকিত করে। সে শব্দের প্রভাব কসমিক বা অস্টার ওয়ার্ল্ড উভয় জগতে প্রকাশিত।

গালি হালকা একটি শব্দ। গালি কোনো তলোয়ার বা তোপ নয়; বরং গালি হচ্ছে একটি শব্দ বা কতিপয় শব্দের সমষ্টি, কিন্তু এ শব্দ উচ্চারণের সাথে যার প্রতি উচ্চারিত হয় তার দেহমনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ আগুন কোথা থেকে আসে? এ আগুন সে বুকে থাকে যে বুক থেকে এ গালি বের হয়। সে আগুন গালিদাতার মুখ থেকে অন্যের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। লিসাদ বিটার বলেন, আপনাকে আমি বলবো, কখনো গালি দেবেন না। কারণ গালি আপনার চেহারা বিকৃত করে দেবে। ইসলাম যা চৌদ্দশ বছর পূর্বে নিষেধ করেছে, আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার পর সে বিষয় নিষিদ্ধ করেছে। গালি দ্বারা ঘৃণা ছড়ায়। মূলত গালি হচ্ছে নেতিবাচক অগ্নিশিখার শক্তি। এ শক্তি নেতিবাচক বা নেগেটিভ প্রভাব থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

হাসি ও আধুনিক বিজ্ঞান

গালি হচ্ছে একটি বা একাধিক শব্দ। এর ভেতর নেগেটিভ শক্তি আগুন লাগিয়ে দেয়। এ আগুন মূলত বুকের ভেতর থেক বের হয়।

www.nagorikpathagar.org

একইভাবে ভালোবাসা হচ্ছে এক প্রকার আলো। এ আলোও থাকে বুকের ভেতর। হাসি হচ্ছে এ আলো এবং রশ্মির অংশ। হাসির মাধ্যমে সে রশ্মি কসমিক ওয়ার্ল্ডে তরঙ্গ তৈরী করে। এ রশ্মি অন্যের মনে শীতলতার জন্ম দেয়। ফলে সে আনন্দ অনুভব করে।

রসূল (স.) বলেছেন, কারো সাথে হাসিমুখে দেখা করাও এক রকমের সদকা। এটা প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা বৃদ্ধি করার একটা ভংগি।

মনস্তত্ত্ব বিশারদ ফ্রয়েড বলেছেন, সমাজের মূলনীতি হাসির মাধ্যমে তৈরী হয়। হাসি যদি অবশিষ্ট থাকে তবে সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে। হাসি যদি না থাকে তবে ভালোবাসা, সহমর্মিতার প্রেরণা আপনা থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। হাসির ধারা বা রশ্মি অন্যের মনে ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার প্রেরণা তৈরী করে।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রোগ ও বিজ্ঞান

ফ্রান্সের ফিজিওলজিস্ট রিকহেট তাঁর রচিত 'থার্টি ইয়ার্স ফিজিক্যাল রিসার্চ' গ্রন্থে লেখেছেন, মানুষের ক্রমাগত পাপের কারণে তার আত্মা নাপাক হয়ে যায়। তারপর বংশধরদের মধ্যেও সেই অপবিত্রতা সংক্রমিত হয়। উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও রোগের সংক্রমণ মূলত পাপের শাস্তির কারণেই হয়ে থাকে।

পুণ্যের বিনিময় বা সওয়াব যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি পাপের ফলও মানুষকে স্থায়ীভাবে ভোগ করতে হয়। এ প্রভাব বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। এটাকে আমরা উত্তরাধিকার রোগ বলতে পারি। যেমন একজন লোক পাপের কারণে সিফিলিস বা গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়। ফিজিওলজি এবং প্যাথলজি বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব রোগের জীবাণু মায়ের জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়। এমনি করে এ রোগ বংশানুক্রমিকভাবে টিকে থাকে।

পাপ শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরই ক্ষতি করে না; বরং পাপের ফল বংশানুক্রমিকভাবে পরবর্তী বংশধরদেরও ভোগ করতে হয়।

হাই তোলার সময়ে মুখে হাত দেয়া

রসূল (স.) হাই তোলার সময় মুখে হাত চাপা দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। (যাদুল মায়াদ)

কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায়, রসূল (স.) হাই তোলা পছন্দ করতেন না। হাই তোলার সময়ে মুখে বাম হাতের পিঠ ব্যবহার করার জন্যে হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হাই তোলার সময় মুখ হাঁ হয়ে যায়। হাত চাপা দেয়া হলে হাঁ বড় হতে পারে না।

হাই তোলার সময় মানুষ গভীরভাবে নিশ্বাস নেয়। এ সময় বাইরের ধুলো বালি, জীবাণু মুখের ভেতর প্রবেশ করার আশংকা থাকে। মুখে হাত চাপা দেয়া হলে সেসব মুখের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না। মুখের ভেতর দিয়ে এসব রোগজীবাণু পেটে পৌছে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

হাই তোলার সময়ে মুখে বাম হাত চাপা দিতে এ কারণেই বলা হয়েছে যে, এর ফলে রোগজীবাণু লাগলে তা বাম হাতে লাগবে। হাই তোলার সময়ে মুখে হাত চাপা দেয়ার জন্যে ডান হাত ব্যবহার করা যাবে না। কারণ ডান হাত দিয়ে মানুষ খাবার গ্রহণ করে। ডান হাতে জীবাণু লেগে থাকলে সে জীবাণু খাবার সাথে মিশে পেটে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (স.) হাই তোলা এ কারণে অপছন্দ করতেন যে, হাই তোলা ক্লান্তি অবসাদ এবং অলসতার পরিচয় বহন করে। অলস মানুষ দ্বারা দ্বীন দুনিয়ার কোনো কাজই হয় না।

কুকুরের উচ্ছিষ্ট মাটি দিয়ে রগড়ানো

জার্মানীর একজন ডাক্তারের নাম ডাক্তার কুর্খ। তিনি সংবাদপত্রে কটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। এতে বোঝা যাবে, হাদীসের শিক্ষা এমন যুক্তিসংগত যে, প্রতিটি সুস্থ স্বভাবের অধিকারী মানুষ সে শিক্ষা গ্রহণ করবে। সে মানুষ যে কোনো ধর্মের অনুসারী হোক না কেন।

ডাক্তার সাহেব লেখেছেন, জলাতংক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি মানবতার মহান মুক্তিদূত মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছি। এ রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে মহানবী (স.)-এর একটি হাদীস আমাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ করেছে। আমি তাঁর এক হাদীসে পড়েছি, কোনো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয় তবে সে পাত্র সাত বার ধুবে। ছয় বার পানি দিয়ে এবং একবার মাটি দিয়ে রগড়ে নিতে হবে। এ হাদীস সম্পর্কে আমি যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করলাম। মনে মনে ভাবলাম, মহানবী (স.)-এর মতো মানুষ কখনো ফালতু কথা বলতে পারেন না। নিশ্চয়ই তাঁর কথার মধ্যে কল্যাণকর কোনো দিক রয়েছে। আমি মাটির উপাদানগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে প্রতিটি উপাদান কুকুরের লালায় ব্যবহার করে দেখেছি। অবশেষে নিশাদলের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সামনে আসতেই আমার কাছে উন্মোচিত হয় যে, এটা জলাতংক রোগের চিকিৎসা। এভাবেই আমি এ রোগের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। মহানবী (স.) কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাত্র মাটি দ্বারা ধূতে কেন বলেছেন? এর কারণ হচ্ছে, জলাতংক রোগের জীবাণু নামক পদার্থ নিশাদল সব সময় মাটিতেই থাকে। যদি মহানবী (স.) শুধু মাটি দিয়ে বরতন কচলে নিতে বলতেন তবে বুঝা যেতো তিনি শুধু পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কেননা মাটি অতি সহজলভ্য এবং সর্বত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি ছয় বার পানি দিয়ে ধুয়ে একবার মাটি দিয়ে পরিষ্কার করতে বলেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে।

মহানবী (স.)-এর অন্য এক হাদীসে রয়েছে, জ্বর হচ্ছে দোযখের আগুনের অংশ, এ আগুন পানি দিয়ে নেভাও। তাঁর এ হাদীস শুনে এক সময় ডাক্তাররা হাসাহাসি করতেন, কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ঠান্ডা পানির মধ্যেই জ্বরের চিকিৎসার প্রধান উপাদান রয়েছে। মোটকথা, মহানবী (স.)-এর বহু হাদীস চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান উৎস। গবেষণা ও অনুসন্ধানে এসব বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে। আমি বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত এ মহামানবের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি দ্বিধাহীনভাবে বলছি, আদম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে মোহাম্মদ (স.)-এর সমকক্ষ কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেননি। (আহকামে ইসলাম আকল কি নযর সে)

মাছি ডুবিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা

সুনানে ইবনে মাজা গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, রসূল (স.) বলেছেন, মাছির এক পাখায় বিষ অন্য পাখায় প্রতিষেধক

www.nagorikpathagar.org

থাকে। কাজেই কোনো খাদ্যদ্রব্যে যদি মাছি বসে তবে মাছিটি সে খাদ্যে ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে বিষাক্ত পাখার বিষ ও প্রতিষেধক পাখার ওষুধে সমান সমান হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, মাছির এক পাখায় বিষাক্ত ভাইরাস রয়েছে। সে ভাইরাস খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মাছি যখন কোনো খাদ্যদ্রব্যে বসে তখন সে খাদ্যদ্রব্যে তার পাখার বিষ ছড়িয়ে দেয়। তার অন্য পাখায় থাকে এন্টিভাইরাস জীবাণু। যদি মাছি খাদ্যদ্রব্যে ডুবিয়ে দেয়া হয় তাহলে এন্টিভাইরাস প্রতিষেধক সে খাদ্যে সংক্রমিত বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। ফলে সে খাবার গ্রহণে কোনো ক্ষতি হয় না, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। মাছিকে খাবারে ডুবিয়ে দেয়া না হলে পাখার বিষে খাদ্য বিষাক্ত হবে এবং তা খেলে মানুষের জীবননাশের আশংকা দেখা দেবে।

দুই সমুদ্র প্রবাহের রহস্য

কোস্টিউ একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। খৃস্টান ধর্মের সাথে গভীর সম্পর্ক তার। তিনি সমুদ্রের পানি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিলো, দুই সমুদ্রের পানি পরস্পর মিলেমিশে যায় না কেন, তিনি ভেবে পান না পানির রং না হয় আলাদা হলো, কিন্তু পানি মিশবে না কেন? পানির ওপর গবেষণায় তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। তারপর একটি থিওরী আবিষ্কার করেন। সে থিওরীর নামকরণ করেন কোস্টিউ থিওরী।

কিছুকাল পর একজন মুসলমান বিজ্ঞানীর সংগে তার দেখা হয়। তার সামনে নিজের থিওরীর কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেন। মুসলমান বিজ্ঞানী বললেন, আপনি তো এখন গবেষণা করছেন, আপনাকে আমি চৌদ্দশ বছর আগের একটি তথ্য দিচ্ছি। তারপর মুসলমান বিজ্ঞানী কোস্টিউকে কোরআনের সূরা আর রাহমানের সংশ্লিষ্ট আয়াত পাঠ করেন শোনান। বিস্মিত অভিভূত বিজ্ঞানী কোস্টিউ সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যান।

কোরআনের সে আয়াত আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র, যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল। যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না।' (সূরা আর রাহমান)

উল্লিখিত আয়াতে দু'টি বিষয় রয়েছে।

১. দু'টি সমুদ্রের পরস্পর মিলিত হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

২. দু'টি সমুদ্রের মধ্যে অন্তরাল থাকার কারণে তারা পরস্পর মিলিত হতে পারে না।

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যাক। ফরাসী বিজ্ঞানী ভন জ্যাক ডি কোস্টিউ সমুদ্র গবেষণার জন্যে বিখ্যাত। তিনি রোম সাগর এবং আটলান্টিক সাগরের ওপর সুদীর্ঘ গবেষণা করে দেখেছেন, রাসায়নিক এবং জীবতাত্ত্বিকভাবে এ দু'টি সাগর সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি লেখেছেন, জিব্রাল্টার প্রণালীর দক্ষিণে মরক্কো, উত্তরে স্পেন, কিন্তু মরক্কোর অংশের পানি সম্পূর্ণ মিঠা। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রশস্ত সমুদ্র এ অংশে একটি ডিমের মতো চিরুনির দাঁতের আকৃতি ধারণ করেছে। এ কারণে রোম সাগর এবং আটলান্টিক সাগর পরস্পরের সংগে মিশে না। এ বাস্তবতার আলোকে কোরআনের সূরা আর রাহমানের আয়াত দেখে বিজ্ঞানী কোস্টিউ বিস্ময়ে অভিভূত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

সূরা আর রাহমানে উল্লিখিত আয়াতে জিব্রাল্টার প্রণালীর অবস্থা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ। দুই সমুদ্রের অন্তরাল বা আড়াল সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেটা কী? সমুদ্রে জীবিত প্রাণীর সংখ্যা স্থলভাগের প্রাণীর সংখ্যার চেয়ে অধিক। সেখানে নানা প্রকার প্রাণী রয়েছে। মোট কথা, আল্লাহর কুদরতের অপার নিদর্শন সেখানে বিদ্যমান। এটা ঠিক যে, বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে জীবন কাটায়।

এখন সূরা আর রাহমানের ২২ নম্বর আয়াতের প্রতি মনোযোগ দেয়া যাক। এ আয়াতে বলা হয়েছে, উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। আয়াতে মুক্তা এবং প্রবালের কথা জানানো হয়েছে।

সমুদ্রে বিশেষ ধরনের ফুল পাওয়া যায়। সেই ফুল নানা বর্ণের পাপড়িতে ঢাকা। স্থলভাগে এ রকম ফুল পাওয়া যায় না। সমুদ্রের গভীরে এতো সুন্দর ফুল ফোটে যা স্থলভাগে কল্পনাও করা যায় না। সমুদ্রে লাল রং-এর এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়। সেই মাছের দেহ থেকে আলো বের হয় এবং চারদিকে বিকিরণ করে। সমুদ্রের অতল গভীরের অন্ধকারে ত্রিশ প্রকারের নানা রং-এর অসংখ্য রকমের মাছ পাওয়া যায়। এসব সৃষ্টি আল্লাহর অসামান্য কুদরতের প্রমাণ। কোরআনের আয়াতে দুই সমুদ্রের পানি মিশে না যাওয়ার যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা সমুদ্রে সৃষ্ট জীববৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সমুদ্রের গভীরে যতো প্রাণী বসবাস করে আধুনিক যুগেও হিসাব করে তার সংখ্যা বের করা অসম্ভব।

উভয় সমুদ্রের গভীরে রয়েছে নানা বর্ণের নানা জাতের ফুল। এসব ফুলের কোনোটির রং নীল কোনোটির রং হলুদ। উভয় সমুদ্রের মাছ এবং ফুলের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য রয়েছে। এছাড়া সমুদ্রের গভীরে আলো ছড়ানো নীল রং-এর এক ধরনের মাকড়সা পাওয়া যায়। সেসব মাকড়সা রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করে।

সমুদ্রের অতল গভীরে যেখানে খালি চোখে কিছু দেখা যায় না সেখানে এতো সুন্দর জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্বের কারণ কী? সূরা আর রাহমানের ১৯ থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত মহান আল্লাহর অসংখ্য কুদরতের বর্ণনা রয়েছে। কোরআনের বর্ণনার চৌদ্দশ বছর পর সমুদ্রে সৃষ্ট জীব সম্পর্কে এটলাস এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানতে পারি, হাজার হাজার সৃষ্ট জীব একটির মধ্যে অন্যটি মিশে যায় না। তারা স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে বসবাস করে। আলো বিকিরণ করা চমকানো মাছ মানুষের জন্যে সমুদ্রের গভীরে গাইড হিসেবে কাজ করে। আধুনিক জ্ঞানের আলোতে আমরা দেখতে পাই, ভূপৃষ্ঠে কিভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিলো। কোরআনের আয়াতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য দেয়া হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভূপৃষ্ঠে প্রাণের সঞ্চার হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন। প্রথমে অর্গানিক স্ট্রাকচার সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছিলো। ওটা এ জন্যে করা হয়েছিলো যেন প্রাণী এবং নিষ্প্রাণ জিনিসের মধ্যেকার রাসায়নিক পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। এটা রাসায়নিক জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে অর্গানিক ক্যামেস্ট্রি জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন ঘটায়।

www.nagorikpathagar.org

প্রাথমিক গবেষণায় জানা গেছে, অর্গানিক স্ট্রাকচারের বিশেষ কথা হচ্ছে, এতে কার্বন এটম নেতিবাচকভাবে বিদ্যুৎ তৈরী করে, অর্থাৎ নেগেটিভ চার্জ পাওয়া যায়।

এসব তথ্যের কারণে জেমস ওয়াটসনের সজীব জিনিসের ডিএনএ পরীক্ষায় সহায়ক হয়েছে। মোট কথা, জীবনের মূল উপাদান সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫০ সালে অর্গানিক স্ট্রাকচার অধ্যয়নে মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, প্রত্যেক প্রকার অংগ প্রত্যংগ এক ধরনের কম্পিউটার ব্যবস্থায় তৈরী হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি ছোটো ক্যালকুলেটরের কথা বলা যায়। একারণেই কোরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি সৃষ্টি করেছি এবং আগে থেকেই বিন্যস্ত করেছি। আল্লাহ তায়ালা মাটি সৃষ্টি করার পর মাটি এবং পানিকে জীবন সৃষ্টির আদেশ দিয়েছেন। তারপর জীবনকে সুবিন্যাস্তভাবে সাজিয়েছেন। (ডাক্তার হালুক বাকী)

হাঁচি দিয়ে আল হামদু লিল্লাহ বলা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেন, আল্লাহর কাছে হাঁচি পছন্দনীয় এবং হাই অপছন্দীয়। কোনো ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে এবং আল হামদু লিল্লাহ বলেছে, এটা কেউ শুনতে পেলে সাথে সাথে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। হাই এলে যথাসম্ভব তাকে নিবৃত্ত করতে হবে। কারণ মানুষকে হাই দিতে দেখে শয়তান হাসে। অর্থাৎ শয়তান খুশী হয়। কারণ হাই হচ্ছে ক্লান্তি, অবসাদ এবং অলসতার প্রমাণ। শয়তান এসব জিনিসকে পছন্দ করে। (বোখারী)

লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ইসলামী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নসরুল্লাহ খান বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, কোনো মুসলমান হাঁচি দেয়ার পর আল হামদু লিল্লাহ বলবে। যে ব্যক্তি শুনবে সে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। তারপর যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে সে বলবে ইয়াহদী কুমুল্লাহ। এ হাদীস শোনার পর একজন ইংরেজ মনে মনে চিন্তা করলেন, একটি সাধারণ কাজের প্রেক্ষিতে এতো দোয়া পড়ার কারণ কী? তারপর তাকে জানানো হলো, এতো দোয়া পাঠ করা অর্থহীন নয়; বরং এ দ্বারা আল্লাহর শোকর আদায় করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মস্তিস্কের শিরায় বাতাস থেমে থাকে। সেই বাতাস প্রেসারের মাধ্যমে বের করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হাঁচির ব্যবস্থা করেছেন। হাঁচির প্রেসারের মাধ্যমে নাসিকাপথে বাতাস বের হয়ে যায়। এ বাতাস থেমে থাকলে রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। এ কারণেই যে ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে আল্লাহর শোকর আদায় করে।

দিনে মানুষ নানা রকমের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। অনেক লোক এমন রয়েছে যাদের ধুলোবালির মধ্যে কাজ করতে হয়। ফলে সে ধুলোবালি নাকের ভেতর ঢুকে যায়। নাকের ভেতর ধুলোবালি এবং জীবাণু আটকে রাখার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা নাকের ভেতর লোমের ব্যবস্থা করেছেন। হাঁচির মাধ্যমে সেসব জীবাণু বাইরে বের হয়ে যায়। হাঁচির মাধ্যমে বাতাস বের হওয়ার জন্যে এরকম প্রেসার পড়ে যে জীবাণু

www.nagorikpathagar.org

নাকের ভেতর অবস্থান করার সুযোগই পায় না। এসব ধুলোবালি এবং জীবাণু নাকের ভেতর দিয়ে মাথায় বা পেটের ভেতর পৌঁছুলে নানারকম রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা হাঁচির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। এ কারণেই রসূল (স.) হাঁচি পছন্দ করেছেন।

রসূল (স.)-এর কথা বলা

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) তোমাদের মতো তাড়াহুড়ো করে কথা বলতেন না; বরং তাঁর কথা ছিলো স্পষ্ট। প্রতিটি শব্দ অন্য শব্দ থেকে আলাদা হতো। শ্রোতারা তাঁর কথা অনায়াসেই ভালোভাবে বুঝতে পারতো।

অর্থাৎ রসূল (স.)-এর কথা বলার ধরন এমন ছিলো না যে, মানুষ কিছু বুঝতো কিছু বুঝতো না; বরং তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, তাঁর কথা প্রত্যেক শ্রোতাই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হতেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) (গুরুত্বপূর্ণ) কোনো কথা তিন বার উচ্চারণ করতেন, যেন শ্রোতারা ভালোভাবে বুঝতে পারে।

তিনি তিন বার এ কারণে বলতেন যেন কঠিন কথা হলে শ্রোতা ভালোভাবে মনযোগী হতে পারে, অথবা শ্রোতার সংখ্যা বেশী হলে সামনে, ডানে বামে তিন দিকে ফিরে বলতেন যেন শ্রোতারা তাঁর কথার মর্ম ভালোভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তিনবার বলার এটাই ছিলো উদ্দেশ্য। অন্যথা দুবার বলা যথেষ্ট হলে দুবারই বলতেন। (তিরমিযী)

আর্জেন্টিনা সফর এবং
কথা বলার আদব

আর্জেন্টিনা সফরের সময় আমি একবার আমার বন্ধু শিবলির সংগে একটি ঝিলের তীরে ভ্রমণ করছিলাম। শিবলি বললো, আপনি কি কখনো প্রফেসর দারের সংগে দেখা করেছেন? আমি বললাম, না করিনি। তিনি কে? শিবলি বললো, তিনি একজন বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিশারদ। পরদিন আমরা তার কাছে গেলাম। আমি আমার দেখা করার উদ্দেশ্য সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে জানালাম। তিনি খুশী হলেন এবং জীবন যাপনের কয়েকটি মূলনীতি সম্পর্কে আমাকে জানালেন। কথা বলার আদব সম্পর্কে তিনি বললেন, থেমে থেমে কথা বলবে, অন্যের কথা শুনবে। গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝানোর জন্যে সে কথার পুনরাবৃত্তিও করতে পারো। অন্যজন যখন কথা বলবে তখন তার মুখের দিকে তাকাবে, তার প্রতি গভীর মনোযোগ দেবে। (দুনিয়ার দিগন্তে প্রথম সফর, মালিক জাবেদ)

জাতির নেতা হচ্ছে জাতির সেবক

রসূল (স.) বলেছেন, জাতির নেতা হচ্ছে জাতির সেবক। যে ব্যক্তি মানবসেবায় অগ্রণী ভূমিকা রাখে, পুণ্যের পথে তার চেয়ে অগ্রগামী শুধু সে-ই হতে পারে যে আল্লাহর পথে শহীদ হয়। (মেশকাত, আদাবে জিন্দেগী)

রসূল (স.) নেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি সব সময় মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। জীবনের শুরু থেকে তিনি মানুষের সেবা করেছেন। মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মাসজিদে নববী নির্মাণ কাজে রসূল (স.)

নিজেও অংশগ্রহণ করেন। এক সফরের সময় রান্না করা হচ্ছিলো। রসূল (স.) সে সময় জংগল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে একটি ঘটনা সর্বজনবিদিত, তিনি নিজের কোমরে আটার বস্তা বয়ে নিয়ে এক বৃদ্ধ ও তার সন্তানদের রুটি তৈরী করে খাইয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এ রকম বহু ঘটনার বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের কেউ কেউ আমিরুল মোমেনীন এবং জননেতা হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেদের সবসময় নিয়োজিত রেখেছিলেন।

আব্রাহাম লিংকনের মানব সেবা

আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলতেন, আমি আমেরিকার জনগণের প্রভু নই; বরং একজন সাধারণ মানুষ। এর আগে যখন আমার ওপর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছিলো না তখন আমি নিজেকে হালকা মনে করতাম, কিন্তু এখন আমি অনুভব করছি, আমার ওপর যেন বোঝা চেপে রয়েছে। আমি নিজের ওপর এমন কিছু কাজের দায়িত্ব নিয়েছি যে কাজ একজন শ্রমিকই করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সেবা করে যাওয়া, তাই আমি সেবা করে যাবো। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয় বরং সেবক হিসেবেই আমি খ্যাতি অর্জন করবো।

রসূল (স.)-এর বরকতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

লিও পলের গবেষণা

লিউ পল একজন বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট। তিনি বলেন, আমি প্রতিটি শব্দের মাঝে এক ভিন্ন ধরনের অপার্থিব শক্তি অনুভব করি। আমি অনুভব করি, মানুষ যখন সৎ উদ্দেশে কোনো ভালো কাজ করে তখন তার মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দ আলাদা একটি শক্তি অর্জন করে। এটা একটা স্পর্শাতীত ব্যাপার। খাদ্য দ্রব্যের ওপর এসব শব্দ উচ্চারিত হলে এতে বিশেষ বরকত দেখা দেয় এবং সে খাদ্যে বহু লোকের তৃপ্তি হয়। তবে এর জন্যে নিয়তের পরিচ্ছন্নতা এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতা জরুরী। (প্যারাসাইকোলজির কারিশমা)

সফরের সময় অন্তরংগ সংগী নেয়া

রসূল (স.) বলেছেন, মানুষ যদি একা সফরের সে সকল ক্ষতির কথা জানতো যেসব আমি জানি, তবে রাতে কেউ একাকী সফর করতো না। (বোখারী)

একদিন এক ব্যক্তি বহুদূর থেকে সফর করে রসূল (স.)-এর কাছে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার সংগে আর কে আছে? লোকটি বললো, কেউ নেই। আমি একা এসেছি। রসূল (স.) বললেন, একা সফর করে শয়তান, দুই জন সফরকারী শয়তান, তবে তিন জন সফরকারী হলে কোনো ক্ষতি নেই। (তিরমিযী)

হামফ্রের স্মৃতিচারণ

হামফ্রে লেখেছেন, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মানুষ যেন কখনো একাকী সফর না করে। একবার আমি লরনিয়ার জংগলে একা সফর করছিলাম। সফরের সময় একজন লোকের সংগে আমার দেখা হলো। লোকটিকে গ্রাম্য এবং জংলী মনে

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছিলো। কথায় কথায় ভুলিয়ে সে আমাকে তার আস্তানায় নিয়ে গেলো। ঝুপড়ির মতো একটা ঘর। সেখানে খড়কুটোর তৈরী বিছানা। কথায় কথায় সে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো। আমি ছিলাম ভীষণ ক্লান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে জেগে বুঝতে পারলাম আমি একাধারে দুই দিন ঘুমিয়েছি। বিছানার পাশে নেশা ধরানোর মতো লতাপাতার ঘ্রাণ পেলাম। তাকিয়ে দেখি, আমার সংগে যেসব টাকা পয়সা এবং সফর সরঞ্জাম ছিলো সেসব কিছুই নেই। সেদিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর কোনোদিন কোথাও একাকী সফর করবো না। সফরের সময় একজন সংগী থাকা উত্তম এবং নিরাপদ। (হামফ্রের স্মৃতিকথা)

ইসলামে কারো অনুকরণ নিষেধ করা হয়েছে

রসূল (স.)-এর হাদীসে কারো অনুকরণ নিষেধ করা হয়েছে। (আদাবে জিন্দেগী)

অনুকরণ ও মনস্তত্ত্ব, ফ্রয়েডের দৃষ্টিভংগি

অনুকরণ মানব মনস্তত্ত্বের একটি অংশ। এতে মানুষ অন্যের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। এতে সমালোচনার বিষয়ও রয়েছে। অনেক সময় অন্যের কুঅভ্যাস অনুকরণ করে সে ব্যক্তিকে ব্যংগ বিদ্রূপ করা হয়। এ কারণে এ কাজ সমালোচনার যোগ্য। অন্যের কথা, কাজ অনুকরণ করা হলে যে ব্যক্তি অনুকরণ করে তার ওপর এর প্রভাব পড়ে। এতে তোতলামি এবং কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

হোমারের অভিজ্ঞতা

কাউকে অনুকরণ করার প্রবণতা মানুষের সৃষ্টিশীলতা বিনাশ করে। মানুষ চিন্তা ভাবনা ছেড়ে অনুকরণপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর প্রভাব পড়ে তার কর্মজীবনে। ধীরে ধীরে তার সৃষ্টিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। (হোমারের অভিজ্ঞতা)

মহিলার সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক

আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই পুরুষ মহিলাদের ওপর মর্যাদাবান। (আল কোরআন)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, যদি মানুষকে সাজদা দেয়া জায়েয হতো তবে আমি আদেশ দিতাম প্রত্যেক স্ত্রী যেন তার স্বামীকে সাজদা করে। আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষের জন্যে অন্য মানুষের সাজদা নিষিদ্ধ করেছেন।

পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং রক্ষক

ইসলামী আইনে মহিলাদের সাক্ষ্য অর্ধেক। অর্থাৎ দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। ইসলাম মহিলাদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করেছে। এ প্রসংগে আধুনিক কালের কয়েকটি গবেষণা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

হেভলক এলিসের গবেষণা

হেভলক এলিস আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের অন্যতম বড়ো বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তিনি তার লেখা 'পুরুষ ও নারী' গ্রন্থে নারী পুরুষের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, নারীদের চরিত্রে প্রভাবিত হওয়ার মাত্রা পুরুষের চেয়ে অধিক। ছোটো ছোটো বিষয়েও নারীরা অন্যদের কথা খুব সহজেই বিশ্বাস করে।

www.nagorikpathagar.org

আকর্ষণীয়ভাবে কোনো বিষয় নারীদের সামনে উপস্থাপন করা হলে তারা সে বিষয় নিয়ে এতোটা প্রভাবিত হয় যে, সেটার জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। এছাড়া নারী অন্যদের সমবেদনায় ছটফট করে। তার মধ্যে সে রকমের আত্মবিশ্বাস নেই যে রকম পুরুষদের মধ্যে রয়েছে।

হেভলক এলিস আরো লেখেছেন, নারীর মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা রয়েছে এবং পুরুষের বুদ্ধি নারীর চেয়ে বেশী। পুরুষের মধ্যে নিজের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা উপকার পাওয়ার যোগ্যতা বেশী থাকে। পুরুষ যা শিক্ষা করে, চিন্তা ভাবনা এবং গবেষণার মাধ্যমে তা আরো বৃদ্ধি করতে থাকে। তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে নারীদের চেয়ে অগ্রগামী। নারীর পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি শক্তি কম। তারা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। এ কারণেই নারী বাস্তবতাকে ভয় পায়। কারণ জীবন আবেগ এবং প্রেরণার মিশ্রণে তৈরী। নারীর এ প্রবণতা তাদের বিবেকবুদ্ধি কম হওয়ার প্রমাণ দেয় না, বরং এটা তাদের যৌন চরিত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট। এতে বুঝা যায়, বিজ্ঞান এবং গবেষণাধর্মী কাজের জন্যে নারীর মস্তিষ্ক কাংখিত মাত্রায় উপযুক্ত নয়। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে। তবে সেই ব্যতিক্রমকে বিবেচনায় এনে প্রকৃত সত্য এবং বাস্তবতা উপেক্ষা করা যাবে না।

ডাক্তার লিম্বরাসের গ্রন্থ– নারীর আত্মা

ডাক্তার লিম্বরাস তার লেখা 'নারীর আত্মা' গ্রন্থে লেখেছেন, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে শারীরিক গঠন, উচ্চতা, হাড়ের গঠন এবং মাসলের পার্থক্যই যে শুধু রয়েছে তা নয়; বরং আলো হাওয়া গ্রহণ এবং খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের মধ্যেও পুরুষের সাথে পার্থক্য বিদ্যমান। তাদের রোগের প্রকৃতিও আলাদা রকমের। তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ আলাদা। উন্নতি অগ্রগতি শুধু এভাবেই সম্ভব হতে পারে যে, নারী পুরুষের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ইনসাইক্লোপেডিয়ায় 'আওরত' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে লেখা হয়েছে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে যৌনাংগের পার্থক্য একটি বড়ো রকমের পার্থক্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ পার্থক্য এখানেই শেষ নয়; বরং নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অন্যান্য অংগ প্রত্যংগও সম্পূর্ণ আলাদা। আভ্যন্তরীণ অংগ প্রত্যংগের কথা বাদ দিলেও যেসব অংগ প্রত্যংগ দৃশ্যমান, এর মধ্যেও নারী এবং পুরুষে পার্থক্য রয়েছে।

উচ্চতায় নারী মধ্যম উচ্চতার পুরুষের চেয়ে বারো সেন্টিমিটার কম হয়ে থাকে। এতে জাতির পার্থক্য নেই; বরং অসভ্য ও পশ্চাৎপদ জাতির লোকদের মধ্যে যেমন এ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি উন্নত সভ্য জাতির মধ্যেও একই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। যুবকদের মধ্যে যেমন এ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, শিশুদের ক্ষেত্রেও একই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

বয়স অনুযায়ী নারী পুরুষের দৈহিক গঠনে যেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি দৈহিক ওযনে পার্থক্য লক্ষণীয়। পুরুষের দেহের স্বাভাবিক ওযন সাতচল্লিশ কেজি আর সমবয়েসী মহিলার ওযন হয়ে থাকে বিয়াল্লিশ কেজি। খুব বেশী হলে সাড়ে বিয়াল্লিশ কেজি হবে, এর বেশী নয়। অর্থাৎ নারী দেহের ওযন পুরুষের দেহের ওযনের চেয়ে

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ কেজি কম হবেই। দেহের মাসলের গঠন এবং শক্তিতেও নারী কোনো পুরুষের মোকাবেলা করতে পারে না।

নারী দেহের মাসল এবং পুরুষ দেহের মাসলের যদি পার্থক্য করা হয় তবে বুঝা যায়, উভয়ের দেহ মাসলের বৈশিষ্ট্য আলাদা। শারীরিক শক্তির দিক থেকেও নারী পুরুষের তুলনায় দুর্বল। নারী পুরুষের শক্তিকে যদি ভাগ করা হয় তবে দেখা যাবে, নারী পুরুষের তিন ভাগের এক ভাগ শক্তির অধিকারী। মাসলের তৎপরতার অবস্থাও একই রকম। পুরুষের মাসল নারীর মাসলের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং কর্মক্ষম।

মানব দেহের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে হৃৎপিন্ড। এ হৃৎপিন্ডের গঠনও নারী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ আলাদা। নারীর হৃৎপিন্ড পুরুষের হৃৎপিন্ডের চেয়ে ষাট ভাগ ছোটো এবং সংকীর্ণ।

মানসিক দিক থেকেও নারী পুরুষের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, নিশ্বাসের মাধ্যমে কার্বোলিক এসিডের যেসব কণা বাইরে আসে তা আভ্যন্তরীণ উত্তাপের সংগে নিশ্বাস হয়ে বাইরে বের হয়। এ সম্পর্কে গবেষণা করে দেখা গেছে, একজন পুরুষ ঘন্টায় প্রায় এগারো ড্রাম কার্বন পোড়ায়, কিন্তু নারী একই সময়ে পোড়ায় ছয় ড্রামের কিছু বেশী। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, নারীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপ পুরুষের তুলনায় অনেক কম- অর্ধেকের সামান্য বেশী। নারীর মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং এসব গবেষণায় প্রমাণিত হয়, পুরুষের চেয়ে নারী নানা ক্ষেত্রেই দুর্বল।

নেহিলিস্ট দার্শনিক আল্লামা প্রোডেনের অভিমত

বিখ্যাত নেহিলিস্ট দার্শনিক আল্লামা প্রোডেন তার 'ইবতেকারে নেযাম' গ্রন্থে লেখেছেন। নারী শারীরিক দুর্বলতার পাশাপাশি বুদ্ধি বিবেচনায়ও পুরুষের তুলনায় দুর্বল। তার চারিত্রিক শক্তিও পুরুষের চারিত্রিক শক্তির তুলনায় আলাদা রকমের। নারীর স্বভাবও পুরুষের স্বভাবের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণেই নারী যা সুন্দর আর অসুন্দর বলে, তার এ মতামত পুরুষের মতামতের সংগে খাপ খায় না।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। পন্ডিত নিকোলাস এবং পন্ডিত হেলি প্রমাণ করেছেন, নারীর পঞ্চ ইন্দ্রিয় পুরুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের চেয়ে অনেক দুর্বল।

দূরবর্তী জায়গা থেকে লেবু বা আতরের ঘ্রাণ পুরুষ অনুভব করতে পারে, কিন্তু নারী পারে না। এতে বুঝা যায়, নারীর অনুভূতি শক্তির চেয়ে পুরুষের অনুভূতি শক্তি প্রখর।

নারীর অনুভূতি শক্তি, বোধশক্তি পুরুষের চেয়ে কম হওয়া সম্পর্কে ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় উল্লেখ রয়েছে, খাদ্যের স্বাদ বিস্বাদ বুঝার ক্ষেত্রে, আওয়ায শোনার ক্ষেত্রে, পিয়ানোর রাগের আওয়ায শোনার ক্ষেত্রে পুরুষের সামর্থ নারীর চেয়ে অধিক।

পন্ডিত লোম্বরুজ এবং শেরজি প্রমুখের গষেণায় প্রমাণিত হয়েছে, নারী পুরুষের চেয়ে অধিক কষ্টসহিষ্ণু। নারীরা যতোটা কষ্ট সহ্য করতে পারে পুরুষ ততোটা পারে না। এতে বুঝা যায় পুরুষের চেয়ে নারীর অনুভূতি শক্তি দুর্বল।

www.nagorikpathagar.org

বোধশক্তির বিচারেও নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল। মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারীর মস্তিষ্ক কোষ পুরুষের তুলনায় কম।

এসব বিশ্লেষণ ও বিবরণ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজনে নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নারীকে তার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী আর পুরুষকে তার কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নারী পুরুষ যেহেতু মানব জীবনের গাড়ীর দু'টি চাকা, পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত এ গাড়ী চলতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা নারী এবং পুরুষের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উভয়ের সীমানাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ সীমা লংঘনের পরিণতি উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। সমাজ সভ্যতায় দেখা দেয় ভাংগন। এ সীমা লংঘনের কারণেই অতীতে বহু জাতির অধপতন হয়েছে।

ইসলাম মানুষের স্বভাবের এ বুনিয়াদী নীতি সামনে রেখেই নারী পুরুষের জন্যে পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। এ কারণেই রসূল (স.) বলেছেন, নারী যখন ঘরের বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার সংগে থাকে। অন্য এক হাদীসে রয়েছে, বেগানা পুরুষ এবং নারী যখন এক জায়গায় একত্রিত হয় তখন তাদের সংগে তৃতীয় একজন থাকে, সে হচ্ছে শয়তান।

মানুষের স্বভাবের এবং ইসলামের শিক্ষা উপেক্ষা করার কারণে আজ পশ্চিমা সমাজের উদাহরণ আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছে। সকল প্রকারের উন্নতি সত্বেও তাদের নারী পুরুষ প্রত্যেকের জীবনের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। তাদের জীবনের তিক্ত ঘটনাবলী পাঠ করে অনুভূত হয়, এ জীবন জাহান্নামের চেয়েও নিকৃষ্ট। উন্নত পশ্চিমা বিশ্বে আজ আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। (সমাজ, গণতন্ত্র ও ইসলাম- মোহাম্মদ মূসা ভুট্টো)

ইতিপূর্বে উল্লিখিত তথ্যাবলীতে আপনারা দেখেছেন, ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল এবং খাটো করেছে, ঠিক তেমনি বিজ্ঞানও তার গবেষণায় নারীকে দুর্বল ও খাটো প্রমাণ করেছে। ইসলাম নারীকে ঢেকে রাখার জিনিস বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু ঢেকে রাখার এ জিনিস যখন উদোম করা হয়, পর্দার অন্তরালের জিনিসকে যখন খোলামেলা করা হয়, নারী পুরুষ যখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলাচল করতে শুরু করে, তখন যে ক্ষতি হয় তার উদাহরণ ইউরোপে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায়।

ফিলটাস জে শেইনের অভিজ্ঞতা

আমেরিকার অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আমেরিকান লেখক ফিলটাস জে শেইন তার রচিত 'কম্যুনিজম এন্ড কনশাসনেস অব দি ওয়েস্ট' গ্রন্থে লেখেছেন, আমেরিকার পারিবারিক জীবনে যে রকম অশান্তি বিদ্যমান, এর উদাহরণ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আমেরিকানদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার জন্যে তাদের পারিবারিক জীবনের প্রতি তাকানোই যথেষ্ট। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে উদাহরণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবার যদি ঋণভারে জর্জরিত হয় তবে নিশ্চিত থাকুন, সমগ্র দেশ একদিন ঋণে জর্জরিত হবে। তারপর এক সময় ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে যদি স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকে তবে জেনে রাখবেন, আমেরিকা আটলান্টিক চার্টার এবং স্বাধীনতার চারটি মূলনীতি অনুসরণ করছে না। ঘরের ভেতর যদি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুর জন্মরোধ করা হয় তবে বুঝতে হবে, তারা জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করছে। ফলে তাদের মধ্যে এ মনোভাব গড়ে ওঠবে যে, তারা মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্যে ফসল নষ্ট করবে, খাদ্যসামগ্রী সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। ঘরের ভেতর স্বামী স্ত্রী যদি ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থাকে, একজন অন্য জনের স্বার্থ উপেক্ষা করে, একজনের সুখ আনন্দ অন্যজনের ওপর নির্ভরশীল একথা ভুলে যায়, তবে এর প্রভাব দেশের শ্রমবাজারে এবং পুঁজিবাজারেও পড়বে। ফলে তারা সমাজকে তাদের শ্রম এবং শ্রমের সুফল থেকে বঞ্চিত করবে, যেমন স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে বঞ্চিত করেছে। যদি ঘরোয়া জীবনে স্বামী স্ত্রী তৃতীয় কাউকে আমন্ত্রণ জানায়, তবে অবশ্যই আমাদের জাতির মধ্যে এমন পরিবর্তন সূচিত হবে, যার পরিণামে বিদেশী দর্শন ও আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটবে।

আমেরিকার বড়ো বড়ো ত্রিশটি শহরে তালাকের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রত্যেক দু'টি বিয়ের মধ্যে একটির পরিণাম হচ্ছে তালাক। প্রতিবছর ২ লাখ ৮৫ হাজার ৫শ' বিয়ের মধ্যে ২ লাখ দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। এতে বুঝা যায়, আমেরিকা ভেতরে ভেতরে ঘুণের শিকার হয়েছে। ১৯২০ সালের পর মদের কারণে মস্তিষ্কের রোগী পাঁচশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এটা প্রমাণিত সত্য যে, বহু মহিলা মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অংগ প্রত্যংগের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এসব রোগের কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা মা হিসেবে তাদের যে দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করেছেন তারা সে দায়িত্ব পালন করছে না। পুরুষরাও পিতার দায়িত্ব পালন করছে না। পরিণামে নানা সমস্যা দেখা দেয়ায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক হয়ে যাচ্ছে। এর আগে উভয়পক্ষ দীর্ঘদিন যাবত মানসিক অশান্তি এবং অস্থিরতায় ভোগে। আমেরিকার ৮৩ ভাগ শক্তি সে দম্পতির কাছে থাকে যাদের ঘরে কোনো সন্তান জন্ম নেয় না। শিক্ষার মাধ্যমে এর কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না। কারণ কলেজ থেকে বের হওয়া ৪৫ ভাগ যুবক এবং ২১ ভাগ যুবতী সন্তান জন্মদানে ও গর্ভধারণে অক্ষম প্রমাণিত হয়।

মার্কিন জাতির বিপর্যয় পারিবারিক জীবনে বিশৃংখলা

পারিবারিক জীবনে বিশৃংখলার কারণে আমেরিকান সমাজে এবং রাষ্ট্রে যেসব বিপর্যয়ের আশংকা সৃষ্টি হয়েছে, গ্রন্থকার সেসব উল্লেখ করেছেন এভাবে–

আমেরিকান জাতি পারিবারিক জীবনে যে পথে অগ্রসর হচ্ছে, যদি তারা তা ত্যাগ না করে তবে শুধু ধর্মীয় এবং চারিত্রিক দিক থেকেই নয়; বরং পার্থিব দিক থেকেও তারা এক ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

প্রথমত আমেরিকা পর্যায়ক্রমে বিশ্বাসঘাতকদের রাষ্ট্রে পরিণত হবে। যে জাতির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোক এরকম মনে করতে থাকে যে, যখন ইচ্ছা তখন নিজের যৌন উন্মাদনা মেটানোর জন্যে বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করা যায় তবে বুঝতে হবে, এ জাতির জীবনে নাগরিক এবং জাতিগত অংগীকারের মূল্য নেই। যখন কোনো

www.nagorikpathagar.org

জাতির জনগণ পারিবারিক জীবনের সংগে সম্পৃক্ততা ত্যাগ করে, তখন দেশ এবং জাতির সংগেও তাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যাবে।

যে জাতির মহিলাদের মধ্যে মিসেস এ সবসময় মিসেস ডি হওয়ার জন্যে সচেষ্ট থাকেন, সে দেশের জনগণকে অন্যের সংগে মেলামেশায় কেউ বাধা দিতে পারে না। যারা আজ পরিবারের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করছে কাল তারা জাতির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা করবে না।

দ্বিতীয়ত মানুষের মন মানসিকতা এমনভাবে গড়ে ওঠবে যে, এরপর কেউ দেশ জাতির জন্যে সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত হবে না। কারণ ঘরই হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে এসব বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া যায়। ঘরই এমন জায়গা যেখানে নিজের আনন্দ অন্যকে বিলিয়ে দেয়ার, অন্যের আরামের জন্যে নিজের আরাম ত্যাগ করার নিস্বার্থ আত্মত্যাগের শিক্ষা পাওয়া যায়। যদি ঘরের মধ্যে বীর তৈরী করার ব্যবস্থা না থাকে, তবে জাতির মধ্য বীর আসবে কোথা থেকে? যারা নিজেদের সন্তানদের জন্যে দুঃখকষ্ট সহ্য করে না, আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয় না, তারা দেশ, জাতির জন্যে কেন পরিশ্রম করবে, কষ্ট করবে? আত্মত্যাগের জন্যে যদি ঘরের ব্যবস্থাপনা অবশিষ্ট না থাকে তবে জাতির ভেতর এর শেকড় কাটা যাবে।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক জং-এর খবর

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬ ভাগ ছাত্রছাত্রী বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছে। শতকরা ৩৪ ভাগ স্বীকার করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর সতীত্ব হারিয়েছে। এখনো তারা নিয়মিত যৌন সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষার্থী জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করে। শতকরা ২১ ভাগ শিক্ষার্থী অশ্লীল ম্যাগাজিন ক্রয় করে। শতকরা ৩৪ ভাগ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। শতকরা ৪৮ ভাগ সমকামিতা সমর্থন করে। শতকরা ২১ ভাগের বেশী শিক্ষার্থী দশ হাজারের বেশীবার নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার করেছে। শতকরা ৫৫ ভাগ শিক্ষার্থী মদ পান করে। (জং, ২৫ই মার্চ, ১৯৯০)

বিবিসি ২০ হাজার ব্যক্তির সংগে কথা বলে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছে। সে রিপোর্টে দেখা যায়, বৃটেনের এক চতুর্থাংশ মানুষ ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক জীবন যাপন করে। দুই তৃতীয়াংশ লিভ টুগেদার করে। (জং, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)

বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে নিয়মিত তালাক হচ্ছে। এসব তালাকের কারণে প্রতি মাসে সরকারী ব্যয় হচ্ছে ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড। এসব তালাকের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু সন্তানের সংখ্যা হচ্ছে প্রতিবছর দেড় লাখ। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী কয়েক বছরে তিন মিলিয়ন নারী পুরুষ তালাকের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ফলে পনের লাখ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (দৈনিক জং, ৬ই জুন, ১৯৯২)

পরিবার প্রথা বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে বৃটেনে অবৈধ সন্তানদের সংখ্যা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। ১৯৯১ সালে ২০ হাজার অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

সরকারী এক মতামত জরিপে দেখা গেছে, ১৯৯১ সালে ১ লাখ ৫৩ হাজার তালাক সংঘটিত হয়েছে। অবৈধ সন্তানের সংখ্যা শতকরা ২৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

নাক কানের লোমের ব্যাপারে সতর্কতা

রসূল (স.) নাক ও কানের লোম টেনে তুলতে নিষেধ করেছেন। কারণ টেনে তোলা হলে জখম হতে পারে। যদি বেশী বড় হয় তবে কেটে ফেলতে হবে।

ডাক্তার কিউরের গবেষণার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগের জীবাণু নাকের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। নাক তাদের নিরাপদ আশ্রয়। রাসূল (স.) নাক কানের লোম উপড়াতে নিষেধ করেছেন। কারণ নাকের লোমে জীবাণু আটকে যায়, দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। ওযুতে নাক পরিষ্কার করার সময়ে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। নাকের পশম টেনে তোলা হলে নাকে জখম হবে এবং তার মধ্য দিয়ে জীবাণু খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেহের ভেতরে প্রবেশ করার আশংকা থাকে।

সৎ মানুষের সংস্পর্শ

রসূল (স.) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করে দেখা দরকার সে কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে। (মোসনাদে আহমদ)

রসূল (স.) আরো বলেন, ভালো মজলিস এবং মন্দ মজলিসের উদাহরণ হচ্ছে সুগন্ধওয়ালা ব্যক্তির মতো। তুমি তার থেকে সুগন্ধ দ্রব্য কেনে নিবে, অথবা সে তোমাকে দান করবে অথবা তার কাছ থেকে সুগন্ধ আসতে থাকবে। পক্ষান্তরে কামারের কাছে থাকলে হাঁপরে ফুঁ দেয়ার সময় সে হয়তো তোমার পোশাক পুড়িয়ে দেবে, ন্যূনতম তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (বোখারী)

রসূল (স.) বলেছেন, মোমেন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। পরহেযগার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে খাবার খাওয়াবে না। (মোসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির আশেপাশে থাকবে সেও হয়তো জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। (বোখারী, মুসলিম)

বিখ্যাত একটি প্রবাদ রয়েছে, বন্ধু টেনে নিয়ে যায়।

একজন কবি বলেছেন, কোনো মানুষের কাছে তার মানসিকতা ও চাল-চলন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না; বরং তার বন্ধুর কাছে প্রশ্ন করো। কারণ বন্ধু বন্ধুর অনুসরণ করে। বলা হয়ে থাকে, মন্দ বন্ধু তার বন্ধুকে নিজের মতো করে নেয়। যে ব্যক্তি নামায আদায়কারীর সংগে বন্ধুত্ব করে সে নামাযী হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বাদশাহর সংগে বন্ধুত্ব করে সে বাদশাহ হয়। কোরআনে এরকম বহু আয়াত রয়েছে যেসব আয়াতে দুনিয়া আখেরাতে মন্দ মজলিস, অর্থাৎ খারাপ মানুষের সংস্পর্শের পরিণাম থেকে বান্দাদের সতর্ক করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় খণ্ড

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

প্রাতভ্রমণ ও ব্যায়াম

রসূল (স.) বাগানে ভ্রমণ করা পছন্দ করতেন। তিনি মাঝে মধ্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাগানে যেতেন। (মামুলাতে নববী, আদাবে জিন্দেগী)

সাহাবায়ে কেরামও এরকম কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। হাদীস গ্রন্থে এবং ইতিহাস গ্রন্থে এরকম বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামও মাঝে মাঝে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাগানে যেতেন।

সাহাবায়ে কেরাম সাধনাপূর্ণ জীবন যাপন করতেন, অলস সময় কাটাতেন না। তারা কখনো পরিখা খনন করতেন, কখনো জংগল থেকে কাঠ কেটে আনতেন, গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতেন, কূপ থেকে পানি তুলতেন, মাটির ঘর তৈরী করতেন, ঘরের কাজে স্ত্রীদের সহায়তা করতেন। এসব কাজ মুসলমানদের জন্যে ব্যায়ামের আওতায় বিবেচিত হতো। রসূল (স.) ক্লান্তি এবং সাঁতার কাটার মতো কাজও করেছেন বলে জানা যায়।

ব্যায়ামের উপকারিতা

ব্যায়ামের উপকারিতা কিছুতেই উপেক্ষা করার মতো নয়। যুবক বৃদ্ধ নারী পুরুষ সকলের জন্যেই ব্যায়াম বিশেষ উপকারী, স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক। বিশেষত যারা মস্তিষ্কের কাজ করেন তাদের জন্যে ব্যায়াম অপরিহার্য।

সকালের মুক্ত তাজা বাতাস সেবনের উদ্দেশ্যে পায়চারি মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। এ ছাড়া ব্যায়াম এবং পায়চারী হৃদপিন্ডের সজীবতা নিশ্চিত করে। (হেলন্ড এন্ড নিউ জেনারেশন)

ব্যায়াম করার ফলে দেহে ঘাম তৈরী হয়। দেহে প্রবেশ করা অনেক বিষাক্ত উপাদান এই ঘামের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। যদি এইসব বিষাক্ত উপাদান দেহ থেকে বের হতে না পারে তবে দেহে এসব বিষাক্ত উপাদান সঞ্চিত থাকে এবং নানাপ্রকার রোগ তৈরী হয়। এসব রোগের মধ্যে ক্যান্সারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মেডিটেশন (মোরাকাবা)

মেডিটেশন হচ্ছে ঐকান্তিক মনোযোগ এবং চিন্তাশক্তির একই জায়গায় সমন্বিত হওয়া। রসূল (স.) নবুওত পাওয়ার আগে হেরা গিরিগুহায় কয়েকদিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চিন্তাভাবনা এবং মেডিটেশন করতেন।

সমগ্রবিশ্বে ইসলামের বিস্তার মেডিটেশনেরই ফল।

এক ঘন্টার চিন্তাভাবনা ৬০ অথবা ৭০ বছরের অহংকার মুক্ত এবাদাতের চেয়ে উত্তম। (নুজহাতুল মাজালিছ)

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছিলেন; এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সামনে হেদায়াতের পথ খুলে দিয়েছিলেন।

আল্লাহর কুদরত এবং সৃষ্টিবৈচিত্র্য সম্পর্কে চিন্তাভবনা করো, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে না।

সূফীগণ ইসলামী জীবনে মানসিক শান্তির লক্ষ্যে মেডিটেশনকে যতোটুকু ব্যবহার করেছিলেন, সম্ভবত সেই উপায় ব্যতীত মানসিক শান্তি পাওয়ার অন্য কোনো সেরা উপায় থাকতে পারে না।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব শান্তির সন্ধান করছে। শান্তির জন্যে আরাম আয়েশের উপকরণ এবং নানারকম ওষুধ ব্যবহার করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কোনো উপকরণের মধ্যে শান্তি রাখেননি বরং আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই শান্তি রেখেছেন। যারা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকে এবং আউলিয়ায়ে কেরামদের রীতি অনুযায়ী মেডিটেশন করে, তারা সব সময় শান্তিতে থাকে এবং শান্তিতে থাকবে।

মেডিটেশন হাউস

বস্তুগত জীবনের চরম উন্নতির পর বর্তমানে শান্তির সন্ধানে ইউরোপ আত্মিক জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। এ উদ্দেশ্যে ইউরোপের বড়ো বড়ো শহরে মেডিটেশন তথা মেডিটেশনহাউস স্থাপন করা হয়েছে। অস্থির চিত্তের মানুষরা সেখানে ডলার পাউন্ডের বিনিময়ে শান্তির সন্ধানে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলছে। তারা চোখ বন্ধ রেখে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল করে পার্থিব জীবনের সকল চিন্তা ভুলে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ উচ্চারণ করছে। (মাওয়ায়েয)

নামায কি মেডিটেশন নয়? খুশু খুজু কি মেডিটেশন নয়? আল্লাহর স্মরণ, তাঁর ধ্যান কি মেডিটেশন নয়? আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা কি মেডিটেশন নয়? ইসলামের সকল বিধান মেডিটেশন এবং প্রশান্তির অন্য নাম।

ইউরোপ এবং ইউরোপীয় জীবন বস্তুগত উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে অশান্তির তিক্ততা অনুভব করেছে। বর্তমানে শান্তির সন্ধানে তারা ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রতি প্রত্যাবর্তন করছে। এ সম্পর্কে আধুনিককালের গবেষণা সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

চিকিৎসায় মেডিটেশন

মেডিটেশনের আরেক নাম হচ্ছে একাগ্রতা। মেডিটেশন শব্দ শোনার সংগে সংগে মানুষের মনে ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কে চিন্তা জাগ্রত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে মেডিটেশনের অর্থ ব্যাপক। উন্নত দেশসমূহে মেডিটেশন মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার বড়ো সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মেডিটেশনকে দেহমনের একত্র সমন্বয় বলা যেতে পারে। যারা উচ্চ রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত, তারা মেডিটেশনের মাধ্যমে এ রোগ দূর করতে বহুলাংশে সফল হয়েছে। আমেরিকায় দুশ্চিন্তাগ্রস্তদেরকে ওষুধ ব্যবহার করানোর চেয়ে মেডিটেশনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এর একটা কারণ

www.nagorikpathagar.org

এটাও যে, বর্তমানে চিকিৎসা ব্যয় অত্যধিক। মেডিটেশনের মাধ্যমে চিকিৎসায় আগ্রহ এবং প্রবণতা উন্নয়নশীল দেশসমূহেও ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, উন্নত বিশ্বে এ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মেডিটেশন নিজের সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা সৃষ্টি করার প্রশিক্ষণ দেয়। এ ব্যাপারে কমপক্ষে আধা ঘন্টা নিজেকে কোনো একটি বিষয়ে মনোযোগী রাখা কল্যাণকর। এ সময়ে একটি শব্দ বা বাক্য বারবার আওড়াতে হবে। এরফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হবে এবং রক্তচাপ কমে যাবে, নিজের মনে প্রফুল্লভাব সৃষ্টি হবে, নিজেকে স্বাধীন মনে হবে। একই সময়ে অন্তরে অনুভূত হবে গভীর প্রশান্তি যেন, আপনি শান্তির সময় পেরিয়ে এসেছেন।

মেডিটেশনের সুফল

মেডিটেশন মানুষের মধ্যে সজীবতার অনুভূতি তৈরী করে। কিছুসংখ্যক মানুষ দাবী করেছেন যে, মেডিটেশন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেডিটেশন সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তারা বিস্ময়করভাবে সফলতা লাভ করেছেন। কিছু সময়ের ধ্যানমগ্নতা তাদের মনে সুস্থতার অনুভূতি জাগ্রত করে, এবং তারা বেশীদিন বেঁচে থাকার চিন্তা মনে পোষণ করে।

মেডিটেশনের মূলনীতি হচ্ছে যে, শান্তিপূর্ণ মস্তিষ্ক মানুষের দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখে। মেডিটেশন সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের মতে, মেডিটেশনের মাধ্যমে জীবন যাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করা যায় এবং এর ফলে শারীরিক অসুস্থতা দূর হয়, যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়, পানাহারে অরুচি দূর হয়, প্রস্রাবের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়, কোলেস্টরেল বৃদ্ধি রোধ হয়, নেশার অভ্যাস দূর হয়, মানসিক চাপ কমে যায় এবং ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আত্মিক পথপ্রদর্শন

আপনি যখন স্বভাবের কাছাকাছি পৌছে যাবেন, তখন আপনি এক বিশেষ রকমের আনন্দ অনুভব করবেন। এই আনন্দ হচ্ছে আত্মিক আনন্দ, এই আনন্দ অনুভূতি হলে আত্মিকভাবেই পথনির্দেশ পাওয়া যায়।

কিভাবে মেডিটেশন (মোরাকাবা) করবেন

মেডিটেশন আপনাকে শিক্ষা দেয় যে, নানাপ্রকার মানসিক চাপের মধ্যে মস্তিষ্ক এবং দেহ কি ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। মানুষকে চেয়ারের ওপর অথবা মেঝেতে সোজা হয়ে বসতে হবে। নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং বর্জনের সময় তাকে নিজের দেহ মনের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ভয় এবং অসন্তুষ্টির অবস্থায় মানুষের মনের অবস্থা কেমন হয় সেটাও সে অনুভব করতে পারে। মেডিটেশনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বাকসংযম সৃষ্টি হয় এবং হাসির মাত্রা কমে যায়। পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই এ রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মেডিটেশনের মাধ্যমে মানুষ ঝগড়া বিবাদ কলহ কোন্দল থেকে দূরে থাকে। ক্রোধে ক্ষেপে যাওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

www.nagorikpathagar.org

পায়চারির মাধ্যমে মেডিটেশন

ধীর পায়ে পায়চারি করুন। সামনের দিকে কমপক্ষে ২০ ফুট পথ অগ্রসর হবেন। এ সময়ে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এ সময়ে আপনার পা তোলায় এবং পা ফেলায় যে অনুভূতি মনে জাগে, সে অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য করুন। এ সময়ে আপনি চুপচাপ থাকুন। এরকম মেডিটেশনের মাধ্যমে আপনার উচ্চ রক্তচাপ কমে যাবে।

উৎকৃষ্ট মেডিটেশন (মোরাকাবা)

সকল কাজের ক্লান্তি অবসন্নতা এবং মানসিক চাপ কমানোর জন্যে আল্লাহু আকবর অথবা ইয়া কাইউমু অথবা আল্লাহ তায়ালা দয়া করো উচ্চস্বরে বা নীচুস্বরে, নীরবে অথবা ক্রমাগত পনের মিনিট পাঠ করবে। এই আমল দিনে কয়েকবার করবে। এই আমলের ফলে দেহের সকল কার্যক্রম স্থিতিশীল হয়ে যাবে এবং আপনি সারাদিন উৎফুল্ল অবস্থায় থাকবেন।

কল্পিত মেডিটেশন (মোরাকাবা)

শারীরিক পরিবর্তন আনার জন্যে এবং রক্তচাপ কমানোর জন্যে, ক্যান্সার প্রতিরোধ করার জন্যে আপনি এ রকম চিন্তা করবেন যে, একটি সাদা আলো আপনার মাথা থেকে পায়ের দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ সময় এ রকম অনুভূতি মনে সৃষ্টি করবেন যে, এই সাদা আলো আপনার দেহের ভেতরের সব জিনিসকে বিগলিত করছে। এ ছাড়া আপনি একথাও মনে করবেন যে, মানসিক চাপ একটি উপাদান হিসেবে আপনার আংগুল এবং আপনার পায়ের তালু থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাসকে একটি স্বাস্থ্যকর আমল মনে করবেন এবং মনে করবেন যে প্রতিটি নিঃশ্বাস আপনাকে সুস্থতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আপনি কি রকমের মেডিটেশন করবেন সেটা কোনো বিষয় নয়। অনেকে কয়েকদিন মেডিটেশন করার পর মেডিটেশন ত্যাগ করেন। এতে মেডিটেশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আপনাকে একটি বিষয়ে আপনার চিন্তা কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে। সেই চিন্তায় পরিবর্তন হতে থাকবে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করবেন যেন আপনার চিন্তা একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত থাকে। এ উদ্দেশ্যে অনেকে বছরের পর বছর মেডিটেশন করেন। মেডিটেশনের মাধ্যমে জীবনকে শান্তিপূর্ণ করা যায়। সুষ্ঠুভাবে মেডিটেশ সম্পন্ন করার জন্যে যথাযথভাবে মেডিটেশনের শিক্ষা করতে হবে। নামায হচ্ছে মেডিটেশনের উৎকৃষ্ট প্রাথমিক অবস্থা।

মেডিটেশনের (মোরাকাবা) কয়েকটি নিয়ম

১. বিছানার ওপরে অথবা চেয়ারের ওপরে প্রথমে আরাম করে বসবেন। কোমর সোজা রাখবেন। প্রচণ্ড ঘুম না এলে শয্যা গ্রহণ করবেন না। এ সময়ে ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করবেন।

২. চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ গভীরভাবে নিঃশ্বাস নেবেন। নিজের মনকে বুঝাবেন যে, এই বিশ মিনিট সময় একান্তই আপনার নিজস্ব।

www.nagorikpathagar.org

৩. দেহকে আরামে রাখবেন এবং মানসিকভাবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জরিপ করবেন। বিশেষত বুক ঘাড় এবং চেহারার কোষের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। প্রতিটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় খেয়াল করবেন যে, এর ফলে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থতা লাভ করছে।

৪. প্রতি মুহূর্ত নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এ সময় আপনি যে মেঝেতে বা চেয়ারে বসে আছেন, সেকথা চিন্তা করবেন এবং আপনার দেহ যে পরিহিত পোশাকের স্পর্শ পাচ্ছে সেকথা চিন্তা করবেন।

৫. নিজের চিন্তাকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত রাখবেন। মেডিটেশনের সময়ে উপরের ১ নং বা ২ নং পদ্ধতির যে কোনো পদ্ধতি আত্মস্থ করা যায়। এ সময়ে ধীরস্থির ভাবে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত নিঃশ্বাস গুণবেন, তারপর ১০ থেকে ১ পর্যন্ত গুণবেন।

৬. চুপচাপ বসে থাকবেন। কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করবেন না। যদি কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে হয় এবং যদি আপনি কষ্ট অনুভব করেন, তবে ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করবেন। নিজের মনোযোগ একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করবেন। এই মেডিটেশনে ওপরে উল্লেখিত ১ নং এবং ২ নং মেডিটেশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

৭. তন্দ্রার মোকাবিলা করবেন। কোমর সোজা রাখবেন। কোমর আলগা রাখবেন, কোনো কিছুর সংগে কোমর ঠেকাবেন না। কিছুতেই যেন ঘুম না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

৮. মেডিটেশন করার সময় ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রাখবেন। এতে বুঝা যাবে মেডিটেশনে কতোটা সময় ব্যয় হয়েছে। যতোটুকু সময় আপনি মেডিটেশনে ব্যয় করতে চান সেই সময় অতিবাহিত হয়েছে কি না।

৯. ধীরে ধীরে নিজের দেহ স্পন্দিত করবেন। প্রথমে পা তারপর বাহু নাড়াবেন। তারপর ধীরে ধীরে পা এবং বাহু প্রসারিত করবেন।

মেডিটেশন সংক্রান্ত জরুরী পরামর্শ

১. খালি পেটে মেডিটেশন করবেন।

২. ঘুম থেকে উঠার পর মেডিটেশনের উৎকৃষ্ট সময়।

৩. তন্দ্রাভাব দূর করার জন্যে মেডিটেশন শুরুর আগে হাত মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন।

৪. মেডিটেশনকে কষ্টকর কাজ ভেবে করবেন না; বরং খুশী মনে মেডিটেশন করবেন।

৫. হালকা হামদ ও নাতের মতো গজলের সুরেলা পরিবেশে মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে মেডিটেশন করবেন। সুগন্ধি মেডিটেশনের জন্যে বিশেষ সহায়ক।

www.nagorikpathagar.org

৬. যে সময় দেহে অস্বস্তি বোধ হয়, দেহ ম্যাজ ম্যাজ করে সে সময় মেডিটেশন করবেন। এ সময় যোগব্যায়াম করার পরও মেডিটেশন করা যাবে।

৭. মেডিটেশ শেষ করার সময় পর্যন্ত মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেবেন। যদি পনের বিশ মিনিট একত্রে বেশী মনে হয় তবে, পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে মেডিটেশন শুরু করবেন।

নিয়মিত মেডিটেশন চালিয়ে যাবেন। মেডিটেশনের সফলতার বিভিন্ন পদ্ধতি পরীক্ষা করবেন। যদি এ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় তবে, তার কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। (ডাক্তার খালেদ মাহমুদ)

কোমর ব্যথা নিরাময়ে

চাটাইয়ের ওপর, মাটিতে বিছানা বিছিয়ে এবং শক্ত জায়গায় শয়ন করা রসূল (স.)-এর সুন্নত। একজন লোক বলেছিলো, আমার কোমরে ছিলো প্রচণ্ড ব্যথা, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই ভালো হচ্ছিলো না। অবশেষে আমি মাটিতে বিছানা পেতে শুতে শুরু করলাম। এর ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমার কোমরের ব্যথা নিরাময় হয়ে গেলো।

টাচ থেরাপি

ইসলামে নারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায়। সন্তানের মাথায় যেন হাত বুলায়। সন্তানকে যেন মমতার চুম্বন দেয়। নিজের হাতে সন্তানের মলমূত্র পরিষ্কার করে। কিছুটা বড়ো হওয়ার পর নরম খাবার খেতে দেয়। এসব কাজের মাধ্যমে শিশুর দেহ ক্রমাগত মায়ের স্পর্শ লাভ করে। ইউরোপের শিশু সন্তানরা এ রকম মাতৃস্নেহ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কারণ, তাদের শিশু সন্তান লালন পালনের ব্যবস্থা করা হয় ডে কেয়ার সেন্টারে। সেখানে শিশু কিছুতেই মায়ের আদর যত্ন স্নেহ ভালোবাসা পায় না। অথচ মুসলিম মহিলাদের সন্তানরা এ রকমের সুবিধা লাভে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে লক্ষ্য করুন।

শিশুর দেহে মায়ের ছোঁয়া বা স্পর্শের গুরুত্ব বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক মনস্তত্ত্ববিদ সাউল সেনবার্গ বলেছেন, ইঁদুরের নবজাত শাবককে মা থেকে আলাদা অবস্থানে রাখার ফলে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি থেমে গেছে। কারণ, মায়ের স্পর্শের মাধ্যমে ইঁদুর শাবক এক প্রকার হরমোন লাভ করেছিলো, কিন্তু মায়ের স্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার ফলে ইঁদুর শাবকের হরমোন প্রাপ্তি থেমে গেছে। তারপর সেসব ইঁদুর শাবককে ব্রাশ দিয়ে আদর দেয়া হয়েছে, তাদের দেহ মুছে দেয়া হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, ব্রাশের স্পর্শ মায়ের আদর সোহাগের মতো হওয়ার কারণে ইঁদুর ছানাদের দেহের হরমোনের ঘাটতি পূরণ হয়েছে এবং তাদের দেহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, টাচ থেরাপির মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। দেহে ইনসুলিনের মতো হরমোন তৈরী হয়। ইনসুলিন বৃদ্ধির কারণে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং

www.nagorikpathagar.org

শাবকরা দ্রুত দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি অর্জন করে। যেসব নবজাতককে ম্যাসাজ করা হয়, তাদের দেহে হরমোন গ্রহণের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারত উপমহাদেশে নবজাতক এবং কম বয়েসী শিশুদের দেহ মালিশ বা ম্যাসাজ করার রীতি বহুকাল যাবত প্রচলিত রয়েছে। প্রতিটি এলাকায় মা, দাদী, নানী, ধাত্রী আয়া প্রমুখ এ কাজ করে থাকে। বহু শত বছর পর সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান এই ম্যাসাজের উপকারিতার কথা স্বীকার করেছে।

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইনফেন্ট ম্যাসাজের এক কর্মকর্তা বলেছেন, আমি জেনে অবাক হইনি যে, মস্তিষ্কের গবেষণায় স্পর্শের শক্তি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, যেসব পিতামাতা আমার কাছ থেকে ম্যাসাজে প্রশিক্ষণ লাভ করেন, তাদের কাছ থেকে ম্যাসাজ সম্পর্কে আমি যেসব তথ্য পেয়েছি এর দ্বারা শিশুদের যে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি, প্রমাণ হিসেবে সে তথ্যই আমার জন্যে যথেষ্ট।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুদের ওপর টাচ থেরাপি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। স্পর্শ দ্বারা তাদের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের পিতামাতারা নিয়মিত তাদের সন্তানদের ম্যাসাজ করেন। সমাজে প্রচলিত এই রীতি বুঝতে বিজ্ঞানের ৭শত বছর সময় লেগেছে। (চাইল্ড কেয়ার ফর ইউনিভার্সাল)

ন্যাচারাল থেরাপি

ক্যামিকেল এবং বিষাক্ত উপাদানের পর বিজ্ঞান স্বভাবধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। সাদাসিধেভাবে জীবন যাপন করাই হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাপন। ন্যাচারাল থেরাপির কয়েকটি দিক রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পারফিউম থেরাপি।

পারফিউম থেরাপি

জার্মানীর ডাক্তার এলফ পারফিউম থেরাপি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছেন এবং বহু লোক এতে উপকৃত হয়েছেন। ডাক্তার এলফের বক্তব্য অনুযায়ী সুগন্ধি একটি সূক্ষ্ম জিনিস আবার রুহও সূক্ষ্ম জিনিস। কাজেই কেউ যখন সুগন্ধি ব্যবহার করে তখন এর প্রভাব পড়ে রূহের ওপর। রূহের সজীবতায় দেহও সজীব হয়ে উঠে।

রাজপ্রাসাদে অনেক সময় সুগন্ধি কাঠ পুড়িয়ে ধূনি দেয়া হয়। রাজপ্রাসাদে কেউ অসুস্থ হলেও সুগন্ধি কাঠ পুড়িয়ে ধূনি দেয়া হয়। সেই সুগন্ধির প্রভাবে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

রসূল (স.) রাইহানের সুগন্ধি পছন্দ করতেন। রাইহানের সুগন্ধি পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগের উপকার করে। যেসব রোগীর সব সময় উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তাদের জন্যেও রাইহানের সুগন্ধি অত্যন্ত উপকারী। যাদের পাকস্থলীতে আলসার হয় তাদের জন্যেও রাইহান খুবই উপকারী।

মনে রাখতে হবে যে, সুগন্ধি জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আপনি যদি এমন জায়গায় উপস্থিত হন যেখানে চারদিকে সুবাস সুগন্ধি ছড়িয়ে থাকে, তখন

www.nagorikpathagar.org

আপনার মন মেযাজ প্রফুল্লতায় ভরে উঠবে। কিন্তু দুর্গন্ধময় কোনো জায়গায় গেলে কেমন হবে? আপনার মন ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠবে। বমি আসতে শুরু করবে।

সুগন্ধি এবং দুর্গন্ধের প্রভাব জীবনের উপর গভীরভাবে পড়ে। এ কারণে রসূল (স.) প্রতি শুক্রবার জুমার দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করার জন্যে বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন। জুমার দিনে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে জুমার নামায আদায় করার জন্যে সমবেত হয়। সুগন্ধি উপস্থিত সকলের মনমেযাজ আমোদিত করে দেয়। আওদ এবং মেশকের সুগন্ধিও দেহ মনকে প্রফুল্ল করে। যারা এই সুগন্ধি ব্যবহার করবে তারা সব সময় সজীব এবং প্রাণবন্ত থাকবে। (ফেতরি এলাজ)

রসূল (স.) কিভাবে হাঁটতেন

হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) চলার সময়ে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পা ফেলতেন। তার হাঁটার সময় মনে হতো তিনি যেন উপর থেকে নীচের দিকে নামছেন। (নাশরুত তীব)

রসূল (স.)-এর চলার সময় পায়ের গোড়ালীতে দেহভার অধিক রাখতেন। এভাবে চলার যেসব উপকারিতা রয়েছে সেসব নিম্নরূপ-

১. ডাক্তার কলিম খান দীর্ঘ গবেষণার পর লিখেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে চলবে সে কখনো দেহের জোড়া ব্যথায় আক্রান্ত হবে না।

২. এভাবে চলার জন্যে প্রথমে অভ্যাস করতে হবে তারপর চলতে হবে। এভাবে পথ চললে দীর্ঘ পথ হাঁটার পর ক্লান্তি আসবে না।

৩. ইউরোপীয় পর্যটকদের রচিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, যদি আপনি দীর্ঘ পথ সফর করতে চান, তবে পায়ের গোড়ালীর উপর জোর দিয়ে পথ চলুন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটবেন।

৪. যারা এভাবে হাঁটে তাদের চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়।

৫. দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝরঝরে থাকে এবং কোনো প্রকার অস্থিরতা অনুভব হয় না।

৬. আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যাদেরকে আমি এভাবে চলার বা দৌড়ানোর পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তাদের অধিকাংশ ছিলো খেলোয়াড়। তারা সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে।

৭. রসূল (স.) পায়ে হেঁটেও পথ চলতেন, ঘোড়ায়ও আরোহণ করতেন। হাদীসের আলেমগণ পরামর্শ দিয়েছেন, যারা ঘোড়ায় চলাচল করে তারা কিছু পথ ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হাঁটা উচিত। বর্তমানে আমরা পায়ে হাঁটার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অথচ ইউরোপের জনগণ যতোটা সম্ভব পায়ে হেঁটে পথ চলাকে প্রাধান্য দেয়।

পা আগে সৃষ্টি হয়েছে নাকি চাকা আগে তৈরী হয়েছে?

পায়ে হাঁটা সুন্নত। এই একটা সুন্নত ত্যাগ করার ফলে কি কি ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে?

www.nagorikpathagar.org

আমার পিতা পায়ে চলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। একজন লোক তাকে দেখে বললেন, হাকিম সাহেব আপনাকে আমি প্রায়ই পায়ে হাঁটতে দেখি। আপনি দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে চলাচল করেন কেন? আমার পিতা প্রশ্নকারীকে জানালেন, পায়ে হাঁটা স্বাস্থ্যকর। সে ব্যক্তি বললেন, হাঁ আমার এক বন্ধু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। লাহোর হাসপাতালে ভর্তি হলো। সেখানের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞগণ বললেন, আপনি করাচী চলে যান। করাচীতে কিছুদিন চিকিৎসা করা হলো। কোনো উন্নতি না হওয়ায় ডাক্তাররা তাকে লন্ডন যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। লন্ডনের ডাক্তাররা পুরোপুরি চেক আপের পর বললেন, আপনাকে আমেরিকা যেতে হবে। সেখানে কার্ডিয়াক হাসপাতালে চিকিৎসা নিলে আপনি সুস্থ হতে পারেন। আমার বন্ধু আমেরিকায় গেলেন। সেখানে পৌঁছার পর লক্ষ্য করলেন যে, হাসপাতালের প্রধান ফটকে লেখা রয়েছে, পা আগে সৃষ্টি হয়েছে নাকি চাকা আগে তৈরী হয়েছে? সেখানে আমার বন্ধু চিকিৎসা করাতে লাগলেন। যথেষ্ট উন্নতিও হলো। ডাক্তাররা তাকে বললেন, আপনি প্রতিদিন কিছু পথ হাঁটবেন। আপনার রোগের এটাই হচ্ছে চিকিৎসা।

এটা স্পষ্ট যে, পা আগে সৃষ্টি হয়েছে, তারপর চাকা তৈরী হয়েছে বা আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে সর্বত্র হুইল বা চাকার ব্যবহার। আল্লাহর ভরসা না করে বর্তমানে আমরা চিকিৎসার উপর অধিক ভরসা করি। আমরা রোগের কারণ চিন্তা করতে চাই না। একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, নেক আমল যারা করে না তারা পায়ের চেয়ে চাকার ব্যবহার বেশী করে। হুইল বা চাকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাইকেল থেকে উড়োজাহাজের উদাহরণ পর্যন্ত দেয়া যায়।

একজন বাদশাহ সব সময় সুস্থ নীরোগ থাকতেন। অন্য দেশের বাদশাহ এই বাদশাহর সাথে এক সাক্ষাৎকালে তার নীরোগ থাকার রহস্য জানতে চাইলেন।

সুস্থ বাদশাহ বললেন, আমার পা হচ্ছে আমার চিকিৎসক। আমি তাদের সেবা গ্রহণ করি। যখন আমি হাঁটি তখন আমার পা চলে। পা যখন চলে তখন সারা দেহে প্রশান্তি এবং তৃপ্তি অনুভব করি।

সাঁতার

রসূল (স.) সব সময় সাদাসিধে এবং সাধনাপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। সাধনার মাধ্যমে তিনি নিজের শক্তি নিরাপদ রাখতে এবং শক্তি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করতেন। সাঁতারের ব্যাপারেও অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কারণ, সাঁতার দেয়া হলো দেহের উত্তম ব্যায়াম সম্পন্ন করা।

একবার একটি পুকুরে রসূল (স.) এবং কয়েকজন সাহাবা সাঁতার দিচ্ছিলেন। তিনি সাঁতার দেয়া সাহাবাদের মধ্যে জোড়া বেঁধে দিয়ে বললেন, প্রত্যেকে তার বিপরীত ব্যক্তির কাছে সাঁতার দিয়ে পৌঁছাবে। রসূল (স.)-এর বিপরীত ব্যক্তি হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

মনোনীত হন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। রসূল (স.) সাঁতার দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে পৌঁছে তাঁর ঘাড় চেপে ধরলেন। (মেশকাত, আদাবে জিন্দেগী)

রসূল (স.)-এর সকল কাজের মধ্যেই অসংখ্য বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসামূলক, মনস্তাত্ত্বিক এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উপকারিতা নিহিত ছিলো। সাঁতার সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা নীচে উল্লেখ করা হলো।

খেলাধূলার ক্ষতি

ইসলামে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্যে খেলাধূলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রসূল (স.)-এর জীবনে এ ধরনের খেলাধূলা, ক্রীড়া কৌতুকের উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। রসূল (স.) সাঁতার দিয়েছেন, দৌড়ে অংশ নিয়েছেন, ঘোড় দৌড়ে অংশ নিয়েছেন, কুস্তি লড়েছেন, তীরন্দাজি করেছেন, বাগানে ভ্রমণ করেছেন। এসব বিষয়ে বহু রকমের ইসলামী এবং জেহাদী গুণাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে। সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শরীয়তী ব্যবস্থার বিন্যাসও এসব কিছুর উদ্দেশ্য।

ইসলাম কোনো বন্দী জীবনের নাম নয়, ইসলাম জোরজবরদস্তি কঠোরতার ধর্মও নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে একটি নিয়মতান্ত্রিক ধর্মবিশ্বাস। ইসলামের অনুসারীরা এসব নিয়ম যখন মেনে চলবে, তখন তারা সাফল ও উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণে সক্ষম হবে। বর্তমানে আমরা স্বাস্থ্য ও সুস্থতা লাভের জন্যে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যেসব খেলাধূলার আয়োজন আমরা করে থাকি– এসব কিছুর পরিণাম কি হবে? এ সম্পর্কে ইউরোপীয় দার্শনিকদের কিছু বক্তব্য নীচে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ডাক্তার এডসানের মতে, বর্তমান ক্রীড়া ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং জিমখানা, ক্লাবের মাধ্যমে যে রকম নগ্নতার প্রসার ঘটেছে এবং যেসব দুরারোগ্য ব্যাধির বিস্তার ঘটেছে, অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে এতোটা ঘটেনি। এসব অশ্লীলতা নগ্নতা এবং রোগব্যাধির বিস্তারে খেলোয়াড়দের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

যদি আমরা এর প্রতিকার চাই তবে আমাদের এমন সব খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে, যেসব খেলাধূলা ঘরের ভেতর সম্পন্ন হয় এবং খেলোয়াড়দের দেহ যেন অনাবৃত না থাকে। (মাসিক রাবেত)

বর্তমান খেলাধূলায় ক্ষয়ক্ষতি

হযরত আলী মুরতাজা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেন, হে আলী তুমি তোমার উরু অন্যের সামনে প্রকাশ করবে না। আর তুমি কোনো জীবিত বা মৃতের উরু বা রানের দিকে তাকাবে না। (মেশকাত, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

বর্তমানে আমাদের সমাজে ফুটবল, হকি, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলাধূলার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলায় যেসব পুরুষ এবং নারী অংশগ্রহণ করে থাকে রসূল (স.)-এর উপরোক্ত হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে। যারা ওদের নগ্ন উরু দেখে তারাও পাপে লিপ্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখা নিষিদ্ধ। কুস্তি এবং অন্যান্য খেলায় নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত করা বা কাউকে দেখানো শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা মানব দেহের এই অংশ ছতরের অন্তর্ভুক্ত।

দুঃখের বিষয় ফুটবল এবং অন্যান্য খেলায় বহু দ্বীনদার ব্যক্তিও নারীদের ইযযত আব্রুর কথা ভুলে যান। মোটকথা যে কোনো খেলাতেই নারী পুরুষের ছতরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। এতে আমরা আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাবো।

রসূল (স.)-এর অভিশাপ

হযরত হাসান বসরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রসূল (স.) তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন যারা মন্দ দৃষ্টিতে তাকায় এবং যাদের প্রতি মন্দ দৃষ্টিতে তাকানো হয়। (বায়হাকী)

মোটকথা যারা নিজেদের ছতর খুলে রাখে এবং যারা তা দেখে এই শ্রেণীর সকর পুরুষ নারীই রসূল (স.)-এর অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত।

সংগীতের অপকারিতা ঃ রসূল (স.) বলেছেন, সংগীত অন্তরে নেফাক সৃষ্টি করে ঠিক যেমন পানি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে রসূল (স.) বলেন, গান হচ্ছে শয়তানের কণ্ঠস্বর। (আল হাদীস)

সংগীত রূহের শাস্তি ঃ সংগীত বা গান হচ্ছে শয়তানের একটি সূক্ষ্ম জাল। এই জালে শয়তান দুনিয়ার মানুষদের খুব সহজেই পথভ্রষ্ট করে। কারো কারো কাছে সংগীত হচ্ছে রূহের খাদ্য। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা হবে। কিন্তু আমি মনে করি সংগীত রূহের খাদ্য নয় বরং রূহের শাস্তি। মাদারি যেমন ডুগডুগি বাজিয়ে বানরের খেলা দেখায়, বানরকে নাচায় এবং মানুষকে বেকুব বানিয়ে পয়সা আদায় করে- ঠিক তেমনি সংগীতের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। শয়তান সংগীতের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেয় দেখো এরা হচ্ছে সেই জাতি যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ উম্মত মনে করে, সৃষ্টির সেরা জীব মনে করে। এই শ্রেষ্ঠ জাতিকে আমি কিভাবে নির্বোধ বানিয়ে দিচ্ছি।

নেফাকের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সংগে। উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত নেফাকের অর্থ এটাও হতে পারে যে, কেউ যদি সংগীতের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তবে তার দ্বীন দুনিয়া জাহির বাতেনের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হবে। অন্য কথায় সে ব্যক্তি দ্বীনী কাজের ক্ষেত্রে দূরে চলে যাবে। হাদীস বিশারদরা নেফাকের অন্য ব্যাখ্যায় বলেছেন, সংগীতের সংগে যুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু নেফাকের মধ্যে সম্পন্ন হবে। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে ভালো জানেন।

যে কোনো রোগের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে অসুস্থ কোনো ব্যক্তি তার অসুস্থতাকে কোনোপ্রকার গুরুত্বই দেয় না। পাপের চূড়ান্ত পর্যায়, ধ্বংসাত্মক পর্যায় হচ্ছে মানুষ পাপ করবে কিন্তু পাপকে পাপই মনে করবে না বরং পাপ করার পর গর্ব প্রকাশ করবে। আমাদের দেশে বর্তমানে এক শ্রেণীর প্রগতিশীল এবং আধুনিক মনস্কতার

www.nagorikpathagar.org

দাবীদার মানুষ নাচ গানকে পাপ মনে করে না। তারা নাচগানকে শিল্প সংস্কৃতি ক্রীড়া কৌতুক নামে অভিহিত করে। তারা গান নাচ ইত্যাদি শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপকে রূহের খাদ্য নামে অভিহিত করে।

ফয়সালাবাদের সফর

আমাকে একবার মুলতান থেকে ফয়সালাবাদ পর্যন্ত গাড়ীযোগে একজন রোগী দেখতে যেতে হয়েছিলো। আমাকে সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসতে দেয়া হলো। আমরা রওয়ানা হলাম। ঝাং-এর কাছে প্রচুর বৃষ্টিপাতে রাস্তা কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিলো। সেখানে একটি সেতু ছিলো। সেতুর দুই পাশে প্রচুর পানি জমে গিয়েছিলো এবং একটি বাস সেতু থেকে গড়িয়ে পানিতে পড়েছিলো। আমাদের গাড়ী সেতুর কাছে পৌছেই পিছলাতে শুরু করলো। ড্রাইভারকে বললাম, এটা কি হচ্ছে? ড্রাইভার বললো, গাড়ী পিছলে যাচ্ছে, আমার কিছু করার নেই। সামনে দোকানদাররা চিৎকার করতে লাগলো যে, মরে গেলো, মরে গেলো। গাড়ী পানিভর্তি একটি খাদের দিকে যাচ্ছিলো, কিন্তু সেই গাড়ী খাদের কাছে পৌছেই থেমে গিয়ে এক ধাক্কায় সেতুর উপর উঠে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলো। আল্লাহর রহমতে গাড়ী এবং আমরা সবাই নিরাপদ ছিলাম। বহু লোক সেখানে সমবেত হলো। কেউ বুঝতে পারছিলো না যে, গাড়ী পানি ভরা খাদে না পড়ে কিভাবে ফিরে এসে সেতুর উপর উঠে পড়লো। এই কাজ কে করেছে? আমরা যারা সে গাড়ীর যাত্রী ছিলাম আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছিলাম যে, সুন্নতি তরিকায় সফরের কারণে আমরা নিশ্চিত এক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলাম। আল্লাহ তায়ালা তার রসূলের তরিকা অনুযায়ী চলার মাধ্যমে আমাদেরকে দুই জাহানের কামিয়াবী দান করুন।

রাতের সফর

১৯৮০ সালে আমি ভাওয়ালপুরে চাকরি করছিলাম। এক রাতে খবর পেলাম যে, আমার পিতা রাজেনপুরে গুরুতর অসুস্থ। আমি যেন খুব শীঘ্র সেখানে পৌছি। আমি সেই রাতে সপরিবারে রওয়ানা হলাম। সফরের শুরুতে সকল দোয়া দরূদ পাঠ করলাম। খানপুরের কাছে পৌছে দেখি সড়ক ভাঙ্গা এবং সংকীর্ণ। গাড়ী সেই সড়ক অতিক্রম করতে যথেষ্ট সময় নিচ্ছিলো। এক জায়গায় আমার গাড়ী ট্রাক এবং বাসের মাঝখানে আটকে গেলো। ড্রাইভারদের অনেক অনুনয় বিনয় করলাম, কিন্তু কে শোনে কার কথা। ট্রাক ড্রাইভার আমার গাড়ীর উপর প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে ভীষণ জোরে শব্দ হলো। শিশুরা চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে বাসওয়ালা ট্রাকওয়ালা তাদের গাড়ী নিয়ে পালিয়ে গেলো। আমি গাড়ী থেকে নীচে নেমে গাড়ী পরীক্ষা করলাম, গাড়ীতে আঁচড় লাগা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি হয়নি। গাড়ীতে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করতেই গাড়ী স্টার্ট নিলো এবং আমরা ভালোভাবে গন্তব্যে পৌছে গেলাম।

এতো বড়ো দুর্ঘটনা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রসূল (স.)-এর সুন্নতের উপর আমল করার কারণেই রক্ষা করেছেন সন্দেহ নেই।

www.nagorikpathagar.org

পাহাড়ী সফর

কয়েক বছর আগে এক সফরে আমি এক পাহাড়ে আরোহণ করছিলাম। প্রতি কদমে রসূল (স.)-এর বর্ণিত তরিকা অনুযায়ী আল্লাহু আকবার বলছিলাম। সফরটি ছিলো বিপজ্জনক। কারণ, পাহাড়ের নীচে সিন্ধু নদী প্রবাহিত হচ্ছিলো। বৃষ্টির কারণে পথ ছিলো পিচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলো এক বৃদ্ধ পাঠান। সেই পাঠান ছিলো সবার আগে এবং উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলছিলো।

হঠাৎ বৃদ্ধ পাঠানের পা পিছলে গেলো এবং সে পাহাড় থেকে নীচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার গড়িয়ে পড়া আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম। নীচে সিন্ধু নদীতে ভেসে যাওয়া থেকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। হঠাৎ দেখি সেই পাঠান একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং পাহাড়ের মাটি আঁকড়ে রেখেছে। আমরা নীচে রশি ছুঁড়ে দিলাম। সেই রশি বেয়ে সে উপরে উঠে এলো। নীচে সিন্ধু নদী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

বৃদ্ধ পাঠানকে আমি পরীক্ষা করে দেখলাম তার দেহে সামান্য জখম ছাড়া আর কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। সে যথারীতি আমাদের সাথে সফর করছিলো। এভাবে বেঁচে গেলো কি কারণে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। পাঠান ঝটপট জবাব দিলো যে, আমি সুন্নতি তরিকা অনুযায়ী উপরের দিকে উঠছিলাম, এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আমাকে রক্ষা করেছেন।

শরীরে গুটি উঠা রোগ

ষোড়শ শতাব্দীর কথা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক টমাস সিডনের কাছে শরীরে গুটি উঠা এক রোগী এসেছিলো। ডাক্তার সিডন তাকে নানাভাবে চিকিৎসা করলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগ নিরাময় হলো না। তারপর ডাক্তার মাস সিডন রোগীকে লন্ডন থেকে একশত মাইল দূরে বড়ো একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঠিকানা লিখে দিয়ে সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। রোগী ঘোড়ায় আরোহণ করে একশত মাইল দূরে গেলো। কিন্তু সেই অরণ্য এলাকায় এ রকম কোনো চিকিৎসকের নামও কেউ শোনেনি বলে তাকে জানালো। অগত্যা রোগী লন্ডনে ফিরে এলো। টমাস সিডনের কাছে এসে রোগী বললো, কি রকম জংগলে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেখানে তো এ রকম নামের কোনো ডাক্তার নেই। টমাস সিডন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার রোগের খবর কি? রোগীও যেন তার রোগের কথা শুনে চমকে উঠলো। সে বললো, কিসের রোগ? টমাস সিডন বললেন, তুমি যে রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলে।

প্রকৃতপক্ষে ঘোড়ার পিঠে চড়ে একশত মাইল যাওয়া এবং একশত মাইল আসার কারণে রোগীর দেহ থেকে যে ঘাম বের হয়েছিলো এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে অক্সিজেন পৌছেছিলো, তার দেহে যে হরমোন তৈরী হয়েছিলো- এই সবকিছু একত্রিত হয়ে রোগীর রোগ খুব কম সময়ে আরোগ্য হয়ে গিয়েছিলো।

একজন চিকিৎসককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, গায়ে গোটা উঠার খাটিয়া রোগের চিকিৎসা কি? ডাক্তার বললেন, সারা দিনে মাত্র দুই টাকা ব্যয় করবে

www.nagorikpathagar.org

এবং অনেক টাকা উপার্জন করবে। অর্থাৎ ডাক্তার তাকে অনেক অনেক পরিশ্রম করার কথা বুঝাতে চেয়েছেন।

মানসিক রোগীর চিকিৎসা

উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে চিকিৎসকরা রোগীদেরকে মেডিটেশনের প্রতি আকৃষ্ট করছেন। মেডিটেশনের মাধ্যমে রোগীরা খুব সহজে রোগের কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে। তাদের মানসিক কষ্ট দূর হওয়ার কারণে তারা স্বস্তি এবং শান্তি লাভ করে।

দেহের সুস্থতা বজায় রাখার জন্যে ভালো রক্তের প্রয়োজন। ভালো রক্ত চলাচল দেহের নানারকমের রোগ, মানসিক উদ্বেগ দূর করে দেয়। দেহ কোষে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। যেসব রোগী মনে মনে চিন্তা করে যে, তারা আর কখনো সুস্থ হবে না, আরোগ্য হবে না, তারা মেডিটেশনের মাধ্যমে সুস্থ হতে পারেন। রোগীর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। নিয়মিত মেডিটেশন করা হলে মানুষের অনুভূতি জাগ্রত এবং প্রখর হয়। এতে মানুষের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মেডিটেশন মানুষের কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি করে। কেউ যদি বছরে ১০দিন অভিনিবেশ সহকারে মেডিটেশন করে তবে, সে ব্যক্তি দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে পুরো বছর সুস্থ থাকতে পারে।

হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপ

হৃদপিন্ডে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হলে হৃদরোগ সৃষ্টি হয়। শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের ফলে বুকে চাপ সৃষ্টি হয়, কোরআনে মানুষের অন্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে, হে মানুষ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তার প্রতিকার এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত। (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

এই আয়াত সকাল সন্ধ্যা পাঠ করে রোগী যদি নিজের উপর ফুঁ দেয়, তবে রোগী এই রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

একজন বুযুর্গের পুত্রের হৃদরোগ দেখা দিলে তিনি কোনো ডাক্তারের কাছে গেলেন না এবং কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে সকাল সন্ধ্যা পুত্রের দেহে ফুঁ দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে উক্ত বুযুর্গের পুত্র সুস্থ হয়ে গেলো। আয়াতগুলোর অর্থ নিম্নরূপ-

আমি তো জানি ওরা যা বলে এতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের এবাদত করো। (সূরা হিজর, ৯৭-৯৯)

সেই বুযুর্গের মুখে একথা শোনার পর আমি আমার কাছে আসা হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের গত দশ বছর যাবত এই আয়াত পাঠ করার পরামর্শ দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

আসছি। এই আয়াত সকাল সন্ধ্যা আগে পরে দরূদ শরীফের সাথে তিনবার পাঠ করতে হবে। এছাড়া নিয়মিত নামায আদায় করতে হবে। এভাবে পরামর্শ দেয়ার পর থেকে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। এটা আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং পবিত্র কোরআনের বরকতের কারণে সম্ভব হয়েছে।

দুই বছরের একটি শিশু ব্লাডপ্রেশারে আক্রান্ত হলো। তাকে ওষুধ দেয়ার পরিবর্তে কোরআনের উপরোক্ত আয়াত সকাল সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করে তাকে ফুঁ দেয়া হলো। এ ছাড়া তাকে গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়া হলো। সেই শিশু গত দুই মাস যাবত সম্পূর্ণ সুস্থ। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে নিবেদিত।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঘোড়া

হাসপাতালে ঘোড়ার আচরণ লক্ষ্য করার মতো। ঘোড়া যদি একবার চিকিৎসার নিয়ম বুঝে ফেলে তবে চিকিৎসককে পূর্ণ সহযোগিতা করে। ইনকেজশন দেখে মহিষের মতো লাফাতে শুরু করে না, বরং ধৈর্যের সংগে ইনজেকশন গ্রহণ করে। চিকিৎসার ব্যাপারে আস্থাশীল করার পর সেই ঘোড়া ধৈর্যের সংগে অস্ত্রোপচার করার কাজ সম্পন্ন হতে সহায়তা করে। আমি এ রকম একটি ঘোড়া দেখেছি যে ঘোড়ার নাক দিয়ে সর্দি ঝরতো। সর্দির কারণে সেই ঘোড়ার নিঃশ্বাস গ্রহণ বর্জনে সমস্যা হতো। বছরে দুইবার সেই ঘোড়ার নাকের হাড় ছিদ্র করে জমে থাকা সর্দি বের করে ফেলা হতো। চিকিৎসার সময়ে ঘোড়াটি নিজে থেকে অপারেশন থিয়েটার উপস্থিত হতো। অস্ত্রোপচারের সময় একটুও নড়াচড়া করতো না। চিকিৎসক নির্বিঘ্নে ঘোড়ার চিকিৎসা কাজ সম্পন্ন করতেন।

স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর কান্না

কান্না চেপে রাখা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। এক মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর পরও কাঁদেনি। সেই স্বামীর সংগে ছয় বছর দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে। এ সময়ে স্বামীর সংগে আনন্দেই কাটিয়েছিলো। তিন সন্তানের মা হলেও মহিলা ছিলো তখনো যৌবনবতী। স্বামীর সংগে তার দাম্পত্য জীবন কেটেছে প্রেম ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে। এ রকম ভালোবাসাপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের উদাহরণ কমই পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে শোকে মহিলা পাথর হয়ে গেলো। সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় তার ছিলো দিশাহারা অবস্থা। এই শোক মহিলা ধৈর্যের সংগে সহ্য করছিলো। তিন মাস কেটে যাওয়ার পর আমি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম। মহিলা মানসিক কষ্টে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিলো। তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। শোকে দুঃখে কষ্টে চোখের অশ্রু প্রবাহিত করা আল্লাহর একটি নেয়ামত। এই মহিলা আল্লাহর সেই নেয়ামত থেকে নিজেকে এ কারণেই বঞ্চিত রাখলো যে, কান্নাকে সমাজের মানুষ ভালো চোখে দেখে না। কান্নাকে মানুষ মনে করে লজ্জাজনক কাজ। সমাজের এই রুসম রেওয়ায মানতে গিয়ে মহিলা নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলো। এর কুফল সেই মহিলাকে ভোগ করতে হয়েছিলো।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট

রসূল (স.)-এর দুধবোন হযরত শায়মা ঘুম পাড়ানিয়া গান গাইতেন। তিনি যে গান গাইতেন সেটি হচ্ছে এই,

আমার জন্যে একটি ভাই এসেছে

আমার এ ভাই তার মায়ের কাছে নেই

পিতার কাছে নেই চাচার কাছে নেই

ওহে আল্লাহ তায়ালা তুমি

তার চোখে ঘুম দাও।

(রসূল (স.)-এর রাজনৈতিক জীবন, ড. হামিদুল্লাহ)

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, ঘুম পাড়ানিয়া গান শিশুর চোখে তাড়াতাড়ি শুধু ঘুমই আনে না বরং এ গান শিশুর ভবিষ্যত নির্মাণেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। যেসব শিশু মায়ের সংস্পর্শে ঘুমায় তারা ওসব শিশু যারা একা ঘুমায়, বড়ো হয়ে তাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান এবং মেধাবী হয়। যেসব শিশু মায়ের কাছে ঘুমায় তারা নিজেদেরকে অধিক নিরাপদ মনে করে। পক্ষান্তরে যেসব শিশু মায়ের সান্নিধ্য বঞ্চিত হয়ে ঘুমায়, তারা হীনমন্যতার শিকার হয়। মায়ের সান্নিধ্যে ঘুমানো শিশু আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠে।

শূকরের গোশত কিডনি রোগ বাড়ায়

লিয়াকত আলী শাহ সাহেব বলেছেন, আমার ইংল্যান্ডে সফরের অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বর্তমানে ইউরোপের চিকিৎসকরা শূকরের গোশত খেতে কঠোরভাবে নিষেধ করছেন। কারণ, শূকরের গোশত যারা খায় তাদের কিডনির অসুখ বেশী হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখেছি- আপনার হাত ধুয়ে নিন। ইউরোপের লোকেরা খাবার আগে হাত ধোয়া বর্তমানে জরুরী মনে করছে।

দুরোরোগ্য যৌন রোগ

অশ্লীলতার ব্যাপকতার ফলে দুরারোগ্য যৌনব্যাধি বৃদ্ধি পায়। আমেরিকায় প্রায় শতকরা ৯০ জন মানুষ যৌনব্যাধির প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, সেখানে প্রতি বছর ২ লাখ গণোরিয়ার রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া প্রতি বছর ১ লাখ ৬০ হাজার সিফিলিস রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এ পরিসংখ্যান সরকারী হাসপাতালে, চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা নিতে আসা রোগীদের। ৬৩টি চিকিৎসা কেন্দ্রে শুধুমাত্র যৌন রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। এসব প্রাইভেট চিকিৎসা কেন্দ্রে আসা রোগীর সংখ্যা সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী। এ সকল চিকিৎসকের কাছে গণোরিয়ার শতকরা ৬১ ভাগ লোক এবং সিফিলিসের শতকরা ৮৯ ভাগ লোক চিকিৎসা নিতে আসে। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৩৩ তম খণ্ড, পৃঃ ৪৫)

www.nagorikpathagar.org

প্রতি বছর ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার শিশু শুধুমাত্র পারিবারিক যৌন রোগের কারণে মারা যায়। গনোরিয়া এবং সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীদের বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় শ্রেণীর নারী পুরুষই রয়েছে। নারীরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে বিবাহিতা মহিলাদের যৌনাঙ্গে যেসব অপারেশন করা হয় এর মধ্যে ৭৫ ভাগের অঙ্গে সিফিলিসের প্রভাব পাওয়া যায়।

দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ

একজন এসোসিয়েট প্রফেসর গুরুতর জন্ডিসে আক্রান্ত হলেন। তিনি আমার অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। একদিন মেডিকেল বোর্ড তাকে চিকিৎসার অনুপযুক্ত ঘোষণা করলো। কারো মাধ্যমে ডাক্তার একথা শোনার পর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। আছরের সময় নার্স এসে আমাকে জানালো যে, ডাক্তার সাহেব ভীষণ কান্নাকাটি করছেন। তিনি ছিলেন কোরআনে হাফেজ। আমি তাকে সূরা ইয়াসিন এবং দোয়া ইউনুসের ফযিলত শোনালাম। তাকে বললাম আপনি যদি বিশ্বাসের সাথে এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে রোগ থেকে মুক্ত করে দেবেন।

ডাক্তার সাহেব আমার কথা বিশ্বাস করলেন এবং রাতদিন সূরা ইয়াসিন এবং দোয়ায়ে ইউনুস পাঠ করতে লাগলেন। নার্সগণ আমাকে বলেছেন, ঘুমের মধ্যেও ডাক্তার সাহেব কোরআন পাঠ করতেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে ডাক্তার সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। জন্ডিসের এরকম চিকিৎসা দুনিয়ার কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মালিশ এবং বিশেষজ্ঞগণ

দেহের মালিশে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এটা এমন একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য কথা যা সবাই জানে। কুস্তিগীর জোয়ানদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তেল মালিশ করা। বয়স্কদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের দেহে ময়দা ঘি বা শুধু তেল মালিশ করার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণ মালিশের উপকারিতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।

শিশুদের দুর্বল কোমরে মালিশ করা হলে খুব কম সময়ে সেসব শক্তিমান হয়ে উঠে। দুর্বল শিশুদের জন্যে মালিশ খুবই উপকারী। শিশুদের বুকে কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি করে নয়, বরং হাল্কাভাবে মালিশ করতে হবে। হাতের তালু দিয়ে এ মালিশ করতে হবে। দুর্বল শিশুদের ক্ষেত্রে মাছের তেল বা যয়তুনের তেল মালিশ করা অত্যন্ত উপকারী। মালিশ দ্বারা দেহের শুষ্কতা দূর হয়, দেহ মযবুত হয় এবং সুন্দর হয়।

মাথার চুলে তেল মালিশ করা হলে চুল বৃদ্ধি পায়। চোখ এবং মস্তিষ্ক শক্তিশালী হয়। হাত পায়ের তালুতে তেল মালিশ করা হলে দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয়। মালিশের জন্যে গাই গরুর ঘি, বাদামে রওগন, রওগনে যয়তুন এবং তাজা সরিষার তৈল বিশেষ উপকারী।

মালিশ দ্বারা দেহের অবসাদ এবং ক্লান্তি দূর হয়। রক্তের ভারসাম্য তৈরী হয়। দেহ সুন্দর হয় এবং শক্তিশালী হয়। মাথায় তেল মালিশ করা হলে মস্তিষ্কে এবং চোখে

www.nagorikpathagar.org

আলো বৃদ্ধি পায়। চুল বাড়ে, ভালো ঘুম হয়। হাত পায়ের তালুতে মালিশ করা হলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, অনিদ্রা সমস্যা দূর হয়।

সারা দেহে মালিশ করা আবশ্যক। বিশেষ করে মাথা, নাভি হাত পায়ে সরিষার তেল মালিশ করা দরকার। নাকে কানে তেল দেয়া খুবই উপকারী। তবে জ্বর কাশি উচ্চ রক্তচাপ এবং যাদের বমি হয়েছে তাদের মালিশ করা নিষিদ্ধ। মালিশ করার পরপরই গোসল করা যাবে না। মালিশের কমপক্ষে এক ঘন্টা পর গোসল করতে হবে।

ডাক্তার লিকারের অভিমত

ডাক্তার লিকার মিউনিখের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লাস্টিক সার্জারী বিভাগের প্রধান। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজে বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তৃতায় বলেন, কুৎসিত মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। সৃষ্টির অপূর্ণতা পূর্ণ করা, সংশোধন করা বিজ্ঞানের কাজ। প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে শারীরিক ত্রুটি দূর করা যায়। মালিশের মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। বলা যায়, সার্জারি হচ্ছে মালিশের আপন বোন।

ডাক্তার লিকার প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে বিত্তবান মহিলা, চিত্রনায়িকা এবং অসুন্দর লোকদের সুন্দর করেছেন। ডাক্তার লিকার মালিশ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়েছেন।

ডাক্তার স্যার উইলিয়াম উলসারের সাক্ষ্য

ওয়ার্ল্ড মেডিকেল কনফারেন্সের প্রধান ডাক্তার স্যার উইলিয়াম উলসার তার এক বক্তৃতায় মালিশ সম্পর্কে বলেছেন, মালিশ বিজ্ঞানের একটি আলাদা শাখা। মালিশের মাধ্যমে চিকিৎসা করা আল্লাহর স্বাভাবিক কুদরতের অন্যতম। অন্যান্য চিকিৎসার মতো মালিশের মাধ্যমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা নেই। এ কারণে মালিশের মাধ্যমে চিকিৎসায় ক্ষতির কোনো আশংকা নেই। মালিশ নিঃসন্দেহে সুস্থ মানুষকে সুন্দর করে, যৌবনের শক্তি অটুট রাখে এবং দেহ মনের সুস্থতা বজায় থাকে।

শক্তি বৃদ্ধির জন্যে মালিশ

আঘাত, জখম, ফুলে যাওয়া, মচকানো ইত্যাদি শারীরিক সমস্যায় মালিশের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। গ্রীক চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদিক এবং ইংরেজী চিকিৎসা বিজ্ঞানে মালিশকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন প্রকারে মালিশের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মালিশের প্রভাব রক্তে, শিরা-উপশিরায় এবং দেহের জোড়ায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দেহের দুর্বল অংশে মালিশ করা হলে এবং অনুভূতিহীন অংশে মালিশ করা হলে সেই অংশে শক্তি ফিরে আসে অনুভূতি ফিরে আসে।

দেহের যে অঙ্গে ক্রমাগত তেল মালিশ করা হয় সে অঙ্গে সজীবতা এবং শক্তি ফিরে আসে। অনেকেই জানে না যে, পুরুষাঙ্গে মালিশ করা হলে সেই অঙ্গে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, এবং যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উরুর ভেতরের অংশে, নাভীর নীচের

www.nagorikpathagar.org

অংশে, মাথার পেছনের অংশে এবং কানের উপরের অংশে এই চার জায়গার সাথে পুরুষাঙ্গের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এই চায় জায়গায় ভালোভাবে মালিশ করা প্রয়োজন। কানের উপরের অংশ কেটে দেয়া হলে মানুষ নপুংশক হয়ে যায়। এতে বোঝায় যায়, কানের উপরের অংশের রগের সাথে পুরুষাঙ্গের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই এই অংশের মালিশ পুরুষাঙ্গের শক্তির জন্যে বিশেষ প্রয়োজন এবং বিশেষ উপকারী। কানের উপরের অংশে দিন দুই চার বার এমনিতে মালিশ করা হলেও দেহে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির উপায়

গ্রীস এবং রোমের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই অঞ্চলের মহিলারা মালিশের মাধ্যমে নিজেদেরকে সুন্দর করে তোলে। বিয়ের পর স্বামীর সংসারে মেয়েদের পাঠানোর সময় সেবিকা হিসেবে যেসব দাসী পাঠানো হয়, তারা মালিশের ব্যাপারে দক্ষ হয়ে থাকে।

গ্রীসের মাহিলাদের ধারণা, দেহের মালিশ বিশেষত কান, রান এবং কোমরের মালিশে সৌন্দর্য এবং যৌবন অটুট থাকে। এখনো গ্রীসের নারীরা মালিশের সাহায্যে নিজেদের দৈহিক সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখে। প্রাচীনকালে রোমের সকল ভদ্র পরিবারে মালিশে অভিজ্ঞ দাসী রাখা হতো। সেসব দাসী প্রতিদিন তাদের গৃহকর্ত্রীদের দেহ মালিশ করতো। এখনো তুরস্ক, ইটালী, গ্রীস, পারস্য, আরব, রোম প্রভৃতি দেশে মালিশের জন্যে হাম্মাম রয়েছে। সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেহের সকল অংশ মালিশ করা হয়ে থাকে।

মোগল আমলে জামরুলের খোসা, আটা, বেসন, সুন্দল এবং দুধের সর মিলিয়ে মহিলারা মুখে মালিশ করতো। বিত্তশালী মহিলারা পেস্তা, বাদাম, জাফরান, মোম এবং কাছাম নামের এক জাতীয় ফুল দুধে মিশিয়ে চেহারায় মালিশ করতো। মিশরের নারীরা দুধ দিয়ে দেহ মালিশ করতো। মিশরের বিখ্যাত সুন্দরী ক্লিও পেট্রার দুধ দিয়ে গোসল করার কথাতো সবাই জানে। ক্লিওপেট্রার দাসীগণ দুধের সাথে সুবাসিত তেল মিশিয়ে ক্লিওপেট্রার দেহ মালিশ করতো। এতে তার দেহ চকচকে এবং সুন্দর থাকতো। মিসরের নারীরা এখনো গোসলের আগে রওগন, যয়তুন দিয়ে দেহ মালিশ করে থাকে। রোম সম্রাট নীরোর প্রেমিকা দুধ দিয়ে গোসল করতো নিজের হাতে মুখে যয়তুনের তেল মালিশ করতো। যেনো হাত ও মুখ মোলায়েম, কমনীয় থাকে। স্কটল্যান্ডে মেরী অব স্কটল্যান্ডের পৌত্রী বা দৌহিত্রী রওগন বাদামে সগন্ধ মিশিয়ে দেহে মালিশ করতো। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বার্নাড ফিটকারি, রওগন বাদাম এবং গোলাপের রস মালিশ করে নিজের সৌন্দর্য অটুট রেখেছিলো।

প্রাচীনকালে আফ্রিকার জংলী হাবশীদের মধ্যে নিয়ম ছিলো যে, বিয়ের একমাস আগে থেকে বিয়ের কনেকে প্রতিদিন মালিশ করা হতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, এভাবে মালিশ করা হলে দেহে যৌবন এবং সৌন্দর্য ফিরে আসে। দেহ সুন্দর এবং সুস্থ রাখার জন্যে মালিশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মালিশের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

দেহের রক্ত চলাচল স্বাভাবিকতা ফিরে পায় এবং রক্তে উত্তাপ তৈরী হয়। রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। রক্তের দূষিত উপাদান রক্ত থেকে আলাদা হয়ে যায়। পরে সেই সব দূষিত উপাদান লোমকূপের মাধ্যমে ঘাম হিসেবে বের হয়ে যায়। মালিশের মাধ্যমে দেহে সজীবতা, শক্তি এবং উত্তাপ তৈরী হয়। এরফলে দেহ হয় সুস্থ ও সুন্দর। (মেডিকেল সার্ভে অব কিং)

হারাম জিনিসের মধ্যে আরোগ্য নেই

ইসলাম হালাল হারাম নির্ধারণ করে মুসলমানদের জন্যে বিরাট কল্যাণ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান সকল হারাম জিনিসের উপর গবেষণা করার পর হালাল জিনিসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছে। ইউরোপ শূকর এবং মদকে যতোই পছন্দ করুক কিন্তু আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দু'টি জিনিস মানুষের জন্যে বিষতূল্য প্রাণঘাতী। বর্তমানে ব্যবহার করা ওষুধে রোগ আরোগ্য হয় না কেন?

প্রকৃতপক্ষে এসব ওষুধ ইউরোপ এবং পশ্চিমা দেশসমূহ থেকে তৈরী হয়ে আসে। এসব ওষুধের মধ্যে এরকম হারাম জিনিসের সংমিশ্রণ থাকে, যার ফলে আল্লাহর কাছে আরোগ্য পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। বরং এর মধ্যে রয়েছে গুরুতর ক্ষতি এবং অন্তহীন দুর্ভোগ। এলোপ্যাথি ওষুধের মধ্যে যতো হারাম, ঘৃণ্য ও নোংরা জিনিসের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়; সম্ভবত অন্য কোনো জিনিসে এরকম মিশানো হয় না।

বর্তমানে আমরা একটার পর একটা ঔষধ পরিবর্তন করতে থাকি, কিন্তু কোনো ফল হয় না। একজন বুযুর্গ মন্তব্য করেছেন, বর্তমানে আমরা হারাম উপায়ে উপার্জিত টাকা দিয়ে হারাম ওষুধ ক্রয় করে সেই ওষুধ সেবন করে সুস্থ হতে চাই, কিন্তু এতে কি সুস্থ হওয়া সম্ভব? আমাদের বিছানা, বাড়ীঘর, পানি হারাম। এসব হারামের ব্যবহার করেও শান্তি পেতে চাই, কিন্তু শান্তি পাই না। তারপর শান্তির জন্যে সুস্থতার জন্যে হারাম উপায়ে তৈরী ওষুধ সেবন করি। কিন্তু শান্তি এবং সুস্থতা থাকে সুদূর পরাহত। আমরা বুঝতে চাই না যে, হালালের মধ্যেই শান্তি রয়েছে।

হযরত উম্মে দারদা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি রোগের ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। (তিবরানী)

কাজেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু হারাম জিনিস দ্বারা সে চিকিৎসা করানো যাবে না।

তারেক ইবনে সওয়ায়দ (রা.) এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ রসূল (স.)-কে আঙ্গুরের তৈরী মদ দিয়ে চিকিৎসা করার কথা জিজ্ঞেস করলে রসূল (স.) বলেন, হারাম জিনিসের মধ্যে আরোগ্য নেই।

হারাম জীবের গোশত, রক্ত, মদ এবং বিষাক্ত নেশাজাত জিনিসের মধ্যে আরোগ্য নেই।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত চিকিৎসকগণ নিউমোনিয়া রোগীদের ব্রান্ডি খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রান্ডি দেহের রোগ প্রতিরোধ

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতা শেষ করে দেয়। ফলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ কারণে অমুসলিম চিকিৎসকগণ বর্তমানে রোগ প্রতিকারে ব্রান্ডি খাওয়ার পরামর্শ কোনো রোগীকে দেননা। শূকরের চর্বি থেকে তৈরী ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতিকারে ব্যবস্থা দেয়া হতো, কিন্তু এতে কোনো উপকার না হওয়ায় এ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

অন্ত্রে এবং কিডনীতে পোকা

প্যাসিও লোপসিস বাসকি শূকর এবং কুকুরের দেহে পাওয়া যায়। এ পোকার কারণে পেটের ব্যথায় মৃত্যু হতে পারে। এ পোকা কুকুর এবং শূকরের কাছাকাছি থাকে। এর ফলে মানুষের দেহে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং জীবনভর কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দেখা দেয়।

ইউরোপের লোকদের গোশতের চাহিদা পূরণ করার মতো পশু সেখানে পাওয়া যায় না। গোশতের চাহিদা পূরণের জন্যে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চিলি, আর্জেন্টিনা, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে গোশত আমদানী করা হয়। বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানীর জন্যে আর্জেন্টিনা থেকে গোশত আমদানী করা হতো। কিন্তু আর্জেনটিনা থেকে আমদানী করা গোশতের মাধ্যমে গেঁটে বাত এবং অন্যান্য রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় জার্মানীর সরকার আমদানীকৃত গোশত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করে। ফলে জার্মানীতে গোশতের মূল্য বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞগণ বাজারজাত করার আগে গোশতের টিনের গায়ে লেবেল এঁটে দিতো যে, এই গোশত ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এতো সতর্কতা সত্ত্বেও রোগের প্রকোপ কমেনি। বর্তমানে শূকরের গোশত সতর্কতামূলক দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বাজারজাত করা হয়।

এতো রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও গোশতের ভেতর ক্ষতির পোকা না থাকায় ধারণা যদিও পাওয়া যায়– কিন্তু সেই গোশত ব্যবহারে হৃদরোগের আশংকা বিদ্যমান থাকে।

দুর্বল শূকরের গোশত খেলেও দেহে ৫৪৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা তৈরী হয়। অথচ বকরির গোশতে এই তাপমাত্রার পরিমাণ ২৪৫ ডিগ্রি। শূকরের গোশত ব্যবহারে কম ক্ষতি হওয়ার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় শূকরের গোশত যখন নিরাপদ নয়, তখন কিভাবে এই গোশতকে খাওয়ার উপযোগী করা যাবে?

শূকরের গোশত খেলে হৃদরোগ, ব্লাড প্রেশার ইত্যাদি রোগের আশংকা বৃদ্ধি পায়। শূকরের গোশত সেবীদের জোড়ায় ব্যথা সব সময় লেগে থাকে। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে শূকরের গোশত যারা খায় তাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকে না। ইউরোপের লোকেরা একারণেই ব্যক্তিত্বহীন জীবন যাপন করে।

রোগীর সেবা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

একজন লোক বলেছেন, আমি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। নিঃসঙ্গতার কারণে ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলাম। আমার বন্ধুরা খবর পেয়ে কয়েকদিন পর আমাকে দেখতে এলো। তাদের সাহচর্যে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগলো এবং খুব দ্রুত আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ রোগীর সেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। কারণ, রোগীর সেবা করা হলে সেই সেবা রোগীকে খুব দ্রুত রোগমুক্ত করে সুস্থতা দেয়।

কেনেডি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসার উদ্দেশে একজন লোক আমেরিকার কেনেডি হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি বলেন, সেখানে আমি দেখেছি প্রতিদিন দুইবার রোগীর কাছে পাদ্রী এবং মনস্তত্ত্ববিশারদ ডাক্তার হাসিমুখে আসেন এবং খোঁজ খবর নেন। তারা রোগীদের সান্ত্বনা দেন, দ্রুত আরোগ্য হবেন বলে আশার কথা শোনান। পাদ্রী রোগীদের রোগমুক্তির জন্যে দোয়া করেন। সেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উপরোক্ত রোগী বলেন, আমি হাসপাতালের এরকম ব্যবস্থাপনা দেখে অবাক হয়েছি। মনে মনে চিন্তা করেছি ইসলাম অনেক আগেই রোগীদের এরকম সেবার নির্দেশ দিয়েছে।

আমি সেই হাসপাতালে লক্ষ্য করেছি যে, রোগীদের খোঁজ খবর নেয়া, তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখার এ ব্যবস্থা লক্ষ্য করে অনেক রোগীই উক্ত হাসপাতালে ভর্তি হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ উক্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগী খুব তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভে সক্ষম হন।

সাহাবায়ে কেরামের ৬টি ভিটামিন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

সাহাবায়ে কেরামের বীরত্ব, শক্তি সম্পর্কে শত শত বছর যাবত আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। বিশ্বের মানুষ এই গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের শক্তির রহস্য কি ছিলো? বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘদিন যাবত এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। সার্জারির একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামগণ খুব কমই অসুস্থ হতেন। তাদের স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো একাধিক। সন্তান সংখ্যা ছিলো অনেক। এই শক্তির রহস্য কি? এর রহস্য নিম্নরূপ–

(১) তারা দাড়ি রাখতেন।

(২) তারা গোঁফ কেটে ফেলতেন।

(৩) মাথার চুল ছোটো করতেন।

(৪) নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করতেন।

(৫) ঢিলেঢালা খোলামেলা পোশাক পরিধান করতেন।

(৬) ঘোড়ার পিঠে সফর করে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতেন।

দাড়ি গোঁফ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মাথার চুল হয়তো ছোটো করে রাখতে হবে অথবা কামিয়ে ফেলতে হবে অথবা জুলফির মতো লম্বা করতে হবে। এ সম্পর্কিত একটি ফিজিওলজিক্যাল রিপোর্ট নিম্নরূপ–

চিলি এবং আর্জেন্টিনায় একটি বিশেষজ্ঞ টিম গবেষণার পর একথা জানিয়েছেন যে, যাদের মাথার চুল এক মাপের থাকে, ছোটো বড়ো থাকে না তারা মস্তিষ্কের রোগ

www.nagorikpathagar.org

এবং ঘাড়ের রোগ থেকে রক্ষা পায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে মাথায় কালো চুলে সূর্যের কিরণ পড়ার পর এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হয়। চুল যদি ছোটো বড়ো হয়, তবে সূর্যকিরণ মস্তিষ্কে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে মাথার চুল একই রকমের রাখা আবশ্যক। এ কারণে ইসলাম মাথার চুল ছোটো বা বড়ো, এক সমান রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

নাভির নীচের লোম কেটে ফেলা কোনো কোনো ধর্মে নিষিদ্ধ। কিন্তু নাভির নীচে লোম বড়ো করে রাখা নানা রকমের রোগের কারণ হয়ে দেখা দেয়। অনেক প্রকারের রোগ জীবাণু সেই লোমে আটকে থাকে। নাভির নীচের ত্বকের গ্লান্ডজ প্রভাবিত হয় এবং এতে নানা প্রকার ক্ষতি দেখা দেয়।

নাভির নীচের লোম বড়ো করে রাখা হলে প্রোস্টেট গ্রন্থি প্রভাবিত হয়। এরই প্রভাব যৌনাঙ্গের উপর পড়ে। পক্ষান্তরে এই লোম পরিষ্কার করা হলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

ঢিলেঢালা খোলামেলা পোশাক ব্যবহারের উপকারিতা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বীনের দাওয়াত এবং দ্বীনের জন্যে মেহনত করার উপকারিতা বোঝার জন্যে যে কোনো একটি ঘটনাই যথেষ্ট। খৃষ্টান বৈজ্ঞানিক ডাক্তার কোস্ট্রো সমুদ্র সম্পর্কে গবেষণার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, পুণ্যের অনুশীলন এবং প্রচার দৈহিক সুস্থতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং শক্তিশালী ওষুধ ব্যবহারের চেয়ে কম ফলপ্রসূ নয়। কারণ, শব্দের প্রভাব দেহে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। দ্বীনের কথা যতো বেশী বলা হবে, দেহ মনের শক্তি ততো বৃদ্ধি পাবে।

বকরির দুধ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.)-এর সাতটি বকরি দুধ দিতো। এসব বকরি উম্মে আয়মান (রা.) চরাতেন। তারপর দুধ দোহন করে রসূল (স.)-এর কাছে পেশ করতেন। (মাদারেজুন নবুয়ত)

রসূল (স.) একজন সাহাবীর ঘরে গেলেন। সেই সাহাবী রসূল (স.)-এর সামনে বকরির দুধ পেশ করলেন। রসূল (স.) সেই দুধ পান করলেন। (বোখারী)

বকরির দুধ উপাদেয় খাদ্য এবং পানীয়। এই খাদ্যের উপকারিতা বৃদ্ধি পায় যদি দুগ্ধবতী বকরি চারণভূমিতে বিচরণ করে। কারণ, চারণভূমিতে সেই বকরি নানা রকমের খাদ্য খেতে পায়। নানা রকম লতাপাতা, ঘাস খাওয়ার পর সেসব হজম হয়ে যে দুধ বের হয়- সেই দুধের প্রভাব মানবদেহের জন্যে কল্যাণকর।

গান্ধী খদ্দরের পোশাক পরিধান করতেন এবং বকরির দুধ পান করতেন। তিনি বলতেন, নিম গাছের নীচে বাঁধা বকরির দুধ পান করতে যদি পাই, তবে আমি বিশ্ব নেতৃত্ব চাই না।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক প্রতিদিন ভোরে খালি পেটে বকরির দুধ পান করতেন। সারা জীবন তিনি বকরির দুধ পান করে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আল্লামা ইকবাল বকরির দুধ ভীষণ পছন্দ করতেন। তাদের এ পছন্দের কথা ইতিহাস এবং জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে।

বকরির দুধের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে টিবি বা যক্ষ্মা এবং ক্যান্সার প্রতিরোধক উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বকরির দুধ মানুষের জন্যে রোগ প্রতিরোধক এবং শেফার উপকরণ সম্পন্ন।

বকরির দুধ গাভী, মহিষের দুধের চেয়ে উপকারী

বকরির দুধ গাভী এবং মহিষের দুধের চেয়ে বেশী উপকারী। দেহের পুষ্টি এবং দেহ পালনে বকরির দুধ বিশেষ সহায়ক। আমেরিকার খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর ডগলাস থমাস অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, বকরির দুধ অন্য সকল প্রকার পানীয়ের চেয়ে উত্তম এবং উপকারী। বকরির দুধ উত্তম হওয়ার কারণ হচ্ছে, বকরিদের রোগ হয় কম এবং বকরির দুধ তাড়াতাড়ি হযম হয়ে যায়।

ডাক্তার মেরিট বর্ণনা করেছেন, শিশুদের খাদ্য হিসেবে বকরির দুধ উত্তম। গাভীর দুধ শিশুর হজমের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বকরির দুধ খুব সহজে হজম হয়ে যায়।

ডাক্তার এন এন বেক পুষ্টিগুণ বিচারের লক্ষ্যে বকরির এবং গাভীর দুধের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বকরির দুধ তাড়াতাড়ি হজম হয়। বিশেষ করে এই দুধ সেসব শিশুর জন্যে অত্যন্ত উপকারী যাদের পুষ্টি থেমে গেছে। যেসব রোগীর পাকস্থলীর সমস্যা রয়েছে, তাদেরকে বকরির দুধ ব্যবহার করার জন্যে চিকিৎসকগণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বকরির দুধ সহজপাচ্য হওয়ার বিশেষ কারণ রয়েছে। এই দুধের চর্বির দেয়াল খুব পাতলা এবং সূক্ষ্ম। এই দুধ পাকস্থলীর লালায় খুব সহজে প্রভাব বিস্তার করে। বকরির দুধে চিকনাই এবং লবনাক্ততার পরিমাণ বেশী থাকে। এক প্রকার লবনাক্ততার মধ্যে ক্যালশিয়াম রয়েছে, এই ক্যালশিয়াম লবণ বকরির দুধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্যালশিয়াম দেহের পুষ্টির জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেহে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ কম হলে যক্ষ্মা এবং ক্ষয়কাশি রোগ হতে পারে।

বকরি এবং গাভীর দুধের পার্থক্য খুব সহজে বোঝা যায়। গাভীর দুধ দুর্বল পাকস্থলীর লোকদের জন্যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গাভীর দুধ হজমের জন্যে দুই ঘন্টা সময় প্রয়োজন। অথচ বকরির দুধ মাত্র আধা ঘন্টা সময়ে হজম হয়ে যায়। গাভী, বকরি এবং মানুষের দুধে যে লবণাক্ততা রয়েছে তা বারো প্রকার। এর মধ্যে বকরির দুধে এই লবণাক্ততা নয় প্রকার, গাভীর দুধে ছয় প্রকার এবং মহিলাদের দুধে পাঁচ প্রকার বিদ্যমান থাকে। গাভীর দুধে লৌহ কণিকা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু বকরির দুধে লৌহ কণিকা সাত থেকে দশগুণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। পটাশিয়ামের পরিমাণও বকরির দুধে বেশী থাকে। অক্সিজেন আহরণে পটাশিয়ামই সবচেয়ে বেশী কর্মক্ষম। পটাশিয়াম অক্সিজেনকে টেনে নেয়। অক্সিজেন যেখানেই থাকুক পটাশিয়াম

www.nagorikpathagar.org

তাকে টেনে নেয়। এর সাথে লৌহ কণিকা মেশানো হলে বোঝা যাবে যে, অক্সিজেন শোষণের ক্ষমতা বকরির দুধের চেয়ে বেশী অন্য কোনো প্রকার দুধের মধ্যেই নেই।

বকরির দুধে অধিক পরিমাণে ক্লোরিন বিদ্যমান থাকে। এই দুধ হাড়ের পুষ্টি বৃদ্ধি করে, দাঁত শক্ত করে, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল করে। মেরুদণ্ডের হাড়ের পুষ্টি এবং শক্তির উপর আমাদের সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। ম্যাগনেশিয়াম এই হাড় মযবুত করে। এই উপাদানও বকরির দুধে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দেহের বিষাক্ত উপাদান বিলীন করে লিভার এবং কিডনির পথে বের করে দেয়ার জন্যে সোডিয়াম লবণ বিশেষ ভূমিকা রাখে। সোডিয়াম যদি এই কাজ না করে তবে লাইম এবং ম্যাগনেশিয়াম শক্ত হয়ে লিভার এবং কিডনিতে পাথরের জন্ম দেয়। বকরির দুধে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম বিদ্যমান থাকে। এছাড়া বকরির দুধে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন।

বকরির দুধ ঠাণ্ডা এবং সূক্ষ্ম। জঙ্গলে বিচরণশীল বকরির দুধ উপকারের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। এই দুধ কাশি, যক্ষা, পুরাতন জ্বর, লিভার, কিডনি, পাণ্ডুরোগ, জন্ডিস, মস্তিষ্ক এবং রক্তের অসুখ রোধে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করে। বকরির দুধে 'কাথ' মিশিয়ে গড়গড়া করা হলে মুখের ভেতর ছাল উঠার প্রতিকার পাওয়া যায়। বকরির দুধে তুলা ভিজিয়ে রাতে চোখের উপর রেখে পট্টি বেঁধে দেয়া হলে, চোখের ব্যথায় উপশম ঘটে।

গর্ভবতী মহিলাদের জন্যে খেজুরের মধ্যে আয়রণ ক্যাপসুল রয়েছে

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) বলেন, যেসব মহিলার নেফাস রোগ রয়েছে আমি মনে করি তাদের জন্যে খেজুরের চেয়ে উত্তম কোনো প্রতিষেধক নেই। রোগীর জন্যে মধুর চেয়ে উপকারী অন্য কোনো দ্রব্য নেই।

রসূল (স.) বলেন, তোমরা তোমাদের নারীদের নেফাসের সময়ে খেজুর খেতে দাও। কেননা হযরত মারইয়ামের গর্ভ থেকে হযরত ঈসা (আ.) যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময় হযরত মরিয়ম খেজুর খেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার বিবেচনায় যদি খেজুরের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো খাবার মারইয়ামের জন্যে সে সময় প্রযোজ্য হতো তবে আল্লাহ্ তায়ালা বিবি মারইয়ামের জন্যে সেই খাবারই ব্যবস্থা করতেন।

রসূল (স.) আরো বলেন, নেফাসের সময়ে মহিলাদের যদি খেজুর খাওয়ানো হয়, তবে তাদের সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হয়। (নুজহাতুল মাজালেছ, ২য় খণ্ড, রাহবারে যিন্দেগী)

বর্তমানে গর্ভবতী মহিলাদের দেহের লোহার অভাব পূরণের জন্যে এক ধরনের ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের ডাক্তার নিকস ক্লোর খেজুর সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গর্ভবতী মহিলাদের যদি প্রতিদিন একটি খেজুর খাওয়ানো হয়, তবে গর্ভবতীর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এর প্রভাব পড়ে। গর্ভের শিশুও শক্তিশালী হয়। যেসব মহিলা গর্ভকালে খেজুর ব্যবহার করে তাদের গর্ভকালীন জটিলতা দূর হয়ে যায়। তাদের প্রসবকালীন যন্ত্রণা বহুলাংশে লাঘব হয়। (সায়েন্স আওর ওয়ার্ল্ড)

www.nagorikpathagar.org

খেজুর আয়রন অর্থাৎ লৌহ দ্বারা পূর্ণ এবং দেহের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভধারণের পর মহিলাদের দেহে লৌহকণিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ কারণে তাদের খেজুর ব্যবহার করানো আবশ্যক। গর্ভকালের শেষ দিকে গর্ভবতী মহিলাদের খেজুর খাওয়ালে প্রসবকালীন জটিলতা কমে যায়। এছাড়া নানা প্রকার রোগ থেকে মহিলারা রক্ষা পায়।

একজন মহিলার প্রতিবারই প্রসবকালীন সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করতো। অনেক চিকিৎসা করার পরও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। তারপর তাকে পরামর্শ দেয়া হলো যে, গর্ভকালীন সময়ে তাকে প্রতিদিন একটি বা দু'টি খেজুর খাওয়ানো হবে। প্রসব করার পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বহাল রাখতে বলা হয়েছে। খেজুর খাওয়ানোর ফলে মহিলার প্রসবকালীন জটিলতা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছিলো। মহিলার স্বাস্থ্যেরও বেশ উন্নতি হয়েছিলো।

হৃদরোগ থেকে আত্মরক্ষা

কার্ডিয়োলোজিস্ট রোগীদেরকে চালুনি ব্যবহার না করা আটা বা মোটা আটা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রোগীদের পরামর্শ দেয়া হয় তারা যেন মোটা আটা খায়। কারণ, এরকম আটা দেহে কোলেস্টরেল বৃদ্ধি রোধ করে। এতে রক্ত জমাট বাঁধে না। এ রকম আটা খেলে হৃদপিণ্ড অধিক রক্ত সঞ্চালনের সামর্থ্য অর্জন করে। মোটা আটা না খাওয়ার কারণে বর্তমানে ঘরে ঘরে পেটের পীড়ার রোগী দেখা যাচ্ছে। গ্যাস, পেটের পীড়া, অস্বস্তি, অবসাদ ইত্যাদি সকল রোগের উৎস হচ্ছে আমাদের গ্রহণ করা খাদ্য। এর মূলে রয়েছে আটা।

রক্তচাপের রোগীদেরকে না ছানা আটার রুটি খাওয়ানোর ফলে তারা বিস্ময়করভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আটার খোসা পানিতে সিদ্ধ করে যদি চা বা কফির মতো পান করা যায় তবে কাশি, স্থায়ী সর্দি, রক্ত চাপ, পাকস্থলীর ব্যথা বেদনা এবং গ্যাস উঠা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মহিলাদের স্তন এবং যৌনাঙ্গের ক্যান্সার রোধ করার লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, যেসব মহিলা এসব ওষুধ ব্যবহার করবে, তারা কোনো না কোনো সময়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে।

জ্বর পানি এবং বিজ্ঞান

হযরত নাফে (রা.) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে আমি শুনেছি, রসূল (স.) বলেছেন, সাধারণ জ্বর বা প্রচণ্ড জ্বরের উৎস দোযখের আগুন, কাজেই সে আগুনকে পানি দিয়ে শীতল করো। (যাদুল মায়াদ)

হযরত আবু হোমায়রা এমরান সানঈ (রা.) বর্ণনা করেছেন, মক্কায় আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে বসেছিলাম। সে সময় আমার জ্বর হয়েছিলো। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, যমযমের পানি দ্বারা তোমার জ্বরকে ঠাণ্ডা

www.nagorikpathagar.org

করো। কেননা রসূল (স.) বলেছেন, জ্বর হচ্ছে দোযখের আগুনের হুল্কা, তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করো।

হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন, জ্বর হচ্ছে আগুনের অংশ। কাজেই সেই আগুন পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করো।

রসূল (স.)-এর যখন জ্বর হতো তিনি এক মশক পানি আনাতেন এবং সেই পানি মাথায় ঢেলে দিয়ে গোসল করতেন। (যাদুল মায়াদ)

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, জ্বরের রোগীকে পানি দিয়ে গোসল করাও। তার মাথায় ঠাণ্ডা পট্টি বাঁধো, রোগীকে বেশী করে পানি পান করাও। চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্বর নিয়ন্ত্রণের এরকম পদ্ধতির কথাই লেখা রয়েছে।

হাইড্রোপ্যাথির বিধান

লুঈ কুনি হাইড্রোপ্যাথির বিধানের কথায় লিখেছেন যে, পানির সাথে মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আমি মনে করি যে, সকল জ্বরের রোগী, প্লেগের রোগী, লিভারের রোগীর চিকিৎসা পানি দ্বারাই সম্ভব। এসব রোগীর পানিতে গোসল করাতে হবে, পানি পান করাতে হবে।

আমি দেখেছি, বহু রোগী পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত হয়। এসব রোগীকে যদি বেশী করে পানি ব্যবহার করানো যায়, গোসল করানো যায়- তবে খুব শীঘ্র তাদের রোগ নিরাময় হতে পারে।

বিবিধ রোগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, ছকিফ প্রতিনিধি দলের মধ্যে একজন লোক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলো। রসূল (স.) তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি তোমার কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। (মুসলিম)

রসূল (স.) বলেন, কুষ্ঠ রোগের রোগী থেকে এমনভাবে দূরে পালাও যেমন ব্যাঘ্র থেকে পালাতে থাকো। (বোখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, কুষ্ঠ রোগীর প্রতি বেশীক্ষণ তাকাবে না। (ইবনে মাজা)

রসূল (স.) বলেছেন, কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলো যেন তার এবং তোমার মধ্যে এক বর্ষা পরিমাণ অথবা দুই বর্ষা পরিমাণ ব্যবধান থাকে। (যাদুল মায়াদ)

প্লেগ রোগ সম্পর্কেও রসূল (স.) সতর্ক করেছেন। যদি প্লেগ দেখা দেয়, তবে তোমরা সেখানে অবস্থান করার সেই জায়গা থেকে অন্য কোথাও যাবে না। যদি কোথাও প্লেগের মহামারীর খবর পাও তবে সেখানে যাবে না। (যাদুল মায়াদ)

বর্তমানে বিজ্ঞান বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অনেক ছোটো খাটো রোগের সন্ধানও পেয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে এমন অনেক রোগ রয়েছে, যেসব রোগের তথ্য এখনো আবিষ্কার করা যায়নি।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক বিজ্ঞানের স্বীকারোক্তি

আমেরিকার শিকাগো শহরের ক্যামব্রিজ সেন্টারের বিশিষ্ট প্যাথলজিস্ট একথা স্বীকার করেছেন যে, ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বকে ইসলামই অবগত করেছে এবং ইসলামই এই রোগ চিহ্নিত করেছে। যখনই আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি তখনই আমার একথা মনে হয়েছে যে, আসলেই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। (হামরাজে ছেহেত)

রসূল (স.) বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে আমাদেরকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এবং সেসব রোগ থেকে মুক্ত থাকার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন। সেইসব নীতিমালা অনুসরণ করে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি।

ধর্মানুসারীদের অসুখ বিসুখ

ধর্ম হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার অন্য নাম। দেহের পুষ্টি এবং শান্তির জন্যে খাদ্য প্রয়োজন, কিন্তু এই খাদ্য যদি বেশী গ্রহণ করা হয়, তবে সেটা রোগ সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি দ্বীনদার কোনো মানুষ স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতির বাইরে সরে গিয়ে যখন জীবন কাটায়, তখন সে এরকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রসূল (স.) রমযানের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বেশী রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি অধিক সংখ্যক রোযা রাখতে শুরু করে, তবে সে দুর্বলতা অনুভব করবে, তার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যাবে এবং এক সময় সে পাগল হয়ে যাবে।

শরীয়ত বলেছে, খাদ্য কম খাও। কিন্তু কেউ যদি হঠাৎ খাদ্য কমিয়ে দেয় তবে সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

দ্বীন সব সময় আল্লাহর যিকির করার, আল্লাহকে স্মরণ করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই যিকির যদি মাত্রা ছাড়া হয়ে যায়, শারীরিক সামর্থ্যের অধিক সময় যিকিরে ব্যয় করে, তবে মস্তিষ্ক শুকিয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

মোটকথা ধর্ম হচ্ছে সতর্কতা, মধ্যপন্থা এবং ভারসাম্য সৃষ্টির অন্য নাম।

দ্বীনের বিধি বিধান সহজ করা হয়েছে। দ্বীন যেসব সুযোগ সুবিধা দিয়েছে সেসব গ্রহণ করা দরকার। তবে এটা ঠিক যে, দ্বীনের দেয়া সুযোগের সাথে আমরা নিজেরাও সুযোগযুক্ত করে নিলাম। এরকম করা হলে সেটা তখন আর দ্বীন থাকবে না।

এবাদতে স্বাস্থ্য সচেতনতা

প্রায় সকল ধর্মেই মুক্তি নাজাত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্যে কঠোর সাধনা এবং সংযম পালনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংযম সাধনা, ধ্যান করাকে অনেক বড়ো নেকী মনে করা হয়। এটাও মনের উপর এক রকমের চাপ সৃষ্টি করার নামান্তর।

কোনো কোনো লোক তো এবাদতের নামে নিজের উপর এতোটা কঠোরতা আরোপ করে যে, দেখে অবাক হতে হয়। প্রচণ্ড শীতে বা গরমে খোলা ময়দানে বসে অথবা লোহার চাদর গায়ে দিয়ে এবাদত করে। হিন্দু রোগীদেরকে আমি বিস্ময়কর

www.nagorikpathagar.org

রকমের পূজা অর্চনা করতে দেখেছি। কেউ কেউ সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ মাথা উপরের দিকে দিয়ে ঝুলে থাকে। কেউ একটি নেংটি পরিধান করে লোহার শিকের উপর বসে থাকে, শুয়ে থাকে বা নানা রকম কাজকর্ম করে। এভাবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। আমাদের শহরে একজন হিন্দু যোগী এসেছিলো। সে মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত দুপুরে খালি গায়ে একটি মাত্র নেংটি পরিধান করে খোলা মাঠে বসে থাকতো। মুখে এক টুকরো ভেজা কাপড় পরিধান করে চারদিকে কয়েক মণ কাঠ জড়ো করতো। তারপর সেই কাঠে আগুন লাগিয়ে উত্তপ্ত আগুনের মাঝখানে বসে থাকতো। আগুন নিভে না যাওয়া পর্যন্ত সে এভাবে বসে থাকতো। এভাবে কয়েকদিন একাধারে বসে থাকতো।

ঐতিহাসিক গীবন রোম সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে, ইসলামের আবির্ভাবের আগে সিরিয়ায় একজন খৃষ্টান যুবক খোলা ময়দানে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে নিজেকে সেই বাঁশের মাথায় বেঁধে রাখতো। তারপর বুকে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। এক সময় এই যুবকের মৃত্যু হলো। সেই যুগের খৃষ্টানরা তাকে আল্লাহর ওলী এবং মহাপুরুষ নামে আখ্যায়িত করলো।

ইসলাম এরকমের এবাদত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল (স.)-কে রাত জেগে এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা রসূল (স.)-এর নবুয়ত পাওয়ার প্রথম দিকের ঘটনা। তাকে প্রয়োজনীয় আরাম করতে বলা হয়েছে। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা রসূল (স.)-কে এরকম নির্দেশ দেয়ার কারণে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এরকমের কঠিন সাধনা থেকে বিরত থাকা। বরং নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই সকলের সচেষ্ট থাকা কর্তব্য। ইসলামে উল্লেখিত রকমের যোগ সাধনা এবং কঠোর এবাদতের কোনো গুরুত্ব নেই এবং এ রকমের এবাদতের কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না।

কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না।

রসূল (স.) একদিন তার একজন স্ত্রীর ঘরে রশি ঝুলানো দেখলেন। তিনি বললেন, এই রশি কেন? তাকে জানানো হলো যে, রাতে এবাদত করার সময়ে যখন ঘুম আসে তখন এই রশির সাথে আমার মাথার চুল বেঁধে নিই। তন্দ্রা এলে মাথার চুলে টান পড়ে এবং সাথে সাথে জেগে যাই। রসূল (স.) জানালেন, এরকম এবাদত করা নাজায়েয। যতোটা আমল বরদাশত করা সম্ভব, ততোটাকু আমলই করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের সকল মোফাসসের এবং বুযুর্গানে দ্বীন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঘুমও হচ্ছে এক ধরনের নেশা। ঘুম যখন প্রবলভাবে আসে সে সময় নামায আদায় করা উচিত নয়।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম স্বাস্থ্য রক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। নামাযী নামাযে দাঁড়ানোর পর যদি কারো প্রস্রাব পায়খানার বেগ হয়, তখন নামায ছেড়ে দিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে বলা হয়েছে। তা না হলে সে ব্যক্তির নামায আদায় হবে না। কারণ, যারা প্রস্রাব পায়খানা চেপে রাখে, তারা এবাদতে একনিষ্ঠ এবং আন্তরিক হতে পারে না। তাছাড়া প্রস্রাব পায়খানা চেপে রাখা হলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং নানা প্রকার রোগ হওয়ার আশংকা থাকে।

ইসলাম দীর্ঘ নামাযকে নিরুৎসাহিত করেছে। ইমামদের বলা হয়েছে, তারা যেন নামাযে লম্বা সূরা পাঠ না করে।

ইসলামে এবাদতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে। ওযরের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ক্লান্তির সময়ে, অসুস্থতার সময়ে, সফরের সময়ে নামায কাযা করার বিধান রয়েছে। ক্লান্তি এবং অসুস্থতার কারণে কেউ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অসমর্থ হলে বসে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। এমনকি শুয়ে শুয়ে এবং ইশারায় নামায আদায় করাও জায়েয করা হয়েছে। মহিলাদের জন্যে অনেক এবাদত মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। হায়েজের সময়ে তাদের নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। শরীর ও স্বাস্থ্যের অসুবিধার সময়ে এবাদত অব্যাহত রাখা হলে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে রসূল (স.) এবাদত বন্দেগীতে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই আমল অধিক পছন্দনীয় যে আমল নিয়মিত করা হয়। অর্থাৎ নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে যে এবাদত করা হয়ে থাকে। এবাদতের জন্যে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা এবং মৌনতা অবলম্বন করা অর্থাৎ চুপচাপ থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। (রিয়াদুস সালেহীন)

ইসলামে পারিবারিক জীবন

ইসলামে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আত্মীয় স্বজনের সংগে উত্তম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সংগেও সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। সম্পর্ক ছিন্নকারীর সংগে সম্পর্ক স্থাপন করাই প্রকৃতপক্ষে সম্পর্ক স্থাপন হিসেবে পরিগণিত। (বোখারী, মিনহাজুল মুসলিমিন)

আত্মীয়স্বজনের অধিকার আদায় করতে থাকো। (সূরা বনী ইসরাঈল)

যদি আত্মীয়স্বজনকে দেয়ার মতো কিছু না থাকে, তবে তাদের সংগে নরমভাবে কথা বলবে। (সূরা বনী ইসরাঈল)

মীরাছ বন্টনের সময় যদি রিশতাদার এসে পড়ে, তবে মীরাছ থেকে তাকেও কিছু সম্পদ দিয়ে দেবে এবং তার সংগে নরম ভাষায় কথা বলবে। (সূরা আন নেসা)

কেউ যদি তার এমন রিশতাদারের কাছে কিছু অর্থ চায়, যার কাছে অর্থসম্পদ রয়েছে, অথচ সে সাহায্য প্রার্থীকে না দেয় তবে কেয়ামতের দিন দোযখ থেকে একটি

www.nagorikpathagar.org

সাপ বের হবে এবং সেই সাপ এই কৃপণ ব্যক্তির গলায় শিকলের মতো ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (তিবরানী, মিনহাজুল মুসলিমিন)

হতাশায় পারিবারিক সম্পর্ক বাড়াতে হবে

আমেরিকার হেলথ সার্ভে রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে, রোগীর রোগ দেখা দেয়ার আগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হলে মহিলাদেরকে রোগ থেকে মুক্ত রাখা যায়। এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, যখন কোনো মহিলার ক্ষুধা কমে যায় এবং দৈনন্দিন জীবনে হতাশা ঘিরে ধরে তবে বুঝতে হবে যে, সেই মহিলা শীঘ্রই অসুখে পড়বে। এমতাবস্থায় ওষুধের সন্ধান না করে যদি সেই মহিলা নিজের জীবনাচরণ পরিবর্তন করে, তবে নিজেকে রোগ থেকে দূরে রাখতে পারবে। জীবনের প্রতি হতাশা দেখাদিলে এবং বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হলে পারিবারিক সম্পর্ক উন্নত করতে হবে এবং নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। (প্যারাসাইকোলজির কারিশমা)

স্বামী স্ত্রীর সুস্থ যৌন জীবন

স্বামী স্ত্রীর যৌন জীবনকে ইসলাম সওয়াবের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছে। এই কাজের ফযিলত সম্পর্কে হাদীসের গ্রন্থসমূহে অনেক কথা রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে নিজের স্ত্রীর সংগে যৌন জীবন কাটাতে হবে। এ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে লক্ষ্য করুন।

মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ক কখনো আলাদা না হওয়া সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এই সম্পর্ক স্থাপনের সময় মানবদেহে এমন রাসায়নিক উপাদান তৈরী হয়, যে উপাদান দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্য কথায় বলা যায়, সুস্থ যৌন জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষ অনেক রোগ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। এ ছাড়াও মানব দেহে নানাপ্রকার নেতিবাচক উপাদান বিদ্যমান থাকে, সেসব উপাদান দেহ ব্যবস্থাকে ভারসাম্যহীন করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চলন্ত মেশিনে লোহার তৈরী কোনো জিনিস ফেলে দেয়া হলে সেই মেশিন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থার অবসান

ক্রমাগত মানসিক চাপ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তছনছ করে দেয়। ফলে মানুষ নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। হৃদপিন্ডের অসুখ, আলসার, উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয়।

স্বামী স্ত্রীর যৌন জীবন

সুস্থ যৌন জীবন মানসিক চাপ কমিয়ে দেয়। কারণ সুস্থ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেহ পরিপূর্ণ আরাম ও শান্তি লাভ করে। মানসিক অবস্থা হয় চমৎকার। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

স্বামী স্ত্রী নিজেদের শয়নকক্ষে প্রবেশ এবং নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করার পর, পরস্পরের নিকটবর্তী হলে মানবদেহে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে উভয়ের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব দূরীভূত হয়। এতে মানবদেহে যে রাসায়নিক উপাদান তৈরী হয় তাকে বলা হয়

www.nagorikpathagar.org

এন্ড্রোফেন। যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে দেহে ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা দূর হয়। সারাদেহে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ হাসি খুশী প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠে। এই রকমের রাসায়নিক উপাদান মরফিনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মরফিন মানুষের মানসিক চাপ দূর করে মাথা ব্যথা দূর করে, নানাপ্রকার দৈহিক ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

গবেষণায় প্রমাণিত যে, কোনো কোনো মহিলার যৌন মিলনের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল হয়, তখন তাদের দেহের জোড়ায় জোড়ায় তীব্র ব্যথা হয় এবং সার্ভিক্যাল পেইন বৃদ্ধি পায়। তবে সব মহিলার এরকম হয় না।

তবে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের আগে স্বামী স্ত্রী উভয়কে টেনশনমুক্ত থাকতে হবে। স্বামী স্ত্রী প্রফুল্ল মানসিক অবস্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেই যৌন মিলনের কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করতে পারে।

স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের শুরুতেই এন্ড্রোফেন তৈরী হতে শুরু করে। এন্ড্রোফেন তৈরীর জন্যে যৌন কাজের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি অর্জনের কোনো শর্ত নেই। তবে অধিকতর যৌন তৃপ্তি এন্ড্রোফেন তৈরীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এন্ড্রোফেন দেহের ব্যথা বেদনা ক্লান্তি অবসাদ লাঘব করে। ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ ক্যান্সার এবং অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সহজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

নিয়মিত যারা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের দেহে কল্যাণকর হরমোন বৃদ্ধি পায়। যেসব মহিলার সংগে নিয়মিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, সেসব মহিলার রক্তে এস্ট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে যেসব মহিলার সংগে যৌন সম্পর্ক কম স্থাপন করা হয় অথবা মাঝে মধ্যে স্থাপন করা হয়, তাদের দেহে হরমোনের পরিমাণ কমে যায়। হরমোন নারীদেহকে দীর্ঘকাল সজীব এবং প্রাণবন্ত রাখে, নারীদেহের হাড় মযবুত করে, বেশী বয়সেও নিয়মিত মাসিক হয়। তাদের হৃদপিন্ড নীরোগ এবং সুস্থ থাকে। হরমোন নারীর মন মানসিকতার উপরও প্রভাব বিস্তার ও তার চিন্তাচেতনা সুস্থ করে মানসিক চাপ কমায়। কৃত্রিম হরমোন ব্যবহারের ফলে নারীদেহে নানা প্রকার জটিলতা দেখা দেয়। কাজেই কৃত্রিম হরমোন ব্যবহার না করাই সমীচীন। প্রাকৃতিক নিয়মে স্বামী স্ত্রীর অধিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নারীদেহে অধিক হরমোন তৈরী হতে পারে।

স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের গুরুত্ব

স্বামী স্ত্রীর সুস্থ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উভয়ের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। উভয়ের দৈহিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যৌবনে যেসব পুরুষ নারীদেহ ভোগ করে তারা বার্ধক্যে উপনীত হলেও যৌন সম্পর্ক স্থাপনে থাকে সক্ষম। পক্ষান্তরে যেসব পুরুষ যৌবনকালে স্ত্রীর সংগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, তাদের যৌন শক্তিতে খুব কম সময়ে ভাটা পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লোহার কোনো যন্ত্র যদি দীর্ঘদিন

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহার না করা হয় তবে সে অস্ত্রে মরিচা ধরে। পক্ষান্তরে যে যন্ত্র নিয়মিত ব্যবহার করা হয় সে যন্ত্র দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার উপযোগী থাকে।

যৌবনে নিয়মিত যেসব স্বামী স্ত্রী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে বার্ধক্যে উপনীত হলেও তারা এ কাজে থাকে সক্ষম। যৌন সম্পর্ক স্থাপন একটি আরামদায়ক কাজ। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর স্বামী স্ত্রীর সুখনিদ্রা নিশ্চিত হয়। উভয়ের দেহে ক্লান্তি জড়তা বিন্দুমাত্র থাকে না। অথচ ঘুমের ওষুধ সেবন করে যারা ঘুমায়, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তারা দৈহিক ক্লান্তি অবসাদ দুর্বলতা অনুভব করে। যথাসময়ে ঘুম না হওয়ার কারণ হচ্ছে মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানসিক চাপ দূর হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রী উভয়ে শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারে।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে প্রস্তুত হলেই সুষ্ঠুভাবে যৌন কাজ সম্পন্ন করা যায়। এ রকম স্বামী স্ত্রী জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারে। জীবনের সকল পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর প্রশান্তির ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দেহ মন প্রফুল্ল থাকে। মনে বিরাজ করে পরিচ্ছন্নতার অনুভূতি।

চারিত্রিক কল্যাণ ও উপকারিতা

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উভয়ে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য, নিজ স্ত্রীর সংগে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই প্রার্থিত কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে। অন্য নারীর সংগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হলে মনে অপরাধ বোধ জন্ম নেয়, ভয়-আতংক মনকে ঘিরে ধরে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও মনে জাগে অপরাধবোধ। ফলে যৌন সম্পর্কের যথাযথ কল্যাণ ও উপকারিতা পাওয়া সম্ভব হয় না।

যৌন জড় নারীদের অবস্থা

প্রাকৃতিকভাবে নারীদেহে দু'টি হরমোন পাওয়া যায়। এ দু'টি হরমোন হচ্ছে এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরোন। এই হরমোন নারীদের প্রতিমাসের মাসিক বজায় রাখে। তবে নারীদেহে এস্ট্রোজেন অধিক ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে প্রোজোস্ট্রেরোন। আমাদের দেশের নারীরা নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি অতোটা যত্নশীল নয়। এ কারণে তারা দেহে লোহা, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের স্বল্পতার শিকার হয়। দৈহিক দুর্বলতা, ক্লান্তি, অবসাদের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানদের দুধ পান করানোর সময় নারীদেহে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম এবং লোহার প্রয়োজন দেখা দেয়।

স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ঘরোয়া পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুস্থ যৌন জীবনের জন্যে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীর প্রতি নারীর আগ্রহের স্বল্পতা স্বামীকে ভ্রান্তপথে নিয়ে যেতে পারে। ফলে পারিবারিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

পুরুষ ঘরের বাইরে নানা রকম মানুষের সংগে মেলামেশা করে, নানারকম মানসিক চাপের মধ্যে তাদেরকে সময় কাটাতে হয়। ঘরে ফিরে তারা সুন্দর পরিবেশ আশা করে। যদি ঘরের পরিবেশ সুন্দর হয়, স্ত্রী এবং সন্তানরা যদি গৃহকর্তার প্রতি মনোযোগী হয়ে তাকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করে; তবে ঘরের প্রতি গৃহকর্তার আকর্ষণ বজায় থাকে। তাছাড়া সুস্থ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এই সুন্দর পরিবেশ বিশেষ প্রয়োজন।

সুস্থ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুগন্ধির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে যে, দারচিনি এবং কাদুর তেল যৌন চেতনা বৃদ্ধি সহায়ক।

পুরুষের যৌন জড়তা

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যৌন চেতনা, যৌন তাড়না রয়েছে; তবে এক্ষেত্রে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কারো দেহে বীর্যের পরিমাণ থাকে কম, কারো দেহে থাকে বেশী। টেস্টোটেরন হরমোন যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এর স্বল্পতা পুরুষের দেহে যৌন চেতনা কমিয়ে দেয়। যৌন জড়তা সৃষ্টি করে। তাছাড়া নিয়মিত এবং পরিমিত খাদ্য গ্রহণ না করা হলেও যৌন চেতনা কমে যায়। গাজরের মধ্যে প্রচুর ভিটামিন 'এ' রয়েছে। নিয়মিত গাজর খেলে দেহে চৌন চেতনা বৃদ্ধি পায়। গাজর দেহে ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামও বৃদ্ধি করে দেহের দুর্বলতা, ক্লান্তি অবসাদ দূর করে এবং দেহের স্থুলতা কমাতে সাহায্য করে। সুষম খাদ্য যৌন চেতনার প্রধান সহায়ক।

ঘরের পরিবেশ এবং স্ত্রীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুন্দর পরিপাটি থাকার গুরুত্ব অসামান্য। স্বামী যখন বাইরে থেকে ঘরে ফেরে সে সময় স্ত্রীকে যদি পরিপাটি অবস্থায় দেখে, তবে তার মন খুশী হয়। কাজেই স্ত্রীদের এমনভাবে থাকতে হবে যেন স্বামীর চোখে তাদের আকর্ষণীয় মনে হয়। স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ আচরণও স্বামী স্ত্রীর সুস্থ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পোশাক ব্যবহারে রুচিহীনতার পরিচয়, স্বামীর প্রতি অমনোযোগিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে বিরূপ এবং বিরক্ত করে। এতে করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যৌন আকর্ষণ কমে যায়।

ইসলামের পারিবারিক বিধানে বৃদ্ধ পিতামাতাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে বলা হয়েছে। বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মীয় বিধানে এরকম উদাহরণ পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে হজ্জ এবং ওমরাহ পালনের সওয়াব পাওয়া যায়। পিতামাতার সামনে দিয়ে পথ চলার সময় না হাঁটা, রুক্ষ স্বরে তাদের সংগে কথা না বলার আদেশ দেয়া হয়েছে। পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে বলা হয়েছে। তাদের প্রতি এরকম আচরণ করতে হবে যেন তারা উহ্ শব্দ উচ্চারণ না করেন। কোরআনে এ আদেশ দেয়া হয়েছে। অথচ ইউরোপীয়দের জীবনে আমরা কি দেখতে পাই?

www.nagorikpathagar.org

মানসিক অস্থিরতা

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কেউ যদি মানসিক অস্থিরতার শিকার হয় তবে তার অসুস্থ হওয়ার আশংকা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে চারগুণ বৃদ্ধি পায়। আরো প্রমাণিত হয়েছে, যেসব মহিলার স্বামী দূরে অবস্থান করে অথবা যেসব মহিলা বিধবা তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার আশংকা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, মানসিক অস্থিরতার পরিবেশ মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমাদের সমাজে বর্তমানে এ রকম রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, আমাদের সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের নতুন বংশধররা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করে না, প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এর ফলে তারা হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে, বক্ষব্যাধি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গর্ভবতী মায়ের মানসিক অবস্থা

মানব মস্তিষ্কের যোগ্যতা শিশুর জন্মের আগেই নির্ধারিত হয়ে যায়। আমেরিকান ডাক্তারদের সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী মাতৃ জরায়ুতে শিশুর দশ সপ্তাহ বয়সের সময় থেকেই শিশুর মস্তিষ্কের গঠন শুরু হয়ে যায়। সে সময় মস্তিষ্কের গঠনের যে নকশা তৈরী হয় সেটা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শেখার যোগ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ গবেষণায় জানা গেছে যে, মানব মস্তিষ্ক জন্মের সময় একটি গোলাকার পাথরের মতো থাকে, প্রকৃতি সেটাকে একটি অবয়ব বা আকৃতি দান করে। অভিজ্ঞতায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাতৃ জরায়ুতে দশ সপ্তাহ বয়সের সময় শিশুর মস্তিষ্কে যে গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়, তার ওপর মায়ের মানসিক অবস্থা এবং খাদ্যদ্রব্য প্রভাব বিস্তার করে। মা কি খায় এবং কিভাবে জীবন কাটায় সেই অবস্থা বিবেচিত হয়। কাজেই সে সময়ে মাকে টেনশন থেকে মুক্ত রাখার পাশাপাশি খাদ্য দ্রব্যের ব্যাপারে যত্নশীল থাকতে হয়। শিশুর জন্মের পর দশ বছর যাবত তার মস্তিষ্কের বিকাশও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জন্মের পর শিশুর মনে কোটি কোটি নতুন কালেকশন তৈরী হয়। মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে দশ বছর বয়স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ে যদি শিশুকে প্রভাবিত করার মতো পরিবেশের ব্যবস্থা না করা যায়, তবে শিশুর মস্তিষ্কের অবস্থা প্রভাবিত হবে। অভিজ্ঞতায় আরো প্রমাণিত হয়েছে, যেসব শিশু জন্মের পর প্রথম কয়েক বছর পিতামাতার সরাসরি তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত থাকে তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ প্রভাবিত হয়। শিশুর ভাষা শিক্ষার বয়স জন্ম থেকে তিন বছর পর্যন্ত। কাজেই শিশুকে যদি ভিন্ন কোনো ভাষা আপনি শেখাতে চান, তবে দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই সেই ভাষার সংগে পরিচিত করুন। (আমেরিকান উইমেন হিস্ট্রি রিপোর্ট)

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ইসলাম বিবাহকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছে। এটা সুন্নত এবং ক্ষেত্র বিশেষ ওয়াজেব বলা হয়েছে। কিন্তু ইউরোপের ব্যর্থ বিবাহসমূহ ইউরোপীয়দেরকে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করছে। ইসলাম এক মহান ধর্ম, এই ধর্ম মুসলমানদেরকে বিয়ের মতো ফলপ্রসূ চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

www.nagorikpathagar.org

বিবাহিতদের সুস্থতা

আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান তবে বিবাহ করুন। আমেরিকান চিকিৎসকদের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অবিবাহিত লোকদের চেয়ে বিবাহিত লোকেরা অধিক সুস্থ থাকে। গবেষণা অনুযায়ী বিবাহিত লোকেরা নেশাজাত দ্রব্য কম ব্যবহার করে। তারা নিজেদের খাদ্য দ্রব্যের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখে। এ ব্যাপারে তাদের জীবনসংগী তাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তারা নিয়মিত খেলাধূলা করে। এ সম্পর্কে ১৯ হাজার ব্যক্তির ওপর পরিচালিত গবেষণায় প্রমাণিতও হয়েছে যে, বিবাহিত লোকেরা অবিবাহিত লোকদের তুলনায় উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ব্যথা ইত্যাদি রোগে কম আক্রান্ত হয়। (দৈনিক জং)

(সুখী দম্পতির) আয়ু বৃদ্ধি পায়

বৃটিশ বিবাহ বিশেষজ্ঞরা ইউরোপ এবং আমেরিকায় গবেষণার পর এ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, বিবাহিত লোকেরা বেশীদিন বেঁচে থাকে। তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, শারীরিক এবং মানসিক রোগে কম আক্রান্ত হয়। তারা মানসিক অবসাদে কম ভোগে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা স্থিতিশীলতার মধ্যে থাকে। পক্ষান্তরে, অবিবাহিত অথবা বিবাহ বিচ্ছেদসম্পন্ন লোকেরা এসব ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকার সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণায় আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনে যারা ব্যর্থ তারা নানারকম শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এমসি আলস্টার নামের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বৃটেনে প্রতি বছর ৩ লাখ ৬৪ হাজার নারী পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে প্রভাবিত হয়। দেড় লাখ জারজ সন্তানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দাম্পত্য জীবনে অস্বাভাবিক সম্পর্কের কারণ তারা কর্মক্ষেত্রে প্রায়শঃই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

বিবাহের তিনটি সুফল লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, সুস্থ দাম্পত্য জীবন প্রতিদিনের অস্থিরতা এবং চিন্তা চেতনায় রক্ষাকবচরূপে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত বিবাহিত লোকদের স্বাস্থ্য সাধারণত অবিবাহিত লোকদের চেয়ে ভালো থাকে। তৃতীয়ত বিবাহ নানারকম নেশা যেমন মদপান, অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং ধূমপান থেকে রক্ষা করে।

এমসি আলস্টার আরো বলেছেন, যৌন সম্পর্কের ব্যর্থতার কারণে শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও মানসিক অসুস্থতাও দেখা দেয়। গবেষণায় আরো জানা গেছে যে, ১৯৭৩ সালে বৃটেনের ১০ হাজার বিবাহিত মানসিক রোগীর মধ্যে ২৫৭ জনকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একই বছর ২৫৭ জন অবিবাহিত ব্যক্তিকে মানসিক চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, হৃদরোগে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত লোকের সংখ্যা বেশী। এছাড়া বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিত লোকেরা অধিকসংখ্যায় ক্যান্সার, আত্মহনন এবং অন্যান্য ঘাতক ব্যাধিতে বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে শিশুরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমসি আলস্টার তাঁর গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বিবাহের ব্যর্থতার

www.nagorikpathagar.org

কারণ সম্পর্কে আমাদের বেশী করে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। দাম্পত্য জীবনে প্রতিদিন যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেসব সমস্যা ভালোভাবে সমাধান করাই সফল দাম্পত্য জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। ১৫৯৬ জন বিবাহ বিচ্ছেদকারীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে ভর্তি করা হয়েছে।

সন্তানের ওপর পিতামাতার প্রভাব

যেসব পিতামাতা গান বাজনায় আগ্রহী থাকে, যারা সব সময় প্রেমের গান শোনে, তাদের মনে রাখতে হবে যে তাদের এ আচরণের প্রভাব তাদের সন্তানের ওপর পড়বে। কারণ, পিতামাতা যখন খোদাভীরু, এবাদাত গোযার মোত্তাকী পরহেযগার হবে, হালাল জীবিকা ভক্ষণ করবে এবং হারাম থেকে দূরে থাকবে– তাদের সন্তান হবে মোহাম্মদ বিন কাসিমের মতো, তারেক ইবনে যিয়াদের মতো, মুজাদ্দিদে আলফেসানীর মতো, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়ার মতো, মওলানা আহমদ আলী লাহোরির মতো, সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বোখারীর মতো, মুফতী মাহমুদের মতো, মওলানা হক নওয়ায জংগীর মতো। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হিসেবে পিতামাতা যখন ফাসেক এবং দুষ্কর্মপরায়ণ হবে, হারাম খাবে, গান বাজনায় মশগুল থাকবে, তাদের সন্তান গায়ক হবে শিল্পী হবে, চোর হবে ডাকাত হবে, নেপোলিয়ন হবে হিটলার হবে, চেংগিশ খান হবে হালাকু খান হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুদ্ধি বিবেচনা দান করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ

এ রকম অবস্থায় পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং দাম্পত্য সম্পর্কের একনিষ্ঠতা, পবিত্রতা কিভাবে টিকে থাকতে পারে। যেসব মহিলা স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করে তাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া পুরুষের প্রয়োজন হয় না। বিয়ে ছাড়াই যারা সহজে পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে তারা মনে করে বিয়ে মানেই ঝামেলা। আধুনিক জীবনদর্শন এবং বস্তুবাদী চিন্তাধারা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক যে পাপ এ রকম ধারণা বাতিল করে দিয়েছে। এ রকম সম্পর্কের কারণে তাদের মনে কোনো অপরাধ বোধও জাগে না। সমাজও এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, এই শ্রেণীর মহিলাদের তারা ঘৃণা করে না বা শাস্তিযোগ্য মনে করে না। জর্জ লিন্ডসে আমেরিকার মেয়েদের সম্পর্কে লিখেছেন, মেয়েরা বলে আমি কেন বিয়ে করবো? গত দুই বছর আগে আমার যেসব সাথী বিয়ে করেছিলো তাদের দশজনের মধ্যে পাঁচজনের তালাক হয়ে গেছে। আমি মনে করি, বর্তমান যুগে প্রতিটি মেয়েরই স্বাধীনভাবে প্রেম করার অধিকার রয়েছে। আমরা জন্ম নিরোধের উপায় জানি। কাজেই একটি জারজ সন্তান জন্ম দেয়ার সমস্যা এবং জটিলতার আশংকা থেকেও আমরা মুক্ত। আমরা মনে করি পুরনো আমলের ধ্যান ধারণা আধুনিক কালের চিন্তা বিশ্বাসের কাছে পরিবর্তন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

উপরোক্ত চিন্তাভাবনা যেসব মেয়ে করে তারা নিঃসন্দেহে নির্লজ্জ। এদেরকে বিয়ের জন্যে বাধ্য করাতে পারে গভীর প্রেম। কিন্তু সেই প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রকৃত গভীরতা থাকে না। সত্যিকার প্রেম থাকে না। সাময়িক আকর্ষণ প্রমাণিত হয় এক

www.nagorikpathagar.org

সময়ের গভীর প্রেম। দৈহিক মেলামেশার পর ক্রমেই আকর্ষণ কমে যায়। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। একজনের মন মেযাজের বা ব্যবহারের সামান্য বৈপরীত্য বা ত্রুটিই দোষণীয় হয়ে উঠে অন্যজনের চোখে। পরিণামে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

লিন্ডসে আরো লিখেছেন, ১৯২২ সালে ডেনভোরে প্রতিটি বিয়ের বিপরীতে একটি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। দু'টি বিয়ের বিপরীতে আদালতে একটি তালাকের মামলা রুজু হয়েছে। এ অবস্থা শুধু ডেনভোরেই যে ঘটেছে তা নয়, বরং সকল শহরের অবস্থা প্রায় একই রকম।

তালাক এবং বিচ্ছেদের ঘটনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে বিয়ের সংখ্যার সমানুপাতিকহারে বিচ্ছেদ বা তালাকের মামলাও রুজু হতে থাকবে।

ডেট্রয়েটের একটি খবরের কাগজে এ সম্পর্কিত একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির নাম ফ্রি প্রেম। পত্রিকাটি লিখেছে, বিয়ের সংখ্যাস্বল্পতা, তালাকের সংখ্যাধিক্য, বিবাহ বহির্ভূত একত্র বসবাসের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা পশুত্বের দিকে ফিরে যাচ্ছি। সন্তান জন্মদানের স্বভাবসুলভ আকাঙ্ক্ষা লোপ পাচ্ছে। জন্মগ্রহণ করা শিশুদের প্রতি উদাসীনতা বাড়ছে। সভ্যতা সৃষ্টির জন্যে, স্বাধীন সরকার গঠনের জন্যে পরিবার এবং গৃহ যে প্রয়োজন– এ ধারণার বিলুপ্তি ঘটছে।

ক্রমবর্ধমান বিবাহ বিচ্ছেদ বন্ধ করার জন্যে পরীক্ষামূলক বিবাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কিন্তু এটা আসল রোগের চেয়েও মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষামূলক বিবাহ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রী বিবাহ না করেই একত্রে বসবাস করবে। যদি উভয়ের মনমানসিকতা মিলে যায়, তবে বিবাহ বন্ধনে তারা আবদ্ধ হবে। যদি মিলমিশ, সমঝোতা, সহমর্মিতা গড়ে না উঠে, তবে দু'জন দু'দিকে চলে যাবে। আবার নতুন সঙ্গী খুঁজতে শুরু করবে। পরীক্ষামূলক বিয়ের ক্ষেত্রে সন্তান না নেয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়। কারণ, সন্তান জন্মগ্রহণ করলে বিয়ে করতে হবে। রাশিয়ায় এ রকম ব্যবস্থার নাম দেয়া হয়েছে ফ্রি লাভ।

হায়েয ও নেফাস চলাকালীন সহবাস নিষিদ্ধ

শরীয়তের সুনির্দিষ্ট কিছু বিধান রয়েছে। এক সময় একটি খাবার হালাল হয়ে থাকে, সেই খাবার অন্য সময় হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার করা এবং স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ। ঠিক তেমনি স্ত্রীর হায়েয নেফাস চলাকালে তার সাথে সহবাস করা যাবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মহিলাদের হায়েযের সময় যে রক্ত বের হয় সে রক্ত অত্যন্ত বিষাক্ত, তেজোদ্দীপ্ত এবং ঘৃণ্য। এই রক্ত নারীর দেহের অংশ নয়। কাজেই এই রক্ত বের হওয়া জরুরী।

এক ব্যক্তি প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতো। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল হয়নি। আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এলো। রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস

www.nagorikpathagar.org

করে জানা গেলো, হায়েযের সময় সে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করেছিলো। তারপর থেকে তার এ রকম অবস্থা হয়েছে।

এক মহিলার ঘাড়ের আশেপাশে দানা বের হয়েছে। ফুসকুড়ি হয়েছে সব সময় জ্বলত চুলকাতো। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে মহিলার স্বামী জানালো যে, তার সাথে আমি তার হায়েজের সময় যৌন সঙ্গম করেছিলাম।

এক লোকের প্রস্রাবের পথ বন্ধ হয়ে গেলো। অন্য উপায়ে অর্থাৎ ডুশ দিয়ে কিছু প্রস্রাব বের করা হতো। আবার প্রস্রাব আটকে থাকতো। আপনা আপনি প্রস্রাব হতো না। অনুসন্ধানে জানা গেলো যে, সে হায়েযের সময় স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করতো।

ইসলাম শান্তি সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলামের সাথে বিদ্রোহ করা হলে রোগ হয় এবং অশান্তি বৃদ্ধি পায়। হায়েযের সময় নেফাসের সময়ে মহিলাদের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করা হলে যেসব রোগ হয় তা নিম্নরূপ–

(১) সিফিলিস, (২) গণোরিয়া, (৩) গ্যাংকরয়েড, (৪) পিনটা, (৫) রাইটারস ডিজিজ, (৬) প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া, (৭) প্রস্রাব আটকে যাওয়া, (৮) প্রস্রাবের নালিতে পাথর হওয়া, (৯) মহিলাদের হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়া, (১০) মহিলাদের যৌনাঙ্গে যন্ত্রণা ও জ্বালাপোড়া, (১১) মহিলাদের জরায়ু অকোজো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এসব রোগ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলাদা গ্রন্থ রয়েছে। এসব রোগ তখনই দেখা দেয়, যখন স্বভাবের বিরুদ্ধে মানুষ মহিলাদের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটায়।

পরিবার পরিকল্পনা

রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব প্রকাশ করবো। (যাদুল মায়াদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যার সন্তান সংখ্যা অধিক। (যাদুল মায়াদ)

রসূল (স.) অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে তার উম্মতকে তাকিদ দিয়েছেন। (মামুলাতে নববী)

রসূল (স.) অধিক সংখ্যক উম্মত পছন্দ করেছেন। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।

বর্তমানে আমরা সন্তান সংখ্যা কমিয়ে সচ্ছল জীবন যাপনের জন্যে সদা চেষ্টা করে যাচ্ছি। অথচ এটা হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র, একটি চক্রান্ত। মুসলমানের সংখ্যা কমাতে কমাতে এক সময় দুনিয়াকে মুসলমান শূন্য করাই এই চক্রান্তের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য।

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব মহিলা সন্তান সংখ্যা কমানোর জন্যে ওষুধ ব্যবহার করে, তাদের অবস্থা হয় নিম্নরূপ।

www.nagorikpathagar.org

একজন মহিলা প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতো। তাকে অনেক রকম চিকিৎসা করানো হয়েছে। পীর ফকিরের কাছে নেয়া হয়েছে, কিন্তু সুস্থ হয়নি। সেই মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। মহিলা কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানালো যে, মহিলা তার যৌনাঙ্গে টিউবেকটমি পরিধান করেছে। টিউবেকটমি পরিধান করার পর থেকেই তার অসুস্থতা শুরু হয়েছে। মহিলা নিজেই তার রোগের কারণ বুঝতে পেরেছে। মহিলার যৌনাঙ্গ থেকে টিউবেকটমি খুলে ফেলা হলো। এতে মহিলা সুস্থ হয়ে গেলো।

একজন মহিলার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। অনুসন্ধানে জানা গেলো যে, মহিলা দুইমাস যাবত জন্মনিয়ন্ত্রণের বটিকা সেবন করছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বটিকা খেয়ে কোনো কোনো মহিলা বেশ মোটা হয়ে যায়। কারো আভ্যন্তরীণ জটিল রোগও দেখা দেয়।

মোটকথা, আমরা প্রকৃতিবিরুদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের শাস্তি দেবেন। কাজেই আমাদের উচিত আল্লাহর আইনের প্রতি ফিরে আসা অথচ আমরা আল্লাহর আইনের বিপরীত পথে দ্বিধাহীনভাবে এগিয়ে চলেছি।

গাইনোকোলজিস্টদের সতর্কতা

আমেরিকার মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট মেডিকিউন মহিলাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, সাবধান! যদি সন্তান সংখ্যা কমাতে চান, তবে অসংখ্য রোগ আপনাদের ঘিরে ধরবে। এতে ক্রমাগত নানা রোগে জর্জরিত হবেন। এমনকি ক্যান্সারের আশংকাও দেখা দেবে।

বায়ু সেবনের উপকারিতা

বায়ু সেবন এবং পায়চারি করায় কি উপকার পাওয়া যায়? এর মাধ্যমে দেহে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, দেহের প্রতিটি অংশে অক্সিজেন পৌঁছে, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কে চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায়, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া পায়চারি করা এবং হাঁটার মাধ্যমে দেহে হরমোন তৈরী হয়। শারীরিক নড়াচড়া এবং স্পন্দনের মাধ্যমে দেহের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক গতি লাভ করে। যেসব লোক সারাদিন শুয়ে বসে থাকে এবং কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে সওয়ারীতে বা যানবাহনে আরোহণ করে যায়– তাদের কিডনি কর্মক্ষম থাকে না। এর ফলে নানা রকম রোগের উপসর্গ তৈরী হতে পারে।

ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে নিয়মিত পায়চারি করা রক্তচাপ বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করে। এই পায়চারির মাধ্যমে নাড়ির গতি বা স্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হয় না। সৌভাগ্যক্রমে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার মন্ডপ্রেল আনজেহানি অসংখ্য মানুষের নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষার রেকর্ড রেখেছেন। তাঁর রেকর্ড থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাড়ির গতি যতো দ্রুত হবে জীবনের মেয়াদ ততোই হবে সংক্ষিপ্ত। এটা ঠিক দুই দুইয়ে চার হওয়ার মতো বিষয়। একটি ঘড়ি যতো দ্রুত চলাচল করবে ততোই তার ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। নাড়ির দ্রুততার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু ত্বরান্বিত করা।

www.nagorikpathagar.org

পায়চারি এবং হাঁটা হাঁটির আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে এর মাধ্যমে রক্তের কোলেস্টরল বৃদ্ধি পায় না। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে। এর ফলে সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত হতে পারে।

পঁচাত্তর বছর বয়স্ক লোকের কাহিনী

এমন অনেক পেশা রয়েছে যেসব পেশায় হাতের ব্যবহার বেশী করতে হয়। ৭৫ বছর বয়স্ক একজন লোক অফিসের দরোজা জানালা, কাঁচ ইত্যাদি পরিষ্কার করতেন। তাকে তার হৃদপিন্ডের সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন কিসের সমস্যা? এ রকম প্রশ্নই ছিলো তার কাছে অবান্তর। কারণ, তার হৃদপিন্ডে কোনো সমস্যাই ছিলো না। সেই ব্যক্তি ত্রিশ চল্লিশ বছর যাবত নিজের হাত দ্বারা অফিসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পন্ন করতেন। তিনি এর সুফল লাভ করেন। তার হৃদপিন্ড এবং ফুসফুস থাকে রোগমুক্ত। তার শ্বাস প্রশ্বাস ছিলো স্বাভাবিক এবং তার গৃহীত অক্সিজেন দেহের সকল অংশে যথারীতি পৌছে যাচ্ছিলো। ফলে তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন। কাঠ মিস্ত্রিদের কাজও হাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যারা অর্কেস্ট্রা বাজায় এবং যারা পরিচ্ছন্নতার কাজ করে, তাদের কাজের মধ্যে দীর্ঘায়ু লাভের রহস্য লুকিয়ে থাকে।

এক রেলওয়ে কর্মচারীর কাহিনী

রেলওয়েতে ইঞ্জিন এবং বগি দেখা শোনার দায়িত্ব এক ব্যক্তি পালন করছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত তিনি এ দায়িত্ব পালন করার পর অবসর নেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, অবসর নেয়ার পর শান্তিতে জীবন কাটাবেন। তিনি সব সময় বেকার শুয়ে বসে সময় কাটাতেন। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিলো। কিন্তু এক বছরের বেকারত্ব তাকে গুরুতর রোগে আক্রান্ত করলো। তার হৃদপিন্ডে সমস্যা দেখা দিলো। ফলে তিনি এক সময় সেই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

কুস্তিগীরদের সমস্যা

পেশাদার কুস্তিগীর পাহলোয়ানরা যতোদিন যাবত পেশায় ব্যস্ত থাকে ততোদিন তারা সুস্থ থাকে। কিন্তু পেশা ছেড়ে অলস জীবন যাপন করতে শুরু করলেই তাদের জীবনের আয়ু কমে যায়। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব কুস্তিগীর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাদের পেশা অব্যাহত রেখেছে, তারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে। কিন্তু যারা অলস অকর্মণ্য জীবন যাপন করতে শুরু করেছে তারা মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেছে। যেসব লোক ফ্লাটের উঁচু তলায় বসবাস করে এবং প্রতিদিন সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করে, তাদের এই উঠাবসার মাধ্যমে ব্যায়ামের কাজ সম্পন্ন হয়। তারা নীচতলায় বসবাসকারীদের তুলনায় দেহকে অধিক কাজে লাগায়। কাজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠানামাকে কষ্টকর কাজ না ভেবে এর উপকারিতা গ্রহণ করা আবশ্যক।

মুসলমানের লাশ এবং কাফেরের লাশ

ইসলামের নীতিমালা সহজ সরল এবং সাদাসিধে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বিদ্যমান। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইসলাম মানুষের জন্যে সহজ

www.nagorikpathagar.org

সাবলীলভাবে সবকিছু সম্পন্ন করার বিধান দিয়েছে। এতে ধনী গরীব সবাই উপকৃত হতে পারে।

মুসলমান এবং কাফেরের লাশের সৎকারের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। একজন মুসলমানের মৃত্যুর পর সাদাসিদে সাধারণ এক টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে কাফন দেয়া হয়। তারপর অনাড়ম্বর পরিবেশে কবরে দাফন করা হয়।

পক্ষান্তরে ইউরোপে বেঁচে থাকা যেমন কঠিন এবং কষ্টকর, তেমনি মৃত্যুবরণও কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রফেসর ব্লেক লিখেছেন, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় ইউরোপে মৃত্যুবরণ করাও দুর্মূল্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাদ্রী এসে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার আগে লাশ দাফন করা যায় না। কিন্তু পুরোহিত এসে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা পর্যন্ত যেসব নিয়ম রয়েছে, সেসব নিয়মকে কঠিন শাস্তি বলতে হয়। (প্রফেসর ব্লেক, আপার গেজেট)

ইউরোপে মৃতদের শ্রেণীভেদ

ইউরোপে মৃতদেহকে উন্নতমানের থ্রি পিসে জড়ানো হয়। উন্নত মানের টাই পরিধান করানো হয়। তারপর বহু মূল্যবান একটি সিন্দুকে লাশ ঢুকিয়ে দাফন করা হয়। দাফন কাজের আগে মুর্দাকে গোসল দেয়া, ঘর থেকে কবরস্থান পর্যন্ত নেয়া, পোশাক পরিধান করানো, সুগন্ধি মাখানো, সিন্দুক তৈরী করে লাশ সিন্দুকে রাখা এবং দাফন করা ইত্যাদি প্রতিটি কাজের জন্যে সমাজ কল্যাণ সংস্থা আলাদা বিল আদায় করে। যেখানে মুর্দাকে দাফন করা হয় সেই জমি কিনে নিতে হয়। কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশে জমি কেনার নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। স্থায়ীভাবে জমি কেনা হলে অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হয়, এর ফলে কবর সংরক্ষিত থাকে। অস্থায়ীভাবে কেনা কবরের জায়গায় অন্য মুর্দা দাফন করা হয়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থার অধীনে মুর্দাকে দামী থ্রি পিস পরিধান করানো হয়, দামী টাই এবং বহু মূল্যবান কাঠের সিন্দুকে দাফন করা হয়।

তৃতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে মৃতদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। বর্তমান যুগে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, জমির স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতে মৃতদের অবস্থা

বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ ভারতে রুসম রেওয়াযের কমতি নেই। ধনী দরিদ্র সবাই নানারকম রুসম রেওয়াযের নিগড়ে বাঁধা।

বিত্তবান হিন্দুর শেষকৃত্য

একজন বিত্তবান হিন্দুর মৃত্যুর পর পন্ডিতজী মহারাজের উপস্থিতি, খাঁটি মাখন দিয়ে তৈরী ঘি, চন্দন কাঠ, নানা প্রকার খাদ্য পানীয় সংগে দেয়ার রেওয়ায পালন অপরিহার্য। এসব রেওয়ায পালনের পর সেই হিন্দুর মৃতদেহ পোড়ানো হয়।

www.nagorikpathagar.org

গরীব হিন্দুদের শেষকৃত্য

একজন দরিদ্র হিন্দুর মৃত্যুর পর দরিদ্র এবং বংশধর নেই এরকম একজন পন্ডিতজীকে উপস্থিত থাকতে হয়। তারপর সস্তা দামের তেল, সস্তা দামের কাঠ এবং কিছু সাধারণ খাদ্যসামগ্রী সংগে দিয়ে সেই মৃতদেহ আগুনে পোড়ানো হয়।

দুঃস্থ নিঃস্ব হিন্দুদের শেষকৃত্য

মৃত্যু পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার মতো টাকা যাদের থাকে না, এক বেলা খাবার যাদের কষ্টকর অবস্থায় জোটে, তাদের পক্ষে নানারকম আনুষ্ঠানিকতা পালন করা সম্ভব হয় না। এ রকম দুঃস্থ নিঃস্ব হিন্দুদের আংগুল কেটে আগুনে পোড়ানো হয়। তারপর মৃতদেহ গংগায় ভাসিয়ে দেয়া হয়। কংকালের ব্যবসায় নিয়োজিত লোকেরা সেই মৃতদেহ নদী থেকে তুলে নিয়ে গোশত জ্বালিয়ে ফেলে, তারপর কংকাল বা দেহকাঠামো বিক্রি করে দেয়। (আমার দেখা ইউরোপ, সৈয়দ নুর খান ছাদিদি)

ভেবে দেখুন পাঠক, ইসলামের অনুসারীদের দুনিয়ার জীবন যেমন সহজ, মৃত্যুর পরও সহজ নিয়ম কানুনের মাধ্যমে দাফন সম্পন্ন হয়।

আমেরিকান হাসপাতালের গবেষণা

আমেরিকার একটি বড়ো হাসপাতালে প্রায় ৯ হাজার রোগীর ওপর মেডিটেশন সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছিলো। এসব রোগীর মধ্যে এরকম মহিলাও ছিলো যারা মা হতে পারেনি। এসব রোগীকে মেডিটেশন করানো হয়। মেডিটেশনের ষষ্ঠ দিনের কর্মসূচী শেষ করার পর মাতৃত্ব বঞ্চিত শতকরা ৩৬ ভাগ মহিলা গর্ভধারণ করে। অন্য রোগীরাও আরাম অনুভব করে।

যারা বছরের বেশীর ভাগ সময় মেডিটেশনের মধ্যে কাটায়, তাদের দেহে ডিএইচইএ হরমোন সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশী পাওয়া যায়। বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে এই হরমোন দেহে কমতে থাকে। যারা বেশী সময় মেডিটেশন করে এ রকম লোক খুব কমই অসুস্থ হয়। তারা হৃদরোগ বা হার্ট এটাক থেকে নিরাপদ থাকে।

বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের ওপর মেডিটেশনের পরীক্ষা করেছেন। মানসিক রোগীরা সব সময় যেহেতু নেতিবাচক চিন্তা করেন, এ কারণে তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, গভীর নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সংগে মেডিটেশন করা হলে মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ, অশান্তি দূর হয়ে যায়।

মানসিক রোগীরা মেডিটেশনের শক্তিতে সুস্থ হয়ে উঠে। এই শক্তিও বিজ্ঞানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপনি যখন কোনো প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় অথবা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন আপনার মস্তিষ্ক এডরিনাল গ্লান্ডকে হরমোন সরবরাহ করার ইংগিত দেয়। এতে আপনার হৃদপিন্ড ভারী হয়ে উঠে, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়, রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায়, দেহ ঘামে সিক্ত হয়ে উঠে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রশান্তি অনুভব করে। মানুষের ভেতর যে যুদ্ধ চলতে থাকে সে যুদ্ধকে থামিয়ে দেয়। আপনি

www.nagorikpathagar.org

যদি মেডিটেশনয় অভ্যস্ত হন তবে, ওপরে উল্লেখিত অবস্থার ওপর আপনি খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হবেন।

এই কাজ খুব সহজ

মেডিটেশন কোনো বিস্ময়কর বিষয় নয়, কোনো ওষুধের বিকল্পও নয়। মেডিটেশন কোনো প্রকার যৌন রোগের চিকিৎসা করতে পারে না, দেহের জখম আরোগ্য করতে পারে না। মেডিটেশন দ্বারা তারাই উপকার লাভ করতে পারে, যারা উপকার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। মেডিটেশনের অনুশীলন করা যায়। মেডিটেশন করার জন্যে কোনো প্রকার ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, এর মন্দ কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়াও নেই।

প্রতিদিন বিশ মিনিট মেডিটেশন করা মানুষের জন্যে সহজ এবং কল্যাণকর। মেডিটেশনের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়। মানুষের মনে সমস্যা সমাধানের চিন্তা জাগ্রত হয়। মন্দ অবস্থায়ও মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কেউ যদি মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় এবং কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম না হয়- তবে মেডিটেশনের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। মেডিটেশন পালনের মাধ্যমে মানুষের মনে আনন্দ জেগে উঠে। মানুষের মনে তখনই আনন্দ অনুভূত হয় যখন আনন্দদায়ক কোনো ঘটনা ঘটে। যেমন আপনি ভালো একটা চাকরি পেয়েছেন অথবা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো জিনিস কিনতে পেরেছেন। যদি কোনো কারণ ছাড়াই আপনার মনে খুশীর পরশ জেগে উঠে তবে, আপনি তাকে আনন্দের চেয়ে বড়ো কোনো উপাধি দিতে পারেন।

রসূল (স.)-এর জুতো

হযরত ইবনে বোরায়দা (রা.) তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাজ্জাশী রসূল (স.)-এর ব্যবহারের জন্যে একজোড়া কালো রঙের মোজা পাঠিয়েছিলেন। রসূল (স.) সেই মোজা পরিধান করেন। (ইবনে মাযা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.)-কে আমি এ রকম চামড়ার জুতো পরিধান করতে দেখেছি যে জুতোয় পশম ছিলো না। অর্থাৎ চামড়া শোধন করার পর সেই চামড়া দিয়ে তৈরী করা জুতো পরিধান করতেন। (বোখারী)

একজন সাহাবী বলেন, হযরত আনাস (রা.)-কে আমি রসূল (স.)-এর জুতো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর জুতোয় দু'টি ফিতা ছিলো। (তিরমিযী)

রসূল (স.)-এর দুইখানি জুতো ছিলো চামড়ার তৈরী এবং দুইখানি জুতোই ছিলো সমান। বর্তমানে উঁচু হিলের জুতো এবং রবারের তৈরী জুতো কি রকম ক্ষতি করছে সেটা ধারণাও করা যায় না। একজন ফিজিও থেরাপিস্টের সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো যে, উঁচু হিলের জুতো ইহুদীদের ষড়যন্ত্র। এই জুতো পরিধানের মাধ্যমে নারীদের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং তারা পুরুষদের সঙ্গে অবৈধ যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

যদি আমরা রসূল (স.)-এর আদর্শ অনুযায়ী জুতো তৈরী করি এবং চামড়ার জুতো ব্যবহার করি, তবে অনেক প্রকার রোগ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হবো।

চমকে দেয়ার মতো অভিজ্ঞতা

রসূল (স.) চামড়ার জুতো ব্যবহার করতেন। যখন থেকে আমরা এই জুতো ত্যাগ করেছি, তখন থেকে ক্রমাগত পেরেশানির মধ্যে রয়েছি। ফ্যাশন রক্ষা করতে গিয়ে আমরা সুন্নত থেকে দূরে সরে গেছি। মানুষ শুরু থেকেই দেহ মনের সুখের প্রতি সচেষ্ট। বিভিন্ন যুগে মানুষ তার শারীরিক সুখের জন্যে, সৌন্দর্যের জন্যে নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে। প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে জীবন কাটাতো সেকথা সবাই জানে। সে সময় মানুষের দেহে পোশাক ছিলো না, পায়ে জুতো ছিলো না। এভাবেই তারা জীবন যাপন করতো। প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান যুগ কি আমাদের উন্নতির পথে পরিচালিত করেছে? বর্তমান যুগে তো চারিদিকে ফ্যাশনের জয়জয়কার চলছে। নিজের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্যে জুতো নির্বাচনের কথা চিন্তা করা যায়। জুতো নরম হলে, সুন্দর হলে সোনায় সোহাগা। কিন্তু এই জুতো কি স্বাস্থ্যের জন্যে এবং জীবনের স্থায়িত্বের জন্যে সহায়ক? এরকম প্রশ্নের প্রতি খুব কম সংখ্যক মানুষই মনোযোগ দেয়।

একজন লোক বলেছেন, আমার ঘন ঘন প্রস্রাব হতো। অনেক চিকিৎসা করালাম, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। একদিন এক অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। সেখানে এক লোক বললেন, ইউসুফ সাহেব, আপনি এতো বুদ্ধিমান মানুষ, কিন্তু এরকম জুতো কেন ব্যবহার করেন যাতে স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি হয়? আমার পায়ে ছিলো রবারের জুতো। কথাটি শোনার পর আমার ঘন ঘন প্রস্রাবের রোগের কথা মনে পড়লো। আমি সেদিন থেকে চামড়ার জুতো ব্যবহার শুরু করলাম। ফলে আমার রোগ কমতে লাগলো এবং এক সময় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেলো।

এক যুবক আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এলো। তার সারা দেহে ব্যথা, স্নায়ু দুর্বল। সব সময় অস্থিরতায় ভোগে। সে জানালো, ডাক্তার সাহেব আমি বড়ো বিপদে পড়েছি। কয়েক বছর যাবত পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারছি না। কয়েকজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু আমার রোগের কোনো চিকিৎসা কেউ দিতে পারেননি।

আমি লক্ষ্য করলাম যুবকের পায়ে ইংলিশ জুতো, যে জুতো সাধারণত বরফের দেশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই জুতোর ব্যবহার আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আমি তার জুতো ব্যবহার নিষিদ্ধ করে তাকে নতুন জুতোর ব্যবস্থা করে দিলাম এবং নামমাত্র কিছু ওষুধ দিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই রোগী আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে গেলো।

মস্তিষ্কের উপর জুতোর প্রভাব

পায়ে যখন আঘাত লাগে তখন সে আঘাতে বেশী প্রভাবিত হয় মস্তিষ্ক। অনেক সময় দেখা যায়, মস্তিষ্কের আঘাতের কারণে পায়ের জখম তাড়াতাড়ি ভালো হয় না।

www.nagorikpathagar.org

এতে বোঝা যায়, মস্তিষ্কের সুস্থতার সাথে পায়ের সুস্থতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিশিষ্ট্য বিজ্ঞানী নিউটন মানসিক চাপ এবং মস্তিষ্কের অবসাদের শিকার হয়েছিলেন। তিনি সাথে সাথে পায়ের জুতো পরিবর্তন করে ফেললেন। জুতো পরিবর্তনের পর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করলেন। জার্মানীর একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, জুতো ঠিক তো মস্তিষ্ক ঠিক। জুতো নরম তো মস্তিষ্ক নরম। জুতো শক্ত তো মস্তিষ্ক শক্ত। এসব কথা সাধারণ কথা, কিন্তু একটুখানি চিন্তা করলে মানুষ এসব কথা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোগ

আগে দেখা যেতো যে, বয়স্ক লোকেরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু বর্তমানে যুবকদেরও এসব রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এছাড়া যুবকরা মানসিক রোগেও আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এর অনেক কারণ রয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, জুতো সুস্থতার সহায়ক। জুতোর প্রান্ত ব্যবহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা রোগ এবং মানসিক রোগ সৃষ্টি করে।

জুতোর সঠিক ব্যবহার

ভারতের রাজা বাদশাহগণ সেলিম শাহী জুতো পছন্দ করতেন। বংশ পরম্পরায় তারা এ জুতো ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে চিন্তা করা হলে দেখা গেলো যে, তারা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে জানতেন।

সম্রাট বাবর বলেন, ভারতের মাটিতে পা দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি যে, এখানের আবহাওয়া অন্য রকম। এ কারণে আমি সেলিম শাহী জুতো মনোনীত করেছি।

আমার চিকিৎসালয়ে এক মহিলা এলো। এই মহিলা গত ১৮ বছর যাবত মাথা ব্যথা রোগে ভুগছে। কোনো চিকিৎসায় সুফল পাচ্ছেন না। জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে, এই মহিলা সব সময় উঁচু হিলের জুতো ব্যবহার করে আসছে। আমি তার জুতো পরিবর্তনের পরামর্শ দিলাম। মহিলার মাথা ব্যথা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো।

গ্রামে বসবাসকারী একজন লোক চামড়ার তৈরী দেশী জুতো ব্যবহার করতো। সে তার জুতো প্রতিদিন তেল মাখিয়ে রাখতো। সে জানালো যে, বর্তমানে আমার বয়স ৮০ বছর। আমার চোখের দৃষ্টি এখনো উজ্জ্বল, দাঁত পড়েনি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনো দুর্বলতা নেই, কোনো রোগ ব্যাধি নেই। আমি মনে করি, তেল মালিশ করে পরিপাটি করে রাখা জুতোর ব্যবহারের কারণেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন কাটাচ্ছি।

মোটকথা, সঠিক জুতো ব্যবহারে মানুষ নানা রকম রোগ থেকে সুস্থ জীবন কাটাতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে এরকম অনেক জুতো পাওয়া যায়, যেসব জুতো আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে খাপ খায় না, তবে সব সময় পায়ে জুতো রাখা ঠিক নয়। মাঝে মধ্যে খালি পায়ে হাঁটা উচিত। হাই হিল এবং কষ্টদায়ক জুতো পরিহার করা দরকার। আমরা যখন হাঁটি তখন পায়ের সাথে জুতোর ঘর্ষণে এক

www.nagorikpathagar.org

ধরনের উত্তাপ তৈরী হয়। যদি পায়ে চামড়ার জুতো থাকে তবে সে উত্তাপ দূর হয়ে যায়। যদি রবার প্লাস্টিকের জুতো থাকে, তবে পা গরম হয়ে যায় এবং জ্বালা শুরু হয়। এর পরিণামে নানা রকমের রোগ দেখা দেয়।

ক্যানভাসের জুতো শিশুর জন্যে ক্ষতিকর

শিশুর জন্যে সাধারণ জুতোর পরিবর্তে টেনিস বা ক্যানভাসের জুতোর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো চিকিৎসকও হয়তো এসব জুতোর ব্যবহার অনুমোদন করেন। কিন্তু এরকম জুতো ব্যবহারে শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা থাকে। আমেরিকায় একটি সংগঠন রয়েছে সেই সংগঠন চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুদের জুতোর ব্যবহার পরীক্ষা করে। সেই সংগঠনের মুখপাত্র বলেন, শিশুদের জন্যে ক্যানভাসের জুতোর ব্যবহার চিকিৎসকরা অনুমোদন করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক চিকিৎসকই এসব জুতোর ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ক্যানভাসের জুতো ব্যবহারের ফলে শিশুর পা গরম হয়ে যায়, পা বেশী ঘামে। কারণ, অন্য জুতোর চেয়ে ক্যানভাসের জুতো পায়ের সাথে বেশী ঘষা খায়। অল্পবয়স্ক শিশুরা ক্যানভাসের জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটাচলা করার ফলে তাদের পা গরম হয়ে যায় পা ঘেমে যায়। ক্যানভাসের জুতো ব্যবহারকারী শিশুদের পায়ের মোজা খোলার পর সেই মোজা ভেজা দেখা যায়।

টেনিস বা ক্যানভাসের জুতো পায়ের সাথে ঘষা খেয়ে যে উত্তাপ সৃষ্টি করে সেই উত্তাপ প্রায় ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, গরমের মৌসুমে যারা পরিশ্রম করে তাদের পায়ের উত্তাপ চামড়ার জুতো ব্যবহারকারীদের পায়ের উত্তাপের চেয়ে ৯৫ থেকে ১০০ ভাগ ফারেনহাইট বেড়ে যায়। কিন্তু ক্যানভাসের জুতো ব্যবহারকারীদের পায়ের উত্তাপ ১২৫ ভাগ ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌছে যায়।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ক্যানভাসের জুতোর শুকতলা অন্য জুতোর চেয়ে অধিক নরম। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, ছোটো শিশুর ওজন এতো বেশী নয় যে, চলার সময় পায়ে কোমলতা অনুভব করবে, আরাম পাবে। শিশুদের ক্যানভাসের জুতো সাধারণত একই ধরনের হয়ে থাকে। এই জুতো নরম আরামদায়ক হওয়ায় শিশুদের জন্যে ক্রয় করা হয়, কিন্তু এই জুতো শিশুদের ক্ষতি করে।

হাইহিল জুতোর ব্যবহার

মহিলারা হাইহিল জুতো স্যান্ডেল পরিধান করতে পছন্দ করে। কিন্তু তারা জানে না, এই জুতো তাদের পা, উরু এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কতোটা ক্ষতি করে। বর্তমানে ফ্যাশনের কারণে উঁচু হিলের ছোটো জুতো মহিলারা ব্যবহার করে। বেশীদিন এসব জুতো ব্যবহার করা হলে হাড়ের ব্যথা দেখা দেয়। এই জুতো পায়ে এবং উরুতে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত করে। কখনো কখনো কোমরে ব্যথা হয়। এসব জুতোর ব্যবহার ত্যাগ করলে মহিলাদের এসব রোগ হওয়ার আশংকা কমে যাবে। হাইহিল পরিহিতা মহিলাদের পা জুতোর বা স্যান্ডেলের ভেতর স্বাভাবিকভাবে থাকে না। হাঁটার সময় বেশ কষ্ট হয়।

www.nagorikpathagar.org

অনিদ্রা

প্রায় সব মানুষ অনিদ্রার শিকার। ডাক্তারদের ক্লিনিকে, চিকিৎসকদের ঔষধালয়ে এসব রোগীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সম্পর্কিত ওষুধ যতো আবিষ্কৃত হচ্ছে, রোগীও ততো বাড়ছে। আপনি আপনার চারদিকের পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, এই অনিদ্রার আসল কারণ হচ্ছে স্থবির জীবন। যেসব রোগী আমার কাছে এসে কেঁদে কেঁদে সমস্যার কথা জানিয়ে প্রতিকার চান, তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের অবস্থা হচ্ছে তারা যেখানে কর্মরত সেখানে দেহ চলাচলের চেয়ে মস্তিষ্ক বেশী চালাতে হয়। এ রকম রোগীকে পায়ে হাঁটার পরামর্শ দেয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যে রোগমুক্ত হয়ে অবাক হয়ে যান। অনিদ্রা থেকে মুক্তি পান। যাদের উপর ঘুমের বড়ি কোনো প্রভাব বিস্তার করে না, তারা যখন পায়ে হাঁটার চিকিৎসা ব্যবস্থা অনুযায়ী হাঁটতে থাকেন এবং ঘুমের শান্তি ফিরে পান তখন তাদের বিস্ময়ের শেষ থাকে না।

হযমের ওষুধ

ট্রেনে বাসে, হাটে বাজারে, সব জায়গায় হযমের ওষুধের বিজ্ঞাপন আপনি দেখতে পাবেন। অথবা এরকম ওষুধ বিক্রেতা পাবেন যারা দাবী করবে যে, তাদের ওষুধ এক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিষেধক। বর্তমানে দেশে পাকস্থলীর রোগ নিরাময়ের জন্যে যতো ওষুধ তৈরী হয় এবং বিক্রি হয় সম্ভবত অন্য কোনো রোগের জন্যে এতো বেশী ওষুধ তৈরী হয় না। অথচ পেটে গ্যাস হওয়া হযমের সমস্যার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে পায়ে হাঁটা। যখন আমরা পুষ্টিকর খাবার খেয়ে চেয়ারে বসে পড়ি, চলাফেরা করি না তখন ভক্ষণকৃত খাবার সহজে হযম হয় না। ফলে ভক্ষণ করা খাদ্য পুষ্টির পরিবর্তে রোগ তৈরী করে।

স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য

কোষ্ঠকাঠিন্য একটি জটিল সমস্যা। ওষুধ খেলে ভালো হয়, পেট পরিষ্কার হয়, কিন্তু আবার আগের মতো অবস্থা দেখা দেয়। কোষ্ঠ কাঠিন্যের চিকিৎসার পাশাপাশি রোগী যদি নিয়মিত কিছু পথ পায়ে হাঁটতে শুরু করে, তবে এই স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

হৃদ রোগ

হৃদপিন্ড একটি স্পন্দনশীল অঙ্গ। এ কারণে এই অঙ্গ স্পন্দন পছন্দ করে। হৃদ রোগের প্রকোপও তাদের ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যারা হাঁটা চলা বন্ধ রাখে। মানুষ যদি হৃদপিন্ডের মতোই স্পন্দন না করে হাঁটাচলা না করে, তবে হৃদপিন্ড অভিমান করে বেঁকে বসে। তারপর সেই হৃদপিন্ডকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নানা রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তার রাগ অভিমান কমতে চায় না। এই রোগের চিকিৎসা, এই রোগ না হওয়ার পূর্বাহ্নিক সতর্কতা হচ্ছে পায়ে চলা, শুধুই পায়ে চলা।

ভুঁড়ি কমানো

ভুঁড়ি মেদ কমানোর কি ওষুধ আছে? একজন পুলিশ অফিসার তার ভুঁড়ি কমানোর জন্যে আমার কাছে এলেন, আমি তাকে ওষুধ দিলাম এবং প্রতিদিন পাঁচ কিলোমিটার

www.nagorikpathagar.org

পায়ে হাঁটার পরামর্শ দিলাম। লোকটি আমার কথার উপর গুরুত্ব দিলেন। চল্লিশ দিন আমার কথা অনুযায়ী হাঁটাহাঁটি করার পর তার ভুঁড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। এমনকি তার প্যান্টের ঘের কমাতে হলো।

চোখে সুরমা দেয়া এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর কাছে একটি সুর্মাদানি ছিলো। সেই সুর্মাদানি থেকে প্রতি রাতে তিন শলাকা সুর্মা তিনি উভয় চোখে লাগাতেন। (তিরমিযী, রাহবারে জিন্দেগী)

সুরমা ব্যবহার করা রসূল (স.)-এর সুন্নত। দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও সুর্মা ব্যবহারের উপকার রয়েছে।

সুর্মা এন্টিসেপ্টিক্। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, চোখে সুর্মা ব্যবহার করা হলে সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট চোখের পাতলা রেটিনার ক্ষতি করতে পারে না। তা নাহলে সূর্যের তীব্র রশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট চোখের ক্ষতির কারণ হয়।

সুর্মা ব্যবহারে চোখে ইনফেকশন হয় না। চোখ থেকে অবিরাম পানি ঝরতে থাকা রোগীদের জন্যে সুর্মা ব্যবহার উপকারী। সুস্থ লোকদের মধ্যে যারা সুর্মা ব্যবহার করে, তাদের চোখের পানি ঝরার রোগ কখনো হয় না। আধুনিক চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মতে, সুর্মা চোখের এমন সব রোগের উপকার করে যেসব রোগের চিকিৎসা চিকিৎসা বিজ্ঞানেও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানে যেসব রোগের চিকিৎসা অসম্ভব।

চোখের ব্যথা, যখম, জ্বালাযন্ত্রণার উপশমের জন্যে সুর্মা অত্যন্ত উপকারী। সুর্মা ব্যবহারে সকল প্রকার রোগ জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

দৃষ্টির হেফাযত

অজু করার সময় চোখ খোলা রেখে চোখে পানির ছিটা দেয়া হলে চোখ পরিষ্কার থাকে। এর ফলে চোখের কোনো অসুখ হওয়ার কোনো প্রকার আশংকা থাকে না। রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা ঘুমানোর আগে চোখে সুর্মা লাগাও। (তিরমিযী)

রসূল (স.)-এর চোখের দৃষ্টি একই রকম ছিলো। কখনো পার্থক্য দেখা দেয়নি। যারা রসূল (স.)-এর সুন্নতের উপর আমল করবে, তাদের চোখের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না।

দিনে চোখে যেসব ধূলোবালি প্রবেশ করে রাতে সুরমা ব্যবহার করা হলে চোখের কোণ দিয়ে বের হওয়া পানির সাথে সেসব ধূলোবালি বের হয়ে যায়। সকালে ওজু করার সময় মুখ ধোয়ার পর চোখে সুর্মার কালো দাগ থাকে না।

যারা লেখাপড়া করে এবং সূক্ষ্ম কাজ করে তাদের জন্যে সুর্মার ব্যবহার জরুরী। সুর্মা ব্যবহারের ফলে চোখের ক্লান্তি, দুর্বলতা দূর হয়ে যায়।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় সুর্মার ব্যবহার কমে গেছে। চোখের দৃষ্টির ঘাটতি পূরণের জন্যে বর্তমানে চশমা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সুর্মা ব্যবহার করা হয় না। অথচ সুরমা ব্যবহার চশমার চেয়ে খরচ অনেক কম।

www.nagorikpathagar.org

জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কোর পরিবেশিত পরিসংখ্যা, তথ্যে জানা যায়, বর্তমানে বিশ্বে ৮০ লাখ দৃষ্টিহীন লোক রয়েছে। এদের মধ্যে শতকরা আশিভাগ রয়েছে এশিয়া এবং আফ্রিকায়। এই দুটি মহাদেশে চোখের হেফাযতের বা নিরাপত্তার ব্যাপারে অধিক উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।

নারী পুরুষের চোখের পানি

চোখের অশ্রু প্রবাহিত করা কি সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ? নাকি রোগ? এ সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে, চোখের পানিতে উপকারও রয়েছে, আবার ক্ষতিও রয়েছে। যদি উত্তেজনা, জেদ, ক্রোধ এবং উন্মাদনায় চোখের পানি প্রবাহিত হয়, তবে সে পানি প্রবাহ ক্ষতিকর। যদি ভালোবাসা এবং সমবেদনা সহানুভূতির কারণে চোখের পানি প্রবাহিত হয় তবে সে পানি প্রবাহ উপকারী।

সার্জারীর বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞগণ সার্জারির পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উত্তেজিত হলে চোখের উপর বিশেষ রকমের প্রভাব পড়ে। এই পানি যদি আবেগ, ভালোবাসা এবং সহানুভূতিমূলক হয়, তবে সে পানি নারী-পুরুষের চেহারায় পড়লে চেহারাকে এলার্জি থেকে মুক্ত রাখে এবং চেহারায় সজীবতা আনে।

যদি এই পানি ঘৃণা এবং প্রতিশোধের কারণে প্রবাহিত হয়, তবে এই পানি দ্বারা মস্তিষ্ক এবং আঙ্গিক অসুখ দেখা দেয়। আমার এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, যাদের চোখে চিকিৎসার উর্ধ্বে রোগ দেখা গেছে তাদেরকে আমি উত্তেজনাকর এবং প্রতিশোধপরায়ণ হিসেবে পেয়েছি। তবে সবাই নয় কেউ কেউ।

গোঁফ কেটে ফেলা

গোঁফ কাটো দাড়ি বাড়াও। (আল হাদীস)

গোঁফ বড়ো হচ্ছে, কিন্তু দাড়ি কেটে ফেলা হচ্ছে। এতে কি ক্ষতি হয় এবং কি কি রোগ হয়- এ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

কিউল ফাদার একজন পান্ডু রোগ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। তার গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানুষের ঠোঁটে অনুভূতিশীল তীব্র গ্লান্ড থাকে। এই গ্লান্ডের মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এই গ্লান্ড নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় তৈরী করে। উপরের ঠোঁটের গ্লান্ডে এ রকম হরমোন তৈরী হয়, যার জন্যে বাইরের প্রভাব এবং পানি বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ঠোঁটের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটে না। কারণ, গোঁফ যদি না থাকে তবে উপরের ঠোঁটে পানি লাগবে এবং বাইরের বাতাসের প্রভাবে সেই ঠোঁট প্রভাবিত হবে। বিপরীত অবস্থায় গোঁফ পানি এবং বাতাসকে ঠেকিয়ে রাখে।

এই গ্লান্ডে যদি পানি এবং বাতাস না লাগে তবে দীর্ঘ মেয়াদী সর্দি, মাঢ়ীর অসুখ, দেহে টানা পোড়েন সৃষ্টি হবে। তাছাড়া গোঁফ বড়ো হলে সেখানে জীবাণু আটকে যায় এবং খাওয়ার সময় সেই জীবাণু পেটের ভেতর প্রবেশ করে।

নীচের ঠোঁটের অবস্থা উপরের ঠোঁটের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণেই ইসলাম গোঁফ কাটার এবং দাড়ি রাখার আদেশ দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অজিফা এবং যেকেরের বৈজ্ঞানিক প্রভাব

ভালো একটি কথা মনকে প্রশান্তি এবং ভালোবাসায় পূর্ণ করে। একইভাবে একটি মন্দ কথা মনে ঘৃণা এবং বিরক্তি সৃষ্টি করে।

একজন নাস্তিক একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো আপনি যে অজিফা এবং আয়াত পাঠ করেন এর কি কোনো প্রভাব দেখা দেয়? এসব তো শুধু কিছু শব্দ। সেই ব্যক্তি নাস্তিককে গালি দিলেন। নাস্তিক ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো।

সে বললো, আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন করলাম আর আপনি আমাকে গালি দিলেন? সেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বললেন, গালির কথাতো শব্দ মাত্র, এই শব্দের প্রভাব, ক্রোধে তোমার দেহে আগুন ধরে গেছে। অজিফা এবং আয়াতের প্রভাবও ঠিক এ রকম।

অজিফার শব্দের মধ্যে কি শক্তি রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। নামকরণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান উপশিরোনামে সে আলোচনা সন্নিবেশিত রয়েছে। সেখানে মনোযোগ দিয়ে দেখে নেয়া যেতে পারে।

কোনো কোনো অজিফা মানুষকে এমন শক্তি দান করে যে, মানুষ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

এস্ট্রোলজিস্ট ডাক্তার লিউল পল বলেছেন, কোরআন শুধু শব্দ সমষ্টি নয় বরং কোরআন একটি শক্তি। এই শক্তি অধ্যয়নকারীর মধ্যেই শুধু সংক্রমিত হয় না বরং তার আশে পাশে যারা বসা থাকে তারাও সে শক্তি অনুভব করে।

কোরআনের কিছু শব্দ আমি তিন মাস পাঠ করেছি। সেই সব শব্দ আমি চোখ বন্ধ করে যখন পাঠ করেছি, তখন অসংখ্য দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আমি আমার রোগীদেরও সেসব আয়াত পাঠ করতে বলেছি, তারা অল্পদিনেই আরোগ্য লাভ করেছে।

বর্তমান বিজ্ঞান কোরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছে। তারপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কোরআনের প্রতিটি শব্দ হচ্ছে শক্তির উৎস। অথচ সেসব শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহার করা হলে এতো শক্তি পাওয়া যায় না। যতো শক্তি কোরআন পাঠে পাওয়া যায়। (ডাক্তার লিউল পল ও জীবন)

একজন পাইলটের ঈমান

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন বোম্বার পাইলট কিডনি রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হতো। ডাক্তারগণ অপারেশনের জন্যে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ঘনঘটা শুরু হওয়ায় সেই পাইলটের অপারেশন করার সুযোগ হয়নি।

বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা উক্ত পাইলটের কিডনি সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরকম পাইলটের সঙ্গে বিমানে আরোহণ ছিলো একান্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে তার সঙ্গে কেউ নেভিগেটর হতে সাহস করছিলো না। কিন্তু কিডনি রোগের রোগী

www.nagorikpathagar.org

পাইলটের উৎসাহ দেখে একজন বৈমানিক তার বিমানে আরোহণ করে বোমা বর্ষণে প্রস্তুত হলো।

কিডনি রোগে আক্রান্ত পাইলট বোমা বর্ষণে যাওয়ার আগে এবং বোমা বর্ষণ করে ফিরে আসার সময় কোরআনের 'আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে' এই আয়াত পাঠ করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। (সূরা নূর, আয়াত ৩৫)

সতের দিনের যুদ্ধের প্রাক্কালে এই বৈমানিক নিয়মিত এই আমল করছিলো। ফলে সতের দিনের যুদ্ধের সময় সেই বৈমানিক একবারও কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়নি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তার অপারেশন করা হলো এবং উভয় কিডনি থেকে ১৯টি পাথর বের করা হলো।

ডাক্তারদের মতে, ১৯টি পাথর থাকা অবস্থায় কারো কিডনি সচল থাকতে পারে না। এ রকম রোগী কোনো শারীরিক কাজ করার উপযুক্ত থাকে না। অথচ আল্লাহর কোরআনের ফযিলত এবং বরকতের ফলে এই পাইলট অন্য পাইলটদের চেয়েও অধিক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অভিযান পরিচালনা করেছিলো। শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করার ক্ষেত্রে এই পাইলট অন্য পাইলটদের চেয়ে কোনো অবস্থায় কম দক্ষতা এবং সাহসিকতার পরিচয় দেয়নি।

ঘোড়ায় চড়া

রসূল (স.) ঘোড়ায় আরোহণ করতে পছন্দ করতেন। তিনি নিজের ঘোড়ার সেবাযত্ন নিজেই করতেন। নিজের জামার আস্তিন দিয়ে ঘোড়ার মুখ মুছে দিতেন। ঘোড়ার দেহের লোম এবং কেশরে আংগুল দিয়ে বিলি কাটতেন। তিনি বলতেন, কেয়ামত কাল পর্যন্ত কল্যাণ ঘোড়ার ললাটের সংগে যুক্ত রয়েছে। (আবু দাউদ)

ঘোড়া সম্পর্কে হাদীসে নববী

সহীহ বোখারীতে হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমি দেখেছি রসূল (স.) তাঁর হাতের আংগুল দিয়ে ঘোড়ার কপালের কেশে বিলি কাটছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের সংগে কল্যাণ যুক্ত করে দিয়েছেন।

এই হাদীসে ললাট দ্বারা সেই লোমের কথা বলা হয়েছে যা ঘোড়ার কপালে ঝুলে থাকে। খাত্তাবী (র.) বলেন, ললাট দ্বারা পুরো ঘোড়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। (হায়াতুল হায়ওয়ান)

রসূল (স.) ঘোড়ার দেহে শেকাল পছন্দ করতেন না। শেকাল অর্থ হচ্ছে ঘোড়ার ডানদিকের পেছনের পায়ের এবং সামনের দিকের বাম পা সাদা থাকা। শেকাল সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। আভিধানিকদের মতে, শেকাল অর্থ হচ্ছে ঘোড়ার তিন পা সাদা এবং চতুর্থ পা সাদা নয়। (হায়াতুল হায়ওয়ান)

শায়খুল ইসলাম হাফেয জাহাবি (র.) তবাকাতুল হোফফায গ্রন্থে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর সনদে নিজের ওস্তাদ শেখ শরফুদ্দিন দমিয়াতির কাছ থেকে বর্ণনা

www.nagorikpathagar.org

করেছেন, ফেরেশতারা তিনটি খেলা ব্যতীত অন্য কোনো খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পছন্দ করে না। ১. স্বামীস্ত্রীর হাসি ঠাট্টা, ক্রীড়া কৌতুক। ২. ঘোড়া দৌড়ানো ৩. তীর নিক্ষেপ করা।

রসূল (স.)-এর ঘোড়ার নাম

সোহায়লী আততারিফ ওয়াল আ'লাম গ্রন্থে রসূল (স.)-এর ঘোড়াসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন।

রসূল (স.)-এর একটি ঘোড়ার নাম ছিলো ছাকাব। এই নাম এ কারণেই রাখা হয়েছে যে, এই ঘোড়া পানির স্রোতধারার মতোই দ্রুত চলাচল করতো। ছাকাব অর্থ গুলে লালাও রাখা হয়েছে।

রসূল (স.)-এর একটি ঘোড়ার নাম হচ্ছে মারতযি। ঘোড়ার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার কারণেই এই নামকরণ করা হয়েছে। অন্য একটি ঘোড়ার নাম হচ্ছে লাহিফ। লাহিফ শব্দের অর্থ হচ্ছে জড়ানো এবং ঢাকা দেয়া। এই ঘোড়া এতো দ্রুতগামী ছিলো যে, পথ যেন তার পায়ের সংগে জড়িয়ে যেতো। কেউ কেউ এই ঘোড়ার নাম মুজমা, নাহিফও বলেছেন।

সহীহ বোখারীতে রসূল (স.)-এর একটি ঘোড়ার নাম লাজাজ বলে উল্লেখ করেছেন। রসূল (স.)-এর একটি ঘোড়ার নাম ছিলো জালাউহ। অপর একটি ঘোড়ার নাম ছিলো ফারহু।

তাঁর আরেকটি ঘোড়ার নাম ছিলো দারদ। এই ঘোড়া রসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-কে দান করেন। হযরত ওমর (রা.) জেহাদের সময়ে এই ঘোড়ায় আরোহণ করতেন। এই ঘোড়াটি রসূল (স.) খুব কম মূল্যে ক্রয় করেছিলেন। (হায়াতুল হায়ওয়ান)

ঘোড়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বিস্ময়কর কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন।

স্যার লেপোল গ্রেফোনোর মতে

যে ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করতে অভ্যস্ত হবে, তার মধ্যে অসংখ্য গুণাবলী পাওয়া যাবে। সে ব্যক্তি সুস্থসবল, নির্ভীক এবং নির্ভয় হবে। ভীরু কাপুরুষ হবে না। সে আত্মবিশ্বাসী হবে, বীরত্বের অধিকারী হবে এবং যে কোনো সমস্যা মোকাবেলায় তার মধ্যে প্রভূত শক্তি বিদ্যমান থাকবে। (দি ক্রেপস অব দি পাঞ্জাব)

ঘোড়ার মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা

বুদ্ধি বিবেক হওয়ার পর আমি প্রথম চতুষ্পদ জন্তু দেখেছি সেটি ছিলো ঘোড়া। সেদিনের স্মৃতি আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে। বর্তমানে এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করছি যে, ভাষাহীন পশুদের তাকানো, শব্দ করা, অংগভংগি এবং তাদের চিন্তা ভাবনা পর্যালোচনা করাই হচ্ছে আমার কাজ।

ঘোড়ার চিন্তা শক্তি

ঘোড়া সম্পর্কে একটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে যে, ঘোড়ার চিন্তাশক্তি রয়েছে। কিছু লোক মনে করে যে, ঘোড়া অন্যান্য পশুর মতো একটি চতুষ্পদ প্রাণী। তারা ঘোড়ার

www.nagorikpathagar.org

চিন্তাশক্তি রয়েছে এ রকম কথা স্বীকার করে না। তারা বলে যে, লাঠি হাতে প্রহার করা হলেই তারা মানুষের উপকার করতে পারে। কিন্তু একাধিক প্রাণী বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে যে, ঘোড়া বিভিন্ন বিষয়ে রীতিমতো চিন্তা ভাবনা করে। এই বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক না হলেও আংশিক সত্য। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, ঘোড়া একদিন একটি কাজ ভালোভাবে না করলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন সে কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে। ঘোড়া বুঝতে পারে যে, আপনি লাঠি নিয়েছেন কি না অথবা আপনি ধারালো গোড়ালীর জুতো পরিধান করেছেন কি না। যদি আপনি বিশেষ রকমের পোশাক পরিধান করেন তখন ঘাড়া বুঝতে পারে যে, আপনি শিকারে যাবেন। সাধারণ পোশাক পরিধান করলে ঘোড়া বুঝতে পারে যে, আপনি কোথাও বেড়াতে যাবেন।

ঘোড়ার মেধাবী এবং বুদ্ধিমান হওয়া না হওয়া তার মালিকের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। ঘোড়া তার মালিকের কাছ থেকে নিজের সাহায্য আদায় করে নিতে পারে। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের ঘোড়া ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দেয়া সত্ত্বেও অতোটা চৌকস এবং বুদ্ধিমান হয় না।

অপছন্দনীয় লোকদের ঘোড়া আহত করে দেয়। ঘোড়া তার মালিককে সম্মান করে। ঘোড়ার খাবার খাওয়ার সময় তার কাছাকাছি যদি মালিক অবস্থান করে, তবে ঘোড়া তাড়াতাড়ি খাবার খায়। যদি অনভিজ্ঞ সওয়ার তার পিঠে আরোহণ করে, তবে তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়। ঘোড় দৌড়ের সময় বিজয়ী এবং পরাজিত হওয়ার অনুভূতি ঘোড়াকে বিমর্ষ এবং আনন্দিত করে। এতে করে ঘোড়ার বুদ্ধি বিবেচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব বক্তব্যের বিষয়ে যদি কারো মনে সন্দেহ থাকে, তবে নিম্নোক্ত ঘটনাবলীর ওপর দৃষ্টিপাত করুন।

আমার পিতা ঘোড়া দৌড়ের ক্ষেত্রে একজন পরিচিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বিগত ৫২ বছর যাবত ঘোড়ার সংগে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাঁর একটি ঘোটকীর নাম ছিলো উলফত। এই ঘোটকী আগেই বুঝতে পারতো তার মালিক তাকে রেসের জন্যে প্রেরণ করছে কি না। যদি রেসে এই ঘোটকী পরাজিত হতো, তবে সেদিন সে কোনো খাবার মুখে তুলতো না। পরদিন সকাল পর্যন্ত সে অনশন পালন করতো। তারপর আমার পিতা রাজা সাহেব তার দেহে হাত বুলিয়ে তাকে আদর সোহাগ করার পর সে খাবার গ্রহণ করতো।

ঠোঁট ও দাঁতের সাহায্যে ঘোড়ার পানি বের করা

একটি ঘোটকী অন্য পশুদের চেয়ে আগে পানি পান করার জায়গায় পৌঁছে যেতো। একবার এক চারণভূমির এক কোণে হস্তচালিত একটি পানির টিউবওয়েল লাগানো ছিলো। সেই নলকূপের হাতল দিয়ে পানি তোলা হতো। একটি ঘোটকীকে দেখা গেলো সে টিউবওয়েলের হাতল প্রথমে ঠোঁট দিয়ে এবং পরে দাঁতে কামড়ে টিউবওয়েল থেকে পানি চিপে বের করলো। প্রথমে ঠোঁট দিয়ে চেপে পানি বের করতে ঘোটকী ব্যর্থ হওয়ায় দাঁত দিয়ে কামড়ে ওপর নীচ করে পানি বের করে দিচ্ছিলো। আশে পাশে সমবেত সব পশু সেই পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলো। ঘোটকীর

www.nagorikpathagar.org

এই কাজের সময় কৌতহলী কোনো দর্শক এসে তার প্রতি তাকালে ঘোটকী পানি তোলা বন্ধ করে দিয়ে তার প্রতি তাকাতো এবং জোরে জোরে মাটিতে পদাঘাত করতো। সে যেন দর্শককে এটাই বুঝাতে চাইতো যে দেখো, দেখো এভাবেই পানি তোলা হয়ে থাকে।

ইংল্যান্ডের একটি ঘোড়ার কথা

ইংল্যান্ডের একজন কর্নেল রিনান্ডের ঘোড়ার কাহিনী বিস্ময়কর। তিনি ঘোড়ার আস্তাবলের এক পাশে পিতলের দু'টি নল লাগিয়ে রেখেছিলেন। একটি থেকে গরম পানি বের হতো অন্যটি থেকে বের হতো ঠান্ডা পানি। ইংল্যান্ডের বিশেষ রীতি অনুযায়ী গরম এবং ঠান্ডা উভয় পানি একত্রিত করে বালতি বা গামলা পূর্ণ করা হতো। ঘোড়াটি সেই নল খুলে প্রথমে পরীক্ষা করে দেখতো। যদি পানি বেশী গরম থাকতো তবে সেই নল বন্ধ করে ঠান্ডা পানির নল খুলতো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পান করে নল বন্ধ করে দিতো। কর্নেল নিজের চোখে একদিন দেখেছেন যে, ঘোড়াটি গরম পানির নল খুলে পানি গরম দেখতে পেয়ে সাথে সাথে সেই নল বন্ধ করেছে এবং ঠান্ডা পানির নল খুলে ঠান্ডা পানি পান করেছে। কর্নেল এই দৃশ্য একাধিকবার তার কাছে আসা মেহমানদের দেখিয়েছেন। মেহমানরা ঘোড়ার পানির নল খোলা এবং বন্ধ করার দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছেন।

ঘোড়ার আনুগত্য

উক্ত কর্নেল সাহেবের অন্য দু'টি ঘোড়া আদেশ শোনা এবং পালন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলো।

একটি ঘোড়া কর্নেলের আদেশে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতো। অন্য একটি ঘোড়া আদেশ পাওয়ার পর সাধারণ ঘোড়াদের মতো হ্রেষাধ্বনি করতো। অন্য একটি ঘোটকী কর্নেল সাহেবের ইংগিত পেলে তাকে চুম্বন করতো এবং সেই ঘোড়া তার প্রতিটি কথা বুঝতো। কারণ, সেই ঘোড়া কর্ণেল সাহেবের আদেশ লংঘন করেছে এ রকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। সেই ঘোড়াকে যা আদেশ করতেন সেই আদেশই পালন করতো।

ঘোড়া যদি কখনো আগুনের উত্তাপের স্পর্শ পায়, তবে জীবনভর সে কথাটি মনে রাখে। জ্বলন্ত অংগার দেখে সে সতর্ক হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ঘোড়া প্রজ্বলিত অংগার দেখে সেই অংগার পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। একজন সহিস একবার সিগারেট পানরত অবস্থায় একটি ঘোড়ার দেহ মালিশ করছিলো। এক পর্যায়ে সিগারেটের প্রজ্বলিত অংশ ঘোড়ার নাকের সংগে লেগে যায়। সাথে সাথে সেখানে সামান্য ফোস্কা পড়ে। তারপর থেকে সেই ঘোড়া কাউকে সিগারেট ধরিয়ে তার কাছে যেতে দেখলে লাফাতে থাকতো।

ঘোড়ার দাঁত

ঘোড়ার মুখের ভেতর দাঁতের সংখ্যা ৪৬টি। দুই মাড়ি ডানে বামে ঘুরিয়ে খাবার চিবায়। ঘোড়ার ওপরের মাঢ়ী নীচের মাঢ়ীর চেয়ে চওড়া। আমি এমন একটি ঘোড়া

www.nagorikpathagar.org

দেখেছি যেই ঘোড়ার মাঢ়ীর দাঁত প্রায় প্রতি তিন মাস পর ধারালো হয়ে মাঢ়ীতে ক্ষত সৃষ্টি করতো। এই ঘোড়াটি হাসপাতালে নেয়ার পর দীর্ঘ সময় যাবত মুখ খুলে দাঁত ঘষতো। অথচ অন্যান্য ঘোড়ার ক্ষেত্রে দেখা যেতো এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

ঘোড়ার ভালোবাসা

নিজ ঘরের প্রতি ঘোড়ার আকর্ষণ এবং ভালোবাসা অসামান্য। নিজ ঘরের প্রতি ঘোড়ার ভালোবাসা দেখে মনে হয় প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের কাছে ছুটে যায় ঘোড়াও ঠিক তেমন। নিজের ঘর দূরে থাকলেও মাইলের পর মাইল দৌড়ে ঘোড়া নিজের ঘরে ফিরে আসে।

শিকার করতে নেয়া ঘোড়া ঘরে ফেরার সময় ভীষণ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঘোড়া সানন্দে পথ চলে। নাচতে নাচতে ঘরে ফেরে। শতকরা একশত ভাগ ঘোড়ার ক্ষেত্রেই ঘরের প্রতি একই রকমের আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। যারা ঘোড়ার পরিচর্যা করে, সব সময় আরোহণ করে, যারা ঘোড়ার ব্যবসা করে তারা ঘরের প্রতি ঘোড়ার আগ্রহ ও আকর্ষণের অসংখ্য ঘটনা শোনাতে পারবে।

আমার এক বন্ধুর এমন একটি ঘোড়া ছিলো যে, সেই ঘোড়া চিয়ারিং ক্রস থেকে গাফ রোড পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি রাস্তা সম্পর্কেই অবগত ছিলো। ঘোড়ার মালিক চিয়ারিং ক্রসে পৌছে যাত্রা বিরতি করতো এবং সিগারেট ধরাতো। দেখা গেছে, ঘোড়াকে সেখানে ছেড়ে দেয়ার পর সে ব্যস্ত সড়ক পাড়ি দিয়ে গাফ রোডে মালিকের বাড়ীতে নির্বিঘ্নে পৌছে যেতো। সেনাবাহিনীর একটি ঘোড়া বিক্রি হওয়ার পর ঘোড়া ক্রয়কারী নতুন মালিক পঁচিশ মাইল দূরের একটি নতুন শহরে নিয়ে যান। নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রি করার এক সপ্তাহ পর ঘোড়া বিপর্যস্ত অবস্থায় তার আগের মালিকের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলো। একটি ঘোড়া বৃদ্ধ হওয়ার কারণে ঘোড়ার মালিক ঘোড়াটি গ্রামে পাঠিয়ে দেন। মালিকের উদ্দেশ্য ছিলো ঘোড়াটি গ্রামের চারণ ভূমিতে ঘুরে ফিরে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাবে। মালিকের গ্রামের বাড়ী ছিলো শহর থেকে ১৬ মাইল দূরে। ঘোড়া সেই গ্রামে আগে কখনো যায়নি। কিন্তু গ্রামে ঘোড়ার মন টেকেনি। একদিন ঘোড়াটি শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। তিনটি রেলওয়ে ফটক এবং একটি নদীর টোল ট্যাক্স সেতু অতিক্রম করে ঘোড়াটি সূর্যাস্তের আগে শহরে মালিকের ঘরে এসে পৌছুলো। তারপর মালিকের ঘরের জানালার পাশে গিয়ে হ্রেষাধ্বনি তুলে মালিককে নিজের আগমন সংবাদ অবগত করলো। বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে যে, এই ঘোড়াটির এক চোখ ছিলো অন্ধ এবং বার্ধক্যজনিত কারণে সে ছিলো ভীষণ দুর্বল। যে চোখ ভালো ছিলো সে চোখেও ঘোড়াটি ভালোভাবে দেখতে পেতো না।

ঘোড়া অনেক সময় নিজের কাজের প্রকৃতি এবং মালিকের ওপর গর্ব করে। মালিকের কাছ থেকে পৃথক হতে তার কষ্ট হয়। একটি ঘোড়া দশ বছর যাবত ফায়ার ব্রিগেডে দায়িত্ব পালন করছিলো। তারপর সেই ঘোড়া ফসল মাড়াইয়ের কাজ করে, এ রকম এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়। এই অপমানের কারণে ঘোড়াটি মনে দারুণ

www.nagorikpathagar.org

আঘাত পায়। একদিন ঘোড়ার নতুন মালিক ফায়ার ব্রিগেডের অট্টালিকার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। পুরনো আবাসস্থলের প্রতি ঘোড়ার দৃষ্টি পড়ার পর ঘোড়া দ্রুত ছুটে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের অট্টালিকার প্রতি তাকায় এবং অট্টালিকার সামনের খুঁটির সাথে প্রচন্ড জোরে মাথা দিয়ে আঘাত করে। ঘোড়াটি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ঘোড়াটির এই আত্মহত্যার ফলে ঘোড়ার মনস্তত্ত্বের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

একটি ঘোড়াকে সওয়ারীর কাজ থেকে সরিয়ে ফসল মাড়াইয়ের কাজে লাগানো হয়েছিলো। ফসল মাড়াইয়ের কাজে লাগানোর পর সুযোগ পেলেই ঘোড়াটি নিজের হাঁটু মারাত্মকভাবে জখম করে ফেলতো। এর ফলে মালিক তাকে ফসল মাড়াইয়ের কাজ থেকে বিরত রাখতো। প্রতি মাসে দুইবার ঘোড়াটি এ রকম করতো। এর ফলে তাকে পাঁচ সাতদিন কাজ করানো হতো, এছাড়া অন্য সময় ঘোড়াটি বিশ্রামের সুযোগ পেতো। তিন মাস ক্রমাগত চেষ্টার পর ঘোড়াটিকে তার জন্যে নির্ধারিত ফসল মাড়াইয়ের কাজে পোষ মানানো সম্ভব হয়েছিলো। তারপর থেকে সেই ঘোড়া প্রতিবাদহীনভাবে ফসল মাড়াইয়ের কাজ করতো।

ঘোড়ার বেকারত্বের খেসারত

বেকারত্বের সময় এবং বিক্রি করার সময়ে ঘোড়া বিস্ময়কর অভ্যাসের শিকার হয়। যদি কর্মহীন এবং যত্নহীন অবস্থায় বেশী দিন ঘোড়া বাঁধা থাকে, তবে তার বিরক্তি গোপন থাকে না। আস্তাবলের বাইরে মাথা বের করে সে একাধারে ঘোরাতে থাকে। এ অবস্থা চলতে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। কখনো কখনো আকাশের দিকে মুখ তুলে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো ঘোড়া ঘরের কোণের বাঁশ দাঁতে চেপে বিশেষ ভংগিতে বেশ কিছু পরিমাণ বাতাস পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। বিশেষ শব্দ করে সেই বাতাস সে গিলে ফেলে। কেউ যদি বাধা না দেয় তবে সারাদিন ভর বিশেষ ভংগিতে বাতাস গলাধঃকরণ অব্যাহত থাকে। দুপুর নাগাদ অতিরিক্ত বাতাস খাওয়ায় তার পেট ফুলে যায়। নিজের ঘোড়ার প্রতি অযত্নের খেসারত দিতে গিয়ে ঘোড়ার মালিককে তখন পশু চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় এবং ঘোড়ার চিকিৎসা করাতে হয়।

কর্মকৌশল শেখার যোগ্যতা

ঘোড়ার মধ্যে কাজ এবং কাজের কৌশল শেখার বিস্ময়কর যোগ্যতা রয়েছে। সাধারণ সার্কাসে ঘোড়া তার পছন্দ এবং অপছন্দ অর্থাৎ হাঁ এবং না-র প্রকাশ নিজের মাথা নাড়িয়ে করতে পারে। বহু লোক সমাগমের জায়গায় সাদা বা কালো রং-এর টুপি পরিহিত লোকদের বাহু আঁকড়ে ধরে তাদেরকে আলাদা করতে পারে। পা তুলে সালাম জানানো এবং মাটিতে পড়ে যাওয়া রুমাল তুলে মালিককে খুব সহজে দিতে পারে। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলায় ঘোড়া নানা প্রকার দৈহিক কসরত দেখিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়। এসব মেলার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। মেলা বা প্রদর্শনীতে নানাবিধ ক্রীড়া কৌশল সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ঘটনায় বুঝা যায় ঘোড়ার বুদ্ধিবিবেচনা এবং মানসিক পরিপক্বতা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ঘোড়ার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা হলে ঘোড়া তার মেধা ও দক্ষতার প্রমাণ পেশ করতে পারে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়া তার মালিকের হাতের ইশারা এবং চোখের ইশারাও খুব সহজে বুঝতে পারে। তারপর মালিকের ইশারা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে। এ সম্পর্কে পেড্রো নামের এক ক্রীড়াবিদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানা যায়। ছোটো খাটো অবয়বের একটি ঘোড়াকে পেড্রো বিস্ময়কর কিছু কর্মকৌশল শিক্ষা দিয়েছিলো। সেই তেলেসমাতি ঘোড়া পেড্রোর প্রদর্শনী করছিলো। সেই সমাবেশে আমীর ওমরাহ, পুরোহিত এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পেড্রো সেখানে সূক্ষ্ম ইশারা এমনভাবে করলো যে কেউ কিছুই বুঝতে সক্ষম হলো না। ফলে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, ঘোড়া এবং তার মালিকের ওপর শয়তান ভর করেছে। তারপর শাস্তিস্বরূপ পেড্রো এবং ঘোড়াকে পুড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দেয়া হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরও করা হলো।

১৭০৮ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে এমন একটি ইংলিশ ঘোড়ার বিবরণ পাওয়া যায়, যে ঘোড়া নানারকমের তাস আলাদা করে দেখাতে সক্ষম ছিলো। দর্শকরা ঘোড়ার এ রকম বিস্ময়কর কৃতিত্বে ভীত হয়ে পড়লো। ১৭০৭ সালে সেই ঘোড়াকেও পেড্রো এবং তার ঘোড়া সারাকোর পরিণতি বরণ করতে হয়েছিলো।

ঘোড়ার কথা বলা

কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে ঘোড়া তার নানারকম অনুভূতি প্রকাশ করে থাকে। যদি বলা হয় যে, ঘোড়া সকল গৃহ পালিত পশু এমনকি কুকুরের চেয়েও অর্থবোধক ভংগিতে কথা বলে, তবে সেটা অযৌক্তিক হবে না। পাশাপাশি রাখা কয়েকটি ঘোড়ার মধ্যে যদি একটি ঘোড়াকে আলাদা করা হয়, তবে সেই ঘোড়া অন্যান্য ঘোড়াকে বিদায় জানায়। ঘোড়া মাতা তার সন্তানকে ডাকার সময় বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে। পুরুষ ঘোড়া নারী ঘোড়াকে, যুবক ঘোড়া যুবতী ঘোড়াকে বিশেষভাবে আহ্বান জানায়। একত্রে অবস্থানকারী ঘোড়া দ্রুত দৌড়ে যাওয়ার সময় অন্য ঘোড়াদের সূক্ষ্ম ইশারায় অথবা বিশেষ শব্দে সালাম জানায়। আস্তাবলের অন্যান্য ঘোড়ার মধ্যে একটি ঘোড়া যখন বের করে নেয়া হয় সে সময় অন্যান্য ঘোড়া তাকে বিদায় জানায়। কোথাও থেকে ফিরে আসা ঘোড়াকে অবস্থানকারী অন্য ঘোড়া সালামের জবাব দেয়। তবে এই সালাম বিনিময় অন্যান্য ঘোড়া বুঝতে পারে না।

খাবার সামনে আসার পর ঘোড়া গলা থেকে বিশেষ শব্দ বের করে আনন্দ প্রকাশ করে। খাবার দিতে দেরী হলে গলা থেকে বিশেষ শব্দ বের করে ঘোড়া বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে। ছোটো খাটো বিষয়ে যদিও ঘোড়া ভয় পায়, কিন্তু ভয়ের কারণে মানুষের মতো চিৎকার করা নিজের জন্যে সম্মান হানিকর মনে করে। যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও ঘোড়া চিৎকার করে, কিন্তু এই চিৎকার শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় মালিকের চিৎকারের মতোই শোনা যায়।

www.nagorikpathagar.org

ঘোড়ার ব্যথার অনুভূতি

একজন পশু বিশেষজ্ঞ প্রায় এক ডজন ঘোড়াকে রেলগাড়ীর নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, মৃত্যুর সময় সেসব ঘোড়ার কণ্ঠ থেকে যে শব্দ বের হয়েছিলো, সেই শব্দ সাধারণ সময়ে বের হওয়া শব্দের চেয়ে ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। ঘোড়া ব্যথা বেদনা ও যন্ত্রণার অনুভূতি প্রকাশ করে। পেটে ব্যথার সময় মানুষের ব্যথার সময়ের অনুভূতি প্রকাশের মতো শব্দ করে। মুখ ঘুরিয়ে ব্যথার জায়গার প্রতি ইশারা করে। রোগাক্রান্ত কোনো জায়গায় যদি চিকিৎসক অনুভূতি বিলোপ না করেই অস্ত্রোপচার করে, তবে ঘোড়া চিৎকার দিয়ে নিজের বিরক্তির কথা জানায়। যুদ্ধকালীন সময়ে যখন বোমা বর্ষণ করা হয় তখনো ঘোড়া চিৎকার করে। অতীতেও এ রকম যুদ্ধকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা যেসব ঘোড়ার রয়েছে তারা বেশী চিৎকার করে। তবে কোনো ঘোড়া যদি গুরুতরভাবে আহত হয়, তবে ধৈর্যের সংগে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

ঘোড়া যদি সাপের মতো হিসহিস শব্দ করে, তবে বুঝতে হবে সে তার শত্রুকে চিহ্নিত করেছে এবং শীঘ্রই তার ওপর হামলা করবে। এ রকম অবস্থায় ঘোড়ার সামনে যাওার আগে ভেবে দেখবেন আপনিও তার অপছন্দনীয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত কি না।

মানুষের কথোপকথন ঘোড়া বুঝতে পারে

ঘোড়া নিজেদের মধ্যে কথা বিনিময় করে এবং মানুষের বলা কথাও কিছু কিছু বুঝতে পারে। মানুষের কথাবার্তা এবং ভাবভংগি ঘোড়া খুব দ্রুত আত্মস্থ করতে পারে। একটি ভালো কথাও যদি আপনি ক্রুদ্ধভাবে বলেন তবে ঘোড়া আপনার ক্রোধের প্রকাশ অনুমান করতে পারবে। পক্ষান্তরে ঘোড়া প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। ঘোড়ার শ্রবণ শক্তি অত্যন্ত পরিষ্কার। দূরে কোথাও ফিসফিস করে কথা বলা হলেও ঘোড়া খুব সহজে সেকথা বুঝতে পারে। এ কারণেই ঘোড়া শোরগোল হৈ চৈ পছন্দ করে না। ঘোড়া তার মালিকের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে কাতর থাকে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলার সময়েও মালিকের একটি প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে ঘোড়া তার চলার গতি থামিয়ে দেয়। এসব কিছুর অনেকটাই প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভর করে। যেসব ঘোড়ার প্রশিক্ষণে ত্রুটি থাকে তাদেরকে নরম নাজুক ভাষায় আহ্বান জানানো হলেও তাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

প্রতিশোধ স্পৃহা

ঘোড়ার মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। তবে সে নিজের শত্রুর উপরেই সেই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এক ব্যক্তি ছোটোবেলা থেকে ছোটো খাটো একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতো। সেই ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বেশ লম্বা হয়ে গেলো। এ কারণে নতুন একটি ঘোড়া ক্রয় করলো। নতুন ঘোড়া দেখে ছোটো খাটো দেহের পুরাতন ঘোড়া প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠে। নতুন ঘোড়াকে দেখামাত্র সেই পুরাতন ঘোড়া মাটিতে পা আছড়াতো, উত্তেজনায় ছটফট করতো। একদিন বাঁধন

www.nagorikpathagar.org

ছিঁড়ে ছোটো খাটো বৃদ্ধ হওয়া সেই ঘোড়া নতুন ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিলো।

পশু চিকিৎসক একটি অসুস্থ ঘোড়ার চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু চিকিৎসক যেখানে অস্ত্রোপচার করেছিলেন সেই জায়গায় অনুভূতিনাশক ওষুধ ব্যবহার করেননি। ফলে ঘোড়াটি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলো। এ ঘটনার তিন বছর পর রেসকোর্সের ময়দানে এই ঘোড়া সেই চিকিৎসককে দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আশেপাশের লোকেরা তাৎক্ষণিকভাবে তার সাহায্যের জন্যে ছুটে না এলে সেই চিকিৎসককে ক্রুদ্ধ ঘোড়াটি মেরেই ফেলতো।

যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে, ঘোড় সওয়ার নিহত হলে তার ঘোড়া আততায়ীকে হত্যা করেছে। ইতিহাসে এ রকম বহু ঘটনার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডের একজন বাদশাহ ছিলেন উইলিয়াম সুয়েম। তিনি তার এক সভাসদ জন লেনিউককে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন। জন লেনিউককে যখন ফাঁসি দেয়া হচ্ছিলো, তিনি বাদশাহর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান, কিন্তু বাদশাহ তার সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। জন লেনিউক ছিলেন বাদশাহর পুরনো বন্ধু, তিনি তার অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করে নিজের প্রিয় ঘোড়াটি বাদশাহকে দান করেন। এই ঘোড়া ছিলো দ্রুতগামী এবং আনুগত্য পরায়ণ। বাদশাহ ঘোড়াটি পেয়ে খুশী হন এবং যেখানেই যেতেন এই ঘোড়াই ব্যবহার করতেন। এমনি করে পাঁচ বছর কেটে যায়। একদিন বাদশাহ তার প্রাসাদের সামনে ঘোড়াটির পিঠে আরোহণ করছিলেন, হঠাৎ ঘোড়াটি লাফ দিয়ে উঠে এবং বাদশাহকে মাটিতে ফেলে দেয়। এতে বাদশাহর ঘাড় ভেংগে যায় এবং তিনি সংগে সংগে মৃত্যুবরণ করেন। এটা ছিলো ১৯০২ সালের ৮ই মার্চের ঘটনা। মৃত্যুর পাঁচবছর পর মনিবের অনুগত ঘোড়া মনিব হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলো।

নেশাসক্ত ঘোড়া

ঘোড়া খুব সহজে নেশাজাত দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ে। আমার পিতার একটি ঘোড়ার নাম ছিলো শফকত। সেই ঘোড়া, যেটিকে দেখাশোনা করতো সে ঘোড়াকে দু'একবার চা পান করতে দিয়েছিলো। এতে ঘোড়া চায়ের নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, এমনকি চা পানের সময় হলেই ছটফট শুরু করতো। আস্তাবলের দেয়ালে মাথা ঠুকতো। অবশেষে তাকে চা দেয়ার পর সে শান্ত হতো। আমি একজন কোচোয়ানকে সিগারেট পান করে ঘোড়ার মুখের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে দেখেছি। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে ঘোড়া সেই ধোঁয়া তার ফুসফুসে গ্রহণ করতো। কোচোয়ান দূরে বসে সিগারেট পান করতে শুরু করলে ঘোড়া ছটফট করতো। মাটিতে জোরে জোরে পা ঠুকতো। রেসের সময় অনেকে ঘোড়াকে মদ পান করায়। এর ফলে ঘোড়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। সে সময় নেশার ঘোরে যদি ঘোড়া কোনো অঘটনও ঘটায় তখন ঘোড়া একথা বিবেচনা করে না যে, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো হে মানুষ, আমি এখন নেশাগ্রস্ত।

www.nagorikpathagar.org

পরিশ্রমী ঘরকন্না

রসূল (স.)-এর সময়ে মহিলা সাহাবীরা ঘরকন্নার কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করতেন। তারা নিজের হাতে রান্না করতেন, যাঁতায় গম পিষাতেন, পানি আনতেন, কাপড় সেলাই করতেন। তারা প্রয়োজনে রণাংগনে আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। সৈনিকদের পানি পান করাতেন। এরফলে মহিলাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকতো, তাদের সন্তানদের ওপরও এসব কাজের ভালো প্রভাব পড়তো। ইসলামের দৃষ্টিতে সেই স্ত্রীই আদর্শ, যিনি ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। তার চেহারায় ঘরোয়া কাজের ক্লান্তির ছাপ লেগে থাকে। রান্না ঘরের ধোঁয়া, কালি, ঝুলি গায়ের কাপড়ে লেগে থাকে।

রসূল (স.) বলেন, আমি এবং ধূলি কালি ঝুলি মাখানো নারী কেয়ামতের দিন পাশাপাশি অবস্থান করবো। (আদাবে জিন্দেগী)

যেসময় মহিলারা পরিশ্রম করতেন সে সময় তাদের রোগব্যাধি হতো না। মহিলাদের শ্রমবিমুখ করা হচ্ছে ইউরোপীয় রীতি। বর্তমানে ইউরোপে পুনরায় মহিলাদের ঘরোয়া কাজ কর্মের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বলতে গেলে তারা ঠেকে শিখছে।

ঘরোয়া কাজকর্মের কারণে নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রা.) এর পোশাক ধূলি কালিতে লেপ্টে থাকতো। (মামুলাতে নববী)

আর্থার এন অলাস্টিন

আর্থার এন অলাস্টিন তাঁর লেখা হাফ আওয়ার উইথ মোহাম্মদ (স.) গ্রন্থের ২৮তম পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইসলাম নারীদের ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত দেখতে চায়। এই সকল নারী যখন বিলাসিতায় মেতে উঠে তখন তারা নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। সেসব রোগ নিরাময়ে ডাক্তার এবং হাসপাতাল হিমশিম খেয়ে যায়। আমি মনে করি, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে নারীদের ঘরকন্নার কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃদ্ধাশ্রমে ইউরোপীয় বৃদ্ধাদের অবস্থা

পারিবারিক বিশৃংখলার কারণে ইউরোপীয় নারীরা পৌঢ় বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে বা মহিলাদের নার্সিং হোমে বসবাস করেন। তবে যেসব মহিলার স্বামী বেঁচে থাকে অথবা সন্তান বেঁচে থাকে এবং পারিবারিক পরিবেশ উন্নত থাকে- সেসব মহিলার জীবন যাপনে ভোগান্তির শিকার হতে হয় না। এনআইএইচআর-এর এক রিপোর্টে একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিন হাজার বৃদ্ধা নারী এবং বৃদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উক্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এই রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, নার্সিং হোমে বসবাসকারিণী বৃদ্ধ মহিলারা নানারকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও নার্সিং হোমে স্বস্তিবোধ করেন না। যেসব বৃদ্ধের স্ত্রী জীবিত থাকে তারাও নার্সিং হোমে বা বৃদ্ধাশ্রমে বসবাস করতে রাযি হয় না।

শিশু এবং বৃদ্ধদের একত্রে ভ্রমণ

বয়স্কদের সংগে শিশুদের ভ্রমণে যাওয়া উভয়ের জন্যেই কল্যাণকর। বৃটিশ সংবাদপত্র ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় সম্প্রতি এ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বয়স্কদের সংগে যদি তাদের নাতি নাতনিরা ভ্রমণে বের হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরী হয় এবং উভয়ের মানসিক দূরত্ব দূর হয়ে যায়। এ পর্যায়ে দলভিত্তিক সমবয়েসীদের ভ্রমণের কথাও বলা হয়েছে। বয়স্কদের সংগে বস্করা, শিশু-কিশোরদের সংগে শিশু কিশোররা সফরে বের হলেও এর সুদূর প্রসারী সুফল পাওয়া যায়। এর ফলে শিশু কিশোরদের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলামে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব অসাধারণ। দাম্পত্য জীবনে রূঢ়তা রুক্ষতা কঠোরতা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামে বলা হয়েছে, নারী হচ্ছে বাঁকা হাড়ের তৈরী- এ কারণে তাদের সংগে রূঢ় কঠোর আচরণ করা যাবে না। পুরুষদের মর্যাদাও ইসলামে নিশ্চিত করা হয়েছে। রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার জন্যে যদি আমি অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীদের বলতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সেজদা করে। ইউরোপীয় সমাজে ইসলামের এসব শিক্ষার বাস্তবায়ন না থাকায় তারা নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে জীবন কাটায়।

দাম্পত্য জীবনের তিক্ততার প্রভাব শিশুদের ওপর পড়ে

দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর তিক্ত সম্পর্কের কারণে নারী এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এনআইএইচআর-এর এক রিপোর্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী স্বামী স্ত্রী যখন ঝগড়া করে, তখন শিশুরা নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে। তারপর স্ত্রী যদি ঘর ছেড়ে যায় তবে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা এবং অস্থিরতার মধ্যেই ঘর ছাড়ে। দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতা শুরু হয় প্রথমত টাকা পয়সাকে কেন্দ্র

www.nagorikpathagar.org

করে। তারপর সেটা পরিবারের অন্যান্য বিষয়ে বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ এশিয়ার যৌথ পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বেশী হয় এবং এই ঝগড়ার পরিণামে নারী এবং শিশুরা শারীরিক এবং মানসিক রোগের শিকার হয়। (উইকলি সান)

ইসলাম নারীকে ঘরের চেরাগ নামে অভিহিত করেছে এবং নারীর জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করেছে। এই নারী যখন মজলিস এবং মাহফিলের চেরাগে পরিণত হয়, তখন ঘরের কি অবস্থা হতে পারে? ইসলামী জীবনে পর্দার মধ্যে অবস্থানের কারণে নারী যে সম্মান লাভ করে এবং ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে তার যে গুরুত্ব রয়েছে, অন্য কোথাও সেই গুরুত্ব নেই। ইসলামে নারী ঘরের চেরাগ, বাজারের সৌন্দর্য নয়। নারী যখন নিজের রূপ সৌন্দর্য ফেরী করে বেড়াতে শুরু করে তখন তার পরিণাম কি হয় দেখুন।

কর্মজীবী নারীর পরিবেশ এবং মানসিক চাপ

পারিবারিক পরিবেশে যেসব মহিলা জীবন যাপন করে ধ্বংসাত্মক রোগ তাদের তেমন প্রভাবিত করতে পারে না। কারণ, তারা ঘরের বাইরে কর্মজীবী নারীদের চেয়ে নিজেদের অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। তাছাড়া তাদের পানাহারেও কোনো প্রকার অনিয়ম হয় না। আমেরিকান উইমেন সিন্ডিকেটের এক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ঘরোয়া কাজে ব্যস্ত মহিলাদের ওপর পরিবেশ কম প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষান্তরে কর্মজীবী মহিলারা পরিবেশের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়। ফলে তাদের কর্মক্ষমতা এক সময় কমে যায়। তাদের মানসিক চাপ এতোটা বাড়ে যে, এক পর্যায়ে তাদেরকে চাকুরীতে ইস্তফা দিতে হয়। যে প্রতিষ্ঠানে তারা চাকুরী করে সেই প্রতিষ্ঠান তাদের চাকুরী টিকিয়ে রাখতে অস্বীকার করে।

কর্মজীবী নারীর বহুমুখী সমস্যা

উন্নত বিশ্বে সন্তান প্রসবকালীন সময়ে প্রসূতি মৃত্যুর হার অনেক। বিশ্বে যতো শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ শিশু জন্মগ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে। ভারতীয় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নত বিশ্বে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা লক্ষণীয় নয়। সোশ্যাল সেটআপ এবং দরিদ্রতার কারণে বিশ্বে প্রতিদিন অসংখ্য মা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতে প্রসূতি মৃত্যুর দৈনিক সংখ্যা ৩২১। ভারতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৫০-এর দশকে এ অবস্থা এমন ভয়াবহ পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, প্রতি এক হাজার প্রসূতির মধ্যে সন্তান প্রসবকালে ১৪৬ জন মা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৯০-এর দশকে এই সংখ্যা কমে গিয়ে প্রতি এক হাজারে ৭৪ জনে নেমে আসে। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রতি এক হাজারে মাত্র চার পাঁচ জন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কর্মজীবী নারীরা সন্তান প্রসবকালীন সময়ে নানাপ্রকার জটিলতার সম্মুখীন হয়। দৈহিক ক্লান্তির কারণে তারা মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সন্তান প্রসবের সময় তাদের জীবন হয়ে উঠে ঝুঁকিপূর্ণ। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মজীবী প্রসূতিদের প্রসবকালীন ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে যেসব মহিলা কর্মরত রয়েছে তাদের ছুটি বাড়ানো হয়নি, ফলে তারা ঝুঁকির মধ্যেই থেকে যায়। সন্তান

www.nagorikpathagar.org

প্রসবের পর স্বামী স্ত্রী উভয়ে কর্মজীবী হওয়ার কারণে শিশুর দেখাশোনার দায়িত্ব তারা পালন করতে পারে না। যৌথ পরিবারে শিশুর যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ছোটো সংসারে নবাগত শিশুকে নিয়ে তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়। শিশুকে তারা ঘরেও রেখে যেতে পারে না, আবার অফিসে নেয়াও সম্ভব হয় না।

এমতাবস্থায় চাইল্ড কেয়ার অথবা আয়াদের ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রেও যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ তাদের সমস্যার শেষ থাকে না। কর্মজীবী গ্রামীণ মহিলা এবং শহরে বসবাসকারী মহিলাদের নিজেদের শারীরিক সমস্যা ছাড়াও সন্তান লালন পালন বড়ো রকমের সমস্যা সৃষ্টি করে। উপরন্তু এসব মায়ের ভিটামিন স্বল্পতার কারণে দেহে রক্তের স্বল্পতা দেখা দেয়। মায়ের দেহে ভিটামিন এ-এর স্বল্পতার কারণে শিশুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (দৈনিক প্রতাপ, ভারত)

বৃটেনে পুরুষের সংগে একত্রে কাজ করে এমন মহিলাদের মধ্যে অসংখ্য মহিলার মাথার চুল অকালে পড়ে যায়। বৃটেনের টাইমস সংবাদপত্রে এ বিষয়ের ওপর একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পোর্স মাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এ গবেষণার ব্যবস্থা করেছিলো। রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, পুরুষদের সংগে কর্মরত শতকরা ৩০ ভাগ মহিলার চুল পড়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উক্ত গবেষণায় অফিসে এবং কলে-কারখানায় কর্মরত ৮০০ মহিলার মতামত নেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ওসব মহিলা পুরুষদের সংস্পর্শে ক্রমাগত কর্মরত থাকার কারণে তাদের মধ্যে পুরুষোচিত হরমোন বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থানের কারণে এরকম মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাদের মধ্যে পুরুষদের অভ্যাস ও স্বভাব গড়ে উঠছে। রিপোর্ট অনুযায়ী সাংবাদিকতা, চিকিৎসা, আইন পেশা, বিমান চালনা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করছে। এসব মহিলা নিজ নিজ পেশায় দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে, তবে এ জন্যে তাদেরকে পুরুষদের দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ডাক্তার লাঞ্জ নামের একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, তিনি অকালে চুল ঝরে পড়া মহিলাদের চিকিৎসা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে পুরুষালী হরমোন কমাতে বাধ্য হয়েছেন। (ফরেন হিস্ট্রি অব মেডিকেল)

দুঃসময়ের অশ্রু

রসূল (স.)-এর পুত্রসন্তান হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর পর রসূল (স.)-এর চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিলো। তাঁর দৌহিত্র হযরত যয়নব (রা.)-এর পুত্রের মৃত্যুতেও রসূল (স.) কেঁদেছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, হে আল্লাহর রসূল এটা কি? তিনি বলেছিলেন, এটা হচ্ছে আল্লাহর রহমত, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের অন্তরে এই রহমত প্রবাহমান রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার সেসব বান্দার ওপর দয়া করেন, যারা অন্যের ওপর দয়া করে। (আদাবে জিন্দেগী)

একবার রসূল (স.)-এর দরবারে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। লোকটিকে হত্যা করার পর তার মেয়ে বিলাপ করতে করতে রসূল (স.)-এর দরবারে এলো। মেয়েটির বিলাপ শুনে রসূল (স.) কাঁদতে লাগলেন। সাহাবাগণ এই

www.nagorikpathagar.org

দৃশ্য দেখে অবাক হলেন। রসূল (স.) বললেন, এই কান্না হচ্ছে আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদের কাজ আর হত্যার সিদ্ধান্ত দেয়া হচ্ছে আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের কাজ।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স.)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) রসূল (স.)-কে খবর পাঠালেন যে, আমার পুত্র মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আপনি আসুন। রসূল (স.) জবাবে সালাম পাঠালেন এবং বললেন, নিঃসন্দেহে যা কিছু নেবেন সেটাও তাঁর আর যা কিছু দেবেন সেটাও তাঁর। সবকিছুর জন্যেই তাঁর কাছে সময় নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আশা পোষণ করতে হবে। রসূল (স.)-এর কন্যা পুনরায় কসম দিয়ে খবর পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। তারপর রসূল (স.) যয়নবের ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এ সময় রসূল (স.)-এর সংগে ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.), হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা। রসূল (স.) পৌঁছার পর জয়নবের পুত্রকে তাঁর কোলে দেয়া হলো। শিশুটি সে সময় ছিলো অন্তিম শয্যায়। শিশুর অবস্থা দেখে রসূল (স.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিলো। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বললেন, একি! হে আল্লাহর রসূল আপনি কাঁদছেন? রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মনে দয়ার যে গুণ সৃষ্টি করেছেন, এই কান্না সেই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। যারা অন্যের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া করেন। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত দাউদ (আ.)-এর কান্না

আমাদের পূর্ববর্তীকালের লোকেরা ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। আল্লাহর নবীরা নিজের সন্তানের মৃত্যুতে কান্নাকে নবুওতের মর্যাদা পরিপন্থী মনে করতেন না। হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর দরবারে অঝোর ধারায় কাঁদতেন। তিনি বলতেন, আমার মাথা অশ্রুতে পরিপূর্ণ এবং আমার চোখ অশ্রুর ফোয়ারা।

বুযুর্গদের বক্তব্য

একজন বুযুর্গ বলেছেন, অবশ্যই আমাদের কান্নার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কান্না পছন্দ করেন এবং খিলখিল করে হাসি অপছন্দ করেন। রসূল (স.)-এর সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, দুঃখ কষ্টের সময় চোখের অশ্রু প্রবাহিত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমার এক বন্ধুর কাহিনী

কান্না সবার কাছে পছন্দনীয় নয়। এ কারণে আমার এক বন্ধু তার পনের বছর বয়স্কা কন্যার মৃত্যুতে একটুও কাঁদেনি। সে বিশ্বাসই করতে চায়নি যে, তার কন্যার মৃত্যু হয়েছে। তার হিতাকাঙ্ক্ষরী তাকে কাঁদতে দিতে সবাইকে নিষেধ করেছিলো। মেয়ের লাশ কবরে নামানোর সময় তাকে মেয়ের মুখ দেখতে দেয়া হয়নি। আশংকা ছিলো মেয়ের চেহারা দেখে সে কাঁদতে শুরু করবে। আমার বন্ধুর হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাকে সব সময় হাসি খুশী রাখতে চেয়েছিলো।

www.nagorikpathagar.org

এর ফল কি হয়েছিলো? আমার বন্ধু তার মৃত কন্যার কক্ষটি ঠিক সেভাবে সাজিয়ে রেখেছিলো, যেভাবে মেয়েটি জীবদ্দশায় তার কক্ষ সাজিয়ে রাখতো।

সামাজিক দুরবস্থা

কান্নার ফলে মনের আগুন নিভে যায়, কান্না মনে শান্তি আনে। আমাদের সমাজে একটা প্রবণতা হচ্ছে যে, মানুষ কাউকে কাঁদতে দিতে চায় না। তারা চায় সবাই সব সময় খিলখিল করে হাসুক। কিন্তু তারা চিন্তা করে দেখে না যে, বেশী হাসলে মন মরে যায় অথচ কান্না মনের কলুষ কালিমা দূর করে মনকে সজীব করে তোলে। মানুষ দুঃখ কষ্টের সময় কাঁদবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষের স্বাভাবিক এই প্রবণতা রোধ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ। চোখের গরম অশ্রু ভালোবাসা এবং আবেগের প্রকাশ ঘটায়। আবেগের গলা টিপে হত্যা করার অবস্থা দেখে বলতে হয় সেই প্রাচীন প্রবাদ বাক্য। সেই বাক্যে বলা হয়েছে যে, দাঁড়ানোর চেয়ে বসা ভালো। বসার চেয়ে শুয়ে থাকা ভালো। স্বাভাবিক কান্নায় মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। আনন্দের সময় মানুষ যে কাঁদে, সেই কান্নাও স্বাভাবিক। আনন্দে মানুষ যখন কাঁদে তখন তার চেহারা খুশীতে ঝলমল করে। অশ্রু হচ্ছে ভালোবাসার দর্পণ।

মৃত্যু চিন্তা থেকে দূরে থাকা মানুষের জন্যে শোভনীয় নয়। বরং মৃত্যুর অনুভূতি হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রিয় উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। জনৈক মনীষী বলেছেন, প্রেরণার সংগে বিবেকের সম্পর্ক হচ্ছে দেহের সংগে পোশাকের সম্পর্কের মতো। পোশাক ব্যতীত মানুষ সভ্য ভদ্রোচিত জীবন কাটাতে পারে না। দুঃখে শোকে চিৎকার করে কাঁদা, বিলাপ করা শোভনীয় নয়, কিন্তু নীরবে অশ্রুপাত করা স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বভাবসম্মত এই কাজের বিরোধিতা করা শুধু যে ক্ষতিকর তাই নয়; বরং গোস্তাখি এবং হঠকারিতা। স্বভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ রুদ্ধ করা স্বাভাবিক পক্রিয়া অবমাননার শামিল। মানুষের চোখে যদি অশ্রুর আবেহায়াত না থাকে, তবে মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে না। স্বভাবের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে যারা যুলুম করে বলতে লজ্জা নেই তাদের এ অবস্থা আমাকে কাঁদায়।

কান্নার উপকারিতা

কান্নায় আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর রসূল (স.) সন্তুষ্ট হন। কান্নায় দোযখের আগুন নিভে যায়, জান্নাতের টিকেট পাওয়া যায়। তবে সে কান্না অবশ্যই আল্লাহর ভয়ে হতে হবে।

কান্না সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা

কান্নার মধ্যে এমন উপকারিতা রয়েছে যে, মানুষ যদি সেসব জানতে পারে তবে সব কাজকর্ম ছেড়ে কাঁদতে শুরু করবে। কান্নার ফলে চোখের অসুখ ভালো হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, যারা হাসে তাদের চেয়ে যারা কাঁদে, মানুষ তাদের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়। আমাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক মানুষই কান্নার উপকারিতা সম্পর্কে অবগত।

www.nagorikpathagar.org

এ উপকারিতার কথা জানা থাকলে মানুষ সব কাজ ফেলে শুধুই কাঁদতো। ভারতীয় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কান্নার কারণে চোখের অনেক অসুখ ভালো হয়ে যায়। কান্নার কারণে অনেক বড়ো বড়ো পাপ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। অনেক বড়ো বড়ো আশা আকাঙ্ক্ষা কেঁদে কেঁদে পূরণ করা যায়।

এটা অবধারিত সত্য যে, হাসির চেয়ে কান্না দেখে মানুষ বেশী আকৃষ্ট হয়। যারা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চায়, যারা আল্লাহর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে– তারা একাকী কেঁদে কেঁদে বিশ্বজগতের অনেক রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। হযরত আদম (আ.) এবং বিবি হাওয়া জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সব সময় কেঁদেছিলেন। সেই অবিরাম কান্নার কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অভিমানী প্রিয় মানুষের মন জয় করার জন্যে কান্না হচ্ছে একটি সফল কৌশল। বলা বাহুল্য, কান্না হচ্ছে একটি আশা, আর আশার ওপরই দুনিয়া টিকে আছে।

প্রাকৃতিক সার ব্যবহার এবং কমলা লেবুর চাহিদা

রসূল (স.)-এর যুগে খাঁটি এবং স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্য মানুষ ব্যবহার করতো। অথচ বর্তমানে আমরা কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করছি। কিন্তু ইউরোপীয়রা অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান। তারা খাঁটি ও নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পাকিস্তানের এক ভূ-স্বামীর বেশ বড়ো কমলা লেবুর বাগান রয়েছে। সেই ভূ-স্বামী আমাকে জানিয়েছেন যে, জাপানের একটি ফার্ম আমার কাছে বেশকিছু পরিমাণ কমলা লেবু রফতানী করার চাহিদা উল্লেখ করে আমাকে চিঠি লিখেছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের এখানে এমন কমলা লেবুর যথেষ্ট চাহিদা, যেসব কমলা লেবুতে কৃত্রিম সার ব্যবহার করা হয়নি বরং জৈব ও প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, কৃত্রিম সার ব্যবহার করা কমলা লেবুতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন থাকে না। অথচ প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করা কমলা লেবুতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন থাকে।

বেশী সংখ্যক সন্তান

হযরত মাআকাল ইবনে ইয়াছার (রা.) বর্ণনা করেন রসূল (স.) বলেছেন, এমন নারীকে বিয়ে করবে যে নারী ভালোবাসবে এবং সন্তান প্রসব করবে। (যদি সে বিধবা হয়, তবে আগের বিয়ে দ্বারা এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। যদি সে কুমারী হয়, তবে তার সুস্থতা এবং তার পরিবারের অন্যান্য বিবাহিত নারীর অবস্থা দেখে তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।) কেননা, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্য উম্মতদের ওপর গর্ব করবো। (অর্থাৎ বলতে পারবো যে আমার উম্মত সংখ্যায় বেশী)। (আবু দাউদ, নাসাঈ, হায়াতুল মুসলেমিন)

আমি যে সময় ফ্রান্স সফর করেছিলাম সে সময় একজন লোক আমার সংগে ফ্রান্স থেকে জার্মানীতে গিয়েছিলো। ফ্রান্স থেকে জার্মানীতে যাওয়ার পর সেখানে ব্যয়ের আধিক্য অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান উচ্চ দেখে আমি তাকে পরামর্শ দিলাম যে, আপনি

www.nagorikpathagar.org

ফ্রান্সে ফিরে যান। কারণ, আপনার সংগে সাতটি সন্তান এবং স্ত্রী রয়েছে, জার্মানীতে এতো ব্যয় কিভাবে নির্বাহ করবেন। লোকটি বললো, অর্থ ব্যয়ের জন্যে আমি মোটেই চিন্তিত নই। কারণ আমি সন্তানদের খাদ্য, শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের জন্যে সরকারের কাছে থেকে নিয়মিত ভাতা পাই। যার যতো বেশী সন্তান থাকবে- তার ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। (ফ্রান্স থেকে জার্মানী গ্রন্থের সৌজন্যে)

সন্তান সংখ্যা হ্রাস করার শ্লোগান শুধু মুসলমানদের জন্যে? বিশেষত এশিয়ার দেশসমূহের জন্যেই কি প্রযোজ্য? এক সময় ইউরোপ সন্তান কমানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলো। ফলে তাদের সন্তান সংখ্যা কমতে শুরু করেছিলো। এ সময় হিটলার ঘোষণা করেন, সন্তান বাড়াও, সেনাবাহিনীতে ভর্তি করো, মিত্রশক্তিকে তাড়াও।

রাতের খাবার

রসূল (স.) নিয়মিত রাতের খাবার খেতেন। কয়েকটি খেজুর হলেও তিনি খেতেন। তিনি বলতেন, রাতের খাবার ত্যাগ করা হলে বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজা, উসওয়ায়ে রসূল)

আমার কাছে একজন লোক এসেছিলো। সে জানালো, আমি রাতে খাবার খেতাম না। খালি পেটে ঘুমাতাম। এর ফলে আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হলাম। এখনো সে রোগের চিকিৎসা করাচ্ছি।

মধ্যম পন্থা ও কঠোরতা পরিহার

রসূল (স.) বলেছেন, সাদাসিধে, সহজ সরল জীবন যাপন করো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে জীবন কাটাও। সব সময় হাসিখুশী থাকো। (মেশকাত)

রসূল (স.) একদিন লক্ষ্য করলেন, একজন বয়স্ক ব্যক্তি দুই পুত্রের কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে পথ চলছে। রসূল (স.) জানতে চাইলেন যে, এই বৃদ্ধের কি হয়েছে? তাঁকে জানানো হলো যে, এই লোকটি কাবাঘর পর্যন্ত হেঁটে যাবে বলে মানত করেছে। রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা বেনিয়ায, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। এই বৃদ্ধ নিজেকে শাস্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে। তারপর তিনি লোকটিকে সওয়ারীতে আরোহণ করে তার সফর শেষ করার আদেশ দিলেন। (আদাবুল মোফরাদ)

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) বলেন, যতোটুকু আমল তুমি করতে পারো, যতোটুকু আমল করার শক্তি সামর্থ তোমার মধ্যে রয়েছে- ততোটুকু আমল করো। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ক্লান্ত হবেন না, কিন্তু তোমরা ক্লান্ত হবে। (বোখারী)

হযরত আবু কয়েস (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে এমন সময় উপস্থিত হলাম যে সময় তিনি খোতবা দিচ্ছিলেন। আমি রোদের মধ্যে দাঁড়ালাম। রসূল (স.) আমাকে ছায়ায় যেতে ইঙ্গিত দিলেন, তখন আমি ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। (আদাবুল মোফরাদ)

www.nagorikpathagar.org

এ্যানি বেসান্তের লেখা বইতে এ সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষকদের অভিমত সংকলিত হয়েছে।

এ্যানি বেসান্তের গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্য

ইসলামের মধ্যমপন্থা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান লোভ লালসা অনেক সময় তাদের দৈহিক শক্তি সামর্থের অধিক কাজ করতে বাধ্য করে। সামান্য সময়ের সেই লোভ চরিতার্থ করার কাজ শেষ হওয়ার পর মানুষ মানসিক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। তারপর সেই কাজ যখন শুরু করে, তখন কাজের মধ্যে প্রাণ স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। [দি লাইফ এন্ড টিচিং অব হযরত মোহাম্মদ (স.)]

থমাস ডব্লিউ আর্নল্ড বলেছেন, দীর্ঘ একটি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং অস্থিরতা যখন মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে সুদৃঢ় করে, তখন এই আকাঙ্ক্ষার কারণে বড়ো বড়ো কাজ সম্পন্ন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু নিজের দৈহিক শক্তি সামর্থের চেয়ে অধিক কাজ যখন করতে চায়, তখনই তারা ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে। (দি প্রেসিং অব ইসলাম)

মেজর আর্থার গিলোন লিউনার্ডের অভিমত

রসূল (স.) সাঁতার দিয়েছেন এবং সাঁতারের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, একথা পাঠ করে আমার বিস্ময়ের অবধি রইলো না। অন্যদিকে রসূল (স.)-এর সাধনাপূর্ণ জীবন যাপনের কথা চিন্তা করলে বুঝা যায় প্রকৃতপক্ষে সাঁতারের মাধ্যমে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অংগ প্রত্যঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, দেহের রক্ত প্রবাহ গতিশীলতা লাভ করে, দেহ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে সক্ষম হয়। সাঁতারের এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই রসূল (স.) সাঁতারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রসূল (স.)-এর এই শিক্ষার মাধ্যমে বুঝা যায়, কেউ যদি ক্রীড়া হিসেবে এবং বিনোদন হিসেবেও সাঁতারকে গ্রহণ করে; তবে এর মাধ্যমে দৈহিক সুস্থতা পাওয়া যায় এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ ঘটে।

ফ্রিজে শিশু হত্যা

ইসলাম শিশু সন্তান হত্যা কিছুতেই অনুমোদন করে না। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে শিশুদের ইসলাম পূর্বকালে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়েছে। এখনো বহু দেশে ফ্রিজের ভেতর রেখে নবজাত শিশুদের হত্যা করা হয়ে থাকে। ইসলামে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ এবং গুরুতর পাপ। ইসলাম একটি মহান ও পবিত্র ধর্ম।

নবজাতক হত্যা

নবজাত শিশুদের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভারতে যে চিত্র পাওয়া যায়, সেটা অত্যন্ত ভয়াবহ। সেখানে দরিদ্রতা এবং ক্ষুধার ভয়ে শিশুদের হত্যা করা হয়। বৃটিশ সংবাদপত্র টাইমস-এর এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারতের বিহার এবং তামিলনাড়ুতে ক্ষুধা, দরিদ্রতা এবং যৌতুকের ভয়ে জন্মের পরই নবজাত কন্যা সন্তানকে হত্যা করে।

কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের পরই পিতা তাকে নিকটবর্তী জংগলে নিয়ে যেতো এবং বিষাক্ত গাছের রস খাইয়ে তাকে মেরে ফেলতো। কেউ কেউ ছোটো একটি পাত্রে

www.nagorikpathagar.org

কন্যা সন্তানকে বিরান জায়গায় রেখে আসতো। নবজাত কন্যা সন্তান সেখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতো। কোনো কোনো কন্যা সন্তানকে শক্ত দেয়ালের সংগে চেপে ধরে মেরে ফেলা হতো। তবে দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তানকে হত্যা করতো না কারণ, তারা আশা করতো যে সন্তান বড়ো হয়ে ঘরের কাজকর্ম করে দেবে। ব্রাজিলে কন্যা সন্তানকে দরিদ্রতার কারণে দেহ বিক্রি করতে হতো। দেহ বিক্রির মতো ঘৃণা পেশাই ছিলো তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। পিতামাতার সংসারে খাদ্য দ্রব্যের অভাবে ব্রাজিলের মেয়ে শিশুরা শৈশবেই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতো। তারপর নানারকম অপরাধে জড়িয়ে পড়তো। অপরাধী চক্র এসব মেয়ে শিশু সাবালিকা হওয়ার পর তাদের দিয়ে দেহবিক্রি করাতো। এক্ষেত্রে ব্রাজিলের রেলফে শহরের বিশেষ দুর্নাম রয়েছে। সেখানে রয়েছে বহু সংখ্যক মদপানের ক্লাব এবং পতিতালয়। ব্রাজিলে দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েদের সাহায্যের জন্যে কাসালাপা সাজিম নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাটি গড়ে তুলেছেন রিনা ভেলিনিকো নিলোলাস নামের একজন মহিলা আইনজীবী। উক্ত সংস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত নারী ও শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। পতিতা নারীদের সেখানে লেখাপড়াও শিক্ষা দেয়া হয়। (টাইমস)

পুষ্টিসমৃদ্ধ ফলের ব্যবহার

ইসলাম আরব জাহান থেকে সারা বিশ্বে বিজয়ী হয়েছে। ইসলামের শক্তি অতুলনীয়। খয়বরের গবর্নর মায়ছাব একদা গর্ব করে বলেছেন, আমি বড়ো রকমের খাদ্য স্তূপ নিমিষে সাবাড় করে দিতে পারি। হযরত আলী (রা.) তার এ অহংকারের জবাবে বলেছিলেন, আমি তো শুধু যবের রুটি খাই এবং এতেই আমার পেট ভরে যায়।

ইসলাম যে সব খাদ্য অনুমোদন করেছে আধুনিক বিজ্ঞান সে বিষয়ে গবেষণা করেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবারা সেসব খাবার খেতেন, যেসব খাবার ছিলো পুষ্টিকর এবং খাদ্যগুণে ভরপুর। তারা কোনো প্রকার কৃত্রিম খাদ্য খেতেন না। আধুনিক বিজ্ঞান জানিয়েছে যে, যেসব খাদ্যে ভিটামিন রয়েছে, সেসব খাদ্য কৃত্রিমতার দোষে দুষ্ট নয়।

এক সময় পশ্চিমা দেশসমূহে ঘাসপাতা, ভূষি, ছাতুকে পশুখাদ্য রূপে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমান উন্নত বিশ্বে সেসব খাদ্য মানুষ খুব সহজে গলধঃকরণ করছে।

১৯৭০ সালে ডাক্তার দীনেশ বরকত বলেছেন, বিশ্বের যেসব জাতি বেশী পরিমাণে আমিষযুক্ত খাবার খায়, তারা ক্যান্সার এবং অন্যান্য দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্ত থাকে। আমিষযুক্ত খাদ্য খাওয়ার ফলে আন্ত্রিক রোগ, হার্নিয়া এপেন্ডিসাইটিস, হিপনাটাইস, পিত্ত পাথরি এবং হৃদরোগ হয় না।

১৯২০ সালে পাশ্চাত্যে ডাক্তার জন হার্ভে একই কথা জোরালোভাবে বলেছিলেন। তারপর আমিষযুক্ত নানারকম কৌটাজাত খাবার তৈরী হতে থাকে। এখনো একই

www.nagorikpathagar.org

রকমের কৌটাজাত খাদ্য তৈরী এবং বিক্রি হতে দেখা যায়। ডাক্তার হার্ভের মতে, আমিষযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে আমেরিকার নাগরিকরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

জাহেলি যুগের আচরণ

রসূল (স.)-এর আবির্ভাবের আগে কিছুসংখ্যক লোক স্বজাতীয় লোকদের সংস্কার ও হেদায়াতের উদ্দেশ্যে মনগড়া কিছু বিধান তৈরী করেছিলো। সে সময়ে সমাজে বিস্ময়কর পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। সেটা ছিলো পথভ্রষ্টতার যুগ। ভালো কথা মেনে চলা দূরে থাক, কেউ ভালো কথা শুনতেও চাইতো না। সে সময় বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শনের একটি নিয়ম ছিলো। কেউ সদুপদেশ দিতে এলে যারা পছন্দ করতো না তারা উপদেশদানকারীকে বৃদ্ধাংগুলি দেখাতো। যারা বৃদ্ধাংগুলি দেখাতো তারা মনে করতো যে, এভাবে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে উপদেশ দানকারীকে লজ্জা দেয়া হয়েছে। এ সময়ে জাহেলি যুগের একজন পুণ্যপ্রাণ ব্যক্তি সমাজের লোকদের ভয়ে জংগলের দিকে চলে গেলেন এবং সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি ঘাস পাতা খেতেন এবং আল্লাহর এবাদাত করতেন। আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করতেন। তাঁর এ রকম সাধনার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে কয়েকটি গুণবৈশিষ্ট্য তৈরী করলেন। তিনি পাখীদের প্রতি যখন তাকাতেন তখন পাখীরা নিচে পড়ে যেতো। পাথরের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকালে পাথর ঝরে পড়তো। মোটকথা যে জিনিসের প্রতিই তিনি তাকাতেন, সে জিনিস তার তাকানোর কারণে ঘায়েল হয়ে যেতো। এই সাধকের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মক্কার লোকেরা তার কাছে আসতে শুরু করলো। এ সময়ে মক্কায় রসূল (স.)-এর নবুওত প্রাপ্তির কথা প্রচারিত হলো এবং মক্কার কাফেররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। কাফেররা রসূল (স.)-কে মেরে ফেলার জন্যে নানারকম ষড়যন্ত্র করছিলো। তাঁর প্রচারিত বাণীকে মক্কাবাসী জাদুকরের বাণী হিসেবে আখ্যায়িত করলো। নানা উপায়ে তাঁর প্রচারিত বাণী তারা ব্যর্থ করতে চেয়েও সক্ষম হলো না। মক্কার কাফের নেতারা এক পর্যায়ে অরণ্যবাসী সেই সাধকের কাছে গেলো। কারণ, সেই সাধক কিছু অসাধারণ শক্তি নিজের সাধনায় অর্জন করেছিলেন। মক্কার কাফেররা সেই সাধককে বুঝিয়ে শুনিয়ে মক্কায় ফিরিয়ে আনার কথা চিন্তা করছিলো।

অরণ্যবাসী সাধককে মক্কায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মক্কার কাফেররা নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করলো। সাধক মক্কায় আসতে রাযি হলেন না। তিনি বললেন, মোহাম্মদ (স.) যে বাণী প্রচার করছেন সেই বাণী মুখস্থ করে আপনারা নিয়ে আসুন আমি ধ্যানে অর্থাৎ মেডিটেশনয় বসে পরীক্ষা করবো। ধ্যানে বসার পর আপনারা বারবার আমাকে সেই বাণী শোনাবেন। ঘোরের মধ্যে আমি যে কথা বলবো, সেই বাণী সম্পর্কে সেটাই হবে আমার জবাব। মক্কা থেকে যাওয়া প্রিতিনিধি এ কথা শোনার পর মক্কায় ফিরে যান। তারপর সূরা কাওছার মুখস্থ করে সেই সাধককে শোনান। সাধক ধ্যানে বসে ঘোরের মধ্যে বলেন যে, এই বাণী মানুষের রচিত নয়। আমি হতাশ হয়ে মক্কাভূমি ত্যাগ করে এসেছি। আমি জানতাম না, মক্কায় এমন ব্যক্তির আবির্ভাব

ঘটবে– যিনি মানুষকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর পথে আহ্বান জানাবেন। তারপর সেই সাধক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হন। মক্কার কাফের নেতারা নিজেদের এই ষড়যন্ত্রেও সফল হয়নি। (আহওয়ালে ইসলাম, কিউজ জ্যাকসন থর্ড)

ধর্ম কি বুদ্ধির নাম নাকি অনুকরণ ঃ বিজ্ঞান এবং মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা

মানুষের বিবেক বুদ্ধি অসম্পূর্ণ। কিন্তু দ্বীনে মোহাম্মদী পরিপূর্ণ। মানুষ স্বভাবত খুব দুর্বল। একই সময়ে সকল জীবন ব্যবস্থা তাদের বোধগম্য হয় না। জীবনের একটি ক্ষেত্রে তারা সফলতা অর্জন করলে, অন্য বিষয়ে অপূর্ণতার সম্মুখীন হয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বহু মানুষ এই পৃথিবীতে এ রকম এসেছে যারা দ্বীনকে বিবেকের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের অসম্পূর্ণ বিবেক বুদ্ধি দ্বীনের পূর্ণতার কাছে পরাজিত হয়েছে। ফলে তারা দ্বীনের বিভিন্ন হুকুম আহকাম মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। কেউ কেউ বাহ্যিক অবস্থার মাধ্যমে দ্বীনকে বুঝার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারাও দ্বীনের বাস্তবতা থেকে দূরে থেকেছে। কারণ, দ্বীন হচ্ছে মোহাম্মদ (স.)-এর বর্ণিত ব্যবস্থা। আমার বিবেচনায় আসুক বা না আসুক, মানুষ বলুক অথবা না বলুক, আমি কোরআনের এই আয়াতের ওপর বিশ্বাস করি যে, শুনেছি এবং মেনেছি। ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞান যে গবেষণা শুরু করেছে, গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট মানুষদের ইসলামের পথে নিয়ে আসা। ইসলামে দীক্ষা পাওয়ার জন্যে তাদের সুযোগ তৈরী করা।

মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টি ধোঁকা খেতে পারে, কিন্তু যদি আমরা দ্বীনের দৃষ্টিতে কোনো কিছু দেখতে এবং বুঝতে চাই, তবে যা কিছু দেখতে পাবো সেসব হবে সত্য। দ্বীনের দৃষ্টিতে যা দেখা হয় সেসব সত্য, অন্য দৃষ্টি হচ্ছে সম্পূর্ণ ধোঁকা।

কয়েকটি ঘটনা

জুলিয়ান ফ্যাক্টস নামের নৌবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট রচিত 'সামুদ্রিক সফরনামা' নামক গ্রন্থে এসব ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন, প্রচণ্ড ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া একটি জাহাজ সন্ধান করছিলো। এবেল পোল নামের একটি জাহাজ। আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। সূর্যের আলো ঝলমল করছিলো। হঠাৎ একটি পতাকা দেখা গেলো। সেই পতাকা ডুবে যাওয়া জাহাজ সম্পর্কে ইশারা করছিলো। ডুবে যাওয়া জাহাজে যতো মানুষ ছিলো সবাইকে দেখা গেলো এবং সেই আরোহীরা বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছিলো। যদিও এসব কিছু ছিলো কল্পনা, তবুও উদ্ধারকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন হতাশ লোকদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে একটি নৌকা সমুদ্রে প্রেরণ করেন। সেই নৌকা ডুবন্ত জাহাজের কাছাকাছি হওয়ার সাথে সাথে বহু মানুষের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শোনা গেলো। কিন্তু যখন আমরা গন্তব্যে পৌঁছুলাম, সেখানে কয়েকটি বৃক্ষ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উদ্ধারকারী জাহাজের লোকেরা কল্পনার মাধ্যমে সব ঘটনা বুঝতে পেরেছিলো। এ ধরনের কল্পনা

www.nagorikpathagar.org

করার জন্যে বেশীসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ধোঁকা খাওয়ার জন্যে বা প্রতারিত হওয়ার জন্যে বেশীসংখ্যক লোকের প্রয়োজন নেই। কিছুসংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে যখন একটি দল গঠন করে, তখন তাদের মধ্যে সেই রকম গুণবৈশিষ্ট্য তৈরী হতে পারে- যেসব গুণ সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জ্ঞানী বা নির্বোধ সম্পর্কিত কোনো পার্থক্য থাকে না।

মসিও ডিভির ঘটনা

'মনস্তত্ত্ব জ্ঞান' (ইলমুন নাফছিয়াত) নামের একটি দৈনিক পত্রিকায় মসিও ডিভির লেখা একটি ঘটনার বিবরণ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

মসিও ডিভি একবার ইউরোপের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে এক জায়গায় আমন্ত্রণ জানালো। তাদের সংগে ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক মিস্টার উইলিয়ামও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মসিও ডিভি তাঁর তেলেসমাতি কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার জন্যে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা একত্রিত হওয়ার পর মসিও ডিভি তাদের সামনে কয়েকটি জিনিস উপস্থিত করেন। তারপর বলেন যে, আপনারা এসব জিনিসের যে কোনো জায়গায় ইচ্ছে অনুযায়ী চিহ্ন দিন। তারপর মসিও ডিভি তাদের সামনে অপার্থিব কিছু আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা করেন। সেই জ্ঞান হচ্ছে টেলিপ্যাথির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা মসিও ডিভির কাজে এতোটাই বিস্মিত এবং অভিভূত হন যে, তারা সার্টিফিকেট দেন মসিও ডিভি যা কিছু করেছেন এসব আমাদের বোধ বুদ্ধি চিন্তা চেতনা বহির্ভূত। মানুষের দ্বারা এ রকম কাজ অসম্ভব বলেই তাদের ধারণা ছিলো। সার্টিফিকেট পাওয়ার পর মসিও ডিভি বলেন, এতোক্ষণ আপনারা যা কিছু দেখে বিস্মিত এবং অভিভূত হয়েছেন প্রকৃতপক্ষে এসব ছিলো জাদু। রূহানী শক্তি এবং কাশফ-এর সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই ঘটনা যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি মন্তব্য করেন যে, মসিও ডিভিও যা কিছু প্রদর্শন করেছেন, সেসব কিছুর চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা কিভাবে তাকে সার্টিফিকেট দিলেন।

মসিও লিবান অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে প্যারিসের এক জায়গায় একটি বালকের মৃতদেহ পাওয়া গেলো। সেই জায়গা দিয়ে একটি বালক যাচ্ছিলো। সে লাশ দেখে বললো এটি আমার সহপাঠীর লাশ। পরদিন সেই সহপাঠীর মাকে এনে লাশটি দেখানো হয়। মহিলা লাশ দেখে কান্নাকাটি শুরু করলেন। তিনি বললেন, এই লাশ আমার সন্তানের। সে বহুদিন যাবত নিখোঁজ রয়েছে। মহিলার নাম জাউন্ডরেট। বালকের একজন আত্মীয়কে খবর দেয়া হলো। তিনি লাশ দেখে বললেন, এটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রেয়ারের লাশ। বিচারক সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। বালকের স্কুল শিক্ষকেরও সাক্ষ্য নেয়া হলো। স্কুল শিক্ষক বালকের গলায় একটি সোনার পদক দেখে বললেন, এই পদক তাকে স্কুল থেকে দেয়া হয়েছে। বালকটি ওই মহিলার সন্তান। তিন সপ্তাহ পর জানা গেলো এই লাশ প্যারিসের কোনো বালকের নয় বরং এটি বোর্ডো শহরের একটি বালকের লাশ। একটি কোম্পানী বালকটিকে বোর্ডো শহর থেকে প্যারিসে এনেছিলো। এ তথ্য জানার পর পূর্বোক্ত বালকের মা, নিকটাত্মীয় শিক্ষকসহ সকল সাক্ষী নিজেদের ভুল স্বীকার করলেন।

www.nagorikpathagar.org

দু'টি মেয়ের ডুবে মরার ঘটনা

এ গ্রন্থ যে সময় আমি রচনা করছিলাম, সে সময় খবরের কাগজে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিলো। খবরে বলা হয়, ফ্রান্সের সীন নদীতে দু'টি মেয়ে ডুবে মারা যায়। নদী থেকে তাদের লাশ তুলে শনাক্ত করার জন্যে উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়েছিলো। কয়েকজন লাশ দেখে সাক্ষ্য দেন যে, ওরা দু'জন বোন, ওদের পিতা অমুক। বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে লাশ দাফনের অনুমতি দেন। যে সময় লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তখনই মেয়ে দু'টি বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। যারা লাশ দু'টি এই দু' মেয়ের বলে সাক্ষী দিয়েছিলো, তারা জানালো যে চেহারার মিল দেখে তারা ও রকম সাক্ষী দিয়েছিলো।

দৃষ্টির ধোঁকা

দৃষ্টির ধোঁকা প্রতারণা সম্পর্কে ডাক্তার লিবান যে কথা বলেছেন, সেকথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানব সমাজে পয়গাম্বর এবং উম্মতের পুণ্যপ্রাণ ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য লোকেরা যে ধোঁকার সম্মুখীন হয়, এতে সকল সমাজের মানুষেরই ক্ষতি হয় অপরিসীম। এ রকম ধোঁকার অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। একথা বলা ভুল হবে না যে, ইতিহাসে মেধাবী লোকদের ধোঁকার অনেক বিবরণ রয়েছে। এসব লোককে ধোঁকা প্রতারণা থেকে মুক্ত রেখে সঠিক পথনির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা নবী রসূলদের প্রেরণ করেছেন। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ হচ্ছে এ রকম দৃষ্টির ধোঁকা। কোটি কোটি মানুষ সত্তর বছর যাবত সমাজতন্ত্রকে তাদের মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে দৃষ্টির পরিপূর্ণ ধোঁকা। এই আদর্শ এই মতবাদ মানুষের সমস্যার সমাধান দেয়া তো দূরের কথা, একটি মতবাদ হিসেবে টিকে থাকারই উপযুক্ত নয়। পুঁজিবাদ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্যের সকল দেশ পুঁজিবাদকে উন্নতি অগ্রগতি প্রগতির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী আদর্শ বিশ্বে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরী করেছে। এই সংকট হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সংকট। বিশ্বের সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী সীমিত সংখ্যক পুঁজিবাদীর হাতে কুক্ষিগত রয়েছে।

অথচ কোটি কোটি মানুষ জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। তথাপি পুঁজিবাদী বিশ্বের সমুদয় সম্পদ নিজেদের করায়ত্ত করার উন্মত্ততায় লিপ্ত রয়েছে। তাদের আরো চাই আরো চাই- এর চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তাদের এ লোলুপতার ফলে সমগ্র মানব জাতি শাস্তি ভোগ করছে। তাদেরকে অর্থলোলুপতা থেকে বিরত রাখার মতো কোনো আইন নেই বিধান নেই। আল্লাহ তায়ালা চাহে তো এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটির নীচে প্রোথিত হবে।

দৃষ্টির ধোঁকা ও ইসলাম

ইসলাম তার অনুসারী মুসলমানদের দৃষ্টির ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একটি মূলনীতি দিয়েছে। সেই মূলনীতি হচ্ছে রসূল (স.)-এর আদর্শে জীবন যাপন করা।

www.nagorikpathagar.org

ঈমানদাররা এই মূলনীতি গ্রহণ করেন। রসূল (স.)-এর উপস্থাপিত মূলনীতি পরিত্যাগ করে কেউ যদি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা এবং মেধা অনুযায়ী কোনো মতাদর্শ গ্রহণ করে জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে চায় তবে, সেই মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য হবে না কিছুতেই। সূরা নেসার তেরো ও চৌদ্দতম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, এইসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তবে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

রসূল (স.)-এর মাধ্যমে পাওয়া মোমেনদের যে পথ, সেই পথ ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা, সমবেদনা, কৌশল এবং দূরদৃষ্টিপূর্ণ পথ। (সমাজ, আধুনিকতা ও ইসলাম)

ইসলামে গুপ্তচরবৃত্তি

মোসাদ, র, কেজিবি, সিআইএ, সিক্রেট সার্ভিস, ইন্টেলিজেন্ট প্রভৃতি ছাড়াও রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ন্ত্রিত অসংখ্য গোয়েন্দা সংস্থা সমগ্র বিশ্বে কর্মরত রয়েছে।

হযরত ওমর (রা.)-এর গুপ্তচর ব্যবস্থা

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে শাসন ব্যবস্থার যেসব ক্ষেত্রে উন্নতি, অগ্রগতি সাধিত হয়, সেসবের মধ্যে ছিলো বিচার ব্যবস্থা, জেলখানা স্থাপন, পুলিশের ব্যবস্থা, চেকপোস্টের ব্যবস্থা এবং গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে এসব ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। (সিগমন্ডের মতবাদ, এ আর ওসমানী)

ইসলামে গুপ্তচরবৃত্তি

ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা একথা আপনারা বারবার শুনেছেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যারা ইউরোপীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত, প্রচারক তারা ইসলামকে শুধুমাত্র এবাদাত বন্দেগীর ব্যবস্থা সম্বলিত ধর্মবিশ্বাস-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। অথচ তারা চিন্তা করে দেখে না যে, ইসলামে ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সুবিন্যস্ত সর্বাংগীন সুন্দর বিধান রয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বে যেসব বড়ো বড়ো রাষ্ট্র রয়েছে, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী এবং দুর্বল হওয়ার মূলে রয়েছে গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দা কার্যক্রম। আমেরিকা, রাশিয়া, ইসরাঈল তাদের গুপ্ত গোয়েন্দা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। আমেরিকার একটি গোয়েন্দা বিমান তৈরীতে কোটি ডলার ব্যয় করা হয়। গোপন গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কার্যকর করার জন্যে তারা কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। বর্তমানে সিআইএ, মোসাদ কতো রকমের আধুনিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করছে, এ বিষয়ে সচেতন সকল মানুষই অবগত রয়েছে। অমুসলিম দেশগুলোতে গোয়েন্দা ব্যবহার গুরুত্ব অসাধারণ। অথচ এ রকম শক্তিশালী ব্যবস্থা মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত ছিলো। কেননা, আমাদের দ্বীন

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে গোয়েন্দা কার্যক্রম। যুদ্ধকালীন সময়ে রসূল (স.) মদীনায় আসা যাওয়া লোকদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বদর যুদ্ধে গৃহীত গোয়েন্দা কার্যক্রম

বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রুদের খবর সংগ্রহ করার জন্যে রসূল (স.) হযরত আলী, হযরত যোবায়ের (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে বদর প্রান্তরের কূপের কাছে প্রেরণ করেন। তিনজন সাহাবী জলাশয়ের কাছে কোরায়শদের কয়েকজন রাখালকে দেখতে পান। তারা পশুদের পানি পান করাচ্ছিলো। রাখালদের মধ্য থেকে তারা তিনজনকে গ্রেফতার করে রসূল (স.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। রসূল (স.) নিজে রাখালদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বলেন, তোমরা কোরায়শদের সম্পর্কে আমাকে তথ্য দাও। দুই রাখাল বললো, আল্লাহর কসম তারা ওই পাহাড় টিলার অন্যদিকে রয়েছে।

তাদের সংখ্যা কতো? রসূল (স.) জানতে চাইলেন।

তারা বললো, সেটা আমরা বলতে পারবো না।

রসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিদিন তারা কয়টি উট জবাই করে?

রাখাল দু'জন জানালো কোনোদিন ৯টি কোনোদিন ১০টি।

রসূল (স.) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, শত্রুদের সংখ্যা ৯শ' থেকে এক হাজার জনের মাঝামাঝি। তারপর তিনি জানতে চাইলেন যে, তাদের মধ্যে কোরায়শ নেতাদের কে কে রয়েছে? রাখালরা বললো, ওতবা ইবনে রবিয়া, শাইবা ইবনে রবিয়া, হাকিম ইবনে হাজাম, নওফেল ইবনে খোয়াইলেদ, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালফ, খাজার ইবনে হারেস রয়েছে। একথা শোনার পর রসূল (স.) বললেন, মক্কা তার কলিজার টুকরোদেরকে তোমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

হোনায়েনের যুদ্ধ

হোনায়েনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে রসূল (স.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামিকে শত্রুদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) শত্রু সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি শত্রুদলের সেনাপতি তায়েফ সর্দার মালেকের কিছু কথা নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে পৌছেন। মালেক বলেছিলো বেশক মোহাম্মদ (স.) এর আগে আমাদের মতো জাতির লোকদের মোকাবিলা করেননি। তিনি আমাদের মতো লোকদের সামনে আসেননি। এর আগে তিনি এমন সব লোকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন যারা যুদ্ধ করতে জানে না, তারা ছিলো অর্বাচীন গ্রাম্য লোক। এ কারণে তিনি ওদের ওপর জয়লাভ করতে পেরেছিলেন। শোনো তোমরা, খুব ভোরে আমাদের পশুপাল, সব মহিলা এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। তারপর তোমাদের পক্ষ থেকেই প্রথমে হামলা করবে। তোমরা তীর তলোয়ার রাখার উপাদান ভেংগে ফেলবে। মনে রেখো, তোমাদেরকে বিশ হাজার তলোয়ারের মোকাবেলা করতে হবে। একযোগে হামলা করা হলেই বিজয় অর্জিত হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামি

www.nagorikpathagar.org

(রা.) এই সকল কথা শুনে রসূল (স.)-কে অবগত করেন। তারপর রসূল (স.) সেই বক্তব্যের আলোকে যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ করেন।

আহযাবের যুদ্ধ

আহযাবের যুদ্ধে রসূল (স.) হযরত হোজায়ফা (রা.)-কে শত্রুদের অবস্থা জানার জন্যে প্রেরণ করেন। হযরত হোজায়ফা (রা.) শত্রু শিবিরে প্রবেশ করেন। তিনি জানান যে, আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধের সময় রসূল (স.) বললেন, শত্রুর অবস্থা এবং তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হয়ে আসার জন্যে কে যাবে? তবে শত্রুদের গতিবিধি এবং কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জেনে তাকে ফিরে আসতে হবে। রসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি এই খবর নিয়ে আসতে যাবে, আমি তার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো এবং জান্নাতে সে আমার পাশাপাশি যেন অবস্থান করে, আল্লাহর কাছে এই দোয়াও করবো।

হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর কথা শুনে কেউ দাঁড়ালেন না। সে সময় শীত ছিলো তীব্র। ভয় এবং ক্ষুধার কষ্টও ছিলো অসামান্য। তারপর কাউকে না দাঁড়াতে দেখে রসূল (স.) আমাকে ডেকে বললেন, হে হোজায়ফা, তুমি যাও। শত্রুদের শিবিরে প্রবেশ করবে এবং তাদের খবর আমাদের কাছে পৌঁছাবে। তবে তোমার যাওয়া আসার পথে কেউ যেন জানতে বা বুঝতে না পারে।

হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন, রাতে আমি শত্রুদের শিবিরে প্রবেশ করলাম। সে সময় প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিলো। শত্রুদের হাঁড়ি চুলা কিছু অক্ষত রইলো না। তারা রান্না করার জন্যে চুলা জ্বালাতে সক্ষম হচ্ছিলো না। তাদের তাঁবু উড়ে যাচ্ছিলো। এ সময় আবু সুফিয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে কোরায়শরা, তোমরা নিজ নিজ সংগীকে দেখে রাখবে। একথা শোনার সাথে সাথে আমি আমার পাশের এক ব্যক্তির হাত ধরে বললাম, তোমার নাম কি? সে বললো, অমুকের পুত্র অমুক। আবু সুফিয়ান বললেন, হে কোরায়শ সম্প্রদায়, তোমরা এখন নিজেদের ঘরের মধ্যে নেই। আমাদের উট এবং ঘোড়া ধ্বংস হয়ে গেছে। বনু কোরায়জা আমাদের সংগে অংগীকার ভংগ করেছে। তাদের কাছ থেকে আমরা অপ্রত্যাশিত আচরণ পেয়েছি। কাজেই তোমরা মক্কায় ফিরে চলো। আমি ফিরে যাচ্ছি। একথা বলে আবু সুফিয়ান উটের পিঠে উঠে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন।

হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন, যদি রসূল (স.) আমাকে খবর নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসার শর্ত আরোপ না করতেন, তবে আমি আবু সুফিয়ানকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে পারতাম। তারপর আমি ফিরে এসে সব কথা রসূল (স.)-কে অবগত করলাম। তিনি আমাকে জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানের জন্যে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

এসব ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে, রসূল (স.)-এর জীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যেসব ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, যদি আমরা ইসলামের সব বিষয় মেনে না চলি তবে সফলতার মনযিল অনেক দূরে চলে যাবে। আমাদের

www.nagorikpathagar.org

পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। একজন মোমেনের কর্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয় অনুসরণ করতে হবে, মেনে চলতে হবে। এতেই আমাদের জীবনে সাফল্য নিশ্চিত হবে। (ইসলামে গুপ্তচর বৃত্তির ধারণা)

অবাধ্যতার শাস্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রসূল (স.) বলেছেন, মানুষ যখন খাজনা ট্যাক্সকে নিজেদের মালিকানাভুক্ত সম্পদ মনে করবে, আমানতকে গণিমত মনে করবে, যাকাতকে ট্যাক্স মনে করবে, বেদ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে, নিজের স্ত্রীর আনুগত্য করবে, মায়ের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে, নিজের বন্ধুদের জন্যে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করবে, নিজের পিতাকে কষ্ট দেবে, মানুষ মাসজিদে হৈ চৈ করবে, খান্দানের অভিভাবক ফাছেক হবে, জাতির নেতৃত্ব মন্দ লোকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, মানুষের দুষ্কৃতি এবং অত্যাচারের ভয়ে তাদের সম্মান করা হবে, গান বাজনার সংগে জড়িত লোকেরা গান বাজনাকে সার্বজনীন করার জন্যে সচেষ্ট হবে, ঢালাওভাবে মদ পান করা হবে, উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী কালের লোকদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবে, এমতাবস্থায় মানুষ যেন আকাশে লাল রংয়ের মেঘের অপেক্ষায় থাকে, ভূমিকম্পের অপেক্ষায় থাকে, চন্দ্র গ্রহণের অপেক্ষায় থাকে, চেহারাসমূহ বিকৃত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এছাড়াও আরো নানাপ্রকার নিদর্শন পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকবে। ঠিক যেমন গলার মুক্তার মালার একাংশ ছিঁড়ে গেলে মালায় গাঁথা মুক্তাসমূহ একটির পর একটি ঝরে পড়তে থাকে।

নিদর্শনসমূহের প্রকাশ

হে মুসলমান ভাইয়েরা, চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। যেসব নিদর্শনের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের সমাজে কি সেসব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় না?

১. শাসকবর্গ জনগণের কাছ থেকে আদায় করা ট্যাক্স কি যথেচ্ছ ভোগ ব্যবহার করছে না?

২. পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনকে কি কষ্ট দেয়া হচ্ছে না?

৩. সমাজের নিকৃষ্ট লোকেরা কি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হচ্ছে না?

৪. রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর-এর মাধ্যমে গান বাজনাকে কি সার্বজনীন করা হচ্ছে না?

৫. যাকাতকে কি ট্যাক্স মনে করা হচ্ছে না?

৬. ঘরে ঘরে কি নাচ গান আনন্দ বিনোদনের জলসার আয়োজন করা হচ্ছে না?

নিদর্শন তো পূর্ণতা লাভ করেছে। এবার আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায় থাকুন। অপেক্ষার কি প্রয়োজন, আমরা তো আযাবে ডুবে আছি।

১. অত্যাচারী এবং মন্দ শাসক কি আল্লাহর দেয়া আযাব নয়?

২. আন্তর্জাতিকভাবে মুসলমানদের অবমাননা কি আল্লাহর আযাব নয়?

www.nagorikpathagar.org

৩. হত্যাকাণ্ড, নেফাক, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বিচ্ছিন্নতা কি আল্লাহর আযাব নয়?

৪. নিরাপত্তাহীনতা, ভয় ভীতি কি আল্লাহর দেয়া আযাব নয়?

৫. মানুষের রক্তপাত করা কি আল্লাহর আযাব নয়?

৬. মানসিক দূরত্ব এবং মানসিক অস্থিরতা কি আল্লাহর আযাব নয়?

৭. মান সম্মান নষ্ট হওয়া কি আল্লাহর আযাব নয়?

৮. ভূমিকম্প, ভূমিধস, ঝড় তুফান, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, দুর্ঘটনাসমূহ এবং নানা জায়গায় যুদ্ধ কি আল্লাহর আযাব নয়?

রসূল (স.)-এর বাণী

উপরোক্ত আযাবসমূহতো আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছি, তবু আল্লাহর কাছে তাওবা করার সৌভাগ্য আমাদের হচ্ছে না। আর রাতদিন গান বাজনা, খেলাধূলা, ক্রীড়া বিনোদনে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছি। অথচ রসূল (স.) বলেছেন, যারা গান বাজনা করে তাদের নামায কবুল হয় না। তিনি আরো বলেছেন, কেউ যদি গায়ক গায়িকাদের গান শোনে তার কানে কেয়ামতের দিন গলিত উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার কাছে গায়িকা থাকে, তবে তোমরা সেই মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করবে না। গান বাজনা করা পাপ। গান শোনার জন্যে বসা ফাসেকি অর্থাৎ দুষ্কর্ম এবং গান বাজনা দ্বারা স্বাদ আস্বাদন করা কুফুরী।

ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ

দুঃখের বিষয় মুসলমানরা ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতার কাদায় জড়িয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ থেকে উঠা সকল দুষ্কর্মকে এখানে আসমানী উপহার হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা যে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করছি, এ সম্পর্কে একজন কবি লিখেছেন,

মনের অবস্থা হচ্ছে ইংরেজী চেরাগ // মাথার ভেতর ইংরেজী মস্তিষ্ক
আমাদের চালচলন ইংরেজী // দেহের প্রতিটি লোম ইংরেজী
হিন্দী দেহের মধ্যে প্রাণ ইংরেজী // মুখের ভেতর জিহ্বা ইংরেজী।

অথচ এমন একটা সময় ছিলো যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে মাসজিদের সামনে দিয়ে কেউ যদি গান বাজনা করতে করতে যেতো, তবে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তো। মুসলমান যুবকরা সে উত্তেজনায় নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। কিন্তু বর্তমানে কি হচ্ছে? মাসজিদের ছায়ায় নগ্ন ছায়াছবি প্রদর্শিত হচ্ছে, কিন্তু কোনো যুবকের বিবেক এতে দগ্ধ হয় না।

একটা সময় ছিলো যে সময়ে যারা গান বাজনা করতো তাদেরকে ভাঁড়, কানজার, ডোম বলা হতো। ভদ্র লোকেরা তাদের নিজেদের পাশে বসতে দিতেন না। অথচ এখন তাদের তৎপরতাকে শিল্প নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং তাদেরকে এমন সম্মান দেয়া হচ্ছে যে রকম সম্মান বিশিষ্ট আলেম, ওলী, দরবেশ, বুযুর্গদের দেয়া হচ্ছে না।

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংগীত

বিখ্যাত কোনো গায়ক গায়িকা সংগীত পরিবেশনের জন্যে আমাদের দেশে এলে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। যারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের বলতে শোনা যায় যে, আরে ভাই, সংগীত হচ্ছে রূহের খাদ্য, কিন্তু আমি বলি এটা কেমনতরো রূহের খাদ্য যাকে রসূল (স.) অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। যে গানের মাধ্যমে নেফাক এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, যে গানের মাধ্যমে যিকির, এবাদাত, তেলাওয়াতের স্বাদ বিনষ্ট হয়ে যায়, মুসলিম মহিলাদেরকে বেহায়া বেপর্দা করে দেয়। কাজেই আমার কথা হচ্ছে যে, সংগীত রূহের খাদ্য তো নয় বরং রূহের জন্যে শাস্তিস্বরূপ। এই সংগীত হচ্ছে একটা নেশা অথচ আমরা এই নেশাকে খাদ্য ভেবে নিয়েছি। যদি সংগীত গান বাজনা খাদ্য হয়েও থাকে, তবে জেনে রাখুন সেসব হচ্ছে শয়তান এবং শয়তানের শিষ্য সাগরেদদের রূহের খাদ্য।

এ সবকিছু কায়সার কিসরা, হিন্দু ইহুদীদের রূহের খাদ্য মুসলমানদের রূহের খাদ্য নয়। মুসলমানদের রূহের খাদ্য হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর প্রশংসা এবং রসূল (স.)-এর প্রতি দরূদ সালাম প্রেরণ করা। মুসলমানদের রূহের খাদ্য হচ্ছে নামায যিকর এবং এস্তেগফার।

ফেতনা, সুগন্ধি এবং অপকারিতা

রসূল (স.) বলেছেন, পুরুষদের ব্যবহারের জন্যে সেই সুগন্ধি উপযুক্ত যার রং গোপন থাকবে, যেমন আতর। মহিলাদের জন্যে সেই সুগন্ধি ব্যবহারের উপযুক্ত যার সুগন্ধি গোপন থাকবে, কিন্তু রং দেখা যাবে। (তিরমিযী)

রসূল (স.) বলেছেন, যে মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যদিয়ে চলাচল করে তারা উড়নচণ্ডি (ব্যভিচারিণী)। (তিরমিযী)

একজন মন্দ মানুষের বার্তা অন্য একজন মন্দ মানুষের কাছে সুগন্ধিই পৌঁছে দেয়। অন্যের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সুগন্ধি সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। কেউ কেউ এটাকে তুচ্ছ বিষয় গৌণ বিষয় মনে করতে পারে, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভংগি হচ্ছে একজন মহিলা সুগন্ধি ছড়িয়ে অশালীন পোশাক পরিধান করে পুরুষদের মধ্যে চলাচল করতে পারবে না। কারণ, সুগন্ধি মেখে ঘুরে বেড়ানো নারীর সৌন্দর্য পর্দার আড়ালে থাকলেও তার ব্যবহার করা সুগন্ধি পুরুষদের চঞ্চল করে তুলবে। এ রকম করা পাপ। ধর্মপ্রাণ মহিলাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক এবং সচেতন থাকতে হবে। আধুনিককালের মহিলারা জেনে বুঝে এ রকম আতর সেন্ট সুগন্ধি ব্যবহার করে যা তীব্র গন্ধ ছড়ায়। এসব সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলারা পথে ঘাটে, বাজারে, দোকানে ঘুরে বেড়ায়। তারা পৌঁছার আগেই তাদের ব্যবহার করা সুগন্ধি পৌঁছে যায়।

যেসব মহিলা তীব্র সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকদের দেখানো এবং লোকদের মনে জ্বালা ধরানোই তাদের উদ্দেশ্য। তারা চায় যারা তাদেরকে দেখবে তারা তাদের প্রশংসা করবে, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ রকম মহিলাদের রসূল (স.) বাউন্ডুলে, উড়নচণ্ডি, ব্যভিচারিণী বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই ধর্মপ্রাণ মহিলাদের এ রকম

www.nagorikpathagar.org

সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত নয়, এ রকম পোশাক পরিধান করা উচিত নয় যেসব সুগন্ধি ও পোশাক প্রশ্নের উদ্রেক করে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর এবং তাঁর প্রিয় রসূলের অসন্তুষ্টিমূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখুন। (খেলাধূলা ও ইসলামী শিক্ষা)

সংক্ষিপ্ত পোশাক

বর্তমানে এক রকমের ফ্যাশন হচ্ছে মহিলারা চুল ছোটো করে রাখে, পুরুষরা চুল বড়ো করে। ইসলাম লজ্জাশীলতা পর্দাশীলতার ধর্ম, ইসলাম খোলামেলা ঢিলেঢালা লম্বা এবং সাদা পোশাক অনুমোদন করে। পোশাক সংক্ষিপ্ত হলে কি ক্ষতি হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

মাংস পেশী মরে যায় ঃ টাইটফিট এবং সংক্ষিপ্ত পোশাকের কারণে মাংসপেশী মরে যায় এবং দুর্বল হয়ে যায়। সংক্ষিপ্ত পোশাক দেহকোষের ক্ষতি করে। এছাড়া এ রকমের পোশাক মানসিক চাপ এবং মানসিক রোগ সৃষ্টি করে। (শুক্রবারে প্রকাশিত দৈনিক মাশরিকের সৌজন্যে)

নিয়তের প্রভাব ঃ হযরত যায়েদ ইবনে মাইছারা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি সকল আবেদনকারীর আবেদন মনযুর করি না; বরং তার মনোভাব এবং উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি। যদি সে আমার সন্তুষ্টি কামনা করে তবে তার নীরবতাকে তার চিন্তা হিসেবে তার কথাকে যিকির হিসেবে গ্রহণ করি।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ বলেন, একজন মানুষ যদি এ রকম কথা বলে, যে কথার মধ্যে মানুষের অসন্তুষ্টির উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু তার নিয়ত যদি ভালো থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে সেই ব্যক্তির জন্যে ওযর সৃষ্টি করেন। এর ফলে মানুষ বলতে থাকে যে, তার উদ্দেশ্য ভালো ছিলো। কিন্তু কোনো মানুষ যদি ভালো কথা বলে, কিন্তু তার নিয়ত ভালো না থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনে এ রকম ধারণা সৃষ্টি করেন যে, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভালো ছিলো না।

পুণ্যবানদের কিছু কথা

আওন ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, পুণ্যবান লোকেরা একে অন্যের প্রতি তিনটি কথা লিখে পাঠায়।

১. যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্যে আমল করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার দুনিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

২. যে ব্যক্তি নিজের ভেতর পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার বাহির পরিপাটি করে দেবেন।

৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর সংগে সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন রাখে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মানুষের সংগে সে ব্যক্তির সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন রাখেন।

ছহুল ইবনে সা'দ সায়েদী বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, মোমেনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। মোনাফেকের আমল তার নিয়তের চেয়ে উত্তম। কারণ, মোনাফেকের আমল তার নিয়তের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, বেশক আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা এবং অর্থসম্পদ দেখেন না বরং তিনি তোমাদের কাজ এবং তোমাদের অন্তর দেখেন।

একটি হাদীসে রসূল (স.) বলেন, শোনো, দ্বীন হচ্ছে এখলাছের অন্য নাম। প্রশ্ন করা হলো যে, কার সংগে এখলাছ? কার জন্যে এখলাছ? রসূল (স.) বললেন, আল্লাহর সংগে তাঁর রসূলের সংগে এবং সব মুসলমানের সংগে এখলাছ।

ফেকাহবিদরা বলেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও একিন রাখো, মানুষদেরও ঈমান একিনের দাওয়াত দাও আর মনে আশা পোষণ করো যে, সব মানুষ দ্বীনদার হয়ে যাক।

রেস্টুরেন্ট এবং ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ

প্যারাসাইকোলজি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার লেড বেটার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেছেন যে, হোটেলের খাবার কিছুতেই স্বাস্থ্যের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না। কেননা, সেই খাবার তৈরী এবং পরিবেশের মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছ থেকে অধিক থেকে অধিকতর অর্থ উপার্জন করাই হোটেল মালিকের নিয়ত থাকে। কাজেই আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, হোটেলের খাবার কল্যাণকর এবং সুস্থতার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। (ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তাধারা)

রুশ বিজ্ঞানীর গবেষণা

একজন রুশ বিজ্ঞানী ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত দন্তে শেফা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, বছরের পর বছর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চিকিৎসকদের মধ্যে যাদের নিয়ত ভালো থাকে, তাদের দেহ থেকে এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি বের হয়, সেই রশ্মির প্রতিক্রিয়া হয় ইতিবাচক। তাদের চিকিৎসার সময়ে সেই অদৃশ্য রশ্মির প্রকাশ ঘটে, এর ফলে রোগী সুস্থতা লাভ করে। যদি চিকিৎসকের নিয়ত খারাপ থাকে, তবে তার দেহ থেকে এমন রশ্মির প্রকাশ ঘটে যার প্রতিক্রিয়া হয় নেতিবাচক। সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফলে রোগী সুস্থ হয় না। কারণ, সেই চিকিৎসক নিজেই একজন রোগী। (খবরনামায়ে হামদর্দ)

শিশুর লালন পালন

রসূল (স.)-এর যুগে শিশুরা মাটিতে খেলা করতো। মাটিতে লালিত পালিত হতো। এতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকতো। তাদের দেহে শক্তি সামর্থ বজায় থাকতো। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতো, দূরদৃষ্টি তৈরী হতো। হযরত মাআয (রা.) এবং হযরত মাউয (রা.) বদরের যুদ্ধের সময় যে রকম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এতে বিস্ময়ের শেষ থাকে না। অথচ সে সময় তারা ছিলেন তাদের সংগে থাকা তলোয়ারের চেয়ে খাটো। তারা হাঁটার সময়ে তলোয়ার পেছনে হেঁচড়াতো। এখনো যেসব শিশু মাটিতে খেলাধূলা করে, মাটিতে লালিত পালিত হয়– তারা হয় স্বাস্থ্যবান, রোগ মুক্ত এবং বীরত্বের অধিকারী। এ সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে দেখা যাক।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার হানিম্যানের মতে ঃ মাটিতে এন্টিসেপটিক প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ফ্লোরাইড, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদান বিদ্যমান থাকে। মানব দেহের জন্যে এসব উপাদান অত্যন্ত জরুরী। এ কারণে ছোটো শিশুদের মাটিতে খেলাধূলা করতে দেয়া উচিত, এতে রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা। (দি হিস্ট্রি অব হানিম্যান)

কার্টিলেজ লিয়ার এবং নামায ঃ মেরুদন্ডের হাড়ের মাঝখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে। এর নাম হচ্ছে কার্টিলেজ লিয়ার। এই উপাদান স্পন্দিত না হওয়া দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। নামায আদায়ের সময় এই উপাদান বারবার স্পন্দিত হয়। এই কার্টিলেজ কম হওয়ার কারণে আমাদের ঘাড়ের হাড়ে ব্যথা হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা হয়। এ কারণে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঘাড় নানাভাবে ম্যাসাজ করতে হয়। কিন্তু নামায আদায় করার সময় ডানে বাঁয়ে সালাম ফেরানোর আমলের মাধ্যমে এই ম্যাসাজ বা ব্যায়াম সম্পন্ন হয়ে যায়।

মেরুদন্ডের রোগ প্রতিকারে নামায ঃ একজন মিশরীয় সার্জন বলেছেন, ৪০ জন রোগীর উপর গবেষণা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মেরুদণ্ডের হাড়ের রোগীর জন্য নামাযে নড়াচড়া খুবই উপকারী। মিশরীয় এই চিকিৎসক সার্জন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন। তিনি তার অধীনে চিকিৎসাধীন অপারেশনের রোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন অপারেশনের পর কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। আলজিরিয়ার বার্তা সংস্থা তাদের পরিবেশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেরুদণ্ডের হাড়ের রোগসমূহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি মিশরীয় চিকিৎসকদের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, একথা যথার্থ যে, মেরুদণ্ডের হাড়ের রোগে অপারেশন করা রোগীদের কমপক্ষে এক সপ্তাহ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে।

হাল্কা ব্যায়াম ও নামায ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিয়মিত হাল্কা ব্যায়ামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে কোনো রকমেই এই ব্যায়ামের উপকারিতা রয়েছে। চল্লিশ বছরের কম বয়সের মানুষ কঠিন ব্যায়াম করতে পারে, কিন্তু ৪০ বছরের বেশী যাদের বয়স তাদেরকে হাল্কা ব্যায়াম করতে হবে। নামায হচ্ছে হাল্কা ব্যায়ামের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর চেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট অন্য কোনো ব্যায়াম হতেই পারে না।

বিজ্ঞানী মাওস্কির মতে ঃ বিজ্ঞানী মাওস্কি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, নামাযের চেয়ে অধিক সুশৃংখল চমৎকার ব্যায়াম আমি অন্য একটিও দেখিনি। নামাযের মাধ্যমে একই সঙ্গে হাজার হাজার এমনকি লাখ লাখ মানুষ একজন ইমামের পেছনে নত হয়ে রুকু করে, সেজদা করে। ইমামের অনুসরণে মুক্তাদীগণ দেহের নানা রকম ভঙ্গি করে। এরচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যায়াম অন্য কোনোভাবেই সম্পন্ন হতে পারে না। (প্রাচ্যবাসীদের দৃষ্টিতে ইসলাম)

www.nagorikpathagar.org

বৃটিশ ম্যানেজারের স্বীকারোক্তি ঃ মক্কার একটি প্রতিনিধি দল ব্রিস্টল গ্লাসগো এবং এডিনবরার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। প্রতিনিধি দলে বখশ পরিবার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইকবাল ঢাল সাহেব আমাদের জন্য অন্য একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করলেন। গাড়ীর ড্রাইভার মুসা ভাই সউদী রিয়াল প্রস্তুতকারী বৃটিশ কারখানায় কাজ করেন। তিনি অত্যন্ত এবাদত গোযার এবং পরহেযগার মানুষ। দীর্ঘদিন যাবত তাবলীগের দাওয়াতের কাজ করেন। তিনি আলেম ওলামাদের সেবাযত্ন করেন। তিনি বলেন, রিয়াল প্রস্তুতকারী বৃটিশ কারখানার ইংরেজ ম্যানেজার আমাকে নিয়োগ করার সময় আমার কাজের প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। একপর্যায়ে ম্যানেজার বললেন, মুসা সাহেব আপনি আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কথা বলেছেন। আমি বললাম হাঁ, বলেছি। আল্লাহর আদেশে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। আল্লাহর নির্দেশিত এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানুষের কাছে মতামত নেয়ার আমাদের প্রয়োজন হয় না। বৃটিশ ম্যানেজার বললেন, ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমি চাই এই কারখানায় এরপর যেসব শ্রমিক নিয়োগ করা হবে তাদের সবাইকে নামাযী হতে হবে। মোহাম্মদ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করবে সে অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। অর্থাৎ নামাযের অর্পিত দায়িত্ব যারা পালন করবে, তাদের দ্বারাই অন্যান্য দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব।

বৃটিশ কারখানা ম্যানেজারের এই উপলব্ধি এই চিন্তা আমাদের সমাজে বস্তুবাদী চিন্তার সে সকল মুসলমান রয়েছে তাদেরকে কতোটা প্রভাবিত করবে যারা নামাযের সময় শ্রমিকদের ছুটি দেয়াকে কাজের ক্ষতি মনে করে।

মৃদু হাসি ও হাসি কৌতুক

হাসিমুখে কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা সদকার অন্তর্ভুক্ত। সেই ব্যক্তি ভালো মুসলমান যার মুখে সব সময় মৃদু হাসি লেগে থাকে।

রসূল (স.) যখন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তার চেহারায় থাকতো মৃদু হাসি।

রসূল (স.) বিভিন্ন সময়ে পুরোপুরি হেসেছেন এ রকম প্রমাণও রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যে হাসি কৌতুক করতেন। হাসি সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে দেখা যাক।

হাসি একটি ওষুধ ঃ হাসি ঠাট্টা করার মতো কোনো বিষয় নয়; বরং হাসি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সম্পতি এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে। দীর্ঘ গবেষণার পর চিকিৎসকগণ এ ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, হাসি দেহ ব্যতীত আত্মার জন্যও উত্তম ওষুধ।

ফরেস্ট বোরার্ড-এর মতে ঃ ১৯৪২ সালে ফরেস্ট বোরার্ড লিখেছেন, হাসি মানবদেহে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে সহায়তা করে, পেটের চামড়ায় মালিশের কাজ করে, ক্ষুধার উদ্রেক করে। হাসি রক্ত চলাচলের দ্রুততা নিয়ন্ত্রণ করে, মানবমনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। হাসি ভয় এবং হতাশা দূর করে।

www.nagorikpathagar.org

স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক নরমান কাজিনস হাসির মাধ্যমে একটি জটিল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। এরপর থেকে তিনি রোগ নিরাময়ে হাসির শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন এবং হাসি সম্পর্কে অধিকতর গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছেন।

মেরীল্যান্ডের মনস্তত্ত্ব বিশারদ ঃ অনেক সময় মানুষ আপন মনে হেসে উঠে। এরকম হাসির অবশ্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ডাক্তার হেনরি উলসন একথা বলেছেন। মেরীল্যান্ডের মনস্তত্ত্ব বিশারদ ডাক্তার হেনরি উলসন বলেছেন, চিকিৎসার যে হাসি সে হাসি কোনোক্রমেই ঠাট্টামূলক বা পরিহাসপূর্ণ হাসি হতে পারবে না। বিদ্রূপের হাসি, প্রশংসার হাসি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকৃতপক্ষে আপনি কেন হাসবেন, এটা ঠিক তেমন গুরুত্বপূর্ণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিভাবে হাসবেন।

ঠাট্টা বিদ্রূপের হাসি এক রকম আবার চিকিৎসামূলক হাসি হচ্ছে অন্যরকম। এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় ডাক্তার হেনরি উলসন বলেন, হাসি ঠাট্টা তিন প্রকার। এর মধ্যে বিদ্রূপাত্মক হাসি হচ্ছে একটি। এই হাসিকে ধ্বংসাত্মক হাসিও বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকার হাসি হচ্ছে অর্থপূর্ণ হাসি বা কৌতুককর হাসি। কোনো চুটকি বা কৌতুক শোনার পর এই হাসির প্রকাশ ঘটে। এ হাসি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

তৃতীয় প্রকারের হাসি হচ্ছে সাধারণ কথার মধ্যে প্রকাশ পাওয়া সহজ এবং সাবলীল হাসি। যেমন, আপাতঃদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও কোনো কথার মাধ্যমে যদি নিগূঢ় কোনো সত্য প্রকাশ পায় তবে এ ধরনের হাসির উদ্রেক হয়। এ হাসি তুচ্ছ বিষয়কেও অর্থপূর্ণ করে। জীবনের স্বাভাবিক চলমানতার সঙ্গে এ রকম হাসি সাযুজ্যপূর্ণ। ডাক্তার হেনরি উলসন বলেন, আমি তৃতীয় প্রকারের এই হাসি পছন্দ করি।

রেমন্ড মোডির মতে ঃ হাসির পর হাসি গ্রন্থের রচয়িতা রেমন্ড মোডি ডাক্তার হেনরি উলসনের অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রেমন্ড মোডি বলেছেন, যার মধ্যে স্বাভাবিক কৌতুকানুভূতি রয়েছে, এ রকম নিজেকে এবং অন্য মানুষদেরকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে। এ রকম মানুষ জীবনকে এমন রসিকতা এবং পরিহাসের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে যাতে তার নিজের এবং অন্য মানুষদের ভালোবাসা সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

খোশ মেযাজ ঃ অসুস্থ মানুষ সাধারণত দুর্বল স্বভাবের অধিকারী হয়। তারা অসুস্থতার সময় ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তার উলসন বলেন, অধিকাংশ মানুষ নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়। একজন মানুষের আকর্ষণ এবং অনুভূতির কারণে তার অসুস্থতার মেয়াদ কমবেশী হয়। প্রতিটি মানুষকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আপনি যদি হাসিখুশী এবং সদালাপী মানুষ হন, তবে অবশ্যই ইতিবাচক প্রবণতা গ্রহণ করবেন। নেতিবাচক প্রবণতা যদি ভয়, ঘৃণা এবং ক্রোধ-এর বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধকে দুর্বল করে তবে ইতিবাচক প্রেরণার প্রভাব এর বিপরীত হওয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসকদের কাছে এ বিষয়টি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বলা বাহুল্য, খোশ মেযাজ থাকা সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ স্থিতিশীল করে ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে, হাসি শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ স্থিতিশীল করে। হাসি রক্তে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

এ গবেষণার পর ওষুধের পাশাপাশি চিকিৎসকগণ রোগীকে হাসতেও বলতে শুরু করেন। অনেক রোগীকে কোনো ওষুধ না দিয়ে বলেছেন যে, হাসিই হচ্ছে আপনার রোগ নিরাময়ের প্রতিষেধক। কেননা, হাসি সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

ডাক্তার ব্রেসলারের মতে ঃ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যথা নিরাময় কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন ডাক্তার ব্রেসলার। তিনি রোগীদের প্রশ্ন করতেন যে, বলুন তো আপনার রক্তে কোলেস্টরেলের পরিমাণ কতো?

যেসব লোক ব্যথায় আক্রান্ত হয়, তারা এ রকম কাজ করতে পারে না যেসব কাজে তারা আগে তৃপ্তি বোধ করতো। তারা অনুভব করে যে, তাদের কাজের পথে ব্যথা বাধা সৃষ্টি করছে। ডাক্তার ব্রেসলার বলেন, ব্যথা যদি বেশিদিন বিদ্যমান থাকে ,তবেই তা মানুষের প্রফুল্লতা এবং সুস্থতাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ডায়াবেটিসের মতো ক্ষতিকর রোগীদের অবস্থাও একই রকম হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর রোগীগণ হাসি ঠাট্টাকে নিজেদের চিকিৎসার অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারবে না। প্রাপ্তবয়স্ক অনেক রোগীর ডায়াবেটিসের চিকিৎসা হচ্ছে ব্যায়াম, পরিমিত খাদ্যগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন।

ডাক্তার ব্রেসলার বলেন, হাসি একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। তিনি আরো বলেন, ওষুধের পাশাপাশি হাসি ঠাট্টা তামাশার উপাদান যুক্ত করা হলে সাধারণ সর্দিও তাড়াতাড়ি ভালো হয়। সাধারণ সর্দি হলেই অনেকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় আমার পরামর্শ হচ্ছে, নিজেকে পছন্দনীয় কোনো কাজে লিপ্ত রাখুন। মোটকথা অসুস্থতার সময়ে হাসি খুশীর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা হলে রোগ ভালো হয়ে যাবে। এ রকম কাজ সানন্দে সম্পন্ন করা সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি হাসিখুশী না থেকে আপনি মনমরা হয়ে থাকেন এবং দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হন, তবে রোগ আপনাকে পেয়ে বসবে। আপনাকে নাজেহাল করে দেবে। দুইজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ এই পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের এই পরামর্শ শুধু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সকল রোগের রোগীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ডাক্তার উলসন বলেন, এমনকি যদি আপনি উদরাময় বা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন, তবু এ পরামর্শ কাজে লাগাবেন। প্রতিটি মানুষই স্বভাবত কৌতুকপ্রিয়। মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই কৌতুক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে কিছু লোক কঠোর স্বভাবের রয়েছে যারা কৌতুকের ধারে কাছেও যায় না, কিন্তু এমন লোকও রয়েছে যারা জটিল কঠিন পরিস্থিতিতেও কৌতুকের কোনো না কোনো বিষয় বের করে নিতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার বারমান এবং ডাক্তার টৌকে বলেছেন ঃ রুক্ষ স্বভাবের লোকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। সহনশীল স্বাভাবিক মেযাজের লোকদের সান্নিধ্য এবং সংস্পর্শ গ্রহণ করুন। যারা আপনাকে হাসিখুশী থাকতে সহায়তা করবে আপনাকে প্রফুল্ল রাখবে, আপনাকে উদাসীন গোমড়ামুখো করবে না।

ডাক্তার ব্রেসলার বলেন, শুষ্ক নীরস মেযাজের মানুষ অন্যদেরকে নিংড়ে খোকলা করে দেয়। হাসিখুশী মেযাজের লোক সাহসীও হয়ে থাকে। তারা পতিত লোকদের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

কৌতুকপ্রিয়তা শিক্ষা দেয়ার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই। খোশ মেযাজ এবং প্রফুল্ল স্বভাবের লোকদের আচার ব্যবহার থেকেই আপনি কৌতুকপ্রিয়তা শিক্ষা করতে পারেন। কৌতুকপ্রিয়তার মধ্যে স্বভাবসম্মতভাবেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

কৌতুকপ্রিয়তার জন্য বিশেষ সময় এবং সুযোগ সন্ধান করার প্রয়োজন নেই। সচেতন মানুষেরা সব সময়েই এর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। আগেই আমি উল্লেখ করেছি কৌতুকপ্রিয়তা এবং ঠাট্টাবিদ্রূপ এক জিনিস নয়। দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সারকথা, এ যাবত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, এতে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপের চেয়ে আলাদা জিনিস। মনে রাখতে হবে জোরে জোরে অর্থাৎ শব্দ করে হাসা অট্টহাসি দেয়া স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। মৃদু হাসি এবং স্বাভাবিক হাসিই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কল্যাণকর এবং উপকারী। (হাসি ও সমাজ, জে আর নারায়ণ)

মন্দ নারীর সংস্পর্শ পরিহার

রসূল (স.) যে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে পছন্দ করতেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পুণ্যবতী নারী। মন্দ নারীর সংস্পর্শ থেকে রসূল (স.) আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। তিনি দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ আমি এরকম নারী থেকে তোমার পানাহ চাই যে নারী আমার বৃদ্ধ হওয়ার আগেই আমাকে বৃদ্ধ করে দেবে। সেই সন্তান থেকে পানাহ চাই যে সন্তান আমার জন্যে আপদে পরিণত হবে। হে আল্লাহ তুমি রক্ষা করো। আমীন।

কাজেই নিজের জন্যে বা নিজের সন্তানের জন্যে যদি কোনো নারী সন্ধান করো, তবে এরকম নারী সন্ধান করবে যাদের মধ্যে দ্বীনদারী বিদ্যমান রয়েছে। যারা পুণ্যবান। কারণ, নারীর মধ্যে যদি দ্বীনদারী না থাকে তবে সে নারী আযাবে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেউ যদি পুণ্যবতী নারী লাভ করে তবে তাকে মর্যাদা দেয়া উচিত। সেই নারীর অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। নারীর মূল্যায়ন হচ্ছে তার অধিকার সমূহ আদায় করবে, তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। আল্লাহ তায়ালা তার অনুগ্রহে

www.nagorikpathagar.org

রসূল (স.)-এর আদেশ নিষেধের উপর আমাদেরকে আমল করার তওফীক দিন। আমীন।

এ্যানি বেসেন্ট লিখেছেন ঃ মোহাম্মদ (স.) নারীদের চিহ্নিত করার এবং বিভক্ত করার চমৎকার ব্যবস্থা তৈরী করেছেন। আমি তার বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কারণ নারী যদি বদমেযাজী এবং দুশ্চরিত্র হয়, তবে সে ঘরের পরিবেশ কি করে পরিবর্তন করবে, সে তো নিজের মেযাজই পরিবর্তন করতে পারবে না।

সৌন্দর্য দ্বারা কারো চরিত্র বিচার করা যায় না। চরিত্র চেহারায় নয় বরং কর্মে প্রমাণিত হয়। কাজেই নারী নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে। আমি যে গবেষণা করেছি এতে প্রমাণিত হয়েছে নারী যদি চরিত্র এবং কর্মে সঠিক থাকে, তবে ঘরে শান্তি নিশ্চিত হতে পারে। এর ব্যতিক্রম হলে ঘরে দেখা দেয় অবসাদ এবং হতাশা। (দি লাইফ এন্ড টিচিং অব মোহাম্মদ)

স্ত্রীদের অধিকার ঃ হযরত মোয়াবিয়া ইবনে হায়দাত (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে রসূল আমাদের উপর স্ত্রীদের কি অধিকার রয়েছে? রসূল (স.) বললেন, তোমরা যখন খাবে তখন তাদেরকে খাওয়াবে, তোমরা যখন পরিধান করবে তখন তাদেরকে পরিধান করাবে। তাদের মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। তাদেরকে গালাগাল করবে না। তাদেরকে ঘরের মধ্যেই রাখবে। (এছলাহী খোতবাত, ২য় খণ্ড)

স্বামীর উপর যেমন স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তেমনি স্ত্রীর উপরও স্বামীর অধিকার রয়েছে। স্বামীর কর্তব্য সে যেন স্ত্রীর অধিকার আদায় করে। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৮)

স্বামীর যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তবে সকল স্ত্রীর সঙ্গে এক সমান ব্যবহার করতে হবে। যদি এক সমান ব্যবহার করতে কেউ সক্ষম না হয়, তবে সে যেন একজন স্ত্রীর উপরই ধৈর্য ধারণ করে। (সূরা আন নেসা, আয়াত ৪)

স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে ভালোভাবে থাকা। স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। (তিরমিযী, মিনহাজুল মুসলেমীন)

স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। স্ত্রীর একটি আচরণ অপছন্দশীল হলে অন্য আচরণ অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (মুসলিম, মিনহাজুল মুসলেমীন)

স্ত্রীর দেন মোহর সন্তুষ্টচিত্তে পরিশোধ করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। (সূরা আন নেসা, আয়াত ৪)

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, তবে তাকে দেয়া কোনো জিনিস যেন ফেরত না নেয়। (সূরা আন নেসা, আয়াত ২০)

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রী যদি আনুগত্য করতে থাকে, তবে স্বামী তার উপর বাড়াবাড়ি করার জন্যে যেন অজুহাত তালাশ না করে। (সূরা আন নেসা, আয়াত ৩৪)

স্ত্রীর সব রকমের চাহিদার প্রতি স্বামীকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (বোখারী, মিনহাজুল মুসলেমীন)

স্ত্রী যদি হঠকারিতার পরিচয় দেয় অথবা এমন ব্যক্তিকে ডেকে বিছানায় বসায় যাকে বসানো স্বামী পছন্দ করে না অথচ কোনো প্রকার বেহায়াপনার পরিচয় দেয়, তবে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীকে প্রথমে ভালোভাবে বোঝাবে। যদি স্ত্রী না শোনে তবে তার সঙ্গে শয়ন করা বন্ধ করবে। তবু যদি না শোনে তবে স্ত্রীকে শাস্তি দেবে। কিন্তু চেহারায় আঘাত করবে না। এমনভাবে প্রহার করবে যেন স্ত্রীর দেহ জখম না হয়। যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে ঘরেই যেন রাখে। ঘর থেকে বাইরে যেন বের করে না দেয়। স্ত্রীকে গালাগাল যেন না করে। অপ্রয়োজনে যেন স্ত্রীকে প্রহার না করে। (সূরা আন নেসা, মোসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, মুসলিম, তিরমিযী, মিনহাজুল মুসলেমীন)

বিধবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করে তার সঙ্গে ঘর সংসার করা অবস্থায় কেউ যদি কুমারী মেয়ে বিবাহ করে, তবে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে কুমারী স্ত্রীর সঙ্গে সাতদিন অবস্থান করা। তারপর সমানভাবে উভয়ের মধ্যে রাত্রি যাপনের পালা বন্টন করবে। যদি কুমারী কোনো মেয়েকে বিবাহ করে ঘর সংসার করার সময়ে কোনো বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে, তবে বিবাহের পর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী তিনদিন অবস্থান করবে। তারপর উভয়ের মধ্যে রাত্রিযাপনের পালা সমানভাবে বন্টন করবে। (বোখারী, মুসলিম, মিনহাজুল মুসলেমীন)

নারীর প্রতি ইসলামের উদারনীতি

নারী জাতি সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং মানব বাগানের সৌন্দর্য। এ কারণে ইসলাম নারী জাতিকে সম্মানজনক পদ্ধতিতে সকল সামাজিক অধিকার প্রদান করেছে, যেসব অধিকার পাওয়ার জন্যে নারী উপযুক্ত ছিলো। ইসলাম নারীকে ঘরের রাণী হিসেবে অভিহিত করেছে। অন্যান্য জাতি যা করেনি, নারীকে সুযোগ প্রদান করেনি– ইসলাম নারীকে সেই সুযোগ প্রদান করেছে। নারীকে সম্পদশালী হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সহাবস্থানে সমস্যা দেখা দিলে স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে। তালাকপরবর্তী একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে সম্পদের মালিকানার অধিকার দিয়েছে। নারীকে সমাজে সম্মানজনক ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সকল বৈধ আইনগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার দিয়েছে।

জাহেলী যুগে সমাজে নারীর কোনো গুরুত্ব ছিলো না। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলাম নারী জাতিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। পুরুষগণ বুঝতে পেরেছে স্ত্রীদের উপর

www.nagorikpathagar.org

তাদের যেমন অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। (বোখারী, কিতাবুল লেবাছ)

অমুসলিম ঐতিহাসিক এবং বিশেষজ্ঞদের মতে প্রমাণিত যে, ইসলামই প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকারের কথা বলেছে, নারীর অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলামই প্রকৃতপক্ষে নারীকে মুক্তি দিয়েছে, নারীর প্রতি অনুগ্রহ করেছে।

এসব দেখে যারা নারীর অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার, সেইসব তথাকথিত প্রগতিবাদীদের এবং পাশ্চাত্যবাদীদের দৃষ্টি উন্মোচিত হওয়া উচিত। শুধুমাত্র মুসলমান নয় বরং অমুসলিম দার্শনিক, ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, পাদ্রী পুরোহিত এবং বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন যে, ইসলামই নারীকে অধিকার দিয়েছে এবং নারীর মুক্তির সঠিক পথ নির্দেশ দিয়েছে।

বিখ্যাত ফরাসী বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুস্তলিবান 'প্রাচ্যের নারীদের উপর ইসলামের প্রভাব' শিরোনামে রচিত গ্রন্থে লিখেছেন, ইসলাম মুসলিম নারীদের সংস্কৃতিতে অধিকারের উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীদেরকে অপমান এবং অবমাননা থেকে রক্ষা করেছে, তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি অগ্রগতির পথ দেখিয়েছে। কোরআনের উত্তরাধিকার আইন, নারীর অধিকার, ইউরোপের উত্তরাধিকার আইনের চেয়ে অনেক কল্যাণকর ব্যাপক। এসব আইন নারীর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তিনি আরো লিখেছেন, নারীদের অবস্থার উপর ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার উত্তম উপায় হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে ইসলামের আবির্ভাবের আগে নারীদের অবস্থা কেমন ছিলো? এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে আমরা কোরআনের আদেশ নিষেধ সম্বলিত আয়াত উল্লেখ করতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছো তার পূর্ব স্বামীর ঔরশজাত তার গর্ভজান কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে রয়েছে। তবে যদি তাদের সঙ্গে সঙ্গত না হয়ে থাকো (যৌন সম্পর্ক স্থাপন না করে থাকো) এতে তাদের কোনো অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্র করা। পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আন নেসা, আয়াত ২৩)

আল্লাহ তায়ালার এ নিষিদ্ধকরণ দ্বারা বোঝা যায়, যেসব জাতি এসব কাজ করেছে অর্থাৎ নিষিদ্ধ করার আগে ঢালাও বাছবিচারবিহীন যৌন মিলন করেছে, তাদের চরিত্র তাদের কর্ম কতোটুকু পবিত্র কতোটুকু পরিচ্ছন্ন ছিলো।

www.nagorikpathagar.org

ফরাসী গ্রন্থকার আরো লিখেছেন, নারীদের উপর ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে ইসলামের সাংস্কৃতিক অবস্থার সময়ে নারীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, ইসলামী সংস্কৃতি নারীদের যে মর্যাদা দিয়েছে বহুকাল পরে ইউরোপ নারীদের সেই মর্যাদাই দিতে সক্ষম হয়েছে। স্পেনের নারীদের সৈনিকসুলভ আচরণের যে উদাহরণ পাওয়া যায়, এর মূলে রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে নারীদের ভূমিকা। আরব জাতির ইতিহাস থেকেই এই সংস্কৃতি বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। এর মূলে খৃষ্টধর্ম নয় বরং ইসলামের অবদানই স্বীকৃত। ইসলামই নারীদেরকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। (তামাদ্দুনে আরব, পৃ. ২৭৫)

এরপর লেখক জ্ঞান এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ইসলাম নারীদের মর্যাদা খাটো করার পরিবর্তে বৃদ্ধি করেছে। আমাদের এ দাবী সম্পূর্ণ সত্য। এই অভিমত আমার নয়; বরং মোসিও কোসানডি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মোসিও মার্থালেমি সেইন্ট হিলারও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইসলাম নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এটাই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের আবির্ভাবের আগে যেসব ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত ছিলো, যেসব জাতি দুনিয়ায় বসবাস করতো, তাদের অবস্থা ছিলো ইসলামের আবির্ভাবের আগে অত্যন্ত অধঃপতিত এবং নিকৃষ্ট।

ডাক্তার গুস্তাওলিবান তার বক্তব্যের সমর্থনে লিখেছেন, গ্রীকগণ নারীকে একটি নিকৃষ্ট প্রজাতি মনে করতো। কারণ, নারীদের কাজ ছিলো ঘর সামলানো এবং বংশবৃদ্ধি করা। কোনো নারী যদি অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিকলাঙ্গ কোনো সন্তান জন্ম দিতো তবেই সেই নারীকে মেরে ফেলা হতো।

তিনি আরো লিখেছেন, প্রাচীন কালের ধর্মবিশ্বাসীরা নারীদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর নির্মম আচরণ করতো। হিন্দুদের আইনে বলা হয়েছে তকদির, ঝড়তুফান, মৃত্যু, দোযখ, বিষ, বিষাক্ত সাপ এসব কিছু যতো খারাপ, নারী তার চেয়ে অনেক খারাপ। পবিত্র গ্রন্থে লেখা হয়েছে, নারী মৃত্যুর চেয়ে অধিক তিক্ত। প্রাচীন অঙ্গীকারনামার উপদেশ শীর্ষক অধ্যায়ে লেখা রয়েছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন সে যেন নিজেকে নারীদের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করে। এক হাজার পুরুষের মধ্যে একজনকে আমি ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন হিসেবে দেখেছি। কিন্তু সমগ্র নারী জাতির মধ্যে একজন নারীও ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন পাওয়া যাবে না। (তমদ্দুনে আরব, পৃঃ ৩৭৬)

বিশিষ্ট ইউরোপীয় গ্রন্থকার প্রফেসর ডি এস মার্গেলিউথ ইসলাম এবং মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে বিদ্বেষ, জিঘাংসা এবং চূড়ান্ত অপবাদমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি লাইফ অব মোহাম্মদ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে নানা রকম মনগড়া আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু তিনিও এক পর্যায়ে বাস্তব সত্য অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, জাহেলী যুগের আরবে নারীদের দুরবস্থার কথা আর কি বলবো। হিন্দু ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্মেও নারী জাতির মর্যাদার কথা চিন্তা করা হয়নি। নারীগণ কোনো প্রকার সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে এটা ছিলো অচিন্ত্যনীয়। এসব ধর্ম নারীকে এরকম অনুমতি দেয়নি যে, তারাও পুরুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা লাভ করবে। এসব ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থা ছিলো দাসীর মতো। তারা পুরুষদের করুনার উপর জীবন যাপন করতো। একমাত্র মোহাম্মদই নারীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, স্বাধিকার দিয়েছে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে।

বিশিষ্ট স্কলার মানসিওস লিফেলের মতে, আমরা যদি ইসলামের নবীর সময়ের প্রতি লক্ষ্য করি, তবে জানতে পারবো ইসলামের নবী নারীদের জন্যে যে বিধান দিয়েছেন এরকম বিধান অন্য কেউ দেননি। নারীদের প্রতি তিনি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। নারীর অধিকার সম্পর্কে কোরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। নারীদের সঙ্গে কি রকমের ব্যবহার জায়েয আর কি রকমের ব্যবহার জায়েয নয়, সে বিষয়েও পবিত্র কোরআনে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কখনো সংক্ষিপ্ত কখনো বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। (মাকালাতে শিবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪)

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

অশ্লীল সাহিত্য, নগ্নতা ও সিগারেট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ স্কুল কলেজে থাকার সময়ে ছেলেমেয়েরা কিছুটা নিয়ম শৃংখলার মধ্যে থাকে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে, কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর তারা অতীতের অনুশীলিত বদভ্যাসের কারণে অত্যন্ত হিংস্র এবং বেপরোয়া হয়ে উঠে। কারণ, সে সময় তাদের সামনে কোনো বাধা বিঘ্ন থাকে না। কর্মজীবনে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং প্রশমনের নানা উপকরণ ছড়িয়ে থাকে চারদিকে।

একটি মার্কিন সাময়িক পত্রিকায় আমেরিকান যুবকদের চারিত্রিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পত্রিকাটি লিখেছে, তিনটি শয়তানী শক্তি আমাদের পৃথিবীতে ছেয়ে আছে। এই তিন শক্তি একটি মিলে দোযখ তৈরী করছে। অশ্লীল ম্যাগাজিন, বই পুস্তক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নগ্ন ছবি যুবক যুবতীদের যৌন উত্তেজনা উস্কে দিচ্ছে। নারীদের নামমাত্র পোশাক পরিধান, অহরহ ধূমপান, পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা তাদেরকে অবৈধ যৌন সংস্পর্শের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অশ্লীল সাহিত্য, নারীদের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা এবং ধূমপান- এই তিনটি বিষয়ই মারাত্মক। এই তিনটির প্রসার খৃস্টান ধর্মের অনুসারীদের নৈতিক অধঃপতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। যদি এ অবস্থা প্রতিরোধ করা না যায়, তবে আমেরিকা এক সময়ে রোম সাম্রাজ্যের পতনের মতোই পরিণতি বরণ করবে। প্রবৃত্তির দাসত্ব, যৌনতা, নারীদের চূড়ান্ত বেহায়পনা সকল সীমা অতিক্রম করেছে।

উল্লেখিত তিনটি উপসর্গ প্রতিটি যুবক যুবতীর মনে স্থায়ী উত্তেজনা জিইয়ে রাখে। যার দেহের রক্ত গরম, অশ্লীলতা তার মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবেই।

আমেরিকায় পতিতাবৃত্তি

আমেরিকার যেসব মহিলা পতিতা পেশায় নিয়োজিত, তাদের সংখ্যা কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ লাখ। কিন্তু মার্কিন পতিতাদের মধ্যে এবং ভারতীয় পতিতাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন সমাজে পতিতা পেশায় যারা নিয়োজিত তারা ভদ্রঘরের মেয়ে। তারা এই পেশা গ্রহণের আগে কোনো কাজে নিয়োজিত ছিলো। তারা অসৎ সঙ্গে, মন্দ সাহচর্যে নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর বারে, ক্লাবে গিয়ে বসেছে। কয়েক বছর এখানে স্বাধীনভাবে দেহ মিলনের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করবে, তারপর এই কাজ ছেড়ে কোনো অফিসে বা কারখানায় কাজ নেবে। এক গবেষণায় জানা গেছে যে, আমেরিকান পতিতাদের শতকরা ৫০ ভাগ বিভিন্ন গৃহে চাকরানীর পেশায় নিয়োজিত ছিলো। সে পেশা ত্যাগ করে নতুন পেশায় এসেছে। বাকি ৫০ ভাগ বিভিন্ন অফিস, হাসপাতাল এবং দোকানের চাকরি ছেড়ে এসেছে। পনের বিশ বছর বয়সে এই কাজ তারা শুরু করে, পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়সে এসে পতিতাবৃত্তি ছেড়ে স্বাধীন কোনো পেশা বেছে

www.nagorikpathagar.org

নেয়। এই অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আমেরিকায় চার পাঁচ লাখ পতিতার সামাজিক অবস্থা কিরূপ!

আগেই পশ্চিমা বিশ্বের অশ্লীলতা ও নগ্নতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অশ্লীলতার একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক রয়েছে। আমেরিকা, নিউইয়র্ক, রিউডি জেনিরো, বুয়েন্স আয়াসে যৌনতার বিশাল বাজার রয়েছে। নিউইয়র্কে দু'টি বৃহৎ যৌন বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রতিটিতে ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল রয়েছে। এসব কাউন্সিলের সভাপতি এবং সেক্রেটারী ভোটে নির্বাচিত। প্রতিটি বাণিজ্য কেন্দ্রের আইন উপদেষ্টা রয়েছে। মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার পর আইনজীবীরা এসব বাণিজ্য কেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষা করে। যুবতী মেয়েদের এসব কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্যে হাজার হাজার দালাল কর্মরত রয়েছে। তারা সব সময় শিকার সন্ধানে নিয়োজিত থাকে। শিকাগোর একটি সংস্থার সভাপতি জানিয়েছেন, ১৫ মাসের একটি হিসাব আমার কাছে রয়েছে। এ সময়ে ৭ হাজার ২০০ মেয়ে চিঠি লিখেছে যে, তারা শীঘ্র সিকাগো যৌন বাণিজ্য কেন্দ্রে গিয়ে পৌছুবে। এদের মধ্যে ১৫০০ মেয়ে ইতিমধ্যেই পৌছে গেছে, অন্যদের খবর পরে জানা যায়নি।

বার, ক্লাব ছাড়াও অসংখ্য সাক্ষাৎকার হাউস, কল হাউস রয়েছে। এসব ব্যবস্থা এ কারণেই রাখা হয়েছে, যেন কোনো ভদ্র শিক্ষিত যুগল যদি পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ এবং ভাব বিনিময় করতে চায় তাহলে করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, একটি শহরে এরকম সংস্থা রয়েছে ৭৮টি। একটি শহরে ৪৩টি এবং অন্য একটি শহরে ৩৩টি। এসব সংস্থার কার্যালয়ে শুধু অবিবাহিত যুবক যুবতীই আসে না, বরং বিবাহিত মহিলারাও আসে। একজন সমাজ সংস্কারক মন্তব্য করেছেন যে, নিউইয়র্কের বিবাহিত দম্পতিদের এক তৃতীয়াংশ নিজেদের দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ত নয়। অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে এবং স্বামী স্ত্রীকে না জানিয়ে অন্যত্র দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়। দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে নিউইয়র্কের অবস্থা মোটেই আলাদা নয়।

আমেরিকার চারিত্রিক অধঃপতন রোধের জন্যে কমিটেড অব ফরটিন নামে একটি সংস্থা রয়েছে। এই সংস্থার উদ্যোগে দেশের দৈনিক অধঃপতনের জন্যে দায়ী কেন্দ্রসমূহের উপর জরিপ চালানো হয়। এই সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকার যতো ড্যান্স ক্লাব, নাইট ক্লাব, বিউটি সেলুন, মেসেজ রুম এবং হেয়ার ড্রেসিং রয়েছে, এর সবই মদ পানের জন্যে উন্মুক্ত এবং অন্যান্য অশ্লীল কাজও নিয়মিত চলে।

জাতীয় আত্মহত্যা

প্রবৃত্তি পূজা, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্বের প্রতি ঘৃণা, পারিবারিক জীবনের প্রতি অনীহা, দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি অবিশ্বস্ততা নারীদের বিয়ের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ নষ্ট করে দিয়েছে। অথচ বিয়ে করা এবং মা হওয়া নারী জীবনের সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা। মানুষের বংশধারা, সভ্যতা সংস্কৃতির টিকে থাকা নারীর এই আকাঙ্ক্ষার

www.nagorikpathagar.org

উপর নির্ভরশীল। এই আকাঙ্ক্ষার প্রতি নারীদের অনীহার কারণেই জন্ম নিরোধ, গর্ভপাত এবং শিশু হত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। জন্মনিরোধ সামগ্রী আমেরিকার যুবক যুবতীরা ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো দোকান থেকে কিনে নিতে পারে।

সাধারণ নারীদের কথা বাদ দিলেও স্কুল কলেজগামী বালিকাদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সব সময় পাওয়া যায়। কারণ, যদি বয়ফ্রেন্ডের সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাহলে তার সাথে আনন্দঘন সময় কাটাতে কোনো বাধা থাকবে না।

জজ লিন্ডসে লিখেছেন, হাইস্কুলের স্বল্প বয়স্কা ৪৯৫জন মেয়ে নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে, তারা পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে ১২৫জন মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে। অন্যরা গর্ভবতী হয়নি। তবে গর্ভ ধারণ না করা মেয়েদের অধিকাংশই জন্মনিয়ন্ত্রণের নিয়ম কানুন বেশ ভালোভাবেই জানে।

কুমারী মেয়েরা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী এ কারণেই ব্যবহার করে যেন তাদের স্বাধীন যৌন জীবনে ব্যাঘাত না ঘটে। বিবাহিত মেয়েরা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের কারণ হচ্ছে তারা সন্তান চায় না। কারণ, সন্তানের লালন পালন এবং শিক্ষার দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া স্বামীকে তালাক দেয়ার স্বাধীনতার পথেও সন্তান অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এ কারণে বিবাহিতা মেয়েরা মা হতে চায় না। তারা চায় জীবন আরো বেশী আরো ভালোভাবে উপভোগ করতে। অন্য একটি কারণেও মেয়েরা মা হতে চায় না, সে কারণ হচ্ছে, সন্তান প্রসব করার পর তাদের দৈহিক সৌন্দর্য কমে যাবে।

মোট কথা, কারণ যা কিছুই থাকুক শতকরা ৯৫ ভাগ নারী-পুরুষ সন্তান জন্মদানে অনিচ্ছুক। অন্য ৫ ভাগ যারা গর্ভধারণ করে তাদের ক্ষেত্রেও গর্ভপাত এবং শিশু হত্যার নানা কৌশল রয়েছে। জন্মের পরপরই বহু সন্তানকে মেরে ফেলা হয়।

ইংল্যান্ডের অবস্থা

দুঃখজনক এসব কথা আমি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু জর্জ রয়েল স্কটের এ হিস্ট্রি অব প্রস্টিটিউশন গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি না দিলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তিনি লিখেছেন, যেসব যুবতী ও মহিলা পতিতাবৃত্তিকে অর্থ উপার্জন এবং জীবন যাপনের একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা ছাড়াও এসব বহু যুবতী ও মহিলা রয়েছে যারা অন্য পেশার পাশাপাশি কিছুটা বাড়তি উপার্জনের জন্যেও পতিতাবৃত্তি করে। এদের কেউ পতিতা বললেই এরা ক্ষেপে যায়। কিন্তু এদের অসন্তুষ্টির কারণে বাস্তবতা তো আর অস্বীকার করা যাবে না।

উভয় শ্রেণীর পতিতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? শেষোক্ত পতিতাদের এমেচার প্রস্টিটিউট বলা যায়, বর্তমানে এই দুই শ্রেণীর পতিতার সংখ্যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের উঁচু থেকে নীচু শ্রেণী পর্যন্ত এসব পতিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরো লিখেছেন, যুবতী মেয়েদের বেলেল্লাপনা বর্তমানে ফ্যাশন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সিগারেট পান, তেতো মদ পান, ঠোঁট রাঙানো, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ করা, অশ্লীল সাহিত্য সম্পর্কে মুক্ত কণ্ঠে আলোচনা করা- এসব কিছুই এখন ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত।

যেসব মেয়ে বিয়ের আগেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিয়ের সময় কুমারী মেয়ে খুঁজে পাওয়া এখন দুষ্কর ব্যাপার।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক কালের মেয়েরা যেসব ফ্যাশনেবল পোশাক পরিধান করে, সৌন্দর্য চর্চার যেসব সামগ্রী ব্যবহার করে এসব দেশে অন্যদের চোখ লোভে চক চক করে। তারাও সেসব পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে। প্রশ্ন জাগে যেসব মেয়ে ফ্যাশনেবল দামী পোশাক পরিধান করে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তাদের বৈধ উপার্জন কতো? বৈধ উপার্জন যদিও করে তবু সেই উপার্জনে নিজের ভরণ পোষণ করার পর এতো দামী পোশাক ক্রয় করার কি সামর্থ থাকে? পঞ্চাশ বছর বা অর্ধ শতাব্দী আগে যেকথা বলা হতো, এখনো সেই একই কথা বলতে হয়। কথাটি হচ্ছে, 'আগে এসব মেয়েদের পোশাক ক্রয় করতো তাদের পিতা মাতা বা ভাইয়েরা, আর এখন ক্রয় করে দিচ্ছে অন্য কেউ'।

এ হিস্ট্রি লব প্রস্টিটিউশন গ্রন্থের লেখক আরো লিখেছেন, বর্তমান অবস্থার জন্যে অবাধ নারী স্বাধীনতাও দায়ী। বিগত কয়েক বছরে মেয়েদের উপর পিতামাতার তত্ত্বাবধান অনেক কমে গেছে। ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে ছেলেরাও এতোটা স্বাধীনতা ভোগ করেনি, যতোটা স্বাধীনতা বর্তমানে মেয়েরা ভোগ করছে।

তিনি আরো লিখেছেন অন্য একটি কারণেও সমাজে যৌনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মেয়েরা বিপুল সংখ্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে, অফিসে আদালতে বিভিন্নমুখী পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন। সেখানে তারা দিন রাত পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কাজ করছে। এ রকম অবাধ মেলামেশার কারণে নারী পুরুষের চারিত্রিক মান অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে পুরুষের শক্তির কাছে নারী পরাজিত হতে বাধ্য। কারণ, নারীর শারীরিক শক্তি পুরুষের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া নারীরও যৌন ক্ষুধা রয়েছে। ফলে পুরুষের এবং নারীর উভয়ের যৌন ক্ষুধার তাড়না তাদেরকে চারিত্রিক দুর্বলতার এবং অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

যুবতী মেয়েরা বিয়ে এবং সম্মানজনক জীবন যাপনের কথা চিন্তা করে না। আনন্দঘন সময় কাটানোর জন্যে এক সময় পুরুষ সময় এবং সুযোগ খুঁজতো। এখন মেয়েরা সুযোগ খুঁজছে। সতীত্ব কুমারীত্বকে মনে করা হচ্ছে সেকেলে জিনিস। আধুনিক যুগের মেয়েদের কাছে সতীত্ব এবং অক্ষত যোনী থাকা উপহাসের বিষয়। তাদের কথা হচ্ছে জীবন হচ্ছে ভোগের জন্যে। যতো পারো আনন্দ করো। এই

www.nagorikpathagar.org

আনন্দের সন্ধানে তারা ছুটে যায় নৃত্যশালায়, নাইট ক্লাবে, হোটেলে, বারে। এই আনন্দ সন্ধানে সম্পূর্ণ অচেনা পুরুষের সাথে তারা দীর্ঘপথ মোটরগাড়ীতে নিরুদ্বেগ ভ্রমণ করে। তারা জেনে বুঝে নিজেদেরকে এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছে দেয়, যে পরিস্থিতি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তারপর, তারা পরিণতির ভয় করে না বরং পরিণতিকে স্বাগত জানায়।

ব্রেসিয়ারের বিপজ্জনক ব্যবহার

ফ্যাশনের জগত বহু বিস্তৃতি লাভ করেছে বক্ষ বন্ধনী বা ব্রেসিয়ার। নারীর সৌন্দর্যে স্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। স্তনের নিরাপত্তা এবং সৌন্দর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের ফ্যাশন ব্রেসিয়ারের ব্যবহার বিস্তৃত লাভ করেছে। রসূল (স.)-এর সময়ে এর ব্যবহার ছিলো না। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যে প্রতিটি নারীরই ব্রেসিয়ার প্রয়োজন।

ব্রেসিয়ার প্রস্তুতকারকদের সাথে আমি ব্রেসিয়ার তৈরীর উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলেছিলাম। এছাড়া ব্রেসিয়ার তৈরীর উপাদানও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। এতে আমি যা জেনেছি বুঝেছি, তা নিম্নরূপ।

ফোমের তৈরী ব্রেসিয়ার

ব্রেসিয়ারে ফোম ভাঁজ করে দেয়া হয়। স্তনকে উঁচু করে দেখানোর জন্যই ফোম ব্যবহার করা হয়। এই ফোম ত্বককে প্রভাবিত করে। স্তনের সাথে ফোম লেপ্টে থাকার কারণে বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। স্তন যেহেতু অত্যন্ত অনুভূতিশীল এবং স্পর্শকাতর, এ কারণে তা বেশী চাপ সহ্য করতে পারে না।

নাইলনের ব্রেসিয়ার

সকল প্রকার ব্রেসিয়ারেই পলিয়েস্টার বা নাইলনের কাপড় ব্যবহার করা হয়। এই কাপড় ঘাম শোষণ করে না, এই কাপড়ের ভেতর বাতাস প্রবেশও করে না, বেরও হতে পারে না।

ব্রেসিয়ার তো নয় যেন খাঁচা

স্তন ঢলে পড়া হেলে পড়া থেকে রক্ষা করার জন্যই ব্রেসিয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ কারণে ব্রেসিয়ার এমনভাবে তৈরী করা হয় যেন ব্রেসিয়ার স্তনকে টেনে ধরে। ব্রেসিয়ারকে বুকের সাথে বেঁধে রাখার জন্যে অর্থাৎ টাইট করার জন্যে দুই কাঁধের উপর দিয়ে ফিতা দিয়ে আটকে দেয়া হয়। ব্রেসিয়ার হচ্ছে একটি খাঁচার মতো। এভাবে খাঁচায় আবদ্ধ থাকার কারণে, ব্রেসিয়ার ব্যবহারে নানা রকম রোগ হওয়ার আশংকা থাকে।

ব্রেসিয়ার এবং স্তনক্যান্সার

লাহোরের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খালেদা ওসমানী জানিয়েছেন, আমার কাছে আসা স্তন ক্যান্সারের রোগীদের অধিকাংশের স্তন ক্যান্সার হয়েছে ব্রেসিয়ার ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org

করার কারণে। দীর্ঘদিন ব্রেসিয়ার বা বক্ষ বন্ধনী ব্যবহার করার কারণেই তাদের স্তনে ক্যান্সার হয়েছে।

স্তনে দুধ কমে যায়

সাদা বিষ অর্থাৎ গুঁড়ো দুধের চাহিদা তৃতীয় বিশ্বে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব গুঁড়ো দুধ ইউরোপীয় দেশসমূহে নিষিদ্ধ এবং স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর বলে ঘোষিত হয়েছে ও রফতানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে; সেসব দুধ তৃতীয় বিশ্বের খোলা বাজারে দেদারছে বিক্রী হচ্ছে।

কিন্তু কিছুকাল আগেও কি শিশুদের জন্যে গুঁড়ো দুধের ব্যবহার ছিলো?

মায়েরা কি গুঁড়ো দুধ সম্পর্কে জানতো?

ডক্টর আল্লামা ইকবাল কি গুঁড়ো দুধ পান করেছিলেন?

কায়েদে আযম কি শৈশবে গুঁড়ো দুধ পান করেছিলেন?

মওলানা জাফর আলী খান কি গুঁড়ো দুধ পান করেছিলেন?

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কি গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করেছিলেন?

আব্রাহাম লিংকন কি গুঁড়ো দুধে পালিত হয়েছিলেন?

ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্রাসাদের রাণী এলিজাবেথ কোন কোম্পানীর গুঁড়ো দুধ পান করতেন?

আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে অসংখ্য মহিলা আসে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ বলে আমার স্তনে দুধ শুকিয়ে গেছে। ডাক্তার আমাকে শিশুকে গুঁড়ো দুধ পান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বর্তমানে অর্থ, ধন সম্পদের লোভ স্বার্থান্বেষী কিছু লোকের চোখে অত্যাচারের কালো চশমা পরিয়ে দিয়েছে। ওষুধ কোম্পানীগুলো তাদের মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের মাধ্যমে চিকিৎসকদের টেলিভিশন, ডিশ, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি কিনে দিয়ে বলে যে, শুধু আমাদের কোম্পানীর ওষুধ প্রেসক্রাইব করবেন। গুঁড়ো দুধগুলোর কোম্পানীর পক্ষ থেকে একই রকমের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিছু চিকিৎসক মহিলাদের জানায় যে, আপনি আপনার শিশুকে গুঁড়ো দুধ খাওয়াবেন, আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

কিছু মহিলা স্তনের সৌন্দর্য অটুট রাখার জন্যে শিশুদের স্তনের দুধ থেকে বঞ্চিত করেন। তারা চায় তাদের স্তন খাড়া থাকুক, কখনো হেলে না পড়ুক।

কোনো অসুখের কারণে অথবা বাইরের কোনো প্রভাব যেমন ব্রেসিয়ার ব্যবহার করার কারণে অধিকাংশ মহিলার দুধ আসলে শুকিয়ে যায়। এ কারণে তাদের সন্তানদের স্তনের দুধ থেকে বঞ্চিত করেন।

কাজেই মনে রাখতে হবে যে, ব্রেসিয়ারের ব্যবহার মহিলাদের স্তনের দুধ কমিয়ে দেয় এবং শেষ করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

অনুভূতিশীল ত্বক

ব্রেসিয়ার ব্যবহার করার কারণে যেহেতু স্তন ঢাকা এবং বাঁধা থাকে, এ কারণে স্তনে এক ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কাজ কর্ম করার সময়ে মেয়েদের কখনো উপরে উঠতে হয়, কখনো নীচে নামতে হয়। এ কারণে ব্রেসিয়ারের সাথে স্তনে ঘষা লাগে। এই ঘষা খাওয়া রোগীদের জন্যে এলার্জির কারণ হয়। ফলে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার জীবাণু হামলা করে। এমনকি একজিমা, চামড়ার জখম, চুলকানি, ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়ার রোগী চিকিৎসা প্র্যাকটিসের সময় প্রায়ই দেখতে পাই।

মনোযোগ আকর্ষণকারী উদাহরণ

উপরে নীচে পলিয়েস্টারের কাপড়। মাঝখানে ফোম দিয়ে আপনি আপনার হাত ছয় ঘন্টা বেঁধে রাখুন। ছয় ঘন্টা পর হাতের কি অবস্থা হবে। সারা দেহের কি অবস্থা হবে দেখতে পাবেন।

হাত শক্ত হওয়া সত্ত্বেও হাতের এ রকম অবস্থা হলে কোমল স্তনের কেমন অবস্থা হতে পারে? স্তন হচ্ছে একটি স্পর্শকাতর অনুভূতিশীল নরম নাযুক অঙ্গ। এই অঙ্গ ব্রেসিয়ার দিয়ে শক্ত করে সারাক্ষণ বেঁধে রাখা হলে, সেই অঙ্গের অবস্থা কেমন হবে? একজন ফিজিও থেরাপিস্ট বলেছেন, ব্রেসিয়ার নারীর যৌন চাহিদা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে। ফলে ব্যভিচারের আশংকা বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোগ

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, স্তনে ব্রেসিয়ারের চাপ সৃষ্টির ফলে দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয়। এই শ্রেণীর মহিলারা সারাক্ষণ নিম্নোক্ত অবস্থার শিকার হয়।

১. এ সকল মহিলা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠে। ছোটোখাটো বিষয়েও গভীর মনোযোগ দিতে শুরু করে।

২. মহিলাদের মেযাজ খিটখিটে হয়ে যায়। তাদের অবস্থা হয় হিস্টিরিয়া রোগীর মতো।

৩. তারা কোমর এবং বাহুর রোগের রোগী হয়ে যায়।

৪. মাথা ভার হয়ে থাকে, মন ছটফট করে, মনের চঞ্চলতা বেড়ে যায়।

ওলামায়ে কেরামের কাছে বিশেষভাবে জেনেছি যে, রসূল (স.)-এর সময়ে মহিলারা ব্রেসিয়ার ব্যবহার করতেন না। যদি আপনার স্ত্রী ব্রেসিয়ার ব্যবহার করার জন্যে জেদ ধরে, তবে তাকে পাতলা কাপড়ের তৈরী ব্রেসিয়ার ব্যবহার করতে দিতে পারেন।

নখ পলিশ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

নখও মানবদেহের মতো জীবন্ত। নখেরও অক্সিজেন এবং আলো বাতাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। নখের জন্যে পানির ব্যবহারও প্রয়োজন। নখ যদি কোনো প্রকার কষ্ট পায় তবে সারা দেহ প্রভাবিত হয়। একজন মহিলার হাতে গোটা উঠেছিলো। চুলকানি, ফোঁড়া, সেই ফোড়ায় পুঁজ জমে গিয়েছিলো। অনেক প্রকার চিকিৎসা করেও

www.nagorikpathagar.org

কোনো লাভ হয়নি। তারপর একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে তাকে নেয়া হয়। সেই ডাক্তার ছিলেন বয়স্ক এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ। ডাক্তার সাহেব মহিলাকে পরীক্ষা করে বললেন, আপনি কতো বছর যাবত নখ পলিশ ব্যবহার করেন? মহিলা জানালেন, গত সাড়ে পাঁচ বছর যাবত। ডাক্তার জানতে চাইলেন আপনার এই রোগ হয়েছে কতো বছর? মহিলা জানালেন, গত পাঁচ বছর যাবত। ডাক্তার মহিলাকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি নখ পালিশ ব্যবহার বন্ধ করুন, তারপর ওষুধ ব্যবহার করুন। মহিলা তাই করলেন। পরে মহিলা জানালেন যে, মাত্র তিন সপ্তাহে তার রোগ আরোগ্য লাভ করেছে।

ক্রোমোপ্যাথির প্রভাব

ক্রোমোপ্যাথি বিশেষজ্ঞদের মতে রং মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ যে রং বারবার দেখে সেই রং তার জীবনে স্থায়ী গাঁথা হয়ে যায়। অধিকাংশ নখ পলিশ যেহেতু লাল রং-এর, এ কারণে এই রং ক্রোধ উত্তেজনা, হাই ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে। এসব রোগে যারা আগে থেকে ভোগে, তারা নখ পলিশ ব্যবহার করার পর তাদের এসব রোগ বেড়ে যায়। নীরোগ মানুষও আস্তে আস্তে এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্যে প্রতিটি রং-এর একটি আলাদা মেযাজ থাকে। বর্তমান ফ্যাশন নানা রকমের নখপলিশের ব্যবহারের তাকিদ দিচ্ছে, ফলে মানুষ নানা রকমের এলার্জির শিকার হচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্যেই এলার্জি একটি যন্ত্রণাদায়ক রোগ, অন্য রোগের রোগী এলার্জিতে আক্রান্ত হলে সে ধৈর্য ধারণ করে কি করে?

নখপলিশের ব্যবহার নখের কোষের মুখ বন্ধ করে দেয়। তাছাড়া নখপলিশ রঙ্গিন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরী করা হয়। এই কেমিক্যাল নানা রকম রোগ সৃষ্টি করে। বিশেষত এর প্রভাব দেহের হরমোন ব্যবস্থার উপর পড়ে। পরিণামে গুরুতর স্ত্রীরোগ তৈরী হয়।

মেকআপ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.)-এর সময়ে বর্তমান নিয়ম পদ্ধতির মেকআপের ব্যবস্থা ছিলো না। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার পর পুনরায় স্বভাবধর্মে ফিরে আসা সেই ফ্যাশনের ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত যে ফ্যাশনের তেলেসমাতি বিশ্বজুড়ে জয় জয়কার সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে একজন পশ্চিমা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কি বলছেন শুনুন।

ডেলকার্নেগির অভিমত

আমি সারা জীবন পড়ালেখা করেছি। আমি গভীরভাবে ভেবে দেখলাম, আমরা স্বভাবের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও স্বভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছি না তো!

ফ্যাশন এবং রুসম রেওয়াযের জনক আমাদেরকে শুধু ধোঁকা দিয়েছে। নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে মেকআপের ব্যবহার শুরু হয়েছিলো। কিন্তু এই মেকআপ নারীর সৌন্দর্যের যে ক্ষতি করেছে অন্য কোনো জিনিস সম্ভবত এতোটা ক্ষতি করেনি। যুদ্ধের কারণে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। বারুদ বিস্ফোরণে ধ্বংসের চূড়ান্ত ঘটেছে। কিন্তু আমি মনে করি, মেকআপের ক্ষতির তুলনায় এসব জিনিসের ক্ষতি কমই হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আপনারা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন যে, মেকআপের সামগ্রীকে কতো বিপজ্জনক ক্যামিকেল ব্যবহার করা হয় এবং যেসব ক্যামিকেলে কি কি ক্ষতি হয়? এসব ক্ষতি হচ্ছে, একনে ভাগারিস, ব্লাক হেড, কাইস্ট, একনে রোসাকিয়া, রিহিনোফাইমা, ফোলি ক্যালিটিস, রিনজওয়ার্ম টিনিয়া কর্পোরিস, ফাঙ্গাল ইনজেকটিওনস।

এসব রোগ আধুনিক বিজ্ঞান চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ মেকআপের কারণে এসব রোগ হয়ে থাকে।

এ রকম বহু ঘটনা সামাজিকভাবে ঘটে যেসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মহিলাদের সুন্দর চেহারা কুৎসিত রূপ ধারণ করে।

একজন নববিবাহিতা বধুকে চিকিৎসার জন্যে আমার চেম্বারে আনা হলো। বউয়ের সারা মুখে কালো দাগ এবং ছোটো ছোটো দানা ভরে আছে। যে পরিবারে বিয়ে হয়েছে সে পরিবারের সবাই হতবাক। খবর নিয়ে জানা গেলো, নিয়মিত কড়া মেকআপের কারণেই চেহারার এই ছিরি হয়েছে। অবিবাহিত একটি মেয়ে নিজের ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে নিজের মেকআপ করেছিলো। কিছুকাল পর দেখা গেলো যে, তার চেহারায় কালো কালো দাগ। কালো কালো রেখা। এমনকি দাড়ি গোফও বেরোতে শুরু করেছে।

ইসলাম ঘরের ভেতর স্বামীর মনঃতুষ্টির জন্যে সৌন্দর্য চর্চা, সাজগোজ অনুমোদন করেছে। বিষাক্ত জিনিসে তৈরী কৃত্রিম সৌন্দর্য সৃষ্টির যে চেষ্টা বর্তমানে চলছে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আধুনিক এক শ্রেণীর যুবতীতো মেকআপের প্রতি বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পুনরায় সাদাসিধে রূপচর্চার প্রতি মনোনিবেশ করেছে।

জুতো মোজা ঝেড়ে মুছে পরিধান করা

রসূল (স.) বলেছেন, জুতা মোজা ঝেড়ে মুছে পরিধান করবে। (যাদুল মাআদ)

কারণ, অনেক সময় জুতোর ভেতর বিষাক্ত কোনো প্রাণী লুকিয়ে থাকে। না ঝেড়ে মুছে জুতো মোজা ব্যবহার করা হলে সেই প্রাণী দংশন করার আশংকা থাকে না। এমনকি জীবনের আশংকা থাকে না।

এক লোক ভোজ অনুষ্ঠান থেকে উঠে জুতো পরিধান করতে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো। খাওয়ার সময় অন্য কেউ সূচালো হাড় ছুঁড়েছে, সেই হাড় জুতোর ভেতর গিয়ে পড়েছে। জুতো না দেখে পরিধান করার কারণে সেই হাড়ের সাথে পা লেগে পা রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

জুতো ঝেড়ে মুছে পরিধান করার সময়ে চোখ জুতোর ভেতর দেখতে পাবো কারণ, অনেক সময় জুতো নোংরা হয়ে থাকে। সেই জুতো পরিধান করা হলে পা নোংরা হয়ে যায়। জুতো দেখে পায়ে দেয়া হলে সেই জুতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।

দুর্গন্ধময়, নোংরা জুতো পরিধান করা হলে নানা রকমের এলার্জি এবং রোগ হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

তাওয়াক্কুল এবং আধুনিক বিজ্ঞান

তাওয়াক্কুল এ রকম ইসলামী অবস্থার নাম যাতে সকল কাজে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ধৈর্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। এই ধৈর্য সহিষ্ণুতা এবং কৃতজ্ঞতা বা শোকর প্রকাশ করার মধ্যে যে শক্তি পাওয়া যায়, বর্তমান কালের মুসলমানরা সেকথা ধারণাও করতে পারবে না।

ইউরোপের জনগণ বর্তমানে নানা রকম মানসিক রোগে আক্রান্ত। এর মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি তাদের নির্ভরতা নেই। তাদের কোনো ক্ষতি হলে তারা সেই ক্ষতির কারণ বুঝতে সক্ষম হলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। যদি কারণ বুঝতে না পারে তবুও নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং এক সময় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বিরক্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সংসারে বসবাস করার সময় নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে ধৈর্য সহিষ্ণুতা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। সেই শিক্ষা মেনে না চলার কারণে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা না করার কারণে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি বা বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

ইসলাম আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়। দৃষ্টির সংযম, কানের সংযম, পায়ের সংযম, মনের সংযম শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের মানুষ এসব সংযমের ধার ধারে না। তারা ইসলামী শরীয়তের সীমা লংঘন করে। যেনা, ব্যভিচার করে। ফলে তারা অপমানিত হয়।

মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা মানুষকে নানা প্রকার গুরুতর রোগ থেকে মুক্তি দেয়। আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল এবং নির্ভরতার কারণে মানুষ সমাজে সুনাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারে।

শিশুকে খেজুর চিবিয়ে রস খাওয়ানো

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর জন্ম গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আমি নবজাতককে নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর কোলে দিলাম। রসূল (স.) কয়েকটি খেজুর আনালেন এবং খেজুর চিবিয়ে নিজের মুখের লালাসহ সেই খেজুর শিশুর মুখে দিলেন। তারপর শিশুর বরকতের জন্যে দোয়া করলেন। মুসলমানদের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী এটি ছিলো প্রথম শিশু। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বর্ণনা করেন, আমার ঘরে শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। তাকে নিয়ে আমি রসূল (স.)-এর কাছে গেলাম। তিনি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে পুরে দিলেন। (বোখারী)

মায়ের পেটে শিশু যে খাবার পায় সেই খাবারের পুষ্টিগুণ এবং খেজুরের পুষ্টিগুণ এক সমান। বিশেষজ্ঞদের মতে, যে খাদ্য শিশু মায়ের পেট থেকে পায় একই রকম খাবার খেজুর থেকেও পায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নবজাতককে আধুনিক পদ্ধতির নানা

www.nagorikpathagar.org

রকম তরল খাবার খাওয়ানো হয়। এসব খাবারের চেয়ে খেজুরের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা কোনোক্রমেই কম নয়।

অধিকাংশ শিশু দুর্বল হয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পরই যদি শিশুকে দুধ, পানি বা অন্য খাবার দেয়া হয়, তবে শিশুর পায়খানা হতে থাকে। এমতাবস্থায় খেজুর চিবিয়ে দেয়ার মাধ্যমে রসূল (স.)-এর সুন্নত পুনরুজ্জীবিত হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

সুগন্ধি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) সুগন্ধি পছন্দ করতেন। (তিরমিযী)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, যে সুগন্ধির রং বোঝা যায় না কিন্তু ঘ্রাণ অনুভব করা যায়, সেই সুগন্ধি হচ্ছে পুরুষের জন্যে আর যে সুগন্ধির রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুগন্ধি অনুভব করা যায় না, সেই সুগন্ধি হচ্ছে মেয়েদের জন্যে। (সুনানে নাসাঈ, তিরমিযী)

রসূল (স.) রাইহানের সুগন্ধি বেশ পছন্দ করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

মেশক এবং আম্বর এর সুগন্ধি রসূল (স.)-এর কাছে সকল সুগন্ধির চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ছিলো। (যাদুল মায়াদ)

দোয়ার প্রভাব

ডাক্তার নূর আহমদ জানায় যে, আমার এক পুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলো। তার অর্ধেক মাথা থেতলে গিয়েছিলো। এর পরিণতিতে সে মৃগী রোগে আক্রান্ত হলো। ডাক্তারগণ তার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিলেন। একথা শুনে আমি হাসপাতাল থেকে বের হলাম, কিছু টাকা দান খয়রাত করলাম এবং দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম।

আধ ঘন্টা ইতিমধ্যে কেটে গেলো। আমার হাসপাতালে পৌঁছার পর মৃগী রোগের প্রকোপ ছিলো না। ডাক্তারগণ অপারেশনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। আল্লাহ তায়ালা অপারেশন ছাড়াই আমার পুত্রকে রোগমুক্ত করে দিলেন।

কোরআনের আয়াতের প্রভাব

একজন প্রফেসরের স্ত্রী ছয়মাস যাবত জ্বরে আক্রান্ত ছিলো। সকল প্রকার টেস্ট করানো হলো, নানা রকম ওষুধ খাওয়ানো হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জ্বর একটুও কমেনি। এই মহিলা আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এলো। আমি তাকে লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ছোবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায জোয়ালেমীন, কোরআনের এই আয়াত সব সময় পাঠ করার পরামর্শ দিলাম। মহিলা প্রথমে ইতস্তত করছিলো। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বললাম, এটাই আপনার চিকিৎসা। তারপর মহিলা দিনে রাতে দোয়ায়ে ইউনুস পাঠ করতে লাগলো। আল্লাহ তায়ালা মাত্র সাতদিনে সেই মহিলাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

সূরা ইয়াসিনের ফযিলত ও কয়েকটি ঘটনা

যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এই সূরা পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে তৃপ্ত করান, যে ব্যক্তি পথ হারানোর পর সূরা ইয়াসিন পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে পথ দেখান, খাদ্য কম থাকার সময়ে যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন পাঠ করে কম খাদ্যে তার তৃপ্ত হয়, যে ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মৃত্যুর কষ্ট থেকে মুক্তি দেন, যে মহিলা প্রসব ব্যথায় কষ্ট পেয়ে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে আল্লাহ্ নিরাপদে তার সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করেন। এসব কথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে পাঠ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আমি যেসব সমস্যায় পড়ে সূরা ইয়াসিন পাঠ করেছি সেসব সমস্যার সমাধান হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তার কালামের বরকতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের তওফীক দিন।

এক ব্যক্তির মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব

আমার এক রোগী মৃত্যু যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলো। তার গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলো। যন্ত্রণায় সে ছটফট করছিলো। আমি সেই রোগীর শিয়রে আস্তে আস্তে সূরা ইয়াসিন পাঠ করতে লাগলাম এবং ডাক্তারদের চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছিলাম। সূরা ইয়াসিন পাঠ শেষ করার পরপরই রোগীর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেলো, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

আমি লক্ষ্য করলাম তার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে এবং চেহারায় মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। সূরা ইয়াসিন পাঠ করার আগে সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলো, কিন্তু এই সূরা পাঠ করার বরকতে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিলেন।

দুর্ঘটনা কবলিত বিমান রক্ষা পেলো

কয়েক বছর আগের কথা। একটি ফকার বিমানে মুলতান থেকে করাচী যাচ্ছিলাম। বিমানে আরোহণের আধা ঘন্টা পর প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়লো আমাদের বিমান। ফকার বিমান হাল্কা হওয়ার কারণে বিমানটি প্রচণ্ড দোল খাচ্ছিলো। যাত্রীরা ভীষণ টেনশনে পড়লো। আমি সূরা ইয়াসিন পড়তে শুরু করলাম। প্রচন্ড ঝড় আমাদের বিমানকে ভারতে নিয়ে গেলো। সেখানে সতর্ক সংকেত পেয়ে পাইলট বিমান ঘুরিয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে রওয়ানা হলো। আমরা ভালোভাবে মুলতান পৌছুলাম। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা ইয়াসিনের বরকতে আমাদেরকে নিজেদের স্বজনদের কাছে পৌছে দিলেন।

কষ্টকর সফরে সহায়তা পাওয়া

একবার আমরা পাহাড়ী এলাকায় সফর করছিলাম। হঠাৎ গাড়ী নষ্ট হয়ে গেলো। তখন ছিলো রমযান মাস। ইফতারের সময় ঘনিয়ে আসছিলো। আমাদের কাছে পানি ছিলো না। সবাই ভীষণ টেনশন অনুভব করছিলাম। কারণ, চারদিকে জঙ্গল এবং পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তার সাহেব সূরা ইয়াসিন পাঠ করতে বললেন। ক্ষুধু-পিপাসা ভয় আমাদের সবাইকে ভীষণ ভয়ের মধ্যে ফেলে দিলো। আমরা সবাই সূরা ইয়াসিন পড়তে লাগলাম। হঠাৎ দেখি কয়েক মিনিট পর একটি খালি গাড়ী আমাদের পাশে এসে থেমে গেলো। ড্রাইভার আমাদেরকে তার গাড়ীতে উঠতে বললো।

আমরা সবাই অবাক হলাম। এমন বিরান জঙ্গলে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সাহায্য করেছেন। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি এখানে কিভাবে এলেন? ড্রাইভার অদ্ভূত কথা বললো। সে বললো, আমি এক জায়গায় যাচ্ছিলাম, কিন্তু পথ ভুল করে এদিকে এসে পড়েছি। তারপর আমরা সবাই ভালোভাবে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছুলাম।

একজন অলি আল্লাহর ঘটনা

১৯৫২ সালে আমি এমবিবিএস-এর ছাত্র ছিলাম। মুলতানের একটি বাগানে সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারীর বক্তৃতা ছিলো। আমার পিতা আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আতাউল্লাহ বোখারী এশার নামাযের পর বক্তৃতা শুরু করলেন, ফজরের সময় বক্তৃতা শেষ করলেন। বক্তৃতা চলার সময়ে রাত প্রায় একটায় শ্রোতাদের অধিকাংশের চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে এলো। আতাউল্লাহ বোখারী সূরা ইয়াসিন পাঠ করতে শুরু করলেন। আতাউল্লাহ বোখারীর তেলাওয়াতের মাধুর্যে সবাই জেগে উঠলো এবং কাঁদতে শুরু করলো। এ সময় আমি লক্ষ্য করলাম- গাছের উচ্চতায় জনসভার উপরে সাদা মেঘের মতো ছেয়ে আছে। সেই মেঘের মধ্যে আলো দেখা যাচ্ছিলো। আমি আমার পিতাকে এই দৃশ্য দেখালাম। তিনিও অবাক হলেন। জনসভায় উপস্থিত সবাই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। প্রায় এক ঘন্টা এই মেঘ আমাদের মাথার উপরে ছিলো। সূরা ইয়াসিন পাঠ শেষ হওয়ার পরই সেই মেঘ হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো। আতাউল্লাহ বোখারী বললেন, আল্লাহর মাখলুক ফেরেশতারা আল্লাহর কালাম শোনার জন্যে এসেছিলো।

আমার পিতার কাছে শুনেছি, ১৯৪২ সালে রাজেনপুরে শুদ্ধি আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করলো। হিন্দুরা জোর করে মুসলমানদেরকে হিন্দুতে পরিণত করছিলো। ছয় সাতটি মুসলমান পরিবার হিন্দু হয়ে গেলো। তারা মাথায় বেনী রাখলো এবং মন্দিরে গিয়ে মূর্তিপূজা শুরু করলো।

এ অবস্থা লক্ষ্য করে মুসলমানদের মধ্যে চরম উদ্বেগ দেখা দিলো। রাজেনপুরের ডাক্তার ছিলেন হিন্দু। পুলিশ ছিলো হিন্দু। মুসলমানরা কিছুই করতে পারছিলো না। সাইয়েদ শাহ আতাউল্লাহ বোখারীকে নিয়ে আসার জন্যে আমার পিতাকে পাঠানো হলো। শাহ আতাউল্লাহ যথারীতি সূরা ইয়াসিন পাঠ করলেন। আল্লাহর এই কালামের প্রভাবে সকল মুরতাদ পরিবার ইসলামে ফিরে এলো। বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দুও ইসলাম গ্রহণ করলো। হিন্দুদের উপর শাহ আতাউল্লাহ বোখারীর প্রভাব ছেয়ে গেলো। শুদ্ধি আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৫ সালে এই আন্দোলন পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। রাজেনপুরের মুসলমানরা পুনরায় শাহ্ আতাউল্লাহ্কে দাওয়াত করার কর্মসূচী তৈরী করলেন। এ খবর পেয়ে হিন্দুরা চুপচাপ হয়ে গেলো। শুদ্ধি আন্দোলন আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি।

সূরা ইয়াসিন পাঠে সন্তান প্রসবে কষ্টের অবসান

কয়েক বছর আগে আমার এক আত্মীয় সন্তান প্রসব করার জন্যে হাসপাতালের লেবার রুমে ভর্তি হলো। লেডী ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, প্রসূতির পেটে শিশু উল্টো অবস্থায় রয়েছে। প্রায় ১২ ঘন্টা দেরী হবে। তাকে লেবার রুমে পরে ডাকা হবে। একথা বলে লেডী ডাক্তার চলে গেলেন। আমি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে কিছু পানিতে ফুঁ দিয়ে প্রসূতিকে পান করালাম। আধা ঘন্টার মধ্যে তার সন্তান প্রসব হলো এবং মহিলা ঘরে চলে গেলো।

তারপর লেডী ডাক্তার প্রসূতিকে লেবার রুমে নেয়ার জন্যে নার্সকে টেলিফোন করলেন। নার্স জানালো, সেই মহিলা সন্তান প্রসব করে অনেক আগেই ঘরে ফিরে গেছে। কোনো সমস্যা হয়নি। একথা শুনে লেডী ডাক্তার আমাকে ফোন করে জানতে চাইলেন এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? আমি তাকে ইয়াসিন সূরা পাঠ করে ফুঁ দেয়া পানি পান করানোর কথা জানালাম। লেডী ডাক্তার শুনে ভীষণ অবাক হলেন।

কয়েক মাস পরে আমার অন্য এক আত্মীয়ার প্রসব ব্যথা উঠলো। লেডী ডাক্তার ১২ ঘন্টা সময় বেঁধে দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সূরা ইয়াসিনের বরকতে এক ঘন্টার মধ্যে প্রসূতির সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করলেন। লেবার রুমের সবাই অবাক হয়ে গেলো। আমি তাদেরকে সূরা ইয়াসিনের বরকতের কথা শোনালাম, তাদের বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

মাওলানা মোহাম্মদ আসলাম ছিলেন নিশতার কলেজের লেকচারার। একদিন আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি একজন গরীব লোক বসে কাঁদছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করায় লোকটি মাওলানাকে জানালো যে, দুইদিন যাবত আমার স্ত্রী লেবার রুমে কষ্ট পাচ্ছে। পেটের ভেতর সন্তান উল্টোভাবে থাকায় প্রসব হচ্ছে না। ডাক্তাররা বলেছেন অপারেশন করতে হবে, ইতিমধ্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, এখন বলছে দুই বোতল রক্ত কিনতে হবে।

মাওলানা মোহাম্মদ আসলাম কিছু পানি চেয়ে আনলেন। তারপর সূরা ইয়াসিন পাঠ করে সেই পানিতে ফুঁ দিলেন। সেই পানি প্রসূতিকে পান করাতে বললেন। পানি পান করানোর পর পরই সন্তান প্রসব হলো, ডাক্তাররা অপারেশন কর্মসূচী বাদ দিলেন।

রসূল (স.)-এর সফর পদ্ধতি

রসূল (স.) দ্বীনের উপর চলা আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। তাঁর একটি সুন্নত বা তরিকা বিশ্বজগতের সবকিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। সফর তো সবাইকে করতে হয়। আমরা যদি রসূল (স.)-এর তরিকা অনুযায়ী সফর করি, তবে সকল প্রকার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে পারি।

www.nagorikpathagar.org

কয়েক বছর আগে পিআইএ'র একাধিক দুর্ঘটনা ঘটলো। পিআইএ'র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ অবস্থা দেখে যাত্রীদের সুন্নত অনুযায়ী সফর করার পরামর্শ দিলেন। সফরের সময় সুন্নত অনুযায়ী দোয়া পাঠ করার পর থেকে আল্লাহ্ তায়ালা পিআইএকে বড়ো রকমের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করলেন।

আমার বন্ধু দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলো

একবার আমার এক বন্ধু রাজেনপুর থেকে বাসে ডেরাগাজি খান যাচ্ছিলো। সফর শুরুর আগে দোয়া পাঠ করেছিলো এবং তার ঘুম এসে গিয়েছিলো। দুর্ঘটনায় বাস উল্টে গেলো। যাত্রীরা সবাই আহত হলো। যাত্রীদের আর্ত চিৎকারে আমার বন্ধুর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ঘুম থেকে জেগে সে লক্ষ্য করলো সে বাদে অন্য সকল যাত্রীই আহত হয়েছে। উল্টে যাওয়া বাস থেকে বের হয়ে আমার বন্ধু দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের স্থানীয় লোকদের সহায়তায় হাসপাতালে পৌঁছালো।

যদি আমরা সকল ড্রাইভার কন্ডাক্টরকে সুন্নতি তরিকায় চলার তাকিদ করি এবং এই তরিকা তাদের ট্রেনিং কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করি, তবে প্রতিদিনের সড়ক দুর্ঘটনা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। আসলে রসূল (স.)-এর তরিকার প্রতি আমাদের মনের কোনো আগ্রহ নেই, যদি থাকতো তবে আমার নিজেদের জানমাল ইযযত রক্ষার জন্যে সেই তরিকা যথাযথভাবে পালন করতাম।

মাসজিদে আসা যাওয়ার আদব

মাসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর, এ কারণে আদবের সাথে মাসজিদে প্রবেশ করা উচিত। মাসজিদে যতোক্ষণ অবস্থান করবে সেই সময় আদব বজায় রাখতে হবে। মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়েও সুন্নতি তরিকার পরিচয় দিতে হবে।

একবার গরমের মৌসুমে আমি মাসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা জুতোর উপর রাখলাম। জুতোর উপর পা রেখে মনে হলো ভেতরে কোনো জিনিস যেন মরে পড়ে রয়েছে। জুতো পরীক্ষা করে দেখা গেলো একটি বিচ্ছু মরে জুতোর ভেতর পড়ে আছে। আমি সুন্নতে নববী অনুযায়ী জুতো পরীক্ষা করেছি দেখেই জুতো পায়ে দেয়ার আগে জুতোর ভেতর পা দেয়া হলে বিচ্ছু আমাকে কামড়ে দিতো। সুন্নতে নববীর অনুসরণ করায় রক্ষা পেলাম।

কাপড় পরিধানে নিয়ম

বুযুর্গদের মুখে শুনেছি যখন কাপড় পরিধান করবে তার আগে কাপড় ঝেড়ে নিয়ো। একইভাবে শোয়ার আগে বিছানাও ঝেড়ে পরিষ্কার করবে।

এক গরমের মৌসুমে আমি কাপড় বদল করছিলাম। মনে মনে চিন্তা করলাম কাপড় ঝেড়ে পরিধান করবো। তারপর কাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করার সময় কাপড়ের ভেতর থেকে একটি বিচ্ছু বের হলো। আমি তাড়াতাড়ি বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

একটি সুন্নতের বরকত

এমন এক সময় ছিলো দাড়ি রাখা ছিলো বেশ কঠিন। বিশেষ করে যারা সরকারী চাকরি করতেন, তাদের ক্ষেত্রে দাড়ি রাখার সমস্যা ও বিড়ম্বনা ছিলো অনেক। ১৯৫৭ সালে আমি গেজেটেড মেডিক্যাল অফিসার পোস্টে নিয়োগ পাওয়ার জন্যে কমিশনের সামনে উপস্থিত হলাম। এমবিবিএস রেকর্ড অনুযায়ী আমি ছিলাম প্রথম নাম্বারে। আমার কাছে অনেকগুলো তমঘা ছিলো, বিভিন্ন পুরস্কার পাওয়ার প্রমাণপত্রও ছিলো।

কিন্তু সুন্নতি তরিকায় দাড়ি রাখার কারণে আমাকে বলা হলো যে, আমরা অফিসার চাই মাসজিদের ইমাম চাই না। আমাকে মনোনীত করা হলো না। আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। পরবর্তী মনোনয়নের জন্যে অপেক্ষা করলাম। মনোনয়ন পেলাম কিন্তু ১৫০জন অফিসারের চেয়ে জুনিয়র হয়ে গেলাম।

আল্লাহর রসূল (স.)-এর সুন্নতের উপর আমল করার পুরস্কার আমি পরবর্তীকালে পেয়েছিলাম। আমি অতিরিক্ত দু'টি ডিগ্রি অর্জন করলাম। খুব অল্প সময়ে প্রফেসর হওয়ার কারণে ১৫০জন অফিসারের চেয়ে সিনিয়র হয়ে গেলাম। রসূল (স.)-এর সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে অনেক সময় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায় যদি ধৈর্য ধারণ করা যায়, তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেই ধৈর্যের ফল দান করেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণ ঈমান এবং রসূল (স.)-এর সুন্নতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

যয়তুনের তেল মালিশ করা

হযরত আমর আবু উসায়েদ থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেন, যয়তুনের তেল খাও এবং মালিশ হিসেবে ব্যবহার করো। কারণ এই তেল পবিত্র বৃক্ষ থেকে তৈরী হয়ে থাকে। (তিরমিযী, মেশকাত)

হযরত আলকামা ইবনে আমের (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের জন্যে যয়তুনের তেল মজুদ রয়েছে। এই তেল খাও এবং দেহে মালিশ করো। এই তেল পাইলস রোগের উপকার করে। (ইবনুস সুন্নি, আবু নাঈম)

যয়তুনের তেল দ্বারা চিকিৎসা করো। এই তেল খাও, দেহে লাগাও, কারণ যয়তুনের গাছ হচ্ছে একটি সম্মানিত গাছ। (কানযুল উম্মাল)

রসূল (স.) আরো বলেছেন, যয়তুনের তেল খাও এবং মালিশ করো। কারণ, এতে ৭০টি রোগের চিকিৎসা রয়েছে। এসব রোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুষ্ঠ রোগ। (ইবনে মাযা, আল হাকেম)

ম্যাসেজ, মালিশের ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের মতোই পুরাতন। তিন হাজার বছর আগে চীনের এক বাদশাহর লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ম্যাসেজ ব্যবহার করা হতো। এরপর হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং আমেরিকায় রীতিমতো ম্যাসেজ সেন্টার গড়ে উঠেছে। আমেরিকান হেলথ একাডেমী ম্যাসেজের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

ন্যাশনাল স্টাইল রেসলিং এসোসিয়েশন অব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ হায়াত বাট বলেছেন, কুস্তি এবং মালিশ একটি অন্যটির জন্যে অত্যাবশ্যক। বর্তমান আধুনিক যুগেও মালিশের বিকল্প কোনো কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। তিনি বলেন, কয়েক মাস আগে পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের প্রাক্তন ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিলো। তিনি বলেছেন, পুরো টিম আমাকে দিয়ে মালিশ করাতো। এতে বোঝা যায় শুধু কুস্তিই নয় বরং আধুনিককালের সকল ক্রীড়াবিদ মালিশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

অনেক সময় এরকম রোগ আসে যার চিকিৎসা শুধুমাত্র ম্যাসেজ বা মালিশই হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উচ্চ রক্তচাপের কোনো রোগী যদি আঘাত পায় তবে তাকে গরম ওষুধ দেয়া যাবে না বরং তার চিকিৎসা মালিশের মাধ্যমে করতে হবে। মালিশ এ রকম লোককে দিয়ে করাতে হবে যার হাত সাবান দিয়ে ধোয়া এবং যার হাত নরম। হালকা নরম হাতে মালিশ করতে হবে। সারা দেহ মালিশ করতে হবে। বিশেষত কোমর, উরু, ঘাড়, বাহু, পিঠ মালিশ করা জরুরী।

একজন লোক ছিলো মৃত্যু শয্যায় শায়িত। লোকটি ছিলো ধর্মপ্রাণ। আমি খবর পাওয়ার পর তার শুশ্রূষার জন্যে গেলাম। খুবই দুর্বল এবং মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো। আমি তার দেহ মালিশ করে দিতে বললাম এবং মালিশের পদ্ধতি জানালাম। একমাস যাবত মালিশ করা হলো। সে সুস্থ হয়ে গেলো। তার সুস্থতায় অন্যরা তো অবাক। অধিকতর শক্তি পাওয়ার আশায় এখনো তাকে মালিশ করা হচ্ছে।

নার্ভের দুর্বলতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিবানো, কামড়ানো, মানসিক ও মস্তিষ্কের অবসাদ, মানসিক অস্থিরতার শিকার যতো রোগী আসে আমি তাদেরকে মালিশ করার পরামর্শ দিই। এর ফলে তারা অল্পদিনে বিস্ময়করভাবে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে।

খেলোয়াড় বা ক্রীড়াবিদদের জন্যে মালিশ অব্যর্থ। কুস্তিগীরদের খাবার কম দিতে হয় এবং তেল মালিশ বিশেষ করে যয়তুনের তেল মালিশ করতে হয়। একজন লোক ছিলো ঘোড়দৌড়ে আগ্রহী। সে প্রত্যহ ঘোড়াকে হাল্কা যয়তুনের তেল দিয়ে মালিশ করতো। তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে ঘোড়ার দেহ মুছে দিতো। সেই ঘোড়ার সাস্থ্য ছিলো ঈর্ষণীয়। লোকে বলাবলি করতো যে, এই ব্যক্তি তার ঘোড়াকে কি ওষুধ খাওয়ায়? অথচ ঘোড়ার স্বাস্থ্যের কারণ ছিলো মালিশ। আপনি মালিশের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তবে দুনিয়ার সব ওষুধ ফেলে রেখে শুধু মালিশে মনোযোগী হবেন।

এক লোক বলেন, আমি গেঁটে বাতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। চার হাজার টাকা ব্যয় করে একটি ইনজেকশান নিলাম। কিন্তু মালিশের মাধ্যমে আমি সুস্থ হলাম।

রসূল (স.) বলেছেন, যেসব ব্যথা কোনো ওষুধে ভালো হয় না, সেসব অসুখের নিরাময়ের জন্যে তেল মালিশ করো। যয়তুনের তেল বিশেষ উপকারী। ফিজিওথেরাপিস্ট, পোলিও, নার্ভের দুর্বলতার রোগীদের যয়তুনের তেল মালিশ করান।

www.nagorikpathagar.org

আংটির পাথর ও আধুনিক বিজ্ঞান

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.)-এর আংটি ছিলো রূপার তৈরী। সেই আংটির নাগিনা ছিলো হাবশী। (শামায়েলে তিরমিযী)

রসূল (স.) রূপার তৈরী যে আংটি পরিধান করতেন, সেই আংটির নাগিনা বা পাথরও ছিলো রূপার। তিনি আকিকের পাথরও পরিধান করেন। তিনি কখনো ডান হাতে কখনো বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন। অধিকাংশ সময় ডানহাতে পরিধান করতেন। আংটির নাগিনা ছিলো হাতের তালুর মতো। (তানবীরুল আযহার, রাহবারে যিন্দেগী)

রসূল (স.) আকীকের নাগিনা ব্যবহার করতেন, হাদীস থেকে একথা জানা যায়। কিন্তু তিনি এজন্যে আকিকের নাগিনা ব্যবহার করতেন না যে, এর দ্বারা সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, সব মুশকিল আসান হবে। বরং হাদীস বিশারদ আলেমদের মতে রসূল (স.) সৌন্দর্যের জন্যে আংটিতে নাগিনা ব্যবহার করতেন।

বিজ্ঞানীদের মতে যে কোনো প্রকার পাথরের উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলে, সেই আলো পাথরের মধ্যে অন্য আলোর রূপ ধারণ করে। সেই আলো স্বাস্থ্য বা সুস্থতার কারণ হয়। কেননা, সেই আলো নার্ভ সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। যদি এই আলো ঠান্ডা হয়, তবে এর দ্বারা বিশেষ প্রভাব তৈরী হয় এবং সেই প্রভাব দেহে স্থানান্তরিত হয়।

পাথর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ নানা কথা বলে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান পাথরের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন। পণ্ডিত অমরনাথ তার বিশ্বাস অনুযায়ী আকিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এভাবে করেছেন। তবে এই বিশ্বাসকে ইসলামী বিশ্বাস মনে করা যাবে না।

আকিক

আকিক একটি সুন্দর এবং বিখ্যাত পাথর। ইংরেজীতে এই পাথরকে বলা হয় এগাটে। ফার্সীতে আকিক, আরবীতে আকিক ইয়ামেনী সংস্কৃতিতে হেল্কি বলা হয়। এই পাথর লাল, সাদা, ধূসর, হলুদ এবং কলজের রঙের মতো হয়ে থাকে। এই পাথর ধর্মীয় পাথরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইয়েমেনী আকিককে বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পাথর মনে করা হয়। এই পাথরের রং কলজের রং-এর মতো।

আকিকের জন্মস্থান

আকিক পাথর মাটির নীচে এবং সমুদ্রের গভীরে পাওয়া যায়। মাটির নীচে একটি পাতলা আবরণীর মধ্যে আকিক পাথর জড়ানো থাকে। এ কারণে এ পাথর সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এ পাথর একটি ভুট্টার মতো হয়ে থাকে। তবে কখনো এর চেয়ে বড়োও হয়। দুই বা তিন ইঞ্চি লম্বা আকিকও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশ্বের কয়েকটি দেশে আকিক পাথরের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ হচ্ছে জার্মানী, আরব, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, ইয়েমেন, আমেরিকা এবং ভারতের গুজরাট, দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ।

www.nagorikpathagar.org

আকিকের রকমভেদ

পাথর বিশেষজ্ঞদের মতে রঙের বিচারে আকিক নানা রকম হয়ে থাকে।

১. রিভ এগেট। এই আকিক হচ্ছে রেশমী ফিতার মতো। এতে কয়েকটি ভাঁজ বা স্তর থাকে।

২. উঙ্গা এগেট। এটাকে বলা হয় সঙ্গে সোলায়মানি আকিক।

৩. বিন্ড এগেট। এই আকিককে বলা হয় ডুরিদার আকিক।

৪. সার্কলার এগেট। এই আকিককে গোলাকার আকিকও বলা হয়।

৫. আই এগেট। এই আকিক হচ্ছে চোখের মতো।

৬. কাওস কাজাহি। এই আকিককে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলে ঝিকমিকিয়ে উঠে।

৭. রিন এগেট। এই আকিক সাইবেরিয়া এবং সিসিলিতে পাওয়া যায়।

৮. বারশেড এগেট। এই আকিক রিন এগেটের টুকরোর মতো হয়ে থাকে।

৯. ফার্টি ফিকশন এগেটা। এটি একাধিক প্রকারের।

১০. মাস এগেটা। এটিকে বলা হয়, উদ্ভিদজাত আকিক। এতে কালডোনি এবং লাল রং-এর মিশ্রণ থাকে। কখনো এই রং ধুসর এবং হলুদও মনে হয়।

১১. প্লাসমা। এই আকিক সবুজ রং-এর হয়ে থাকে।

পারস্যের পাথর বিশেষজ্ঞগণ আরো ৭ প্রকার আকিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

আকিকের তেলেসমাতি

যে ব্যক্তি আকিক পাথর পরিধান করে তার ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং শত্রুদের মনে তার প্রভাব সৃষ্টি হয়। তার সকল প্রয়োজন খুব কম সময়ের মধ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। তার বুকে কখনো ব্যথা হয় না। আকিক পাথর যে ব্যক্তির কাছে থাকে তার কাছে বিষাক্ত কোনো প্রাণী কখনো আসে না। এই পাথর অন্তরে শক্তি যোগায়। আকিক পাথরের প্রভাবে আকিক পরিধানকারীর স্বাস্থ্য ও সুস্থতা অটুট থাকে।

এই পাথর পরিধান করা হলে মেজাজে রুক্ষভাব দূর হয়ে যায়। হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক থাকে। হৃদরোগের কোনো আশংকা থাকে না। এই পাথরের প্রভাবে মানুষের মন থেকে হিংসা ঘৃণা দূর হয়ে যায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হয়। সকল মানুষের জন্যেই এই পাথর কল্যাণকর মনে করা হয়। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, আকিক পাথর যে ব্যক্তি পরিধান করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই পাথর পরিধানে থাকলে সফরের সময় বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই পাথর মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কথিত আছে, যে ব্যক্তি কাফুর, আম্বর এবং আকিক ঘসে মাথায় লাগিয়ে শাসনকর্তার দরবারে যাবে শাসনকর্তা তার প্রতি সদয় হবেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহের পরিচয় দেবেন।

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আকিক

আকিকের ব্যবহারে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে। এই পাথরের সুর্মা চোখের রোগে উপকারী। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল হয়। আকিকের গুঁড়ো মাজন হিসেবে ব্যবহার করা হলে দাঁতের পায়োরিয়া রোগ ভালো হয়। দাঁতের রক্ত পড়া বন্ধ হয়। দাঁত মযবুত এবং সাদা হয়। মুখ থেকে রক্তপড়া বন্ধ করে। পুরাতন জখম নিরাময়ে আকিক অত্যন্ত ফলপ্রসূ। মহিলাদের হায়েজের রক্ত কমে যাওয়া বা বেশী হওয়া রোধ করে। প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসার রোগ দূর করে। (আয়নায় জওহর, পণ্ডিত অমরনাথ)

বর্ণিত উল্লেখিত উপকারিতার সাথে একমত হওয়া জরুরী নয়।

তালবিনা এবং বিজ্ঞান

যবের তৈরী হালুয়াকে বলা হয় তালবিনা। যব গুঁড়ো করে দুধের সাথে মিশিয়ে এই হালুয়া তৈরী করা হয়। তারপর মধু মিশিয়ে খেতে হয়।

রসূল (স.)-এর পরিবারের লোকেরা যখন অসুস্থ হতেন তখন রসূল (স.) যবের হালুয়া তৈরী করার আদেশ দিতেন। তারপর বলতেন, এই হালুয়া রোগীর অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে এবং তার শারীরিক দুর্বলতা এমনভাবে দূর করে যেন মুখের ময়লা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। (ইবনে মাজা)

হযরত আয়শা (রা.) রোগীদের জন্যে তালবিনা তৈরীর আদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, যদিও রোগী এই হালুয়া খেতে না চায়, কিন্তু এই হালুয়া রোগীর জন্যে বিশেষ উপকারী। (বোখারী)

হযরত আয়শা (রা.) থেকে অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, কেউ রসূল (স.)-এর কাছে তার ক্ষুধামন্দার অভিযোগ করলে তিনি তাকে তালবিনা খাওয়ার আদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তালবিনা তোমাদের পেট থেকে দূষিত জিনিস এমনভাবে বের করে দেবে যেমন নাকি তোমরা পানি দিয়ে ধুয়ে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করো।

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তালবিনা নিম্নোক্ত অসুখের ক্ষেত্রে নিরাময় ব্যবস্থা করে। এসব রোগের প্রতিষেধক হিসেবে তালবিনা অতুলনীয়।

(১) হৃদকম্পন এবং উচ্চ রক্তচাপ (২) রক্তে চর্বি বৃদ্ধি পাওয়া এবং চর্বি গাঢ় হওয়া (৩) হৃদপিন্ডের কোষের জটিলতা (৪) পাকস্থলীর শুষ্কতা এবং উত্তাপ (৫) পাকস্থলীর গরম (৬) দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা (৭) ক্ষুধা মন্দা (৮) রোক্রান্ত হওয়ার পর শারীরিক দুর্বলতা (৯) সব সময় মাথা ধরে থাকা (১০) গর্ভবতী মহিলাদের জন্যেও উপকারী (১১) শিশুদের জন্যে উৎকৃষ্ট টনিক (১২) মনের কুমন্ত্রণা এবং ভীতির প্রতিষেধক (১৩) প্রস্রাবের রোগ বিশেষত প্রস্রাবের জ্বালাযন্ত্রণা রোধ করে (১৪) কিডনির ইনফেকশন দূর করে (১৫) কিডনিতে যাদের পাথর হয়, তাদের কিডনিতে পাথর তৈরী রোধ করে। (১৬) কোনো কোনো রোগে কিডনি থেকে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পুঁজ বের হয়। এরকম অবস্থায় তালবিনা সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (১৭) যারা মস্তিষ্কের পরিশ্রম করে তাদের জন্যে তালবিনা বিশেষ উপকারী।

www.nagorikpathagar.org

যবের তৈরী তালবিনা

তালবিনা একটি বিস্ময়কর খাদ্য। আমেরিকার খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে তালবিনা রক্তে চিনি এবং চর্বির পরিমাণে ভারসাম্য তৈরী করে। বর্তমানে যবের তৈরী হালুয়াকে ডায়াবেটিসের, হৃদরোগের এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রতিষেধক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

তালবিনা রক্তের কোলেস্টরেলের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেয়। রক্তের চিনি এবং চর্বি কমিয়ে দেয়। যবের ভূষি খাদ্য হিসেবে গমের ভূষির চেয়ে উৎকৃষ্ট।

আমেরিকার একটি খাদ্যের নাম হচ্ছে মিউজলি। যবের সাথে শুকনো ফল এবং আনুষঙ্গিক জিনিস মিশিয়ে এ খাদ্য তৈরী করা হয়। আগে কখনো এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা বিশ্লেষণ করা হয়নি। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশেষভাবে তৈরী এই খাদ্য রক্তে কোলেস্টরেলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। যারা হাসপাতালে ভর্তি হতে আসে তারা রক্তে তিনশত ডিগ্রি কোলেস্টরেল নিয়ে আসে। এ পরিমাণ আশংকাজনক। চিকিৎসা নিয়ে যখন ঘরে ফিরে যায়, তখন রক্তে কোলেস্টরেলের পরিমাণ থাকে ১৯০ ডিগ্রি। এ পরিমাণ নিরাপদ।

ডাক্তার জেমস এন্ডারসন গত দশ বছর যাবত এটা প্রমাণ করার কাজে ব্যয় করেছেন যে, ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্যে যেসব খাবারের প্রেসক্রিপশন দেয়া হয় সেসবই ভুল। সাধারণত ডায়াবেটিসের রোগীদের বলা হয়, তারা যেন অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে, চিনি এবং নেশাজাত দ্রব্য যেন পরিহার করে। ডাক্তার জেমস পরামর্শ দেন যে, ডায়াবেটিস রোগীদের নেশাজাত দ্রব্য এবং চিনি ব্যবহারে কোনো ক্ষতি হয় না।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যে বৃটেনের খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পর জেমস এন্ডারসন নিজের রোগীদের উপর সেসব খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এতে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এন্ডারসন লক্ষ্য করেন যে, রোগীদের সুস্থতার কারণ মিহিন আটার রুটি নয় বরং ফল। বিশেষত সীম জাতীয় ফ্রেঞ্চবিন ফল। এই ফলের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট বিদ্যমান থাকে, ফলে যবের অভাব পূরণ করে। তারপর ডাক্তার জেমস এন্ডারসন তার রোগীদের অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে তাদের অবস্থা পরীক্ষা করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রসূল (স.)-এর ব্যবহার করা যবই উত্তম খাদ্য।

রসূল (স.) যবকে ভূষিসমেত আহার করতেন। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্যে এই খাদ্য উপায়ে বিবেচিত হয়।

জেমস এন্ডারসন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থে তিনি যবের ব্যবহার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, যবকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার ফলে ৬০ শতাংশ চিকিৎসার অযোগ্য রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। যবের গুঁড়ো হালুয়া হিসেবে তৈরী করে আহার করা হলে সেই খাদ্য দেহে চিনি তৈরী রোধ করে। ফলে রক্তে চিনির

www.nagorikpathagar.org

পরিমাণ কমে যায় এবং পরিমিত পরিমাণে থাকে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যে এ অবস্থা অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

স্কটল্যান্ডে তালবিনা ব্যবহারের প্রচলন নেই। এ কারণে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহের মধ্যে স্কটল্যান্ডের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব খারাপ। ফিনল্যান্ডের চেয়েও স্কটল্যান্ডে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার বেশী।

জেমস এন্ডারসন লিখেছেন, আমার পরিবারের লোকেরা বর্তমানে তালবিনা খেতে শুরু করেছে। (গেজেট ইংল্যান্ড)

মায়ের দুধ এবং বিজ্ঞান

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে মা যখন সন্তানকে স্তনের দুধ পান করায়, সে সময় শিশুর দেহমনে অনুভূতিহীন একটি ধারা প্রবাহিত হয়। এই ধারা সন্তান এবং মায়ের মধ্যে ভালোবাসা, স্নেহ এবং শ্রদ্ধার কারণ হয়ে দেখা দেয়।

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যে সন্তানকে মা বুকের দুধ পান করায়, সে শিশু সন্তানতো মায়ের স্পর্শ অনুভব করে না। গুঁড়ো দুধ তো আয়া, দাসীদের হাতে ব্যবহার করে। মা শিশু সন্তানকে বুকে আগলে রেখে লালন পালন করে না। এ রকম সন্তান যখন বড়ো হবে, মাতাপিতার প্রতি তার ভালোবাসা শ্রদ্ধা থাকবে কি করে? তার কাছ থেকে মাতা পিতা শ্রদ্ধা ভালোবাসা কি আশা করতে পারে?

ইউরোপের শিশুরা দোকান থেকে কেনা টোস্ট আর বার্গার খেয়ে স্কুলে ছুটে যায়। মায়ের হাতে তৈরী নাশতার স্বাদ তারা পায় না। অথচ মায়ের হাতে তৈরী নাশতার মধ্যে রয়েছে মায়ের স্নেহ মমতার ছাপ। এ রকম সন্তানের কাছ থেকে পরবর্তীকালে পিতামাতা কি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আশা করতে পারে? পিতামাতার সেবা যত্ন এসব সন্তান কিভাবে করবে, কেন করবে?

মায়ের বুকের দুধ সন্তানের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত। বর্তমানে রেডিও টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে গুঁড়ো দুধের ক্ষতি সম্পর্কে, অপকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার চালানো হচ্ছে। মনে রাখা আবশ্যক মায়ের বুকের দুধ আল্লাহর দেয়া বিশেষ নেয়ামত। খুব কম সংখ্যক মহিলার সন্তান বুকের দুধ পায় না। এরকম অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে মায়ের বুকের দুধ পরিমিত পরিমাণে ফিরে আসে। কিন্তু অধিকাংশ সন্তানের মায়েরা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সন্তানকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করেন। অনেক মহিলা স্তনের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় সন্তানকে বুকের দুধ দেয় না। পরিণামে কি হয়? আল্লাহ তায়ালা এই শ্রেণীর মায়েদের অধিকাংশকে স্তনক্যানসারে আক্রান্ত করেন।

সাদা বিষের বিপজ্জনক ব্যবহার

সন্তান যখন মায়ের পেটে থাকে বা প্রসবের পরে কোলে আসে, সেই সময়ের মধ্যেই রয়েছে শিশুর পুষ্টি, সুস্থতা, স্বাস্থ্য, দুর্বলতা এবং অসুস্থতা। শিশুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার খাদ্য। এই খাদ্য সম্পর্কে উদাসীনতা শিশুর সমগ্র জীবনে প্রভাব ফেলে।

www.nagorikpathagar.org

জন্মের সময় মানব শিশু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই দুর্বলতা বহুদিন স্থায়ী হয়। অন্য কোনো প্রাণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এতো দীর্ঘ সময় দুর্বল থাকে না। এই দুর্বলতার সময়ে শিশুকে এমন খাদ্য খাওয়ানো উচিত যে খাদ্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা শিশুর জন্যে ব্যবস্থা করেছেন। সেই খাদ্য শিশুর জন্যে সহজলভ্য হতে হবে। শিশুর অতিমাত্রিক দুর্বলতার কারণেই আল্লাহ তায়ালা মায়ের স্তনে শিশুর সে খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বিশ্বের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী একটি খাদ্য হচ্ছে শিশুর জন্যে মায়ের বুকের দুধ। দুর্বল শিশুর স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এ খাদ্য তৈরী করে দিয়েছেন। সন্দেহ নেই যেসব প্রাণী তার সন্তানদের দুধ দেয়, সেসব প্রাণীর দুধের মধ্যেই সন্তানের জন্যে বিদ্যমান রয়েছে পরিমিত পুষ্টি ও শক্তি। শৈশবে মায়ের দুধের বিকল্প অন্য কোনো খাদ্য হতেই পারে না। ভেড়া বকরির শাবককে গাভী বা মহিষের দুধ পান করানো হলে, সেই দুধে ভেড়া বকরির শাবক আপন মায়ের দুধের পুষ্টিগুণ কি খুঁজে পাবে?

একইভাবে মানব শিশুর জন্যে মায়ের বুকের দুধেই রয়েছে প্রয়োজনীয় ও পরিমিত খাদ্যপ্রাণ, পুষ্টি, শক্তি সুস্থতার নিশ্চয়তা। আপন সন্তানের জন্যে জন্মদানকারিণী মায়ের দুধের বিকল্প অন্য দুগ্ধবতী নারীর দুধও হতে পারে না। অন্য দুধের মধ্যে পানি ওষুধ মিশিয়ে মায়ের দুধের বিকল্প তৈরী করা যায়, এরকম কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই একথা বলা হচ্ছে। যদি মায়ের দুধের বিকল্প অন্য কিছু হতো, তবে আল্লাহ তায়ালা মায়ের স্তনে তার পেটের সন্তানের জন্যে দুধের ব্যবস্থা করতেন না। নবজাত শিশু ওইসব প্রাণীর শাবকের মতো অন্য খাদ্যের মুখাপেক্ষী থাকতো যেসব প্রাণী ডিম দেয় এবং বাচ্চা ফোটায়। মায়ের বুকে সন্তানের দুধের ব্যবস্থা রাখা এটাই প্রমাণ করে যে, এর চেয়ে উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য শিশুর জন্যে অন্য কিছুই হতে পারে না।

সন্তান মায়ের দেহের গোশত, রক্ত এবং হাড় থেকে তৈরী হয়। মায়ের দেহের নির্যাস থেকে মায়ের দেহের রক্ত থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় সন্তানের জন্যে মায়ের স্তনে মিষ্টি দুধ। শিশুর জন্মের পর তার দুর্বল সময়ে সেই দুধ শিশুর জন্যে অত্যন্ত উপযোগী এবং উপকারী বিবেচিত হয়। মায়ের বুকের দুধ যদি কোনো রোগের কারণে নষ্ট না হয়ে যায়, তবে সেই দুধ অন্য নারীর বুকের দুধের চেয়ে সংশ্লিষ্ট সন্তানের জন্যে উত্তম।

দুধ শিশুর জন্যে অন্য সব খাদ্যের চেয়ে উত্তম এবং উপাদেয়। এই দুধ মিষ্টি, সুবাসিত এবং দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী। সুগন্ধিযুক্ত কোনো জিনিস অথবা দুর্গন্ধময় কোনো জিনিস দুধের কাছে রাখা হলে দুধের মধ্যে সেই সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ প্রভাব বিস্তার করে। তীব্র অনুভূতিশীল সূক্ষ্মদর্শী অনেক লোক এমন রয়েছে যারা গরু বা মহিষের দুধ পান করে বলে দিতে পারে যে, সেই গরু বা মহিষ আগের দিনে কি খাবার খেয়েছে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ওলান থেকে দুধ বের হওয়ার পরই সেই দুধ বাইরের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় ছয় লাখ

www.nagorikpathagar.org

জীবাণু তৈরী হয়। বোম্বের বাজারে আসা দুধ একবার পরীক্ষা করা হয়েছিলো। সেই দুধে এতো সংখ্যক জীবাণু পাওয়া গেছে যতো সংখ্যক জীবাণু স্থানীয় নোংরা নর্দমায় পাওয়া গেছে। বড়ো বড়ো শহরের বাজারে বিক্রির জন্যে নিয়ে আসা দুধের অবস্থা হচ্ছে এরকম।

পবিত্র কোরআনে দুধের বিশুদ্ধতা, স্বাদ এবং খাদ্য হিসেবে উৎকৃষ্ট হওয়া সম্পর্কে একাধিক আয়াত রয়েছে। রসূল (স.)-এর হাদীসেও দুধের বাইরের প্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। একবার রসূল (স.) বলেন, তোমরা দুধ ঢেকে আনবে। এক টুকরো কাঠ দিয়ে হলেও ঢেকে আনবে।

ওলান থেকে বের হওয়ার পরই বাইরের পরিবেশের প্রভাব দুধের উপর পড়তে শুরু করে। ওলানে সংরক্ষিত দুধ এবং দোহন করা দুধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই যে কোনো প্রাণীর স্তনে বা ওলানে মুখ দিয়ে পান করা দুধ বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকার কারণে সতেজ থাকে এবং এতে অধিক উপকার পাওয়া যায়। পাঞ্জাব এবং অন্যান্য এলাকায় গাভী ও মহিষের দুধ এই নিয়মে মানুষ পান করে থাকে। যারা এভাবে পান করে তাদের স্বাস্থ্য ও সুন্দর ও মযবুত হয়। শারীরিক দুর্বলতা এবং কিছু রোগের প্রতিষেধক হিসেবে এভাবে দুধ পানের জন্যে গ্রাম এলাকায় চিকিৎসকগণ ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করেন। চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থেও যক্ষ্মাসহ কিছু এমন রোগের বিবরণ রয়েছে যেসব রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মহিষের দুধ মহিষের ওলানে মুখ দিয়ে পান করার কথা বলা হয়েছে।

মানব শিশুর জন্যেও মায়ের স্তনে মুখ দিয়ে দুধ পান করা অন্য প্রাণীদের দোহন করা দুধ পানের চেয়ে বহুগুণ উত্তম। কারণ, দোহন করা দুধ বাইরের পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। চিকিৎসা গবেষণায় মানুষের দুধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুধ হচ্ছে গাভীর দুধ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন সন্তানের জন্যে মায়ের স্তনেই দুধের ব্যবস্থা রেখেছেন, তখন আল্লাহর দেয়া এই নেয়ামত উপেক্ষা করে অন্যত্র কেন দুধের সন্ধান করা হবে? এটা আল্লাহর নেয়ামতকে উপেক্ষা করার শামিল এবং শিশু সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতা ছাড়া কিছু নয়।

বর্তমানে মুখবন্ধ কৌটার দুধ বাজারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর মূলে রয়েছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। শিশু স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই দুধ তৈরী করা হয়েছে, এরকম দাবী করা হয়। কিন্তু আমরা নিজেদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের দাবীকে কি করে অস্বীকার করি?

ইউরোপীয়রা এবং তাদের অনুসারী এশীয় এবং আফ্রিকানরা গুঁড়ো দুধের গন্ধও পছন্দ করে না। তারা বলে আমরা তাজা দুধ এবং কৌটার দুধের পার্থক্য বুঝি। কৌটার মাছ এবং ফলের অনেকে প্রশংসা করে, কিন্তু আমাদের দেশে তাজা মাছ এবং ফল পাওয়া যায়। এ কারণে কৌটার মাছ এবং ফল কেউ পছন্দ করে না। এই রকমের মাছ এবং ফল বরতনে সাজিয়ে সামনে এনে খেতে দেয়া হলে অনেকের বমি আসে। ডেনমার্ক এবং হল্যান্ড থেকে কৌটাবদ্ধ পনির যখন ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন

www.nagorikpathagar.org

সেই পনিরে অনেক সময় পোকামাকড় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পনির অনেকেই সুস্বাদু ভেবে খেতে শুরু করে।

যেসব চিকিৎসক বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রভাবিত হন না তাদের মতে, কৌটায় আবদ্ধ মাছ এবং ফলের চেয়ে তাজা জিনিস অধিক স্বাস্থ্যকর এবং উপকারী। তারা আরো বলেন, কৌটায় আবদ্ধ খাদ্যদ্রব্য থেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

মায়ের বুকের দুধ পান না করিয়ে যেসব শিশু লালন পালন করা হয়, তারা শৈশবেই নানা রোগের শিকার হয়। কারণ, দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে না। পক্ষান্তরে যারা মাতৃদুগ্ধে পালিত হয়, তাদের এসব রোগের আশংকা থাকে না এবং তাদের দেহে যথেষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।

অনেক অভিজ্ঞ মা জানিয়েছেন, মায়ের দুধ পান না করালে শিশুর স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব পড়ে। এছাড়া এসব শিশু মায়ের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে মায়ের প্রতি তাদের ভালোবাসা, মমত্ববোধ গড়ে উঠে না। কবি আকবর এলাহাবাদী লিখেছেন–

'শৈশবে মাতৃস্নেহের গন্ধ আসে কিভাবে তার
পান করে কৌটার দুধ শিক্ষা দেয় সরকার।'

মায়ের বুকের দুধ যেসব শিশুকে পান করানো হয় না, সেসব শিশু নানা অসুখে ভোগে। ডাক্তার, ওষুধ কেনা ইত্যাদির পেছনে মাতাপিতার টাকা ব্যয় হয়ে যায়। অসুস্থ হওয়ার পর টানাটানির সংসারেও শিশুর জন্যে তাজা দুধ সংগ্রহ করতে হয়। উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে দুধ ছয় ঘন্টাও নিরাপদ থাকে না, সেখানে তাজা দুধ পাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠে।

নারীদের শারীরিক গঠন আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে করেছেন যে, নারী যে খাদ্য গ্রহণ করে সেই খাদ্যের একাংশ তার নিজের দেহ গঠনে অন্য অংশ বুকের স্তনে দুধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় সন্তানকে বুকের দুধ না খাইয়ে অন্য দুধ কেনার জন্যে টাকা ব্যয় করা কি যুক্তিযুক্ত? এতে সংসারের ব্যয় অহেতুক বেড়ে যায়। মা যা কিছুই আহার করুক তার বুকের স্তনে দুধ তৈরী হবেই। এটা মহান আল্লাহর কুদরতী ব্যবস্থাপনা। সন্তান দুধের অভাবে মারা যাবে না। কিন্তু মায়ের দুধ ছাড়া অন্য দুধ না পেলে বা সেই দুধ দূষিত হলে শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পাবে, অসুখে পড়বে, এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

বয়স্করা তো রোযাও রাখে, কিন্তু শিশুরা তিন চার ঘন্টার বেশী না খেয়ে থাকতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় গরমের মৌসুমে দুধ নষ্ট হয়ে যায় অথচ মায়ের সেকথা জানার সুযোগ থাকে না। নিজের অজান্তে শিশুকে মা সেই নষ্ট দুধ পান করায়। এর ফলে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। শীতপ্রধান দেশে শিশুকে যতোবার দুধ পান করাতে হয়, প্রত্যেকবার সে দুধ গরম করতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুধ সংরক্ষণের জন্যে কতিপয় অভিজ্ঞ চিকিৎসক ফ্লাকস বা ফ্রিজ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব চিকিৎসক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দেন। বিত্তশালীরা ফ্রিজ কিনতে পারে, কিন্তু যাদের দৈনন্দিন জীবনে দু'বেলা অন্ন সংস্থানই কষ্টসাধ্য, সেখানে তারা কিভাবে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে ফ্রিজ কিনে দুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে? ফ্লাকসে গরম দুধ রাখা হলে অল্প সময়ে সে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। তবে ফ্লাকসে যদি দুধ ঠান্ডা করে বরফ মিলিয়ে রাখা হয়, তাহলে দুধ ভালো থাকে।

যেসব শিশু মায়ের দুধ পানের সুযোগ পায় না তাদের দাঁত দুর্বল হয়ে যায়। এরকম মানুষ খুব দ্রুত দাঁতের রোগে আক্রান্ত হয়। দাঁতের অসুখ থেকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অসুখও দেখা দিতে পারে।

মায়ের জরায়ুতে শিশুর প্রাণের সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিশু নয়মাস যাবত মায়ের পেটে লালিত পালিত হতে থাকে। শিশুর খাদ্য মায়ের দেহের অংশ থেকেই তৈরী হয়। শিশু জন্মের পরই তাকে বাইরের খাদ্য দেয়া হলে তার স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব পড়ে, দেহ থাকে দুর্বল এবং নাজুক। একজন যুবক যে খাবার খেতে প্রতিদিন অভ্যস্ত, হঠাৎ করে সেই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা হলে সেই যুবকেরই স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালে তৎকালীন বঙ্গদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। ফলে ভাত খেতে অভ্যস্ত বাঙ্গালীদের বাধ্য হয়ে রুটি খেতে হয়েছিলো। অনভ্যস্ততার কারণে সেই রুটি হজম হয়নি, ফলে উদরাময়সহ অন্যান্য রোগেও বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছিলো।

বর্তমান যুগে জীবনের চাহিদা পূরণে প্রতিটি দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। একটি দেশে খাদ্য হিসেবে চাল এবং ফল উৎপন্ন হলে সে দেশ সেসব দ্রব্য সামগ্রী অন্য দেশে রফতানী করে। সে দেশ থেকে গোশত, দুধ ইত্যাদি অন্য দেশ আমদানী করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শান্ত থাকার কারণে অল্প সময়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্য সামগ্রী পৌছে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অশান্ত হলে যে দেশে যুদ্ধ চলে, সেখানে সহজে খাদ্যদ্রব্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস পৌছানো সম্ভব হয় না।

বিগত দু'টি মহাযুদ্ধের সময়ে ইউরোপীয় দেশসমূহ যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হল্যান্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া থেকে দুধ, গোশত আমদানী করতো। কিন্তু জার্মানীর অবরোধ সৃষ্টির কারণে এক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। হাজার হাজার মা তাদের কান্না কাতর শিশুদের নিয়ে পাত্র হাতে বরফ বৃষ্টির মধ্যে খাদ্য পাওয়ার আশায় দুধ মজুদের ডিপোর সামনে অসহায়ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতো। সে দৃশ্য ছিলো বড়ো মর্মান্তিক। এই সমস্যা প্রকটরূপ ধারণ করে যখন পরিবহন ধর্মঘট দেখা দেয়। শত্রুদের অবরোধ সৃষ্টির ফলে বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ধর্মঘটের কারণে দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পন্য পরিবহন সম্ভব হয়ে উঠে না।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ছোটো বড়ো প্রতিটি দেশই এরকম হরতালের সম্মুখীন হয়েছে। এরকম জটিল পরিস্থিতিতে বৃটেন, প্যারিস, আমেরিকায় দুধ পরিবহনের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাখ লাখ শিশু ক্ষুধায় ছটফট করেছে।

দুধ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্যতম। এই দুধ পরিবহনে সমস্যা সৃষ্টি হলে শিশুদের জীবন ধারণই কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরী হয়েছে এবং এক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। বিগত দু'টি মহাযুদ্ধে ডেনমার্ক, হল্যান্ড, প্রভৃতি দেশ, কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার হলে অন্যান্য দেশ তো বটেই, আমেরিকা রাশিয়ারও বিপর্যয় দেখা দেবে। লাখ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু হবে। দুধের ডিপোও থাকবে না, সেই ডিপোর রক্ষণাবেক্ষণকারীরাও থাকবে না। লাখ লাখ মা তাদের শিশুদের ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করতে দেখবে এবং এক সময় নিজেরাও মৃত্যুবরণ করবে।

ইউরোপীয় সভ্যতায় আকৃষ্ট আফ্রিকান এবং এশিয়ান দেশসমূহের মানুষও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক প্রচার প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে প্রাকৃতিক খাদ্য ত্যাগ করে আমদানী করা কৌটার দুধ শিশুদের পান করাতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

আগেকার দিনে সচ্ছল দম্পতিদের সন্তানকে কিছুদিন মায়ের দুধ পান করানোর পর ধাত্রীমাতার কাছে দুধ পান করানোর জন্যে দেয়া হতো। অসচ্ছল মায়েরা সন্তানদের নিজেদের বুকের দুধই পান করাতো। শিশুর মায়ের অসুখ হলে বা মায়ের মৃত্যু হলে ধাত্রীমাতার দুধ পান করানোর পরিবর্তে বকরি বা গাভীর দুধ পান করাতো। তবে সম্মানজনকভাবে মায়ের দুধের পরিবর্তে ধাত্রীমাতার দুধ পান করানোর উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে ধাত্রী মাতার কথাও কেউ চিন্তা করে না বরং শিশুর জন্মের পর থেকেই কৌটার দুধ পান করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কেউ কেউ বলেন, সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো হলে মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, সন্তানকে বুকের দুধ পান করালে মায়ের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটবে এটা কি আল্লাহ তায়ালার জানাই ছিলো না? আল্লাহ তায়ালা মায়ের স্তনে অহেতুক দুধের ব্যবস্থা রেখেছেন? মানব দেহের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপ্রয়োজনীয় নয়, অকারণ নয়। মনে রাখা দরকার, সন্তানকে বুকের দুধ পান না করালেই নারী যৌবনবতী থাকতে পারে না। তার প্রভাব অবশ্যই নারীর স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। সন্তানকে দুধ পান না করালে তিন চার বছর হয়তো স্তন খাড়া থাকে, তারপর আপনা আপনি ঢলে পড়তে শুরু করে। যেসব নারীর সন্তান হয়না তাদের স্তনের সৌন্দর্যও এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যেসব নারী কৃত্রিম উপায়ে সন্তান জন্মদান বন্ধ রাখে তাদের স্তনও একসময় ঢলে পড়ে।

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব মহিলা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করে এবং সন্তানকে বুকের দুধ পান করায়, তারা সাধারণত দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং তাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল যুগের সমস্যা এবং সংকট সম্পর্কে অবগত। কোরআনে তিনি বলেন, মানুষকে তার মা কষ্ট করে বহন করে, তারপর কষ্ট করে প্রসব করে। তারপর তাকে লালন পালন করে। দুধ পান করানোর সময় ত্রিশ মাস হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন মায়ের সন্তান তার পেটে আসার পর থেকে মায়ের রক্তে গোশতে লালিত পালিত হয়। ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়।

বিয়ের পর গর্ভধারণ করা হলে আট নয় মাস সন্তান মায়ের গর্ভে থাকে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, মা তার সন্তানকে দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করায়।

এই সময়ের মধ্যে এবং তারপরে শিশু আংশিকভাবে বাইরের খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। অনেক সময় পুরোপুরিই বাইরের খাবার খায়। কোরআনের শিক্ষার উপর যদি আমল করা হয়, তবে বহুক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবনে শান্তি সুখ ফিরে আসতে পারে এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। শিশু আল্লাহর ব্যবস্থা করা খাদ্য মায়ের বুকের দুধ খেয়ে প্রতিপালিত হতে পারে। তার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিশ্চিত হতে পারে।

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, শিশুকে বুকের দুধ ছাড়ানোর মাধ্যমে বাইরের দুধ পান করানোর সময় যদি চিন্তা করা হয় যে, বাইরের দুধটুকু মাকে দেয়া হবে, তাহলে শিশু বাইরের দুধটুকু মায়ের স্তন থেকেই পেতে পারে। এতে মায়ের স্বাস্থ্য যেমন ভালো থাকবে, তেমনি শিশু বাইরের দুধের মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। বর্তমানে শিশু বিশেষজ্ঞগণের সকলেই অভিন্ন মতামত প্রকাশ করছে যে, কৌটার দুধ হচ্ছে সাদা বিষ, অন্য কিছু নয়। (ইসলামী সমাজনীতি ও বিশেষজ্ঞগণ)

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যবসা বাণিজ্য

হযরত মা'য়ায (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম পেশা সেই সকল ব্যবসায়ীর যারা কথা বললে সত্য বলে, আমানতের খেয়ানত করে না, ওয়াদা খেলাফ করে না, যখন কেনো জিনিস বিক্রি করে তখন সেই জিনিসের প্রশংসা করে না, ক্রয় করা জিনিসের মূল্য পরিশোধ করতে দেরী করে না, যদি তাদের কাছ থেকে কেউ ঋণ নেয় তবে সেই ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর কড়াকড়ি করে না। (বায়হাকী, ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

আমার এক বন্ধু এমবিএ করার পর ফিরে এলে তার কাছে আমি ব্যবসায়ের কৌশল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, বর্তমানে সমগ্র ইউরোপ এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে যে, ক্রেতার উপকার করো, বিক্রীত জিনিস ফেরত নাও, ক্রেতাকে তোমার জিনিসের ত্রুটির কথা জানাও, ক্রেতার সাথে নম্র ভাষায় আন্তরিকতার সাথে কথা বলো, তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলো এবং তার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখো।

এটা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নীতি নাকি আমার আপনার নবী মোহাম্মদ (স.)-এর নীতি? চিন্তার বিষয়। ইউরোপ এ কারণেই ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করছে, অথচ আমরা অধঃপতনের গভীরে জড়িয়ে রয়েছি।

ওলামায়ে কেরাম এবং হাদীস বিশারদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন, দাস এবং কর্মচারীকে ক্ষমা করবে, তাদের সব কাজে সহায়তা করবে, তাদের কাজে সমালোচনার পরিবর্তে প্রশংসা করবে। আমরা কি এরকম করি? আমরা নিজেদের ভৃত্য এবং কর্মচারীদের কাজের প্রশংসা করি? অথচ ইউরোপ এই নীতি অনুসরণ করে সফলতা অর্জন করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করা দরকার এবং সন্তর্পণে সামনে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক গ্রাম প্রশংসা এবং এক কেজি সমালোচনা

একটি কোম্পানীর সাফল্য দ্রুত মালামাল প্রস্তুত করার উপর নির্ভর করতো। তারা প্রয়োজনীয় মালামাল সময়মতো উৎপাদন করতে পারতো না। অথচ তাদের মেশিনারিজ ছিলো সম্পূর্ণ নতুন। কর্মকর্তা বারবার পরিবর্তন করা হলো, কিন্তু মালামাল প্রস্তুত বৃদ্ধি পেলো না। কোম্পানীর প্রধান অবশেষে একজন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ চাইলেন, তাকে সব খুলে বললেন। সেই প্রকৌশলী যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, কোম্পানীর পরিচালকগণ যন্ত্রপাতির উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে, কিন্তু যারা সেসব চালায় সেসব শ্রমিক কর্মচারীকে ধমক, সমালোচনার মধ্যে রেখেছিলো। অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কোম্পানীর প্রধানকে বললেন, আপনি কর্মকর্তা

www.nagorikpathagar.org

কর্মচারী বা শ্রমিক পরিবর্তন করবেন না, এর কোনো প্রয়োজন নেই বরং যারা আছে তাদের মনোবল বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিন। তাদের কাজের প্রশংসা করুন। প্রত্যেক শাখা প্রধানের কাজের জন্যে তাকে বাহবা দিন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। সেই শাখা প্রধান আপনার অনুকরণে তার অধীনস্থদের কাজের দক্ষতার প্রশংসা করবে। তাদের পিঠে হাত চাপড়ে তাদের উৎসাহিত করবে। আমার ধারণা, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি শ্রমিকের কাজের দক্ষতার মূল্যায়ন করুন। তাদের উৎসাহিত করুন। তারপর প্রকৌশলী তার ব্রিফকেস খুলে একটি রঙিন পোস্টার বের করে বললেন, প্রত্যেক শাখা প্রধানের টেবিলে এটি ফটোস্ট্যাট করে সেঁটে দিন। পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'এক গ্রাম প্রশংসা এক কেজি সমালোচনার চেয়ে অনেক ভারী'।

কোম্পানীর চেয়ারম্যান অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তা বাস্তবায়ন করলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, তার কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমালোচনার চেয়ে প্রশংসা উৎপাদন বৃদ্ধির অধিক সহায়ক। সামান্য প্রশংসা পেয়েই শ্রমিক কর্মচারীরা মনে-প্রাণে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে আত্মনিয়োগ করলো। একজন কর্মচারী অন্যজনের চেয়ে অধিকতর দক্ষতা প্রমাণে সচেষ্ট হলো। আরো বেশী প্রশংসা এবং কাজের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা করতে লাগলো।

কাজের মূল্যায়ন করা, দক্ষতার প্রশংসা করাও একটি শিল্প। এ ক্ষেত্রে কারো যোগ্যতা কারো চেয়ে বেশী থাকে। যেমন কোনো লোকের থাকে কবি প্রতিভা, কারো থাকে সঙ্গীত প্রতিভা, কারো থাকে প্রবন্ধ রচনার প্রতিভা। এসব যোগ্যতা প্রতিভা কারো থাকে কম কারো থাকে বেশী। এমন অনেক লোককে আমি জানি, যারা শুধু প্রশংসা পেতে চায়। প্রশংসা করলে কে না খুশী হয়। একজন ইমাম সাহেবকে আমি দেখেছি তিনি সব সময় হাসি খুশী থাকেন। সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন। সকলের খোঁজ খবর নেন, প্রয়োজনে প্রশংসা করেন। সকলের সাথে ইমাম সাহেবের সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহারে সবাই খুশী, ইমাম সাহেবের সবাই প্রশংসা করেন। ইমাম সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সবার মধ্যে ছাপ ফেলে।

ইমাম সাহেব একবার আমার একটি লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তার প্রশংসার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না। আন্তরিতাপূর্ণ প্রশংসার যে প্রভাব পড়ে কৃত্রিম প্রশংসা সেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একজন অভিজ্ঞ মানুষ তার কৌশল, আন্তরিকতা এবং ব্যবহার দিয়ে পশুকেও অনুগত করতে পারে।

আমার একজন বয়স্ক বন্ধু কয়েক মাস যাবত অসুস্থ ছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলতেন যে, তার আত্মীয় স্বজন তার খবর নেয় না। কিছুদিন পর তার পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আমার সেই বন্ধুর জন্যে নানা জিনিস উপহার পাঠালো এবং তার ভালোভাবে চলার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা পাঠালো। এসব পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে আমার সেই বন্ধু বিস্ময়করভাবে সুস্থ হয়ে গেলো এবং হাসিখুশী জীবন যাপন করতে লাগলো।

www.nagorikpathagar.org

প্রচলিত সামাজিক রীতিতে কুশল বিনিময়ের জন্যে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয় তার প্রভাবও কম নয়। ধন্যবাদ, কেমন আছেন, ভালো আছেন তোর এসব কথারও বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

শিশুদের উপহার পাওয়ার পর উপহার প্রদানকারীকে ধন্যবাদ, শোকরিয়া জ্ঞাপক কথা বলার জন্যে শিখিয়ে দিতে হবে। এতে উপহার প্রদানকারী অভিভাবক, পিতামাতা খুশী হন। অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বলাও এক প্রকার ভদ্রতা এবং সামাজিকতা। অনেক সময় একটি ভালো কথা শুনেই একজন বিষণ্ন বিষাদগ্রস্ত মানুষের মন ভালো হয়ে যায়। শব্দের যাদুকরি প্রভাব সম্পর্কে সবাই জানে। অথচ অনেকে এই বিষয়টি জানে না। (ম্যান এন্ড বিজনেস)

ব্যবসা বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ীর কার্যক্রম

আল্লাহ তায়ালা তার মাখলুকের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি মাটিতে চলাচলকারী সকল প্রাণীর রিযিকের যিম্মাদার। রিযিক শুধু অর্থসম্পদ নয় বরং আমাদের সকল গুণাবলীই রিযিক। আমাদের দৃষ্টিশক্তি রিযিক, কথা বলার শক্তি রিযিক, বেঁচে থাকার শক্তি এবং আচার ব্যবহার রিযিক। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এমন রিযিকদাতা যিনি শিশুর জন্মের আগেই তার রিযিক-এর ব্যবস্থা করে রাখেন মায়ের বুকে। আমরা রিযিক পাওয়ার জন্যে দেশ বিদেশে সফর করি, চাকরি করি, ব্যবসা বাণিজ্য করি এবং অন্যান্য বহু রকমের কাজ কর্ম করি।

বর্তমান উন্নত যুগে আমরা সকল কাজে ইউরোপীয়দের উন্নতির নীতি অনুসরণের চেষ্টা করি। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য, নীতি রীতির প্রতি আমরা এতোটাই আকৃষ্ট যে, তাদের প্রাচীনকালের ব্যবসা বাণিজ্যের রেকর্ড চেয়ে এনে নিজেরা পাঠ করি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেসব পড়াই। বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বা ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষকগণ ছাত্র ছাত্রীদের কাছে ইউরোপীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যের পদ্ধতি গর্বের সাথে তুলে ধরেন। সন্তানদের ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিনীতি শিক্ষা দেয়ার জন্যে অভিভাবকরা আমেরিকা, বৃটেনে প্রেরণ করে। কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে না। অথচ শুধু কোরআন এবং সীরাতুন্নবী পাঠ করেই আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের রীতি সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের অভিমত

মোরে একজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ। তার লেখা গ্রন্থে ভালো ব্যবসায়ী হওয়ার জন্যে অঙ্গীকার পালন এবং ইনসাফের সাথে ফয়সালা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, সফল ব্যবসায়ী হওয়ার জন্যে ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন করা জরুরী। এর ফলে সেই ব্যবসায়ীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব তৈরী হবে, মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করবে। যদি কোনো পণ্যের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়, তবে যুক্তিসঙ্গতভাবে সে সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা করলে ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনার ভিত্তি মজবুত হবে। মানুষ আপনার প্রতি আস্থা স্থাপন করবে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য

রসূল (সা.) বলেছেন, তোমার মালামাল বিক্রির জন্য ব্যবসায় মিথ্যা কসম করবেনা। এ রকম কসম করে পণ্য বিক্রি করা সাময়িকভাবে লাভজনক হতে পারে, কিন্তু পরিণামে ব্যবসায়ে বরকত শেষ হয়ে যায়। (মুসলিম)

রসূল (স.) আরো বলেন, সত্যবাদী এবং আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথে থাকবেন। (তিরমিযী)

ইউরোপের একজন বিশেষজ্ঞ রস তার রচিত গ্রন্থ ফাউন্ডেশন অব এথিকসে লিখেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা একটি ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে। অন্যদের সেই জিনিসই দেবেন যা আপনার কর্মচারীদের মনোপূত হবে। এতে আপনার কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এর কর্মচারীদের সম্মান করা, বেতন ভাতা সময় মতো পরিশোধ করা ও ব্যবসায়িক সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত। এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা করা হয়েছে এবং এটা আমাদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিধানও বটে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আমি এ শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে বাদী হবো। আমি যাদের সাথে শত্রুতা করবো তাদের উপর বিজয়ী হবো। (১) যারা আমার নামে অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। (২) যারা কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করেছে। তারপর সেই বিক্রীত টাকা নিজে ভোগ করেছে। (৩) যারা শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে কাজ আদায় করেছে, তারপর তাদের পারিশ্রমিক দেয়নি। (ইবনে মাজা)

এই সব হাদীসে শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দিতে বলা হয়েছে। শ্রমিকের পারিশ্রমিক যদি সে কাজ শেষ হওয়ার পরপরই পেয়ে যায়, তাহলে সে কাজে মনোযোগী হবে না কেন? এভাবে পারিশ্রমিক পেয়ে শ্রমিক মনে মনে চিন্তা করবে যে, আমার মালিক আমার মঙ্গল চিন্তা করেন, তার কাছে আমার শ্রমের মূল্য আছে, গুরুত্ব আছে। কাজেই আমাকে তার কাজে আরো বেশী মনোযোগী হতে হবে।

শ্রমিক কর্মচারীদের রিযিক তাদের বাহুর শক্তি মধ্যে রয়েছে। শারীরিক শক্তি মহান আল্লাহর দান। এই শক্তি দ্বারা রিযিক বা জীবিকা উপার্জন করা হয়। হাতের দ্বারা কাজ করা হয় এতে পেটের খাবার জোটে। সবাইকে রিযিক উপার্জন করতে হয়। রিযিক উপার্জনকারী ধনী হোক বা গরীব হোক সে আল্লাহর বন্ধু।

রিযিক উপার্জনের ক্ষেত্রে ধর্ম মানুষকে পথ নির্দেশ করে থাকে। ধর্ম বলে দেয় হারাম কি এবং হালাল কি। জায়েয কি নাজায়েয কি। সওয়াব কি আযাব কি। দয়া কি কঠোরতা কি। নিঃশ্বাস কমে যাওয়ায় জীবনবৃক্ষের শিকড় কাটা যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রিযিকের সকল উৎস এবং উপকারিতা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। বৈধ বিষয়কে অবৈধ বিষয়ে পরিণত করা নির্বুদ্ধিতা এবং পাপ। যারা হারাম বা অবৈধ

www.nagorikpathagar.org

উপার্জনে লালিত পালিত হয় তারা অবশ্যই বিদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হবে, বে-আদব বিবেচিত হবে, অপরাধী বিবেচিত হবে। তারা দ্বিগুণ শাস্তির উপযুক্ত হবে। তাদের পরকালও বরবাদ হবে, সন্তানরাও বরবাদ হবে।

ব্যবসায়ে অঙ্গীকার পালন

ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পেরী রচিত একটি গ্রন্থে ওয়াদা পালন সম্পর্কে লিখেছেন, নতুন ব্যবসায়ীদের ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন অন্যদের চাইতে তাকে অগ্রসর করে দিতে পারে।

এর মাধ্যমে সেই ব্যবসায়ী অল্প সময়ে নিজের জন্যে অধিকতর সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে।

পবিত্র কোরআনে অঙ্গীকার পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা অঙ্গীকার পালন করো। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, তোমরা অঙ্গীকার পালন করবে। বেশক অঙ্গীকার পালন সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

যে ধর্মে অঙ্গীকার পালন সম্পর্কে এতো কঠোর বিধান রয়েছে, সেই বিধানের উপর আমল না করা হলে কতো রকম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ব্যবসায়ীগণ যদি অঙ্গীকার পালন না করে তবে বিষয়টি আইন আদালত পর্যায়ে গড়ায় এবং নানা রকম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। হাদীসে মোনাফেকদের যে পরিচয় উল্লেখ রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পালন না করা। অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। রসূল (স.) তাঁর জীবদ্দশায় নিয়মিতভাবে অঙ্গীকার পালন করেছিলেন। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো শত্রু সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশেরও কম। দুইজন সাহাবী মক্কা থেকে মদীনা আসছিলেন। পথে শত্রু সৈন্যরা তাদেরকে ঘিরে ধরে। তারা সেই দুইজন সাহাবীকে এই অঙ্গীকারে ছেড়ে দেয় যে, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। দুইজন সাহাবী রসূল (স.)-এর সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে জানান। রসূল (স.) সেই দুইজন সাহাবীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখলেন এবং বললেন, তোমরা ফিরে যাও। সকল অবস্থায় অঙ্গীকার পালন করতে হবে। আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চাই।

ঋণ দান এবং ঋণ গ্রহণ

ব্যবসায়িক কাজে বা অভাবের কারণে অনেক সময় ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঋণ গ্রহণের বা ঋণ দেয়ার মাধ্যমে দুইজন লোকের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইসলামে ঋণ দাতা এবং ঋণ গ্রহীতা উভয়ের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঋণ দাতাকে বলা হয়েছে, যদি ঋণ গ্রহীতা অধিকতর দুরবস্থার কারণে সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হয় তবে তাকে সময় দিতে হবে। তবে যদি গৃহীত ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয় এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন এবং এ কাজের

www.nagorikpathagar.org

বিরাট ফযিলত রয়েছে। অন্যদিকে ঋণ গ্রহীতাকে বলা হয়েছে, ঋণ গ্রহণ করার পর যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যদি (তোমাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণকারী) আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে, তবে সে অবস্থা কাটিয়ে উঠা পর্যন্ত তাকে সময় দাও। আর যদি সদকা দাও (গৃহীত ঋণ মওকুফ করে দাও) তবে এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো। (সূরা বাকারা)

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো (ঋণগ্রহীতা) দুঃস্থ ব্যক্তিকে সময় দেয় বা ঋণ মাফ করে দেয়, তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নিজের ছায়ায় জায়গা দেবেন। (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, সচ্ছল (ঋণ গ্রহীতার) ঋণ গ্রহণে টালবাহানা করা যুলুম। (বোখারী, উসওয়ায়ে হাসানা)

মন্দ প্রভাব বিস্তারী ওষুধ সেবন নিষিদ্ধ

রসূল (স.) মন্দ প্রভাব বিস্তারকারী ওষুধ সেবন করতে নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ)

একথা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, কেউ চিকিৎসা করালে সুস্থ হওয়ার আশাতেই করাবে। কিন্তু এ রকম অনেক ওষুধ রয়েছে যেসব ওষুধের প্রভাব ক্ষতিকর। একজন চিকিৎসক রোগীর অবস্থা যেমন বুঝতে পারেন, তেমনি মন্দ ওষুধের প্রভাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন। কাজেই চিকিৎসক যদি মন্দ প্রভাব বিস্তারকারী কোনো ওষুধ দিয়ে থাকেন, তবে একই সময়ে রোগ প্রতিকারের জন্যে ভালো প্রভাব সৃষ্টির ওষুধও দেন। এর ফলে রোগী মন্দ ওষুধের প্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদ হতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান পেনিসিলিনের ব্যবহার ত্যাগ করছে, কারণ, এর উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী পরিমাণে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

হারাম জিনিসের ব্যবহার

যেসব জীব আপনা আপনি মৃত্যুবরণ করে কোরআনে সেসব জীবের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো জীব জানোয়ার যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তার গোশত খেলে সে ব্যক্তিও রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে? কারণ, জীবজন্তুর রোগ সাধারণত জীবাণু এবং ভাইরাস কবলিত হয়েই জন্ম নেয়। এ কারণে মৃত পশুর গোশতে সংক্রমিত ভাইরাস রোগীর দেহে প্রবেশ করে, আর ভাইরাস আক্রান্ত সেই গোশত সুস্থ মানুষের জন্যেও ক্ষতিকর। মৃত্যুর পর মৃত পশুর পোস্ট মর্টেম করা হলে মৃত্যুর কারণ উদঘাটন করা যায়। রোগের প্রকৃতি জানা সম্ভব হলে বোঝা যাবে সেই রোগ খাদ্যকে প্রভাবিত করবে কি না। যেমন মুরগীর কথা বলা যায়। আপনার মুরগী মারা গেলে সেই মৃত মুরগীকে কোনো পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। ডাক্তার পোস্ট মর্টেম করে দেখে রোগ নির্ণয়ে সক্ষম হবেন। তারপর মতামত দিতে পারবেন সেই মুরগীর গোশত কোনো সুস্থ মানুষের জন্যে নিরাপদ কি না।

মৃত পশুর গোশতের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে রক্ত। পশু জবাই করার পর তার দেহের সব রক্ত বের হয়ে যায়। কিন্তু মৃত পশুর বা প্রাণীর সব রক্তই তার দেহে বিদ্যমান থাকে। এর ফলে গোশত খারাপ হয়ে যায়। সেই গোশত রাসায়নিকভাবে এমন বিষাক্ত উপাদান সৃষ্টি করে, যা ব্যবহার করার পর সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

রক্ত হারাম

কোরআনে রক্তকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক আয়াতে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, রক্ত দ্বারা সেই রক্ত বোঝানো হয়েছে যে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মতো।

জীবিত কোনো পশুর দেহ থেকে রক্ত বের হওয়ার পর সেই রক্ত সাথে সাথে জমে যায়। জমে যাওয়ার পর সেই রক্ত জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এই রক্ত হযম করার মতো উপাদান মানুষের পাকস্থলীতে থাকে না। কিন্তু রক্ত হজম করার মতো উপাদান বিড়াল, কুকুর, চিতাবাঘ, বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি জীবের দেহে থাকে। এ কারণে কোনো মানুষ যদি রক্ত পান করে, তবে সেই রক্ত পাকস্থলীতে গিয়ে হজম করার শক্তিকেও অকেজো করে দেবে। এর ফলে পাকস্থলী শুধু যে রক্তই হযম করতে পারবে না তা নয়, বরং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হজম করতেও সক্ষম হবে না। কেউ রক্ত পান করলে সেই রক্ত হজম ব্যবস্থাকে বিশৃংখল করে দিয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। রক্তদান করার ফলে গুরুতর অসুস্থতাও দেখা দেয়ার আশংকা থাকে।

মানুষের পাকস্থলীতে রক্ত হজম করার মতো উপাদান যে নেই একথা মানুষ খুব বেশীদিন আগে জানতে পারেনি। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে পবিত্র কোরআন

www.nagorikpathagar.org

রক্তপান করা হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মৃত পশুর রক্ত গোশতের সাথে মিশে থাকে, সেই গোশত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং রক্তে বিষক্রিয়ার কারণে সেই রক্ত বিষাক্ত হয়। রক্তে জীবাণুর সংখ্যা একদিনে কয়েক কোটিতে উন্নীত হয়। জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জীবানু শনাক্ত করা সহজ হয় এবং ওষুধ দিয়ে সেই জীবাণু ধ্বংস করা হয়। এতে বোঝা যায় যে, জীবাণু রক্তের মধ্যে পালিত হয়। এ কারণে রক্তের ব্যবহার নানা রকমের আশংকার সৃষ্টি করে।

শূকরের গোশত

কোরআনে পাঁচ জায়গায় স্পষ্ট ভাষায় শূকরের গোশতকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হিন্দুরা গাভীকে, শিখরা ময়ূরকে পবিত্র বলে মনে করে। ইসলাম শূকরের গোশতকে অপবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের কোনো বিধানই হেকমত থেকে খালি নয়, প্রতিটি বিধানের মধ্যেই হেকমত রয়েছে। এ কারণে প্রতিটি বিধান মেনে চলা ঈমানের দাবী। যারা কারণ জানতে আগ্রহী এবং ইসলাম মেনে চলে না, তারা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে যে বর্তমানে পালিত শূকরের গোশত ডাক্তার তো পরীক্ষা করেন, এই গোশত কি করে ক্ষতিকর হতে পারে?

শূকরের এমন সব অসুখ হয় যেসব অসুখ মানুষেরও হতে পারে। যেমন শূকরের রক্তের নালিতে চর্বি থাকে। শূকরের হৃদরোগ হতে পারে। ব্লাড প্রেশার হতে পারে। যে ঘরে শূকর থাকে বা যারা শূকর খায়, সেই শূকরের অস্তিত্ব তাদের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। কারণ, শূকর বাইরে ঘুরে ফিরে নানা প্রকার রোগ জীবাণু বহন করে আনতে পারে। এসব জীবাণু ঘরের লোকদের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। গাভী মহিষ বকরি মুরগীর যেসব রোগ হয়, এসব রোগ মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হয় না। যেমন ঘরের সকল মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা গেলেও ঘরের লোকদের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু শূকরের দেহে কোনো রোগ দেখা দিলে এবং সেই রোগে শূকরের মৃত্যু হলে, সেই রোগ ঘরের অন্য লোকদেরও সংক্রমিত করবে।

শূকরের উদরাময় রোগ হতে পারে, চর্মরোগ হতে পারে, গুটিবসন্ত হতে পারে, অন্ত্রে নানা রকমের কীট দেখা দিতে পারে। সেসব কীটের ডিম মাছির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। শূকর খাদ্য গ্রহণে বাছ বিছার করে না। শূকর নিজের পায়খানাও খায় নিজের শাবকও অনেক সময় খেয়ে ফেলে। জংলী শূকর অনেক সময় পাগল হয়ে যায়। কাজেই শূকরের সঙ্গে যারা অবস্থান করে তাদের মধ্যে শূকরের স্বভাব দেখা দেয় এবং যারা শূকরের গোশত খায় তারা শূকরের স্বভাব পেয়ে যায়।

ছিদ্র দিয়েও প্রবেশ করতে পারে। তারপর দেহের গোশতে অন্ত্রে বা জোড়ায় বাসা বাঁধে। এই পোকা অন্ত্রে যদি থাকে তবে ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলা যায়, কিন্তু গোশতের ভেতর প্রবেশ করে যখন নিজের চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করে, তখন কোনো ওষুধ ব্যবহারেই কোনো প্রকার উপকার পাওয়া যায় না। দেহের জোড়ায় বসবাস করা পোকার ক্ষেত্রেও একই রকমের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, এই পোকা যদি পায়ের

www.nagorikpathagar.org

গোশতে কোথাও দেখা দেয়, তবে সেই পা দেহের ভার বহনে সক্ষম হয় না। যন্ত্রণায় স্বস্তি শান্তি এবং ঘুম নষ্ট হয়ে যায়।

এছাড়া আরো এক প্রকারের পোকা রয়েছে। সেই পোকা শূকরের দেহ ছাড়া গাভীর দেহেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই পোকা মানবদেহে খাদ্য দ্রব্যের মাঝে প্রবেশ করে। কিন্তু গাভীর গোশত যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয়, এ কারণে মানবদেহে এই পোকা প্রবেশ করতে পারে না।

রসূল (স.) একথা জানতেন, একারণেই তিনি গাভীর দুধ এবং মাখন পছন্দ করা সত্ত্বেও গাভীর গোশতকে রোগ সৃষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, গাভীর দুধের মধ্যে তোমাদের জন্যে উপকার রয়েছে। কারণ, এই দুধ এবং মাখন অত্যন্ত উপকারী ওষুধ। তবে তোমরা গাভীর গোশতের মধ্যে সৃষ্ট অসুখ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো।

মোহাম্মদ আহমদ জাহাবি প্রায় একই রকম বক্তব্য হযরত সোহায়ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। মালিকা বিনতে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, গাভীর দুধের মধ্যে শেফা রয়েছে। এর মাখন উত্তম ওষুধ। তবে গাভীর গোশতের দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এখানে গভীর গোশতকে হারাম বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, তোমরা খাও- তবে খেলে তোমরা অসুস্থ হতে পারো।

গাভীর গোশত সম্পর্কে মোহাদ্দেসগণ নানা প্রকার অপ্রীতিকর অভিমত পেশ করেছেন। এসব মতামতের অধিকাংশই হচ্ছে গাভীর গোশত সম্পর্কিত। গোশতের উপকারিতা বর্ণনা প্রসংগে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। আল্লামা ইবনে কাইয়েম বলেছেন, গাভীর গোশত খেলে ক্যান্সার হতে পারে। এছাড়া দেহ ফুলে যেতে পারে। আফ্রিকা এবং মিশরে বুলহারজিয়া নামে এক প্রকার পোকা গাভীর গোশতের মধ্যে পাওয়া যায়। এই পোকা গাভীর গোশতের চেয়ে শূকরের গোশতের মধ্যে বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়।

শ্বাসরোধ করে পশু হত্যা

শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা পশুর রক্ত সেই পশুর দেহে জমাট বেঁধে থাকে। রক্ত ভেতরে থাকার কারণে গোশত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। গোশতের রং হয়ে যায় লাল। এর ফলে গোশতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। জোর করে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করা হলে রক্তের ভেতর কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এরফলে গোশতের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ রকম গোশত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

যে কোনো প্রকার আঘাতের ফলে পশুর দেহে হিস্টামিন তৈরী হয়। এর দুর্গন্ধ গোশতে ছড়িয়ে পড়ে। হিস্টামিনের প্রভাব এবং ক্ষতি সম্পর্কে আলাদা শিরোনামে বর্ণনা করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

লাঠির আঘাতে মৃত্যুবরণকারী পশুর গোশত হারাম

কোনো পশুর দেহে বা মানুষের দেহে যখন কোনো আঘাত লাগে, তখন সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় দেহে কিছু পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন মানুষ যখন মোটরগাড়ীর সাথে ধাক্কা খায় তখন তার দেহে আঘাত লাগে। দেহের কোনো হাড় ভাঙ্গুক বা না ভাঙ্গুক, দেহ জখম হোক বা না হোক, আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় এবং যন্ত্রণায় চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। হৃদস্পন্দন দুর্বল হয়, দেহ থেকে ঠাণ্ডা ঘাম বের হয়, মুখ শুকিয়ে যায়। আঘাতের কারণে মানুষ অনেক সময় বেহুঁশ হয়ে যায়। ঠোঁট কাঁপতে থাকে। ডাক্তারী ভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় সার্জিক্যাল শক।

রোগীর রক্তচাপ কমে যাওয়ায় চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। রোগীর মনে হতে থাকে সে মরে যাবে। আঘাত যদি তেমন গুরুতর নাও হয়, তবু এ রকমের অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হতে পারে। পক্ষান্তরে গুলীবিদ্ধ অনেক রোগী আমি দেখেছি, যাদের দেহে গুলীবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা তারা প্রথমে অনুভব করতে পারেনি। কারণ, গুলী দেহে বিদ্ধ হয়ে দ্রুত বের হয়ে যায়। অথচ ভারী কোনো জিনিসের নীচে চাপা পড়ে কারো পা যদি থেঁতলে যায়, তবে সেই চাপ পড়ার যন্ত্রণার তীব্রতা বেড়ে যায়। চাকু বা ছুরিকাঘাতের চেয়ে লাঠির আঘাত অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক।

দেহে আঘাত লাগার পর সেই আঘাতপ্রাপ্ত জায়গার চারদিক লাল হয়ে ফুলে যায়। তারপর সেই জায়গা নীল হয়ে যায়। রক্তের নালি ফেটে যাওয়ার কারণে বা রক্ত ছড়িয়ে পড়ার কারণে এরকম হয়ে থাকে। আঘাত পাওয়া জায়গায় যদি গরম পানি ব্যবহার করা হয়, তবে যন্ত্রণা বেড়ে যাবে এবং সেই জায়গা আরো ফুলে যাবে। পক্ষান্তরে যদি ঠাণ্ডা পানি বা বরফ ব্যবহার করা যায়, তবে যন্ত্রণা কমে যাবে এবং ফোলাও কমে যাবে। আঘাত লাগার চব্বিশ ঘন্টা পর স্যাঁক দেয়া হলে সেখানে জমাট বাঁধা রক্ত শিরায় বা নালিতে ফিরে যাবে। আঘাত লাগার প্রতিকার সম্পর্কে এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আবিষ্কার।

প্রাচীনকালের লোকেরা কোথাও আঘাত লাগার পর গরম গরম দুধ পান করতো এবং স্যাঁক দিতো। ওহুদের যুদ্ধের সময় রসূল (স.)-এর দেহে ভোঁতা অস্ত্র এবং পাথরের আঘাত লাগার পর তাঁর চিকিৎসা হিসেবে প্রথমে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলা হয়েছিলো। তারপর পানি ঢালা হয়েছিলো। এর ফলে ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধেনি। ভালোভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করার কারণে ক্ষতস্থান ফুলে যায়নি এবং জ্বালা যন্ত্রণাও অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিলো।

আঘাত পাওয়ার পর সেই যন্ত্রণায় এবং আতংকে দেহে এক প্রকারের রাসায়নিক উপসর্গ হিস্টামিন তৈরী হয়। ব্যথা থেকে সৃষ্ট সকল নিদর্শন হচ্ছে হিস্টামিনের চিকিৎসাজনিত প্রভাব। চর্মরোগেও দেহে এ রকম হিস্টামিন তৈরী হয়। জঙ্গলে বন্য জন্তু দেখে কেউ যখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন হিস্টামিন তৈরী হয়। হিস্টামিন

www.nagorikpathagar.org

তৈরীর পর বন্য জন্তু বহু দূর থেকে তার গন্ধ পায়। যেমন বাঘ যখন জঙ্গলে কোনো দিক থেকে হিস্টামিনের সুবাস অনুভব করে, তখন সে বুঝতে পারে যে কাছাকাছি জায়গায় এমন কোনো প্রাণী রয়েছে যে প্রাণী ভয়ে কাতর হয়েছে। তারপর বাঘ সেই সুবাসের দিকে অগ্রসর হয়ে সেই প্রাণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ আগে সেই প্রাণী শিকারী বাঘের নাগালের মধ্যে ছিলো না।

জীবজন্তু যখন আঘাত পায় অথবা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আহত করা হয় তখন হিস্টামিন তৈরী হওয়ার কারণে রক্তের নালি ছড়িয়ে যায় এবং রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার কমে যায়। গোশতের রং লাল হয়ে যায় এবং সেখানে হিস্টামিনের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়া পশু, লাঠি দিয়ে মেরে ফেলা পশু এবং ধাক্কা খেয়ে জখম হওয়া পশুর গোশত খাওয়া কোরআনে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলামের এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব ক্ষেত্রে হিস্টামিন তৈরী হয় এবং দেহকে প্রভাবিত করে ইসলাম সেসব বিষয় উল্লেখ করেছে। হিস্টামিন তৈরীর ফলে দেহ প্রভাবিত হয়, গোশত বিস্বাদ হয়ে যায়, গোশতের রং বিকৃত হয় এবং সেই গোশত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, ব্লান্ট ইনজুরিস পশুর গোশত হারাম ঘোষণা করে কোরআন তার অনুসারীদের রোগ প্রতিরোধের একটি পরিকল্পনা পেশ করেছে। হারাম পশুর শ্রেণীতে এইসব পশু দেখে আমাদের বোঝা উচিত যে, এই শ্রেণীর পশুর গোশত স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর হওয়ার কারণেই কোরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সকল পশুর গোশত খাওয়ার অনুপযোগী ঘোষণা করে ইসলাম মানুষের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপকার করেছে।

পবিত্র কোরআনে সেই সব পশুর গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, যেসব পশুকে কোনো বন্য জন্তু আঘাত করেছে। সেই জন্তুকে হত্যা করা হয়েছে এটা জরুরী নয়। যেমন বনের বাঘ একটি ভেড়া করলো। মানুষ ছুটে এসে সেই বাঘের কবল থেকে ভেড়াটি রক্ষা করলো। যদিও সেই বাঘ আক্রান্ত ভেড়াকে হত্যা করেনি, কিন্তু ভেড়ার দেহে বাঘের নখ ও দাঁতের আঘাত লেগেছে। ইসলামী শরীয়তে সেই ভেড়ার গোশত খাওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ।

কোনো জীবিত পশুর উপর যখন কোনো বন্য জন্তু হামলা করে তখন আক্রান্ত পশু ভয়ে কাতর হয়ে যায়। এ সময় তার দেহে যে হিস্টামিন তৈরী হয়, সেই হিস্টামিন সেই পশুকে মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী করে দেয়।

বন্য জন্তুদের মুখে বাউলাপনের জীবাণু থাকে। শহুরে কুকুরদের দেহেও বাউলাপনের জীবাণু জংলী পশুদের মাধ্যমে প্রবেশ করে। বাঘ, ভল্লুক, শৃগাল, জংলী বিড়াল, চিতাবাঘ যখন কোনো পশুর উপর হামলা করে, তখন আক্রান্ত পশুর দেহে আক্রমণকারী পশুর বাউলাপনের জীবাণু প্রবেশ করে। বাউলাপন বা রাবিশ এমন রোগ

www.nagorikpathagar.org

যে রোগের কোনো রোগী আজ পর্যন্ত বাঁচতে দেখা যায়নি। যে পশুকে বাউলাপনের হামলার মুখে পড়তে হয়, কোনো চিকিৎসা দ্বারাই সে পশু আরোগ্য লাভ করতে সক্ষম হয় না।

পশুদের মাধ্যমে বিস্তার লাভকারী বাউলাপনের চিকিৎসা যে সম্ভব নয়, ইসলাম একথা শুরু থেকে জেনেছে। এ কারণে ইসলাম তার অনুসারীদের বাউলাপন থেকে রক্ষা করার জন্যে তিনটি পদ্ধতির কথা জানিয়েছে।

(১) ঘরে কুকুর পালন করা যাবে না। ভবঘুরে কুকুর মেরে ফেলতে হবে।

(২) কুকুর যে পাত্রে মুখ দেয় সেই পাত্র কমপক্ষে সাতবার ধুতে হবে। এর মধ্যে একবার মাটি দিয়ে রগড়ে নিতে হবে।

(৩) যে পশুর দেহে কুকুর বা এ জাতীয় কোনো জন্তুর লালা লেগে যাবে, সেই পশুর গোশত খাওয়া যাবে না।

শিকারী কুকুর সম্পর্কিত বিধান

রসূল (স.) একবার মদীনার সব কুকুর হত্যা করার আদেশ দিলেন। আদেশ অনুযায়ী মদীনার সব কুকুর হত্যা করা হলো। তারপর তিনি বললেন, যে ঘরে কুকুর থাকবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কুকুরের অস্তিত্ব ঘরের লোকদের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর।

লাহোর ছাউনির এক আধুনিক পরিবারে রুশ বংশোদ্ভূত একটি কুকুরী পালন করা হতো। কুকুরীর নাম ছিলো নিশি। সেই কুকুরী ছিলো পরিবারের সবার কাছে প্রিয়। শিশুরা সারাদিন সেই কুকুরীর সাথে খেলা করতো। কুকুরী কখনো ক্ষিপ্ত হতো না। কিছুদিন পর পরিবারের এক শিশু জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো। তার দেহে বাউলাপনের জীবাণু পাওয়া গেলো। এই ঘটনার কয়েক মাস পর অন্য একটি শিশুও একই রোগে মৃত্যুবরণ করলো। কুকুরটিকে নানা প্রকার রোগ প্রতিরোধের টিকা দেয়া হয়েছিলো। সেই কুকুর ঘরের বাইরে যেতো না। অন্য কুকুরদের সাথে মেলামেশাও করতো না। সে কাউকে কখনো কামড়ায়নি। তার দাঁতও তেমন মযবুত ছিলো না। কিন্তু তার সান্নিধ্যে সংস্পর্শে দু'টি শিশু অকালে মৃত্যুবরণ করলো। কুকুরীকে পরীক্ষা করার জন্যে হত্যা করা হলো। তারপর পোস্টমর্টেম করে তার দেহে বাউলাপনের জীবাণু পাওয়া গেলো। সেই কুকুরী তার দেহের বাউলাপনের জীবাণু অন্যের দেহে সংক্রমিত করেছিলো।

জীবাণু বিশেষজ্ঞদের মতে, জন্তুর দেহ থেকে এই জীবাণু তখনই সংক্রমিত হয়, যখন তার দেহে অন্য কোনো উপায়ে এই জীবাণু প্রবেশ করে। আক্রান্ত পশুর দেহে বাউলাপনের জীবাণু প্রবেশের দশদিনের মধ্যে পশুটি মারা যাবে। বাউলাপনের জীবাণু আক্রান্ত পশুর দেহে প্রবেশ করার পর তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে। আমেরিকায় এক

www.nagorikpathagar.org

প্রকারের বাদুড় দেখা যায় যারা নিজেরা বাউলাপনের জীবাণু অন্যের দেহে পৌছে দিতে পারে, কিন্তু নিজেরা আক্রান্ত হয় না। আমি অনেক ঘটনা জেনেছি যেসব ক্ষেত্রে আক্রমণকারী পশু রোগে আক্রান্ত হয়নি, কিন্তু অন্য পশুর দেহে ঠিকই রোগের সংক্রমণ ঘটিয়েছে। চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে আমেরিকার একটা ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে একটি মেয়ে কুকুরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে বাউলাপনে আক্রান্ত হয়েছিলো। অথচ সেই কুকুরকে রোগ প্রতিরোধক টীকা দেয়া হয়েছিলো এবং অন্য কুকুরের সঙ্গে সেই কুকুরের কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় যে, যে কোনো জন্তুর লালায় শুধু বাউলাপন নয়, অন্যান্য রোগের জীবাণুও থাকে। এ কারণে যে পশুর দেহে কোনো শিকারী জন্তুর মুখের লালা প্রবেশ করেছে, সে পশুর গোশত খাওয়া মানব জীবনের জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ কারণেই রসূল (স.) সেই সব পশু খাওয়া হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যারা থাবা দিয়ে শিকার করে। উদাহরণ হিসেবে হাদীসে বাঘ এবং শেয়ালের কথা বলা হয়েছে।

যেসব পশুর গোশত হারাম

ইসলাম মানুষের জন্যে সে সব জীব বা পশু হারাম করেছে, যেসব মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। কোরআন মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছে। রসূল (স.) সেসব ব্যখ্যা করেছেন। তোহফাতুল আওয়াম নামক গ্রন্থে হারাম জীব বা পশুসমূহের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। অন্যান্য মাযহাবের সাথে এই তালিকার মামুলি মতপার্থক্য রয়েছে।

যেসব জীব ও পশু খাওয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে সেসব হচ্ছে- কুকুর, শূকর, বিড়াল, ইঁদুর, গুঁইসাপ, জোঁক, কেঁচো, বাঘ, চিতা, হাতী, ভল্লুক, শেয়াল, চিল, বাজ, ফাহীন, বাদুড়, বিচ্ছু, ব্যাঙ, মাকড়সা, সাপ, কাঁকড়া, মশা, মাছি ইত্যাদি।

যেসব হালাল প্রাণী নোংরা জিনিস খায় সেসব ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এদের পরিশুদ্ধ করার একটি পদ্ধতি রয়েছে। এসব প্রাণীকে কিছুকাল যাবত এ রকম অবস্থায় রাখতে হবে যে, তারা পরিষ্কার খাদ্য ভক্ষণ করবে। উটের ক্ষেত্রে ৪০ দিন, গাভী ২০ দিন, ভেড়া বকরি ১০ দিন, ঘরে পালিত মোরগ তিনদিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এসব প্রাণী যদি উল্লেখিত সময় ভালো জিনিস খেতে থাকে, তবে সেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয।

অন্যথা জায়েয হবে না বরং ওদের মেরে ফেলবে। কারণ, ওরা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী থাকেনি।

জবাই করা পশু

খাবার উপযোগী করার জন্যে প্রথমে পশুটি জবাই করতে হবে। জীবিত পশুর দেহ থেকে কোনো অংশের গোশত কেটে নেয়া নিষ্ঠুরতা। কারণ, কিছু অংশ কেটে

www.nagorikpathagar.org

নেয়ার পর দেহ থেকে রক্তের ক্ষরণে সেই প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে। যদি কিছু অংশ কাটার পর রক্ত বন্ধ করা হয় তবে সেই প্রাণীর নিয়মিত চিকিৎসা করতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এরকম প্রাণীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। যদি সেটি মারা যায় তবে তো গেলোই, যদি মারা না যায়, তবু ভবিষ্যতে কোনো কাজে ব্যবহার করার মতো থাকবে না। বরং সেই প্রাণীর দেহের অবশিষ্ট গোশতও কোনো কাজের উপযুক্ত থাকবে না।

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে ধর্মে গোশতকে মানুষের ব্যবহারে লাগার সহজ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। হযরত আবু ওয়াকেদ লাইমী বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) যে সময় প্রথম মদীনায় এসেছিলেন সে সময় মদীনার লোকেরা জীবিত বকরি এবং উটের দেহ থেকে আংশিক গোশত কেটে নিতো। রসূল (স.) এ সম্পর্কে বললেন, জীবিত পশুর দেহ থেকে গোশতের কোনো অংশ কেটে নেয়া হলে কর্তিত গোশত মৃত পশুর গোশত হিসেবে বিবেচিত হবে। (মোসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তি কোনো জীবিত পশুর দেহ থেকে গোশতের টুকরো কেটে নেয়, তার জন্যে সেই কর্তিত গোশত মৃত পশুর গোশতরূপে বিবেচিত হবে। (ইবনে মাজা)

জীবিত পশুর উপর অত্যাচার থেকে বিরত করার জন্যে এবং পশুর গোশতকে সুবিন্যস্ত করার জন্যে ইসলাম নীতিমালার ব্যবস্থা করেছে। এই ব্যবস্থার কারণে নৈতিকতা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে।

পশুর গোশত আহার উপযোগী করার জন্যে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। আদিযুগের মানুষ পাথর ছুঁড়ে পশুকে হত্যা করতো। বড়ো বড়ো পশুদের কয়েকদিন যাবত পাথর ছোঁড়া হতো। পশু হত্যার এই নৃশংস নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পশুর দেহে যে ব্যথা লাগে সে কারণে তার দেহে হিস্টামিন তৈরী হয়। সেই হিস্টামিন পশুর রক্তনালীতে ছড়িয়ে যায়। ভীতির কারণে এরকম পশুর মৃত্যু হলেও তার দেহ থেকে পুরো রক্ত বের হয় না। এর ফলে গোশত বিষাক্ত হয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

পৃথিবীতে মানব বসতি শুরু হওয়ার পরপরই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, পশুদের কষ্ট দিয়ে মেরে না ফেলে যেন নিয়ম অনুযায়ী যবাই করা হয়। বাইবেলে রয়েছে, 'এবং ইবরাহীম হাত বাড়িয়ে ছুরি নিলেন যেন নিজের পুত্রকে জবাই করতে পারেন।'

তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম নিজ পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশে বের হলেন, তখন যথারীতি হাতে ছুরি নিলেন। একই সঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের রক্ত গোপন করা প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি একটি বকরি যবাই করলেন এবং তাঁর কোযা সেই বকরির রক্তে ভেজালেন।

www.nagorikpathagar.org

কোরআনে জবাই প্রসেঙ্গ যাকিয়াতুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র করা। কারণ পশুর গোশত যবাই করে মানুষের খাওয়ার উপযোগী করাকেই পবিত্র করা বলা হয়েছে। এই আমল তাওরাত এবং কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ীই করা হয়।

বোখারীতে সংকলিত একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর আবির্ভাবের আগে এক দাওয়াতে গোশত রান্না করা হয়েছিলো। যেখানে তাওরাত বিশেষজ্ঞ যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নাফিলও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এরকম কোনো গোশত খাই না যে গোশত আল্লাহ তায়ালার নামে যবাই করা হয়নি। কোনো মূর্তির নামে যে গোশত উৎসর্গ করা হয়, সে গোশতও আমি খাই না। এ ঘটনায় বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) জবাইয়ের সেই নিয়ম প্রচলন করেছিলেন, ইসলামে পরবর্তীকালে যা প্রচলিত হয়েছিলো।

সে সময় থেকেই পশুদের লাঠি দিয়ে, পাথর দিয়ে, ছুরি দিয়ে যখম করার পর ঘাড় মটকানোর এক রকমের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিলো।

ইহুদীদের পশু জবাই

মুসলমান ব্যতীত ইহুদীগণ এমন এক জাতি, যারা তাদের উপর অবতীর্ণ ইলহামী কিতাবে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তারা হালাল হারাম অনুযায়ী পূর্ণ আমল করে। খৃষ্টানগণ যদিও তাওরাতের উপর বিশ্বাস পোষণ করে কিন্তু তারা হারাম জিনিস খায়। গোলাম রসূল এবং সেন্ট পল হারাম পশুদের বিস্তারিত তালিকা তৈরী করেছেন, কিন্তু খৃস্টানদের ব্যবহারিক জীবনে এই তালিকার কোনো গুরুত্ব নেই।

ইহুদীরা মুসলমানদের নিয়মেই পশুদের জবাই করে। এ ব্যাপারে হারাম জিনিস কোথাও জবাই হচ্ছে কি না দেখাশোনার জন্যে একটি জবাই কাউন্সিল গঠন করা হয়। এই কাউন্সিল বা কমিটির কাজ হচ্ছে পানাহারের জিনিসগুলো হযরত মুসার শরীয়ত অনুযায়ী হচ্ছে কি না দেখাশোনা করা। এই কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইহুদীরা হালাল উপায়ে জবাই করা গোশত ক্রয় তদারক করে। গোশত বিক্রেতাদের কার্যক্রম দেখাশোনার জন্যে ইন্সপেক্টর নিযুক্ত রয়েছে। সেই ইন্সপেক্টরের পদবী হচ্ছে মাশগিহিম।

তাওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী পশু জবাইয়ের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্যে কসাইদের উপর শর্ত আরোপ করা হয়। এসব শর্ত নিম্নরূপ-

(১) পশু চতুষ্পদ হতে হবে। তার পায়ের ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত হতে হবে। সেই পশু যেন জাবর কাটে- এ রকম হতে হবে।

(২) তাওরাতে যেসব পশু জবাই করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, জবাইয়ের জন্যে নির্ধারিত পশু সেই তালিকাভুক্ত হতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

(৩) পাখিদের তালিকায় কোনো হারাম পাখি অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

(৪) যিনি জবাই করবেন, তাকে আলেম হতে হবে এবং জবাইয়ের নিয়ম কানুন তাকে জানতে হবে। এরকম আলেমকে সোহেট বলা হয়।

(৫) জবাই করার জন্যে ব্যবহার করা ছুরি অত্যন্ত ধারালো হতে হবে।

(৬) শোয়ানোর পর পশুর মাথার নীচে গলায় ছুরি এক জায়গায়ই চালাতে হবে। এই কাজে জবরদস্তি করা যাবে না এবং ছুরি বারবার চালানো যাবে না। পশুর রগ যদি প্রথমবারে কাটা না যায়, তবে সেই গোশত হারাম হয়ে যাবে।

(৭) যিনি জবাই করবেন, তাকে জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন করার সময় হিব্রু ভাষায় দোয়া পাঠ করতে হবে।

(৮) জবাই করার পর পশুর গায়ে লবণ লাগাতে হবে, যেন দেহের পুরো রক্ত বাইরে বের হয়ে আসে।

(৯) পশু জবাইয়ের পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে সঠিকভাবে জবাই করা হয়েছে কি না। তারপর জবাই করা পশুর পায়ে একটি সার্টিফিকেট সেঁটে দিতে হবে। সেই সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে যে, খাওয়ার জন্যে বিবেচিত হলো। এছাড়া ড্রয়িং-এর মতো একটি মার্কা যবাই করা পশুর দেহে লাগাতে হবে। তার পাশে যিনি জবাই করেছেন তার নামে এবং কতো তারিখে জবাই করা হয়েছে, সেটা লেখা থাকবে।

(১০) এরকম পবিত্র গোশত সেই পাত্রে রান্না করা যাবে না যে পাত্রে অপবিত্র বা হারাম জিনিস আগে রান্না করা হয়েছে।

লন্ডনের ইস্ট এন্ড এলাকায় আবদুল্লাহ নামের একজন ইহুদী কসাইয়ের ব্যবসা রয়েছে। ইহুদীরা ছাড়াও মুসলমানরা তার কাছ থেকে গোশত ক্রয় করতো। একবার তার দোকান থেকে জবাই করা মুরগী ক্রয় করা হয়েছিলো। সেই মুরগীর পায়ের সাথে একটি ফিতা লাগানো পাওয়া গেলো। সেই ফিতায় লেখাছিলো, এই গোশত উম এবং এই মুরগী অমুক ব্যক্তি জবাই করেছে।

ইহুদীদের পশু জবাই পদ্ধতির উপর খৃষ্টানগণ প্রায়ই আপত্তি তোলে। নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন এ রকমের জবাইকে যুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করে কয়েকবার জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো।

ইংল্যান্ডে একবার এ সম্পর্কিত আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। সংবাদপত্রে যথেষ্ট লেখালেখিও হয়েছিলো। বৃটেনের বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বৃটেনের রাণীর সরকারী চিকিৎসক লর্ড হার্ডার লিখেছেন, আমি ইহুদীদের পশু জবাইয়ের নিয়ম দেখেছি। এরকম জবাইয়ের ফলে খুব সহজে শান্তিপূর্ণভাবে পশুর মৃত্যু হয়ে থাকে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাকেও এরকম শান্তিপূর্ণ মৃত্যু দান করেন।

www.nagorikpathagar.org

এর কারণ হচ্ছে, ইবরাহীমী সুন্নত অনুযায়ী জবাই করার মাধ্যমে রক্ত চলাচলের প্রধান নালিগুলো কেটে দেয়া হয় এবং পশু অল্পক্ষণের মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ ছটফট করে– কিন্তু সে সময় তার হুঁশ থাকে না। এই নিয়মে জবাই করা পশুকে খাদ্যের উপযোগী খুব সহজে করা যায় এবং এতে পশু তেমন কষ্টও পায় না।

ইহুদীদের পশু জবাই এবং ইসলাম

ইহুদীদের পশু জবাইয়ের পদ্ধতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত অনুযায়ী হয়ে থাকে। তারা সঠিক জায়গায় জবাই করে এবং জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়। কোরআনে বলা হয়েছে, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা খাও। এটা তখনই হবে যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনের উপর ঈমান আনবে। (সূরা আল আনআম)

জবাই করা এবং আল্লাহর নাম নেয়া ইসলামের সঠিক পদ্ধতির অনুসরণেই হয়ে থাকে। যেহেতু ইহুদীগণ হিব্রু ভাষায় আল্লাহর নাম নেয়, এ কারণে কোনো কোনো ফেকাহবিদ আপত্তি তুলেছেন। এ মাসআলা বিশ্লেষণ করার জন্যে একবার আমি বিশিষ্ট আলেমদের জিজ্ঞেস করেছিলাম।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তার লেখা তাফহীমুল কোরআনে ইহুদী খৃষ্টানদের জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া জায়েয বলে অভিহিত করেছেন। মুখোমুখি সাক্ষাৎকালেও তিনি একই অভিমত ব্যক্ত করেন। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আনোয়ার বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার শিক্ষা থেকে বোঝা যায় শুধু ইহুদীদের জবাই করা পশুই শুধু হালাল বরং সাবীদের জবাই করা পশুও হালাল এবং জায়েয। শিয়া আলেম মওলানা আকায়ে সাইয়েদ যাহের দি আল আখবারি বলেন, আমাদের ইমাম বলেছেন, অমুসলিমদের জবাই করা পশু সম্পূর্ণ হারাম। শিয়া আলেম আব্বাস হায়দার আবেদী বলেছেন, যদি আল্লাহর নাম নেয়া হয় এবং ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী জবাই করা হয় এবং যে ব্যক্তি জবাই করবে সে মূর্তিপূজক বা মোশরেক না হয়, তবে সেই পশুর গোশত খাওয়া জায়েয। তবে অন্যান্য শিয়া ওলামা বলেছেন, অমুসলিমদের জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম।

মওলানা আতাউল্লাহ হানিফকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার লেখা ফতোয়ায়ে মিসরী গ্রন্থ বের করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন যে, কোরআনে আহলে কিতাবদের ঘরের খাদ্য হালাল বলা হয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে। খয়বর বিজয়ের দিন এ কারণেই রসূল (স.) এক ইহুদী মহিলার ঘরে বকরির ভূনা গোশত খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামসহ রসূল (স.) সেই গোশত আহার করেছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, অমুসলিমদের জবাই করা পশুর গোশত

www.nagorikpathagar.org

জায়েয। যদিও ইহুদী মহিলা সেই গোশতে বিষ মিশিয়েছিলো এবং সেই গোশত খেয়ে একজন সাহাবীর মৃত্যু হয়েছিলো। অবশ্য ইহুদীদের ঘরের খাবার খেতে গেলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু রসূল (স.) এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কোনো কথা বলেননি। কোনো বিশেষ আদেশ প্রদান করেননি। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ হোসাইন নাঈমী বলেছেন, আহলে কিতাবদের জবাই করা পশু হালাল। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা মোশরেক হতে পারবে না এবং ইসলামী রীতি অনুযায়ী পশুকে গলা দিয়ে যেন জবাই করে। জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। আল্লাহর নাম যে কোনো ভাষায় নিলেই হবে। মাওলানা আল্লামা সাইয়েদ রুহুল্লাহ আমিনীর তাওজিহুল 'মাছায়েল' সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন মাওলানা সাইয়েদ সফদর হোসাইন নাজফি। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জবাই করার জন্যে মুসলমান হওয়া জরুরী। ঘাড়ের চারটি বড়ো রগ কাটতে হবে এবং আল্লাহর নাম নিতে হবে।

ইসলামে পশু জবাই

জবাই করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, হালাল পশুর গোশত এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যেন নষ্ট না হয়। গোশতের রং এবং স্বাদ যেন বজায় থাকে। অন্তত কিছু সময় সেই গোশত যেন খাওয়ার উপযুক্ত থাকে। পশু যদি কষ্ট দিয়ে জবাই করা হয় অথবা পশুর দেহ থেকে পুরো রক্ত বের না হয়, তবে পশুর গোশতে হিস্টামিন তৈরী হয়। পশুর দেহে রক্ত যদি থেকে যায়, তবে সেই গোশত মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, পশু জবাইয়ের ছুরি খুব ভালোভাবে ধার দিতে হবে। তারপর সেই ছুরি এমনভাবে জবাইয়ের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন পশু দেখতে না পায়। জবাই করার সময় খুব দ্রুত জবাই করবে, বেশীক্ষণ সময় নেবে না। (মোসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করার জন্যে আদেশ দিয়েছে। যদি তুমি কাউকে হত্যা করো তবে কম সময়ে হত্যা করবে। জবাই করার সময়েও দ্রুত কাজ সেরে ফেলবে। ছুরি ভালোভাবে ধার করবে এবং পশুকে তার পরিণতিতে পৌঁছে দেবে। (মোসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.) বেদিল ইবনে ওরাকা খাজাঈকে একটি ধূসর রঙের উট প্রেরণ করেন। তাকে মিনার গলিতে একথা ঘোষণা করতে বলা হয় যে, পশুদের গলায় জবাই করতে হবে। জবাই করা পশুর চামড়া ছাড়ানোর কাজে তাড়াহুড়ো করা যাবে না। মিনায় অবস্থান পানাহার এবং খেলাধুলার জন্যে হবে। (দারে কুতনী)

www.nagorikpathagar.org

এই হাদীসেও পশুর গোশত পবিত্র করার লক্ষ্যে জবাইয়ের কথা বলা হয়েছে। পশু জবাইয়ের পর জবাইকৃত পশু সম্পূর্ণ নিথর না হওয়া পর্যন্ত তার চামড়া ছাড়ানো যাবে না। পশুর রূহ যেন আরামের সাথে বের হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

জবাইয়ের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ ইবনে সফওয়ান বর্ণনা করেছেন, দু'টি মৃত খরগোশ হাতে ঝুলিয়ে আমি রসূল (স.)-এর কাছে গেলাম। তাকে জানালাম যে, হে রসূল, আমি এ দু'টি খরগোশ পেয়েছি। জবাই করার জন্যে লোহার কোনো জিনিস হাতের কাছে পাইনি। তারপর আমি একটি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে এ দু'টিকে জবাই করেছি। আমি কি এগুলোর গোশত খেতে পারি? রসূল (স.) বললেন, হাঁ খাও।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, আমার বকরির পাল ছালা' পাহাড়ে ঘাস পাতা খেতো। একদিন আমার দাসী লক্ষ্য করলো যে, একটি বকরি মরে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি একটি পাথর ভেঙ্গে সেই বকরিকে জবাই করলো। এ সম্পর্কে রসূল (স.)-এর মতামত জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাঁ খেতে পারো। (বোখারী)

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি জিজ্ঞেস করলাম- হে রসূল (স.) যদি আমরা কোনো শিকার পেয়ে যাই এবং সে সময় আমাদের কাছে ছুরি না থাকে, তবে কি আমরা লাঠি বা পাথর দিয়ে সেটিকে জবাই করতে পারবো? রসূল (স.) বললেন, তোমরা যা ইচ্ছা তা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করো এবং সে সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করো। (আবু দাউদ)

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পশু জবাই

পশুর দেহ থেকে সব রক্ত বাইরে বের হয়ে যাওয়ার পরই সেই পশুর গোশত খাওয়ার উপযোগী হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। পশুর গলার শাহরগ বা আসল শিরা কেটে ফেলার পর সেই পশু বেহুঁশ হয়ে যায়। হৃদপিণ্ড থেকে মাথার সাথে সংযুক্ত রগ কেটে দেয়া হলে রক্ত তীব্রভাবে বের হয়। তারপর পশু ছটফট করতে থাকে। পশুর পা দ্রুত নড়তে থাকে। দেহের যে কোনো প্রান্তে থাকা রক্ত সে সময় বের হয়ে যায়।

ভারত উপমহাদেশে শিখরা গোশত খায়। তারা দাঁড়িয়ে থাকা পশুর ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে কোপ মারে। পশুর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এটাকে তারা তাদের ভাষায় বলে ঝটকা। এভাবে হত্যা করা পশুর গোশতকে শিখগণ মহাপ্রসাদ নামে অভিহিত করে। ঝটকা করা পশুর শিরচ্ছেদ করার ফলে পশুর দেহ থেকে মাথার ঘাড়ের আশেপাশে থাকা রক্তই শুধু বের হয়। এতে বহু রক্ত পশুর দেহে জমাট বেঁধে থাকে। ফলে গোশতের রং নষ্ট হয়ে যায় এবং গোশতের স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। রান্না করার সময় সেই গোশত থেকে অদ্ভুত রকমের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।

ইউরোপীয় দেশসমূহে বহুকাল যাবত গোশত ঝটকা করা হচ্ছে। একপর্যায়ে তারা গিলোটিন তৈরী করেছে। পশুকে কাঠের খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়, তারপর

www.nagorikpathagar.org

উপর থেকে একটি ভারী ধারালো ছোরা এসে পশুর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মেশিনের সাহায্যে এভাবে জবাই করা পশুর গোশত খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। মৃত পশুর দেহের বিভিন্ন অংশে যেহেতু রক্ত জমাট বেঁধে থাকে, এ কারণে রান্না করার সময় সেই গোশত থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।

পশু জবাই করার আধুনিক কেন্দ্রকে বলা হয় বুটারি। এই কেন্দ্রে পশুকে ভেতরে নেয়ার পর তার মাথায় ভারী হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়। অথবা পশুর মাথায় বিদ্যুৎ শক দেয়া হয়। এতে পশু অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে শিকলের সাথে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইসলামী রীতির অনুকরণে অর্ধেক ঘাড় কেটে নেয়া হয়। আধুনিক পদ্ধতির পশু জবাইয়ে চার পাঁচ মিনিট লেগে যায়। অথচ লাহোরে ইসলামী রীতিতে পশু জবাইয়ের বুচার কেন্দ্রে ভেড়া বকরি জবাই করতে সময় লাগে এক মিনিট আর গরু মহিষের ক্ষেত্রে সময় লাগে তিন থেকে চার মিনিট।

আধুনিক পশু জবাই পদ্ধতিতে পশুকে সংজ্ঞাহীন করার জন্যে মস্তিষ্কে আঘাত বা যে বিদ্যুৎ শক দেয়া হয় এতে পশুকে ভীষণভাবে শারীরিক কষ্ট দেয়া হয়। এর ফলে পশুর দেহে হিস্টামিন তৈরী হয়। পরিণামে এই গোশত কোরআনে বর্ণিত নিষিদ্ধ শ্রেণীর গোশতে পরিণত হয়ে যায়। তাছাড়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবাই করা গোশত খেতে বিস্বাদ মনে হয়। ইউরোপে কয়েকজন সচেতন যুবককে একদিন ইসলামী রীতিতে জবাই করা পশুর গোশত খাওয়ানো হলো। অন্য একদিন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবাই করা পশুর গোশত খাওয়ানো হলো। তারা সবাই স্বীকার করলো যে, ইসলামী রীতিতে জবাই করা পশুর গোশত অধিক সুস্বাদু।

পশু জবাইয়ের ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে পশুও আরামে জীবন দিতে পারে, যারা সেই পশুর গোশত খায় তারা সুস্বাদু গোশত খেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা

নিউইয়র্কের বিভিন্ন হাসপাতালে আমি ঘুরেছি। সেসব হাসপাতালে রোগীরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকে। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোগ আরোগ্য হতে অনেক দেরী হয়। কিন্তু যেসব রোগীর আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব তাদের খোঁজ খবর নেয়, রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে- সেসব রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে।

এরকম অভিজ্ঞতার কথা জেনে নিউইয়র্কের পাদ্রীগণ বিভিন্ন হাসপাতালে যেতে শুরু করেন। তারা রোগীদের সাথে কথা বলতেন, তাদের রোগের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। তারপর রোগীদের পাশে বসে তাদের রোগ মুক্তির জন্যে দোয়া করতেন। পাদ্রীদের এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বহু রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। আমেরিকার বিখ্যাত সাময়িকী রিডার্স ডাইজেস্ট এ অবস্থাকে রূহানিয়াতি বা আধ্যাত্মিকতা বলে ব্যাখ্যা করেছে। পত্রিকাটি লিখেছে যে, দোয়া করার কারণেই রোগীগণ উপকার পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, রোগীরা সারাক্ষণ চিন্তিত থাকে এবং অস্থিরতায় ভোগে। তারা যে কোনো উপায়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে চায়। সংবাদপত্রে প্রায়ই এরকম খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায় যে, নিঃসন্তান মহিলারা রাতের অন্ধকারে কবরস্থানে গিয়ে কবর খুঁজে মৃত মানুষের হাড় বের করে, সেই হাড়ে পানি ঢালতে থাকে। এই শ্রেণীর নিঃসন্তান মহিলা কখনো নিজের প্রতিবেশীর শিশু সন্তানকে মেরে ফেলে। তারপর শিশুর লাশের উপর ঝুঁকে নানা রকম দোয়া বিড়বিড় করে পড়তে থাকে। নিজেদের সন্তানহীনতার ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে তারা নানা রকমের উদ্ভট কাজে লিপ্ত হয়।

ইসলামী রোগীদের মনের অবস্থার প্রতি সর্বপ্রথমে মনোযোগী হয়েছে। এ বিষয়ে এমন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে থাকে যাতে রোগী মনে প্রশান্তি অনুভব করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন- একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানদের উপর পাঁচটি হক রয়েছে।

(১) সালামের জবাব দেয়া (২) রোগীর সেবা করা (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা (৪) দাওয়াত কবুল করা এবং (৫) হাঁচির জবাব দেয়া। (বোখারী, মুসলিম)

ইমাম মুসলিম অপর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করে অধিকারের সংখ্যা ৬টি বলেছেন। ষষ্ঠ অধিকার হচ্ছে মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা।

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, ক্ষুধার্তকে খাবার খেতে দাও। রোগীর সেবা করো। বন্দীকে মুক্তি দাও। (বোখারী)

www.nagorikpathagar.org

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন রোগীর সেবা করি এবং জানাযার সাথে গমন করি। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত ছাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, কোনো মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের কাছে তার রোগের খোঁজ খবর জানার জন্যে এবং শুশ্রুষা করার জন্যে গমন করে, তখন সে ফিরে আসা পর্যন্ত বেহেশতের বাগানে মেওয়া খেতে থাকে। (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন বলবেন, হে বনি আদম, আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা করার জন্যে আসোনি। বনি আদম বলবে হে আল্লাহ, তুমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আমরা কিভাবে তোমার সেবা করবো? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি জানতে যে, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত, কিন্তু তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানো না, যদি তুমি তার সেবা করতে তবে আমাকে তার কাছে পেতে। (মুসলিম)

রোগীর সেবাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে রোগীদের সেবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ তায়ালা রোগীর যারা সেবা করেছে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করবেন এবং তার নিজের সেখানে উপস্থিত থাকার কথা জানাবেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আরফামের চোখের অসুখ হয়েছিলো। রসূল (স.) যায়েদের শুশ্রূষার জন্যে তার গৃহে গিয়েছিলেন। (মোসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) বলেন, কোনো ব্যক্তি কোনো রোগীর সেবার উদ্দেশে যখন গমন করে তখন সেখানে রহমতের সমুদ্রের উপর বসে থাকে, যতোক্ষণ সেখানে থাকে। এমনকি আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে ডুব দিতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, মোসনাদে আহমদ)

রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা হলে রোগীর মন শান্ত থাকে এবং তার মনোবল বৃদ্ধি পায়। রোগ রোগীর পাপ কমিয়ে দেয়। রোগীর দোয়া অন্যদের চেয়ে অধিক কবুল করা হয়।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) বলেন, তুমি যখন রোগীর সেবার জন্যে গমন করবে তখন রোগীকে দিয়ে তোমার নিজের জন্যে দোয়া করাবে। কারণ, রোগীর দোয়া হচ্ছে ফেরেশতাদের দোয়ার মতো। (ইবনে মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রোগীদের সেবার একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূল (স.) একজন বেদুইন রোগীর সেবার জন্যে গমন করেন। তিনি যখনই কোনো রোগীর সেবার জন্যে যেতেন তখন বলতেন, কোনো সমস্যা নেই, ইনশাআল্লাহ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

বেদুইন বললো, কিছুতেই না। আমার দেহের উত্তাপ বেড়ে গেছে। একজন বৃদ্ধের এই উত্তাপ তাকে কবরের সাথে মিশিয়ে দেবে। রসূল (স.) বললেন, হাঁ এরকমই হবে। (বোখারী)

সেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছিলো। লোকটি আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশা প্রকাশ করেছিলো। সে মৃত্যু কামনা করেছিলো। রসূল (স.)-কে বাধ্য করেছিলো তিনি যেন তার আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। মোটকথা তার পরিণাম ভালো হয়নি। নাউযুবিল্লাহ।

অনাড়ম্বর জীবন যাপন

ইসলাম সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের ব্যবস্থা দিয়েছে। এর সকল দিক ও বিভাগে মানুষের জন্যে রয়েছে সহজতা এবং শান্তি। রসূল (স.) সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে আমাদেরকে সাদাসিধে সহজ সরল জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছেন।

মাটি এবং কাঠের বরতন ব্যবহার সাদাসিধে জীবনের প্রমাণ। চীনের ইয়াং প্রদেশের মানুষরা পুনরায় মাটির বরতন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কারণ, ধাতুর বরতন ব্যবহারে রয়েছে ক্ষতি এবং অপকারিতা।

মানুষ যেদিন থেকে যাঁতা পেশা ত্যাগ করেছে, কূয়া থেকে পানি তোলা বন্ধ করেছে, সেদিন থেকে মহিলাদের মোটা হওয়া, আঙ্গিক দুর্বলতা, খিঁচুনি, মেয়েলী রোগ, গাইনোকোলোজিক্যাল ডিজিজ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন কথা প্রসঙ্গে বলেন, আমি একটা কথা চিৎকার দিয়ে বলতে চাই যে, আপনারা গাইনী ওয়ার্ডে ঘুরে পরীক্ষা করে দেখুন, সেইসব মহিলাই অধিক সংখ্যায় জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে, যারা গর্ভপাত ঘটায়।

গর্ভপাতের কারণে নানা রকমের মেয়েলী রোগ প্রকাশ পায়।

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যে, যে নারী অধিক সন্তান প্রসব করতে সক্ষম এরকম নারীকে বিয়ে করো। কিন্তু কম সন্তান সচ্ছল পরিবারের নিশ্চয়তা দেয়, এরকম শ্লোগানের কারণে মহিলারা নানা প্রকার রোগের শিকার হয়।

কাপড় ধোয়া ঘরোয়া কাজ। কাপড় ধোয়ার মাধ্যমে হাতের বাহু বুক এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যায়াম সম্পন্ন হয়ে থাকে। মহিলারা নানা রকমের মেয়েলী কষ্ট থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু বর্তমানে কাপড় ধোয়া হচ্ছে মেশিনের সাহায্যে। এর ফলে মহিলারা কাঁধ এবং জোড়ার ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছে।

গাইনী বিশেষজ্ঞদের মতামত হচ্ছে, যেসব মহিলা সন্তানদের বুকের দুধ পান করায় তাদের সন্তান এমনিতেই গর্ভে আসে। এর মাধ্যমেই জন্ম বিরতিকরণ পালন করা যায়। মহিলাদের নানা রকমের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয় না।

আগে মহিলারা সূতী পোশাক পরিধান করতো। তাদের মধ্যে গোপন মেয়েলী রোগের আধিক্য ছিলো না। বিশেষত তারা লিকোরিয়ায় কষ্ট পেতো না। এটা আমার

www.nagorikpathagar.org

কথা নয়, বরং অসংখ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক গবেষণার পর এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আগে মহিলাদের তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা হতো। সে সময় রুসম রেওয়াজ এবং জনসংখ্যা সমস্যার চিন্তা করা হতো না। বিশেষজ্ঞদের মতামত হচ্ছে যে, দেরীতে বিয়ে পুরুষদের জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

মহিলারা নিজ হাতে ঝাড়ু দিলে অর্থাৎ ঘর দুয়ার পরিষ্কার করলে, পানি ভরলে, শিশুদের যত্ন নিলে, খাবার রান্না করলে সেলাই করলে তারা হৃদরোগ, মুটিয়ে যাওয়া এবং মেয়েলী নানা প্রকার কষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

কেমিক্যাল মিশ্রিত মেকআপ বা রূপচর্চার কথা কোনো হাদীস গ্রন্থ থেকে জানা যায় না। কিন্তু মহিলারা যেদিন থেকে রূপচর্চা শুরু করেছে, সেদিন থেকে তাদের মুখমণ্ডলের রোগ, চেহারার সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়া রোধ করার নানা রকম ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে।

একজন মহিলার মুখে দাড়ি গজাতে শুরু করলো। নানা রকম চিকিৎসা করেও কোনো উপকার পাওয়া গেলো না। মহিলা আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এলো। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম যে, মুখের মেকআপ, ক্রিম, স্নো ইত্যাদি ব্যবহার ত্যাগ করুন। মহিলা তাই করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই মহিলা উৎকট ঝামেলা থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

খোলামেলা ঢিলেঢালা পোশাক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার নিশ্চয়তা দেয়। স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এরকম পোশাক ভিটামিনযুক্ত খাদ্যের চেয়েও উপকারী। অথচ এ রকম পোশাক ব্যবহার ত্যাগ করে আমরা প্রকৃতই অস্থিরতার মধ্যে রয়েছি।

ইসলামী জীবন পদ্ধতি সাদাসিধে কিন্তু আরামদায়ক। পাশ্চাত্যের জীবনধারা জটিল এবং যন্ত্রণাদায়ক। যারা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে, তারা নানা রকম রোগ ব্যাধি, অস্থিরতা, অনিদ্রা, আত্মহত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদের মতো সমস্যা থেকে মুক্ত জীবন কাটাতে পারে।

লিপস্টিক কিভাবে তৈরী করা হয়? আগে লিপস্টিকে এক রকম চর্বি ব্যবহার করা হতো যে চর্বি তাড়াতাড়ি বিগলিত হতো না। পরবর্তীকালে শূকরের চর্বি ব্যবহার করা শুরু হয়। দামী লিপস্টিক তৈরীতে এখনো শূকরের চর্বি মেশানো হয়ে থাকে।

লিপস্টিক, ভেজলিন, রঙিন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে ত্বকের নানা রকম রোগ হয়ে থাকে। এমনকি ক্যান্সার হওয়ারও আশংকা থাকে।

ওয়াল বাহরিল মাছজুর— আয়াতের বিস্ময়

কোরআনের সূরা তূর-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের। কোরআনের তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে– আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি সমুদ্রকে উদ্বেলিত আগুনের উপর স্থাপন করেছি।

www.nagorikpathagar.org

ফ্রান্সের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আয়াতের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান চালিয়েছে। তারা সমুদ্রের ৩০ হাজার মিটার গভীরে যখন কাজ চালিয়েছে, দেখা গেলো নীচ থেকে উত্তপ্ত পানি এবং কাদা বের হতে শুরু করে। তারা আরো গভীরে খনন কাজ চালালো। এতে দেখা গেলো যে, আরো বেশী গরম পানি এবং কাদা বের হচ্ছে। আরো নীচে খনন কাজ চালাতে গিয়ে দেখা গেলো যে, খনন কাজে ব্যবহার করা লোহা উত্তাপে গলে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে আগুন। সেই আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে অনেক বেশী উত্তপ্ত। এখানের আগুন সেই আগুনের তুলনায় কিছুই নয়। কোরআনে পুণ্যবানদের রূহের অবস্থানস্থল ইল্লিনে বলা হয়েছে। ইল্লিন হচ্ছে আকাশসমূহের উপরে। পক্ষান্তরে পাপীদের রূহের অবস্থানস্থল বলা হয়েছে সিজ্জিনে। তবে কি সিজ্জিন আগুনভরা উত্তপ্ত জায়গা? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অনেক কথা রয়েছে। সব কথার মূল কথা হচ্ছে যে, সিজ্জিনের আগুন দুনিয়ার আগুন নয়। (এলবার্ট রিপোর্ট)

সাহাবায়ে কেরামের ৬টি খাবার এবং আধুনিক বিজ্ঞান

সাহাবায়ে কেরামের নিত্য ব্যবহার্য ৬টি খাদ্যদ্রব্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। (১) উটের গোশত (২) উটনীর দুধ (৩) যবের রুটি (৪) খেজুর (৫) মধু (৬) গোলাপজল।

(১) উটের গোশতে চর্বি কম থাকায় এই গোশত ব্যবহারে রক্তে কোলস্টরেল তৈরী হয় না। এই গোশত আহার করা হলে দেহ মোটা হয় না। দেহ স্মার্ট থাকে এবং দেহের শক্তি বজায় থাকে।

(২) উটনীর দুধ। কিডনীর যাবতীয় রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে উটনীর দুধ উপকারী। এই দুধ যে ব্যক্তি পান করবে তার কখনো পান্ডুরোগ, জন্ডিস হয় না। এই দুধ পানকারীর রক্তে চর্বি জমাট বাঁধে না। অন্যান্য খাদ্য ভালোভাবে হজম হয়। দেহ মোটা হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং শক্তিশালী হয়।

(৩) যবের রুটি। এই রুটির ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) খেজুর। এ সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) মধু। মধুর শক্তি সম্পর্কে কে অস্বীকার করতে পারে। মধু একটি শক্তিশালী উপাদান। হৃদপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের শক্তিশালীকরণে মধুর ব্যবহার অত্যন্ত উপকারী।

(৬) গোলাপ জল। এক কাপ গোলাপজলে দুই চামচ মধু মিশিয়ে দিনে তিনবার খাওয়ার আগে সেবন করা হলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, পাকস্থলীর যাবতীয় সমস্যা, দেহের সাধারণ দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। গ্রীষ্মের মৌসুমে মধুর ব্যবহার উপকারী, তবে রোগীদের ক্ষেত্রে শীতকালেও ব্যবহার করা যাবে।

www.nagorikpathagar.org

মধু গরম দুধ বা গরম পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা হলে আঙ্গিক দুর্বলতা দূর হয়ে যায়।

গাভীর গোশত এবং আধুনিক বিজ্ঞান

হাকেম এবং আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (স.) বলেছেন, তোমরা গাভীর দুধ পান করো। এই দুধ রোগ প্রতিষেধক এবং এতে ওষুধি গুণ রয়েছে। গাভীর দুধের তৈরী ঘি খাও, ঘি-তে উপকার রয়েছে। তবে গাভীর গোশত খেয়ো না; কারণ, এতে রোগ রয়েছে। (হাশিয়া মোসনাদে ইমাম আজম, রাহবারে যিন্দেগী)

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এখানে রোগীদের জন্যে গাভীর গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে অথবা রুগ্ন গাভীর গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে। গাভী তো একটি হালাল জীব।

চিকিৎসা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গাভীর গোশতের মধ্যে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া টিবি এবং কিডনি রোগের কারণ হয়ে থাকে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গাভীর গোশত খেলে কিডনিতে ফোঁড়া হতে পারে। এ ছাড়া মস্তিষ্কে এক প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে, সে রোগকে বলা হয় ম্যাডকাউ।

ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্টিফেন ডুরাল তার সাম্প্রতিক গবেষণায় বলেছেন যে, গাভীদের কারণে সিজিডি রোগ তৈরী হয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত রোগী পাগল হয়ে যায়, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। এমনকি কোনো কোনো রোগী আত্মহত্যাও করে। এই রোগ ইংল্যান্ড, ভারত, কানাডা, তাইওয়ান এবং আফ্রিকার দেশসমূহের গাভীর মধ্যে অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়।

গাভীর গোশতের কারণে হৃদরোগের আশংকা দেখা দেয়। স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন কমে যায়। সুইডেনে টিবি রোগের বিস্তার ঘটেছে। গবেষণায় জানা গেছে, এর কারণ গাভীর গোশত। গাভীর চিকিৎসা করানোর পর রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় গাভীর খামারে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে চেক আপ করানো হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হয়। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গাভী যদি সুস্থ থাকে, তবে মানুষও সুস্থ থাকবে।

এফআরসিএস ডাক্তারদের প্রতি পরামর্শ

একজন প্রফেসর সার্জন বলেছেন, আমরা যখন বিদেশে স্পেশালাইজেশনের জন্যে গমন করি, তখন অপারেশনের আগে আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়– সেটা নামাযের জন্যে ওজুর মতোই।

রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার আগে আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন হতে বলা হয়। সার্জন যদি জীবাণু সংক্রমিত হাত দ্বারা রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করে, তবে সেই জীবাণু রোগীর দেহেও সংক্রমিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

অস্ত্রোপচারের আগে হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে বলা হয়। হাত এমনভাবে ধুতে হবে যেন হাতের তালু উপরের দিকে থাকে, কনুই নীচের দিকে থাকে এবং কনুই দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। কারণ, কনুই উপরের দিকে রেখে হাত ধোয়া হলে কনুইয়ের দিক থেকে রোগ জীবাণু গড়িয়ে হাতের তালুর দিকে আসবে। পক্ষান্তরে কনুইয়ের দিকে যদি রোগ জীবাণু থেকে যায়, তবে অস্ত্রোপচারের সময় সেই জীবাণু কোনো ক্ষতি করবে না।

কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়ার জন্যে ইসলামে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এইভাবে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নির্দেশ করে ইসলাম মানুষের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

সংযম ক্রোধের ধ্বংসকারিতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে ক্রোধ সম্বরণের চেয়ে বড়ো সংযম আর কিছুতে নেই। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

কুস্তিতে যে ব্যক্তি মানুষদের পরাজিত করে সে বাহাদুর নয়, বরং যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত বাহাদুর। (মাআরেফুল হাদীস)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) বলেছেন, হে মুসলমানগণ তোমাদের কারো ক্রোধের উদ্রেক হলে সে যেন নীরব হয়ে যায়। (মাআরেফুল হাদীস, উসওয়াসে রসূলে আকরাম স.)

ক্রোধ সম্পর্কে ফ্রয়েডের অভিমত

মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড-এর মতে, ক্রোধ হচ্ছে সমাজের সেই সব বড়ো বড়ো অকল্যাণের ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের অধঃপতন ক্রোধের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়। ক্রোধ মানুষের স্মৃতিশক্তিও নষ্ট করে দেয়।

ক্রোধ প্রকৃতপক্ষে মানুষের অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়। ক্রোধ সম্বরণ করার মাধ্যমে মানুষ নিজের ধৈর্য শক্তির প্রকাশ ঘটায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করতে পারে না, তাকে সব সময় লজ্জিত এবং অপমানিত অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়।

ক্রোধ জীবনকে ধ্বংস করে দেয়

ক্রোধ মানব জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন ক্রোধের সময় দাঁড়ানো থাকলে সাথে সাথে বসে পড়ে। যদি বসা অবস্থায় ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে যেন শুয়ে পড়ে। এতেও যদি ক্রোধ প্রশমিত না, হয় তবে পানি পান করতে বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ক্রোধ এবং লোভের কারণে জীবনীশক্তির বিনাশ ঘটে। প্রবীণা বয়স্কা মহিলাগণ বলেছেন, ক্রোধের সময় এবং দুশ্চিন্তার সময় মা যেন শিশুকে দুধ পান না করায়। কারণ, এতে শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিক ডক্টর রেডফোর্ড বি উইলিয়ামস লিখেছেন, যারা ক্রোধ এবং ঘৃণা পোষণ করে, তারা তাড়াতাড়ি মরে যায়। ক্রোধ এবং

ঘৃণার ফলে মানুষের হৃদপিন্ডে সেই রকমের ক্ষতি হয়- যেরকম ক্ষতি ধূমপানের কারণে এবং উচ্চ রক্তচাপের কারণে হয়ে থাকে। আমেরিকার হার্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক এবং লেখকদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্রোধ এবং ঘৃণার আধিক্যের কারণে বহু লোকের অকাল মৃত্যু ঘটতে দেখা গেছে। ক্রোধ, ঘৃণা লোভের দ্বারা তাড়িত ব্যক্তিগণ সব সময় অস্থিরতার মধ্যে থাকে।

এই শ্রেণীর লোকদের ধৈর্য কম থাকায় উচ্চাশা পূরণে ব্যর্থ হয়ে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে ধৈর্য রয়েছে, কৃতজ্ঞতার অনুভূতি রয়েছে, তারা জীবনে যে কোনো পরিস্থিতি সহজভাবে মোকাবেলা করতে পারে এবং জীবনে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

বিশেষজ্ঞগণ অস্থিরচিত্ত ক্রোধে অন্ধ লোভী ব্যক্তিদের ক শ্রেণীতে এবং এদের বিপরীত চরিত্রের লোকদের খ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, ক শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত হৃদরোগের শিকার হয়। এদের দেহে কোলেস্টরেলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে এরা ধূমপানকারী এবং হাই ব্লাড প্রেশারের রোগীদের মতোই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ডক্টর উইলিয়ামস-এর অভিমত থেকে জানা যায় যে, আমেরিকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ উপরোক্ত ক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর লোকদের সমস্যা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করা সম্ভব।

উত্তর ক্যারোলিনার ডিউক ইউনিভার্সিটির ৩৩৫জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ২৫ বছর আগে মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে যে পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, ক্রোধ এবং জিঘাংসাপরায়ণতা নিয়ন্ত্রণে রাখা লোকদের শতকরা ৩জন অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ এরা উপরোক্ত খ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে সে সময়ে ক শ্রেণীর লোকদের মৃত্যু হার শতকরা ১৫জন রেকর্ড করা হয়েছিলো।

ডিউক ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল সেন্টারে সাত বছরব্যাপী গবেষণায় জানা গেছে যে, অত্যধিক ঘৃণা পোষণকারী ব্যক্তিদেরও হৃদপিণ্ডে সমস্যা দেখা দেয় এবং তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়।

ডক্টর উইলিয়ামস ক্রোধ এবং ঘৃণা পোষণকারী লোকদের মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। তবে তিনি বলেছেন, ক্রোধ এবং ঘৃণা পোষণকারী লোকগণ অন্যদেরকে অবিশ্বাস করে, কথায় কথায় ক্ষেপে যায়, নাসিকা এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করে। এর ফলে তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা বৃদ্ধি পায়। তাদের দেহের হরমোনের ভারসাম্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। অথচ খ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত লোকদের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা দেখা দেয় না। কাজেই হৃদরোগ এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রতিরোধ করতে হলে হৃদরোগের অন্যান্য উপসর্গ থেকে নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি ক্রোধ, ঘৃণা, জিঘাংসা, হিংসা, শত্রুতা পোষণের মতো নেতিবাচক অভ্যাস পরিহার করে জীবন কাটাতে হবে। (সাইকোলজি ইন মেডিকেল)

www.nagorikpathagar.org

তেল এবং চিরুনির ব্যবহার

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) নিয়মিত মাথার চুলে তেল দিতেন এবং চিরুনি দ্বারা দাড়ি আঁচড়াইতেন। মাথায় পাগড়ির নীচে এক খণ্ড কাপড় রাখতেন। সব সময় তেল লাগার কারণে সেই কাপড়ের খন্ডকে তেলীর কাপড় মনে হতো। (মেশকাত, শামায়েলে তিরমিযী, রাহবারে যিন্দেগী)

কিছুকাল আগেও ডাক্তারগণ এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে, মাথায় তেল দেয়া, মাথায় ম্যাসেজ করে কোনো উপকার হয় না। অথচ রসূল (স.) মাথার চুলে নিয়মিত তেল ব্যবহার করতেন। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করে বুঝতে পারেন যে, মাথায় তেল দেয়া আসলেই উপকারী।

জেমস সাগমের অভিজ্ঞতা

কানাডার বিখ্যাত ফিজিও থেরাপিস্ট। স্যার জেমস সাগম-এর মতে, মাথায় তেল দেয়া আমি সময়ের অপচয় মনে করতাম। তাছাড়া মনে করতাম অর্থের অপচয়। কিন্তু একটি ঘটনা আমার ধারণার পরিবর্তন ঘটালো।

মোটরগাড়ীতে বসে আমি কিউটর গ্রামের পথে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম একজন লোক অন্য একজন বৃদ্ধের মাথা ম্যাসেজ করছে। আমি কৌতহলী হলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে। গাড়ী থামালাম। নীচে নেমে ম্যাসেজকারীকে ঘটনা জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘর থেকে বের হয়ে দূর দূরান্তে চলে যেতেন। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। এমন কি ডাক্তার মূর-এর কাছেও নিয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এ সময় একজন লোক আমাকে জানালো যে, তুমি তোমার পিতার মাথায় তেল মালিশ করতে থাকো। আমি তাই করতে শুরু করলাম। ২৭দিন যাবত তেল মালিশ করায় আমার পিতা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

লোকটির কথা শুনে আমি অবাক হলাম। রোগীর প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাকালাম। আসলেই লোকটিকে সুস্থ মনে হচ্ছিলো। এ ঘটনা জানার পর আমি পাগলদের চিকিৎসায় উক্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগালাম। আমি এতে আশাতীত সুফল পেলাম। যেসব রোগীর মানসিক চাপ রয়েছে, যাদের দীর্ঘদিন যাবত মাথা ব্যথা রয়েছে, যাদের দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা বেদনা রয়েছে, যাদের চোখের দৃষ্টি কমে গেছে, এই শ্রেণীর রোগীদের তেল মালিশ করে আমি উপকার পেয়েছি। (সায়েন্স আওর ইনসান)

মাথার চুল আঁচড়ানো হলে মাথায় এক প্রকার উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং এলার্জি তৈরী হয়। চুলের মাধ্যমে সেই এলার্জি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। নিয়মিত চুল আঁচড়ানো হলে চুল বড়ো হয় এবং ঘন হয়।

www.nagorikpathagar.org

মাথার চুল আঁচড়ানো না হলে চুলে জীবাণু আটকে যায়। সেই জীবাণু চুলের ভেতর বড় হতে থাকে। এক সময় সেই জীবাণু বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। তাছাড়া চুল না আঁচড়ালে চুলে উকুন তৈরী হয়।

রসূল (স.)-এর বরতন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.)-এর কাছে একটি কাঠের পেয়ালা ছিলো। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

রসূল (স.)-এর কাছে একটি সীসার পাত্র ছিলো। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

রসূল (স.) মাটির বরতনও ব্যবহার করতেন। (মামুলাতে নববী)

প্লাস্টিকের বরতন

প্লাস্টিকের বরতন ফ্যাশন হিসেবে চমৎকার। কিন্তু প্লাস্টিকের বরতনে খাদ্যদ্রব্য রাখা এবং আহার করা ক্ষতিকর। পানাহারের জন্যে সবচেয়ে উত্তম এবং নিরাপদ হচ্ছে মাটির পাত্র, চীনা মাটির পাত্র এবং সীসার তৈরী পাত্র।

বর্তমানে প্লাস্টিকের এবং অন্যান্য কৃত্রিম জিনিসের তৈরী পাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব ক্ষতিকর।

কোলেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা

কোলেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কেন্দ্রের ডক্টর মাইক ফিলিপ বলেছেন, প্লাস্টিকের পাত্রে গরম জিনিস যেমন চা কফি ইত্যাদি পান করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। চায়ে লেবুর রস মিশিয়ে সেই চা প্লাস্টিকের পাত্রে পান করা হলে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ, এরকম চা পান করার সময়ে গরমের প্রভাবে প্লাস্টিকের পাত্র গলে গলে চা-এর সঙ্গে মিশে যায়। ফলে এরকম চা পানে ক্যান্সারের আশংকা সৃষ্টি হয়।

ইঁদুরের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে, প্লাস্টিকের পাত্র গলে গিয়ে সেই উপাদান পেটে যাওয়ার পর ক্যান্সারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ডাক্তার ফিলিপ লোকদের পরামর্শ দেন তারা যেন প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত পাত্রেই খাবার খেতে থাকে।

মাহনামা মেডিকেল

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, চীনের ইয়াং প্রদেশের লোকেরা মাটির বরতন ব্যবহার শুরু করেছে। সেখানের গবেষণা কেন্দ্র এরকম প্রমাণ পেয়েছে যে, মাটির পাত্র একদিকে ঋতুর পরিবর্তন মোকাবেলা করে, অন্যদিকে জীবাণু শোষণ করে। এইসব বরতনে যদি জীবাণু লেগে যায়, সেই সব জীবাণু শোষণ করে বরতন অন্য দিক দিয়ে বের করে দেয়। এই বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয়া হলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই ঘটনা আমাদের পূর্ববর্তীকালের লোকদের তৃপ্তি এবং রোগ স্বল্পতার প্রমাণ।

www.nagorikpathagar.org

মানব ইতিহাসের শুরু থেকে এসব প্রাচীন বরতন ব্যবহার চলে আসছে। মাটির বরতনে পানি পান করার স্বাদ এবং ধাতু নির্মিত বরতনে পানি পান করার স্বাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতি সম্মত জিনিসের সাথে আমরা বিদ্রোহ করেছি, ফলে প্রকৃতি এর বিনিময়ে আমাদেরকে অস্থিরতা এবং উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে। বর্তমানে পলিথিনের বহুমুখী ব্যবহার আমাদের ধ্বংসের মুখোমুখি করে দিয়েছে।

আপনারা চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, আমরা আমাদের আসল জীবনের দিকে ফিরে চলেছি। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের বরতনসমূহের মধ্যে সীসা, চীনামাটি এবং পাথরের বরতন প্রাধান্য পাচ্ছে। রসূল (স.)-এর কাছে সীসার একটি পাত্র বা বরতন ছিলো।

একজন অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ডাক্তার লিখেছেন, অনেক সময় পাকস্থলীতে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত বিষ থেকে যায়। কিন্তু মযবূত পর্দার উপর সেই বিষের প্রভাব পড়ে না। সেইসব পর্দা দৃঢ়তার সাথে বিষ মোকাবেলা করে। ক্ষতি হতে দেয় না। কিন্তু এলুমিনিয়ামের উপাদান যখন সেই সব পর্দাকে দুর্বল করে দেয়, তখন বিষের প্রভাব ঠিকই কার্যকরী হয়। সেই প্রভাব লক্ষ্য করার জন্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না বরং খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

এলুমিনিয়াম পাকস্থলীতে পৌঁছে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার পর নিম্নোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(১) বমি বমি ভাগ জাগে (২) ক্ষুধা কমে যায়। (৩) রক্তের রং-এ পরিবর্তন দেখা দেয়। (৪) বদহজমির সমস্যা দেখা দেয়।

এলুমিনিয়াম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

(১) মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ভিক্টোরন বলেছেন, এলুমিনিয়াম মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে সকল অবস্থায় ক্ষতিকর। (২) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ওয়েলস লিখেছেন, এলুমিনিয়ামের উপাদান পাকস্থলীতে পৌঁছে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করা ছাড়া বিরত হয় না। দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। (৩) ডক্টর এইচ এ শিগান লিখেছেন, এলুমিনিয়ামের উপাদান পাকস্থলীতে পৌছার পর ক্ষুধা কমিয়ে দেয়। অনেক সময় পেটে ব্যথা শুরু হয়। ফলে মাথা ঘুরতে থাকে, বমি বমি ভাব সৃষ্টি হয়। (৪) আমেরিকান হেলথ লীগের প্রেসিডেন্ট ডক্টর হেল্ড বলেছেন এলুমিনিয়ামের উপাদান পাকস্থলীর শক্তি ধ্বংস করে দেয়। (৫) ডক্টর জে ওয়েস্ট নাইট এফসিএস লিখেছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এলুমিনিয়ামের দ্রব্যাদি ব্যবহার ক্ষতিকর। চমক সৃষ্টিকারী এলুমিনিয়ামের দ্রব্যাদি মহিলাদের মন কেড়ে নেয়। বহু পরিবারে এলুমিনিয়ামের পাত্রে খাবার রান্না করা হয়। তাদের উচিত এলুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার ত্যাগ করা।

www.nagorikpathagar.org

এলুমিনিয়ামের পাত্র স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর

আমাদের মধ্যে এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম যারা পানাহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের সমস্যার কথা চিন্তা করেন। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে খাদ্য বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণ মানুষদের সব সময় পানাহারের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে, এখানে ওসব বিষয়ে কারো কোনো প্রকার মনোযোগ নেই। আমরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করি। তাদের চাল চলন পোশাক পরিচ্ছদ, সভ্যতা সংস্কৃতি অনুকরণ করি, কিন্তু তাদের ব্যবহার্য তামা পিতলের বরতন বাদ রেখে তার পরিবর্তে চীনামাটি এবং এলুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছি। তামা, পিতলের উপরে এলুমিনিয়ামকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এ কারণ স্বরূপ বলা যায়, এলুমিনিয়াম সুন্দর চকচকে হওয়া ছাড়াও বেশ সস্তা। কিন্তু একথা কেউ চিন্তা করে দেখে না যে, এলুমিনিয়ামের তৈরী পাত্রে খাবার রান্না করা হলে তার উপাদান খাদ্যের সাথে মিশে যায়। ফলে স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, এলুমিনিয়ামের পাত্রে খাবার রান্না করা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। সম্প্রতি এ সম্পর্কে ডক্টর জর্জ ডুনিলসনের একটি গবেষণার কথা জানা গেছে। তিনি গবেষণায় এটা প্রমাণ করেছেন যে, এলুমিনিয়ামের পাত্রে খাবার রান্না করা হলে এই পাত্রের বিভিন্ন অংশে নানা প্রকার বিষাক্ত উপাদানে পরিবর্তিত হয়। তারপর সেসব খাদ্য দ্রব্যের সাথে মিশে যায়। অনেকে এই বিষের প্রভাব সহজে আত্মস্থ করে ফেলে। তারা এই ক্ষতি অনুভব করতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং মানুষকে রোগে আক্রান্ত করে। অন্য একজন গবেষক বলেছেন, একবার যখন সোডা ওয়াটার এলুমিনিয়ামের পাত্রে রাখা হলো, তখন ফেনা তৈরী হতে লাগলো। অথচ সেই একই পানি যখন কাঁচের গ্লাসে ঢালা হলো তখন কিন্তু ফেনা তৈরী হয়নি। খাদ্যদ্রব্য এলুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করার সময়ে পাত্রের উপাদান অবশ্যই খাদ্যের সাথে মিশে যায়। এলুমিনিয়ামের পাত্রে আধা ঘন্টা যাবত পানি গরম করা হলে সেই পানিতে হাইড্রো অক্সাইড মিশে যায়। এই হাইড্রো অক্সাইড স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।

এলুমিনিয়ামের পাত্র যদি চাকু দিয়ে একটুখানি খুঁচিয়ে জিহ্বায় লাগান তখন ফিটকারির স্বাদ অনুভূত হবে। ফিটকারিকে ইংরেজীতে বলা হয় এলাম। ফিটকারি হচ্ছে এলুমিনিয়ামের এক প্রকার লবণ। এলুমিনিয়ামের সকল রাসায়নিক উপাদানই ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত। এইসব উপাদান খাদ্যের সঙ্গে যখন পাকস্থলীতে পৌছে, তখন তৎপরতা শুরু করে দেয়।

চার প্রকারের সবজি কেটে মিশিয়ে চারভাগ করা হলো। একভাগ রান্না করা হলো চীনা মাটির পাত্রে, বাকি তিনভাগ রান্না করা হলো এলুমিনিয়ামের পাত্রে। চীনা মাটির পাত্রে রান্না করা সবজিতে পাত্রের উপাদান মিশ্রিত হয়নি। কিন্তু এলুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না করা সবজিতে পাত্রের উপাদান মিশে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

এলুমিনিয়ামের পাত্রে চা তৈরী করে ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকা হলে চায়ের মধ্যে পাত্রের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে মিশে যায়। এলুমিনিয়ামের পাত্রে কাঁচা আম রান্না করে খাওয়া হলে সাথে সাথে বমি এবং পাতলা পায়খানা শুরু হবে।

এলুমিনিয়ামের উপাদান পাকস্থলীতে পৌঁছে অন্ত্রকে দুর্বল করে দেয় এবং পাকস্থলীর নাজুক, স্পর্শকাতর পর্দায় ছোটো ছোটো জখম তৈরী করে। খাদ্য হজম হয়ে যাওয়ার পর পাকস্থলীতে এলুমিনিয়ামের উপাদান অবশিষ্ট থাকে। সেই সকল উপাদান রগে এবং পাকস্থলীর নাজুক পর্দায় প্রভাব বিস্তার করে।

এতো কিছু সত্ত্বেও এলুমিনিয়াম সর্বত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

দুধের লাচ্ছি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

রসূল (স.) কখনো নির্ভেজাল খাঁটি দুধ পান করতেন, আবার কখনো ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে পান করতেন অর্থাৎ লাচ্ছি পান করতেন। (মাদারেজুন নবুয়ত)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) তাঁর একজন সাহাবীর সঙ্গে একটি বাগানে গেলেন। সে বাগান ছিলো একজন আনসারীর। সেই আনসারী নিজের বাগানে পানি দিচ্ছিলো। রসূল (স.) বললেন, তোমার কাছে কলসীতে যদি রাতের বাসি পানি থাকে তবে নিয়ে এসো, তা না হলে আমি মুখ লাগিয়ে পানি পান করছি। সাহাবী বললেন, আমার কাছে মশকে রাতের বাসি পানি রয়েছে। একথা বলে আনসারী সাহাবী ঘরে গেলেন, একটি পাত্রে পানি নিলেন তারপর পানির উপর বকরির দুধ দোহন করলেন। রসূল সেই দুধ মেশানো পানি পান করলেন। সাহাবী রসূল (স.)-এর সঙ্গে গমনকারী সাহাবীর জন্যেও একইভাবে দুধ মেশানো পানি নিয়ে এলেন। (বোখারী)

ভেলিয়াম কিউর এবং দুধের লাচ্ছি

ভেলিয়াম কিউর অনুযায়ী যদি আমরা দুধের উপকারিতা বৃদ্ধি করতে চাই, তবে দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করা উচিত। এতে দুধের উপকারিতা বৃদ্ধি পাবে। ডাক্তার কিউর দুধের সঙ্গে পানি মেশানোর পরিমাণের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) এক্স ওয়ান। দুধ এক লিটার পানিও এক লিটার একত্রে মেশাতে হবে।

(২) এক্স টু। দুধ এক লিটার পানি দেড় লিটার একত্রে মেশাতে হবে।

(৩) এক্স থ্রি। এক লিটার দুধে চার লিটার পানি মেশাতে হবে।

এক্স থ্রি সবচেয়ে বেশী উপকারী। এই লাচ্ছি এরকম লোকদের দেবে যাদের দেহে টাইফয়েডের জীবাণু অধিক পরিমাণে রয়েছে।

যাদের পাকস্থলীর উত্তাপ বেশী। এমনকি আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে আলসারের রোগীদের লাচ্ছি ব্যবহার অত্যন্ত উপকারী। (হিউম্যান এন্ড হাইজিন)

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রস্রারের জ্বালা যন্ত্রণা, থেমে থেমে প্রস্রাব হওয়া, পাথরির ক্ষেত্রে দুধের লাচ্ছি বিশেষ উপকারী।

গরমের মধ্যে কোনো পানীয় যদি পিপাসা নিবারণে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে দুধের লাচ্ছি অত্যন্ত উপকারী। কারণ, অন্যান্য যেসব পানীয় তৈরী করা হয়, সেসব হয়তো প্রাচ্যের তৈরী অথবা পাশ্চাত্যের তৈরী। কিন্তু দুধের লাচ্ছি হচ্ছে রসূল (স.)-এর সুন্নত।

লাচ্ছি

লাচ্ছির মধ্যে এমন জীবাণু রয়েছে, যেসব জীবাণুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা পেটে গিয়েই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। সেই যুদ্ধে ওদের পরাজিত করে। এ কারণে রোগ মোকাবেলায় লাচ্ছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে লাচ্ছিকে সংগৃহিণী রোধের প্রতিষেধক বলা হয়েছে। আগুন যেমন খড় কুটোর স্তূপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি লাচ্ছি সংগৃহিনী রোগের মূলসহ উৎপাটিত করে। লাচ্ছি না খাওয়া হলে সংগৃহিণী রোগ দামী ওষুধ ব্যবহারেও নিরাময় করা যায় না। লাচ্ছিই অনেক রোগের প্রতিষেধক। সংগৃহিণী রোগের রোগীদের সব সময় বকরির দুধের লাচ্ছি পান করতে হবে।

লাচ্ছিতে ল্যাকটিক এসিড বিদ্যমান থাকায় পেটে গ্যাস সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপর এর প্রভাব বেশ ভালোভাবে তৈরী হয়। এই লাচ্ছিতে গোশত উৎপাদনকারী প্রোটিন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। এ কারণে অন্যান্য জিনিসের মতো এই লাচ্ছি হজম হতে দেরী হয় না। এই প্রোটিন খুব তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং অন্যান্য জিনিসকেও হজম করে। লাচ্ছির ব্যবহারে গুরুপাক জিনিসও হজম হওয়ার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। পাকস্থলী লাচ্ছির সাহায্য ব্যতীত সেসব গুরুপাক খাদ্য হজম করতে পারে না। লাচ্ছিতে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন, সোডিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ইত্যাদি লবণ বিদ্যমান থাকে। এসব কিছু গোশত এবং হাড়ের গঠনে অত্যন্ত উপকারী।

অনেক সময় অসতর্কতাবশতঃ এমন কিছু খাদ্য গ্রহণ করা হয়, যেসব খাদ্য সহজে হজম হয় না। এসব হজম না হওয়া খাদ্য পাকস্থলীতে ঘুরপাক খেতে থাকে। লাচ্ছি পান করার ফলে অন্ত্রে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং হজম না হওয়া সব জিনিস খুব দ্রুত হজম হয়ে যায়।

লাচ্ছি পান করার ফলে হজমের শক্তি বৃদ্ধি পায়। লাচ্ছি ব্যবহারে দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায়, দেহ মজবুত হয়। লাচ্ছির কারণে প্রস্রাব পায়খানা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হয় না। খাদ্য যথাসময়ে হজম হয়ে যায় এবং বর্জ্য খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়।

ফ্রান্সের ব্লাস্টিউট ইনস্টিটিউট-এর ডাক্তার সিচেন অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, লাচ্ছি ব্যবহার অকালবার্ধক্য রোধ করে। দেহের পুষ্টি সাধনে লাচ্ছি হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

উন্নত মানের খাদ্য। তাজা এবং মিঠা লাচ্ছি পান করা হলে অন্ত্রে বিষ সৃষ্টিকারী জীবাণু সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায় এবং হজম শক্তি বেড়ে যায়।

মোটা আটার উপকারিতা

হযরত সোহায়ল ইবনে সাদ (রা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো যে, রসূল (স.) কখনো সাদা মিহিন ময়দার রুটি খেয়েছেন কি না? হযরত সোহায়ল (রা.) বললেন, রসূল (স.) সামনে তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত কখনো ময়দা আসেনি। প্রশ্নকারী তারপর জিজ্ঞেস করেন, রসূল (স.)-এর যমানায় আপনাদের কাছে কি চালুনি ছিলো? তিনি বলেন, না চালুনি ছিলো না বরং আটার উপর ফুঁ দেয়া হতো। এতে বড়ো বড়ো মোটা মোটা ভুষি উড়ে যেতো, তারপর অবশিষ্ট আটা খামির করে রুটি তৈরী করা হতো। (শামায়েলে তিরমিযী)

আধুনিক বিজ্ঞান খাদ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আজে বাজে খাবার খেয়ে অসুস্থ হওয়া রোগীদের ওষুধ ব্যবস্থা করা হলে সেই ওষুধেও উপকার হয় না। আমাদের রোগীগণ আজেবাজে খাবার খেয়ে দেহ সুস্থ রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। খাদ্যের মধ্যে প্রথমে রয়েছে আটার প্রসঙ্গ। বাজারে যেসব আটা বিক্রি হয় সেসব ময়দার মতো। যারা ঘরে আটা পেষাই করে তারা মিহিন করেই পিষে।

নখ কাটা ও সুন্নতে নববী

রসূল (স.) কখনো জুমার দিনে, কখনো বৃহস্পতিবার নখ কাটতেন। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূল (স.) পনের দিন পর পর নখ কাটতেন। (ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এক প্রকার জীবাণুর ডিম মানুষের নখের ভেতর অবস্থান করে। মানুষ যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন এসব জীবাণুর ডিম খাদ্যের সাথে মিশে পেটে চলে যায় এবং ভেতরে ভেতরে পুষ্ট হতে থাকে।

ক্রিমির ওষুধ খাওয়ার সময় হাত দিয়ে সরাসরি সে ওষুধ মুখে দিতে চিকিৎসকগণ নিষেধ করেছেন। তারা বলেছেন, এই ওষুধ শুকনো কাগজে রেখে তারপর মুখে দিতে হবে। ক্রিমির ওষুধ খাওয়ার আগে গোসল করতে হবে। তারপর রোদে শুকানো কাপড় পরিধান করতে হবে। বিছানার চাদর ধুতে হবে। তারপর রোদে শুকাতে হবে এবং ইস্ত্রি করে বিছানায় বিছাতে হবে। রাতে ক্রিমির ওষুধ খাবে। সকালে উঠে গোসল করবে অল্প গরম পানি দিয়ে। কারণ, ক্রিমির ডিম অনেক সময় হাতে পরিহিত পোশাকে লেগে যাওয়ার কারণে পেটের ভেতর চলে যায়। যদি পোশাক পরিষ্কার করা হয় এবং নখ কাটা হয়– তবে ক্রিমির ডিম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দৈহিক সুস্থতা অর্জিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব মহিলা নখ বড়ো করে রাখে তারা রক্তশূন্যতার শিকার হয়। এছাড়া এই শ্রেণীর মহিলারা মানসিক রোগেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ বলেছেন, নখ বড়ো করা এতোটা বিপজ্জনক যে, মহিলারা এমন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় যে তারা আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হয়।

ইসলামে পানির পরিচ্ছন্নতা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা জীবজগত এবং প্রাণী জগতের জীবন ধারণ বাতাস ছাড়াও পানি নির্ভর করেছেন। এতে কমবেশী হওয়া শুধু প্রাণী জগতের স্বাস্থ্যের উপরই সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে না বরং তাদের খাদ্যদ্রব্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোথায়ও পানির স্বল্পতা দেখা দিলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় এবং জীবজগত ও প্রাণী জগত ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

জীবন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পানির উপর কোরআনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ভাষায় বলেছেন, আমি পানির মাধ্যমে প্রতিটি জিনিসকে জীবন দান করেছি। বাতাস ছাড়া জীবন চলে না। এই বাতাসে যদি পরিমিত পরিমাণে জলীয় উপাদান না থাকে, তবে সেই বাতাসও জীবন ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

বাতাস এবং আলো যে কোনো জিনিসকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে সাহায্য করে। কিন্তু সেটা করে ধীরে ধীরে। কিন্তু পানি নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুব দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। বাতাস এবং আলো দীর্ঘ সময়ে যে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করে দেয়, পানি কয়েক মিনিট সময়েই তা সম্পন্ন করে।

আগুন পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার ব্যবস্থা করে পানির চেয়েও দ্রুত। কিন্তু যে জিনিসকে পবিত্র করে সে জিনিসের অসম্ভব রকমের ক্ষতি করে ফেলে। অথবা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পানির চেয়ে সহজ কোনো জিনিস নেই। পানি কোনো ক্ষতি করে না। পানি নিজে পবিত্র, অন্যদেরও পবিত্রতার ব্যবস্থা করে। পানি মহান আল্লাহ্ তায়ালার এক বিশেষ নেয়ামত। পানি পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার জন্যে একদিকে যেমন অপরিহার্য, তেমনি পানি যদি নোংরা এবং দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে তবে তা স্বাস্থ্যের জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে পানির পবিত্র হওয়া জরুরী। মানুষের স্বাস্থ্য পানির পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

কোরআনে অসংখ্য জায়গায় পবিত্র পরিচ্ছন্ন পানির ঝর্ণাধারার কথা নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে নোংরা বিস্বাদ পানির অপকারিতা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোরআনে বৃষ্টির পানির অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। এই পানি

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। আল্লাহ তায়ালা এই পানি আকাশ থেকে বর্ষণ করেন। এই পানি মাটিকে সকল ক্লেদ কলুষ থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে। মৃত, অনুর্বর, বন্ধ্যা যমীনকে সজীব এবং উর্বরতা দান করে।

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে এবং ইসলাম নির্দেশিত পবিত্রতা অর্জনে পানির কোনো বিকল্প নেই। কাজেই পানির পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানা না যায়, তবে এ পানি সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পানির পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা সম্পর্কে হাদীসে এবং ফেকাহর কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সেসব আলোচনা সম্ভব নয়। সেই সব কিতাবে পানির ব্যবহার উপযোগী হওয়া না হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ব্যবহারকারীর উপর। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, যে পানিতে কোনো নোংরা জিনিস পড়ার কারণে পানির রং ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, সে পানি নাপাক।

ইসলামী ফেকাহর কিতাবে কতোটুকু নোংরা পতিত হলে কি পরিমাণ পানি নাপাক বা অপবিত্র হয়, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনায় ফকীহদের ছোটোখাটো মতপার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। এতে বোঝা যায়, ইসলামের শিক্ষায় পানির পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার কতোটুকু গুরুত্ব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পানি সমস্যা হচ্ছে স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক সমস্যা।

স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে পানির ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পানির কমবেশী হওয়া স্বাস্থ্য রক্ষার মাপকাঠির উপর প্রভাব বিস্তার করে। উন্নত বিশ্বের বড়ো বড়ো শহরে সব রকম নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান। সেসব জায়গায় পানির সমস্যার কথা শোনা যায় না, কিন্তু বিশ্বের তিন চতুর্থাংশ মানুষ যারা বনে জঙ্গলে, গ্রামে বাস করে, উন্নত বিশ্বের সুবিধাভোগী মানুষ ওইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরও নিজেদের মতোই মনে করে। উন্নত বিশ্বের মানুষ উল্লেখিত সুবিধাবঞ্চিত লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে এবং পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্যে সেই পরিমাণ পানির কথাই চিন্তা করে, যে পরিমাণ পানি তারা নিজেরা ব্যবহার করে। অথচ তারা ভেবে দেখে না যে, বিশ্বের বহু এলাকা এমন রয়েছে যেখানে পান করার মতো পানি মাইলের পর মাইল দূর থেকে মাথায় করে অথবা যানবাহনে করে সংগ্রহ করতে হয়। এমনকি এরকম দারিদ্র্যকবলিত বহু এলাকা রয়েছে, যেসব এলাকার মানুষ পানাহারের জন্যে খাদ্যপানীয় থেকে বঞ্চিত। এই শ্রেণীর হতদরিদ্র লোকদের সম্পর্কে যদি চিন্তা করা হয় যে, তারা টেপের নীচে বসে গোসল করবে, নিজের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে, তবে সে চিন্তা হবে নির্বুদ্ধিতা।

ইসলামে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা পানির কমবেশী পাওয়ার নিরিখেই করা হয়েছে। এই মাপকাঠি স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল

www.nagorikpathagar.org

আলামীন করে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থার ফলে পানি কম থাকুক বা বেশী থাকুক, ইসলামের অনুসারীদের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না।

রসূল (স.) স্থির বা বদ্ধ পানিতে কোনো নোংরা ফেলতে বা প্রস্রাব পায়খানা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ, সে পানি ধোয়া মোছা গোসল করা অথবা পান করার কাজে ব্যবহার হয়। রসূল (স.) বহুকালের পুরনো জলাশয়ের অব্যবহৃত বদ্ধ পানি পান করতে এবং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এরকম কূপের পানি বিষাক্ত হয়ে যায়। রসূল (স.) এরকম জলাশয়ে অবতরণ করতেও নিষেধ করেছেন।

বরতন ঢেকে রাখা

রসূল (স.) পানাহারের পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়টি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে কতো বড়ো সতর্কতা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। কারণ, পানাহারের পাত্র ঢেকে না রাখা হলে সাপ, বিচ্ছু বা অন্য কোনো বিষাক্ত প্রাণী সেই পাত্রে মুখ দিতে পারে। ইতিহাসে এবং সমাজ জীবনে এরকম বহু ঘটনার উদাহরণ পাওয়া যায়।

খোলা পাত্রে খাদ্য পানীয় থাকার সময়ে যদি কুকুর সে খাদ্যে মুখ দেয়, তাহলে কুকুরের বহন করা বিপজ্জনক জীবাণু সেই খাদ্যের সাথে মিশে যাওয়ার আশংকা থাকে। ধুলাবালির সাথে প্রচুর রোগ জীবাণু উড়ে বেড়ায়। যদি খাবার পাত্র খোলা থাকে তাহলে রোগ জীবাণু সেই পাত্রে এসে পড়বে। সেই খাবার খেলে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

খাবারের পাত্র খোলা রাখা হলে সেই খাবারে যদি কারো বদনজর লাগে, তবে সেই ব্যক্তির চোখের নেগেটিভ রশ্মি খাদ্যের সাথে মিশে যাবে। তারপর সেই খাবার কেউ গ্রহণ করলে অবশ্যই রোগাক্রান্ত হবে।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

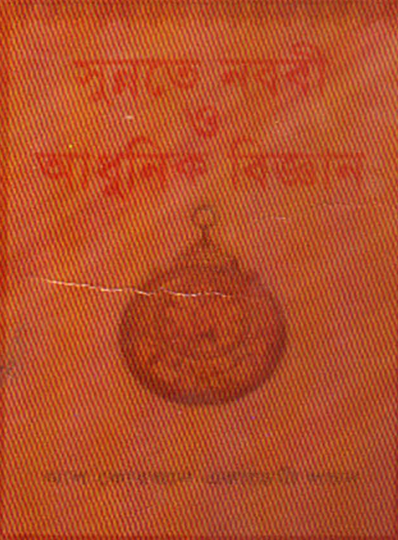

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স